উৎসর্গ

স্নেহময় বশীদা ও বৌদি গার্টরুড এমার্সন
স্নেহনিলয়াসু

যার তর্পণ আজ নিবেদন করছি ছড়ায়—তাকে যারা
জানত তাদের আপন ব'লে—সংখ্যায় নয় বেশি তারা।
তাদের মধ্যে আমরা ত্রয়ী আজো বেঁচে বর্তে আছি :
তার আত্মার তর্পণে আজ এলাম আরো কাছাকাছি।

চুম্বক তার যাদের কাছে আনত টেনে প্রবল টানে,
তার অনাবিল প্রেমের পরশ পেয়ে তারা স্তব-গানে
গাইত যেন চমকে : "এ কী ! বৈরাগীও এমন ভালো
বাসতে পারে কেমন ক'রে, হাসতে এমন ঝরিয়ে আলো !"

নিত্য শোনা তার সে-সরল ভাগ্য অমল তত্ত্বকথার !
চর্মচক্ষে ধর্মব্রতে দেখা ত্যাগের তপস্যা তার !
চশমা চোখে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব করে যারা
তারাও দেখে তার সাধনা হ'ত না কি আত্মহারা ?

নয় তো সে-ত্যাগ কথার কথা—স্বদেশ স্বজন স্বভাষারও
নয় অভিমান কেবল, ছাড়া শ্বেতত্বকের অহঙ্কারও '
অধীন জাতির প্রজ্ঞা বরি' অকিঞ্চনের অশ্রুজলে
অচিন বিদেশিনীকে তার বরণ করা 'গুরু' ব'লে !

অবাক্ হ'য়ে কত প্রবীণ বলত : "ওরে ! এ কে এলো
খাস গোরা দীন ভক্তবেশে ! এত রূপ সে কোথায় পেলো !
বিজ্ঞ হেসে কোন্ সাহসে পাগলই বা বলি তাকে—
বিদ্যার যার নেই পার, হার বুদ্ধি মানে দেখে যাকে ?"

"অচিন যে-সেই চিরচেনা", উঠত কে উচ্ছ্বাসে গেয়ে ?
"আপন যাদের বলি তারা নয় কেউ আপন হরির চেয়ে।
তার কিরণেই ভুবন আলো, যে পেল ভাই, তার দরশন
থাকে না তার বাঁধন রে আর, হয় একাকার জীবন মরণ!'

বিষয়ীরাও অবাক্ হ'ত দেখে যাকে দিনে দিনে,
প্রণাম ক'রে যাকে—তারি আশীর্বাদে নিত চিনে
তাকে অলখ শ্যামলেরই দূত ব'লে এ-ধরাতলে,
কোরো গ্রহণ তার নামে যে-গান বেঁধেছি চোখের জলে।

ইতি
স্নেহঋণী দিলীপ

উদ্বোধন

(কবি নিশিকান্ত)

কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা।
দূর করো তার গতির প্রবাহে প্রমত্ততা।
হৃদয়রক্তে যেটুকু সে পায়
তারি অনুভূতি যেন সে জাগায়,
বাণী যেন তার বহে সুনিবিড় বিমৌনতা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা।

কী হবে ভাসায়ে অকারণে শাদা মেঘের ভেলা ?
কী হবে আকাশকুসুমের রঙে রাঙায়ে বেলা ?
যে-কুসুম ফুটে ওঠে আঙিনায়,
তাই দিয়ে যেন অর্ঘ সাজায়
তার প্রতিফলে পরশিয়া, দাও তন্ময়তা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা।

দূর করো তার বিলাসবিলোল আবর্জনা,
অতিরঞ্জিত অযুত আত্মপ্রবঞ্চনা,
আকুলতাহীন অভিসারনিশা,
তাপহীন রবি, জ্বালাহীন তৃষা,
পরিণয়হীন প্রণয়োৎসব-প্রগল্ভতা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা।

কী হবে লিখিয়া শূন্যের পটে তারার লিখা ?
জ্বালিতে শিখাও আঁধার পথের প্রদীপশিখা।
একবিন্দুর শক্তি ঢালিয়া
সিন্ধুদোলায় দুলায়ো না হিয়া,
ভাসায়ো না ফেন-উচ্ছ্বাসময় উচ্ছলতা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা।

বেদনারে তার কর গো মগন অতল-রসে,
পুলকেরে তার রাখো প্রোজ্জ্বল চেতনাবশে,
বাসনারে তার দাহনে দহিয়া
নিখাদ সোনায় আনো গো বহিয়া,
কামনারে তার দাও সাধনার সার্থকতা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা ।

মুক্তিরে করো প্রাণ-প্রেরণায় উৎসারিত,
শক্তিরে করো লব্ধ আলোকে উদ্ভাসিত,
রাখো তার গতি সত্যের পথে
দিকে দিকে দিক্-বিজয়ের রথে,
দূর করো তার স্বপ্নবিভোল বিমুগ্ধতা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা ।

রচনায় তার আপনারে যেন রচনা করে,
মর্মশোণিতে মানসকমল বিকশি' ধরে ।
হে চিরবন্ধু, হে পরাণ-প্রিয় !
পরাণে তোমার গ্রন্থি বাঁধিয়ো,
অভিন্ন করো তার মধুরতা, বন্ধুরতা :
কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা ।

ভূমিকা

এ-যুগে কথাসাহিত্যের অভ্যুদয়ের পরে বাণীর বাগানে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে উপন্যাসের শতদল, তার পরেই ছোট গল্পের গোলাপ। ডি এইচ লরেন্স উপন্যাসকে বরণ করেছেন "দি বুক অফ লাইফ" ব'লে। কারণ নিশ্চয়ই এই যে, উপন্যাসে সর্ববিধ রসেরই সমাবেশ হয়েছে প্রায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ম'ত: কাব্যরস থেকে স্থরু ক'রে নাটক, ভ্রমণ, বর্ণনা, ইতিহাস, জীবনচরিত, স্মৃতিচারণ, মনস্তত্ত্ব, রূপকথা, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্রূপ—এমনকি যুদ্ধবিগ্রহ গোয়েন্দা-কাহিনীকেও কথাসাহিত্যিক তাঁর রংমহলে সাদরে স্থান দিয়েছেন।

কেবল ধর্মীয় অনুভব উপলব্ধি স্থান পেলেও তেমন মান পায় নি। কয়েকটি কথাচিত্রে (যেমন, টলস্টয়ের ধর্ম কথিকায়) ধর্মের আহ্বান বেজে উঠলেও তেমন প্রতিষ্ঠা পায় নি যেমন পেয়েছে শাস্ত্রে, দর্শনে, আপ্তবাক্যে, কাব্যে। "সং অফ বার্ণাদেৎ"-বর্গীয় দু-একটি ধর্মীয় কাহিনীর কিছুটা নামডাক হয়েছে বটে, কিন্তু সে শুধু তাদের ঐতিহাসিক তথ্যমূল্যের খাতিরে, কোনো অনস্বীকার্য রসমূল্যের জন্যে নয়।

এর একটি কারণ—ধর্মীয় উপলব্ধি যাঁদের হয়েছে তাঁদের মধ্যে কোনো প্রতিভাধর কথাশিল্পীর অভ্যুদয় হয় নি। আর একটি কারণ—ধর্মাত্মারা কথা-সাহিত্যকে ছেলেমানুষি ব'লে হেনস্থা ক'রে আত্মপ্রকাশের মোড় ঘুরিয়েছেন ধর্মপ্রচারে, শিষ্যদীক্ষায়, স্মৃতিসংহিতাকথামৃত-প্রণয়নে—সর্বোপরি নানা সংঘ গঠনে। কথাচিত্রের মধ্যে দিয়েও রসের নির্ঝরণ যে ধর্মীয় পরিবেশে মানুষকে পরমানন্দ পরিবেষণ করতে পারে এমন কথা সোচ্চার ঘোষণায় কেউ বলতে সাহস পায়নি টলস্টয়ের আগে। টলস্টয় পেরেছিলেন কারণ প্রতিভাধরদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন মহাগল্পশিল্পী যার গভীর ধর্মানুভূতি হয়েছিল খৃষ্টের কৃপায়।

আমার মন আশৈশব রসের স্নিগ্ধ স্বাদ পেয়ে এসেছে মহাপুরুষদের জীবন-চরিতে তথা কথালাপে—প্রথমে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে, পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে যার পাঁচ খণ্ড অন্ততঃ চল্লিশ-পঞ্চাশবার পড়েছি (এখনো পড়ি) শুধু স্বাধ্যায় ব'লে বরণ ক'রে নয়, আনন্দঝোরা ব'লে অঙ্গীকার ক'রেও বটে। এ আমার অত্যুক্তি নয় যে, মহাপুরুষের বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী আমার কাছে আশৈশব সৎসাহিত্যের মতনই শুধু বরেণ্য নয়, রসালও মনে হয়েছে।

কৈশোরে আশ্চর্য প্রতিভাধর কথামৃতকার মহাত্মা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে আমি গিয়েছিলাম আমার এক পিসতুত ভাইয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কির ফলে—যেকথা আমার "স্মৃতিচারণ"-এ লিখেছি।* তিনি কেন জানি না আমাকে বিশেষ ক'রেই বলেছিলেন নানা মহাজনের স্মরণীয় উক্তি আমার ডায়রিতে টুকে রাখতে। তাঁর এ-নির্দেশবীজ আমার উত্তরজীবনে উত্তরোত্তর ফুল ফুটিয়েছে আমার নানা স্মৃতিচারণী আত্মকথায়—তীর্থঙ্কর, অ্যামং দি গ্রেট, এদেশে ওদেশে, ভ্রাম্যমাণ, কুম্ভ, নেতাজী, যোগী কৃষ্ণপ্রেম—বর্গীয় গ্রন্থে।

অতঃপর সম্প্রতি আমার প্রিয়তম বন্ধু একনিষ্ঠ যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের দেহরক্ষার পরে† আমি স্থির করি বাংলায় তার স্মৃতিকথা আঁকব রমন্যাসের ঢঙে। আমার YOGI KRISHNAPREM বইটিতে ঐতিহাসিক ভঙ্গিকেই বরণ করেছি। এখন বাংলার পালা। আমার নানা অঘটনী রমন্যাস বহু পাঠক পঠিকার অভিনন্দন পেয়েছে ব'লে ভরসা হয় এ-পরম ভাগবতের চরিত্রের রূপায়নও অনাদৃত হবে না এ-রমন্যাসের কাঠামোয়।

কিন্তু সংকল্প করলে হবে কি, পুণায় আমাদের মন্দিরের নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার দরুণ নববর্ষে এ রমন্যাসটি সুরু করতে পারিনি। আরম্ভ করি জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে ও শেষ করি ২৯এ আষাঢ় ১৪ জুলাই, ১৯৬৬ তারিখে।

লিখবার সময় যে আনন্দ-বেদনার প্রেরণা আমাকে এ-ত্রিশ দিনের মধ্যে একদিনও বিশ্রাম নিতে দেয়নি তার মূলে ছিল সেই পরম বন্ধু যার মিতালিকে আমি ঠাকুরের করুণার অন্যতম নিদর্শন ব'লেই বরণ করেছি—যে করুণার প্রসাদে তাকে আমি পেয়েছিলাম শুধু সাধনসাথী-রূপেই নয়—বহু অবসন্ন মুহূর্তেও দিব্য ভরসা-রূপে।

এবার কয়েকটি কথা ফলিয়ে লিখতে চাই—যাকে বলে পরিপ্রেক্ষণিকা (survey) ওরফে জরীপ।

(১) উপন্যাস লেখার প্রেরণায় আমি প্রথম দিকে লিখেছিলাম পর পর পাঁচটি উপন্যাস : ভাবি এক হয় আর, দ্বিচারিণী, দোটানা, ধূসরে রঙিন ও

* স্মৃতিচারণ প্রথম পর্ব, ২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রীম-র নির্দেশের কথা আমার তীর্থঙ্কর ও আমং দি গ্রেটের ভূমিকাতেও বিশদ করেই লিখছি।

† ১৪ নভেম্বর, ১৯৬৪ সালে নৈনিতালে শেষ নিশ্বাসে সে বলে : "আমার জাহাজ ছেড়েছে—My ship has sailed."

দোলা। এগুলির মধ্যে আত্মিক ধর্মজিজ্ঞাসার চেয়ে মানস সত্যান্বেষণের রসই বোধহয় বেশি ফুটেছে—যাকে নাম দেওয়া হ'য়েছে 'ইনটেলেকচুয়াল উপন্যাস'। অর্থাৎ বুদ্ধির সত্যানুসন্ধান কল্পনার খাসমহলে।

অতঃপর—উত্তরযোগজীবনে—আমার আত্মপ্রকাশ আর নিছক বুদ্ধির নির্দেশ পথে উধাও হ'তে পারেনি, কারণ শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা নেবার পরে আমার মানস জিজ্ঞাসা আত্মিক তৃষ্ণার দিকে মোড় নিয়েছিল—যেমন প্রতি আন্তরিক ধর্মার্থী সাধকের বেলায়ই ঘটে।

আমার এই সাধক ওরফে যোগীর রূপকে আমার বন্ধুরা কেউই সুনজরে দেখেন নি এক কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া। সে আমাকে এ-সম্পর্কে কী লিখেছিল তার খবর মিলবে আমার YOGI KRISHNAPREM-এর তৃতীয় পর্বে তার নানা উপদেশ ও অভিনন্দনে। "ছায়াপথের পথিক"-এ আমার নানা সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে শ্রীঅরবিন্দের প্রজ্ঞা ও কৃষ্ণপ্রেমের স্বজ্ঞা (ইনটুইশন) আমাকে কী ভাবে ও কতখানি আলো দিয়েছিল সেই সংবাদই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। এ-বর্ণনায় নানা স্থানেই কল্পনার মিশেল থাকলেও সর্বত্রই সত্য কথনের ঝঙ্কার অভিজ্ঞ সত্যার্থীদের কানে বেজে উঠবে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

অতঃপর আমার জীবনে আমার কন্যাশিষ্যা ইন্দিরার শুভাগমন হয়। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন—তাকে শিষ্যা ব'লে বরণ করে আমার সাধনসঙ্গিনী করলে আমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে। (এইজন্যেই তার সঙ্কট অসুখে তিনি আমাকে জব্বলপুরে পাঠিয়েছিলেন যার কিছুটা ইতিহাস আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME স্মৃতিচারণের শেষে পেশ করেছি)। কৃষ্ণপ্রেম গুরুদেবের এ-আশ্বাসে শুধু যে সায় দিয়েছিল তাই নয়, ইন্দিরাকে গভীর স্নেহে আশীর্বাদ ক'রে বরণ ক'রে নিয়েছিল আমার সাধনসঙ্গিনী রূপে। কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে আমি যে-বইটি লিখেছি তার দ্বিতীয় পর্বে কৃষ্ণপ্রেমের নানা পত্রেই একথার সাক্ষ্য মিলবে।

(২) অতঃপর পণ্ডিচেরি আশ্রম ছেড়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরার মাধ্যমে ও কল্যাণে আমার সাধনার একটি নতুন দিক খুলে যায়: একের পর এক সার সার নানা অঘটন চাক্ষুষ করি—যার উৎসমূল ওর মধ্যে নানা যোগবিভূতির অভ্যুদয়। এ-চমকপ্রদ প্রেরণায় আমি লিখি আমার প্রথম রমন্যাস—"অঘটন আজো ঘটে।" বইটি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েটেড পাবলিশার্সের দাক্ষিণ্যে প্রকাশ

হ'তে না হ'তে বহু পাঠক পাঠিকাই সোচ্ছ্বাসে সাড়া দেন। আমি শতাধিক পত্র পাই নানা ভাবুক ও রসিকের কাছ থেকে—এখনো পাই প্রায়ই।

উৎসাহিত হ'য়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েটেড পাবলিশার্স আমার দ্বিতীয় রমন্যাস প্রকাশ করেন—"অঘটনের ঘটা"। বাকসাহিত্য সাগ্রহে ছাপেন "অভাবনীয়"—আমার তৃতীয় রমন্যাস। তারপর রূপা এণ্ড কোং ছাপেন আমার চতুর্থ উপন্যাস—"অঘটনের শোভাযাত্রা"। তারপর "অঘটনেব পূর্বরাগ —প্রকাশক সুনীল মণ্ডল (৭৮/১ মহাত্মা গান্ধি রোড)। তারপর "অশ্রুহাসি ইন্দ্রধনু"-র প্রথমার্ধ "হাসিরাশি" জনসেবক বার্ষিকীতে ছাপা হয়। অতঃপর এর দ্বিতীয়ার্ধে বেরোয় কাশীর "উত্তরা" পত্রিকায় "অঘটনে অশ্রুরাঁশি" নামে। (এ-ছুটি একখণ্ডে ছাপা হবে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই আশা করি।) এরপর প্রকাশিত হয় আমার "অঘটনী গল্পমালা"-য় নয়টি ছোট গল্প ও একটি নাটিকা বন্ধুবর শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষের কল্যাণে (২০-এ গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২)। এরপরে প্রকাশিত হ'ল এই বইটি—"ছায়াপথের পথিক"। এ-পর্যায়ের শেষ উপন্যাস "পতিতা ও পতিতপাবন" আশা করি ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করবে। পরপর এতগুলি ধর্মীয় উপন্যাস লিখেছি এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে, অদূর ভবিষ্যতে ধর্মীয় রমন্যাস বঙ্গসাহিত্যে রসাল রম্য রচনা ব'লে মান পাবেই পাবে। কেন এ-বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে বলি, কারণ কথাটা বলবার ম'ত।

এ-যুগে আত্মঘাতী নিরীশ্বরবাদ, সংশয়ী বুদ্ধিবাদ ও লক্ষ্যহীন শিল্পবাদ (আর্ট ফর আর্টস্ সেক) তিনে মিলে আমাদের পটিয়েছে যে, ধর্মীয় বা যৌগিক আনন্দাদি পড়ে দর্শনের কোঠায়, রসের নয়। কিন্তু এসব মত প্রচার করেন তাঁরাই যাঁদের ধর্মের অপরোক্ষ অনুভব উপলব্ধির সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ পরিচয়ই নেই। যাঁদের আছে তাঁদের ঘোষণা এই যে, মানবাত্মার গভীরতম তথা বিচিত্রতম উপলব্ধি ও উচ্ছলন যদি হয় ভাগবতী কৃপা এবং জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হয় জীবনের প্রতিপদে তাঁর নির্দেশে চলা, তাহ'লে আত্মিক ভাবগঙ্গোত্রী সর্বোত্তম রসসৃষ্টির উৎস না হ'য়েই পারে না। তবে একথা ঠিক যে, এ-রসের পরম স্বাদ পেতে হ'লে জিজ্ঞাসুর অন্তরে কিছুটা অন্ততঃ শ্রদ্ধা থাকা চাই ধর্মে, যোগে, আস্তিক্যে। কারণ শ্রদ্ধাবান্ শুধু যে জ্ঞানের অধিকারী হ'য়ে কৃতকৃত্য হন তাই না—"রসানাং রসতম"-র রসস্বরূপের মিলনে আনন্দধন্য হ'তে হ'লেও

চাই শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে রসরাজের প্রসাদার্থী হওয়া। ভরসার কথা এই যে, বুদ্ধির হাজার প্রতিষ্ঠা হ'লেও মানুষের গহন-অন্তরবাসী চিরদিনই আস্তিক ও পূজারী ছিল ও থাকবে। তাই ধর্মের হাজারো ব্যভিচার সত্ত্বেও ধর্মের কথায় আবহমানকাল লক্ষ লক্ষ হৃদয় সাড়া না দিয়ে পারে নি—ভবিষ্যতেও পারবে না।

(৩) এ-সূত্রে আরো একটি কথা না বললেই নয়, যদিও অন্যত্র বলেছি। কথাটি এই যে, এ-শ্রেণীর রমন্যাসে আমি শুধু তথ্যগত সত্যেরই (ফ্যাক্ট) বেসাতি করতে চাই নি। অর্থাৎ আমার এ-জাতীয় রচনা সত্যভিত্তি হ'লেও আমি যত্র তত্র ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার রসান মিশিয়েছি—অবশ্য প্রতি চরিত্রের বা উপলব্ধির মূল ভাবরস লঙ্ঘন না ক'রে। আরো প্রাঞ্জল ভাষায়ঃ এ-রমন্যাস-গুলির সাধক সাধিকার চরিত্র চিত্রণের সময়ে আমি ফটোগ্রাফারের মতন তাঁদের বাহ্য রূপেরই ছবি আঁকতে চাই নি, তাদের মঞ্জুলোজ্জ্বল ব্যক্তিরূপকে আমি যে চোখে দেখেছি সেই ভাবেই ফোটাতে চেয়েছি—চিত্রকরের মতন। তাই যদি কেউ টোকেনঃ "কই, অমুক সাধক তো অমুক সময়ে অমুক শহরে ছিলেন না" বা "অমুক পরিবেশে তমুক কথা বলেন নি" তাহ'লে আমি "গিল্টিপ্লীড়" ক'রেও অকুতোভয়েই বলবঃ "তবু এই-ই সত্যের সত্য—কেন না তাঁদের অন্তর্জীবনের সত্য, বাইবেলের ভাষায়—নট্ অফ দি লেটার, বাট্ অফ দি স্পিরিট।" বাইবেলের আরো একটি মহাবাক্য বরণীয়ঃ 'দি লেটার কিলেথ, বাট্ দি স্পিরিট গিভেথ লাইফ।' জীবনে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে যেসব উপরভাসা রূপের বুদ্বুদলীলা চোখে পড়ে তাদের সজ্ঘবদ্ধ এজাহারেও মেলে না রত্নাকরের অন্তর্লীন মুক্তামণির খবর। বাস্তববাদের মধ্যে একধরণের নিখুঁৎ চিত্রণের আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু একরোখা বাস্তববাদী কিছুতেই সে-নিটোল আনন্দের বা সুডৌল উপলব্ধির সুধাস্বাদ জোগাতে পারেন না যে-সুধা অন্তরাত্মার অন্তিম উপজীব্য। শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্প কাব্য রসচিত্র ঝল্‌কে ওঠে কেবল তখনই যখন শিল্পীর প্রাতিভ দৃষ্টি উপলব্ধির অতলান্তিকে ডুবারি হ'য়ে সেই মণির মণির সন্ধান দেয় যার খবর ডুব না দিলে মিলতেই পারে না।

(৪) শেষ কথাটি এই যে, এ-রমন্যাসে বেশির ভাগ তর্কালোচনা উত্তর-প্রত্যুত্তর আমি সেই ভাবেই সাজিয়েছি যেভাবে কৃষ্ণপ্রেম তর্ক করত। কিন্তু সেই সঙ্গে ব'লে রাখা দরকার, যে, যদিও তার ভাবধারাকে ফুটিয়ে তুলতে সময়ে সময়ে আমি নানা পত্রে পেশ করেছি যা সে মুখে বলেছিল ও ভাষণে পরিবেষণ

করেছি যা সে পত্রে লিখেছিল—কিন্তু তার তর্করীতির ঢং-একটুও বদলাই নি। তার আশ্চর্য ভাষণ বা তর্কালোচনা শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা আশা করি সে স্বয়ংপ্রভ কথাকৌশলীর বাগ্‌ভঙ্গির বক্ষ্যমান চিত্রণে আনন্দ পাবেন—যদিও তার ভাস্বর ব্যক্তিরূপের প্রসন্ন পরিবেশে সে-কথালাপ কী ভাবে উদ্দীপনা জাগাত কোনো অনুলিপিতেই তার পূর্ণিমা-পরিচয় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবু আমি তার আলাপ আলোচনার বিস্ময়কর দীপ্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে (তার ঘোর আপত্তি সত্বেও) তার নানা স্মরণীয় উক্তি ও উপমা টুকে রাখতাম আমার ডায়রিতে। এ-রমন্যাসে তার নানা তর্কালাপের রসনির্ঝর যদি কিছুও ঝরাতে পেরে থাকি তবে তার মূলে আছে আমার এই শ্রুতিসাধনা—যে সাধনায় আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন "শ্রীম" প্রায় ষাট বৎসর আগে।

কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম আদৌ চাইত না কোনো বিজ্ঞপ্তি তার সাধনার বা কথার। তাই তার নানা উপলব্ধির বা ভাষণের কোনো উদ্ধৃতি প্রকাশ করলে সে একটুও খুশী হ'ত না—শেষের দিকে রীতিমত রাগই করত। একবার আমাকে লিখেছিল: "লক্ষ্মীটি দিলীপ, আমার সমস্ত চিঠিপত্রই ছিঁড়ে ফেলো, ছিঁড়ে ফেলো।" ছিঁড়ে ফেলব? কী সর্বনেশে কথা! শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রায়োক্তি মনে পড়ে: ওর শ্রেষ্ঠ রচনা ওর পত্রাবলি।

বৈশাখী সংক্রান্তি ১৩১৩

পুনশ্চ: কথাসাহিত্যের নানা রূপ। একটি—সুচরিত্রের সঙ্গে কুচরিত্রের লড়াই—শেষে (happy ending) সু-র জিৎ কু-র হার। আর একটি—যাতে এ-ধরণের দ্রষ্টিষ্ঠ সংঘাত অনুপস্থিত, যেমন রবীন্দ্রনাথের গোরা বা নৌকাডুবি। এ-জাতীয় উপন্যাসে প্রতি চরিত্রেরই গতি খতিয়ে ভালোর দিকেই, পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব নেই, আছে মনের নানা জটপাকানোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ও পরে সেসব গ্রন্থিমোচন। আমি নিজে এই ধরণের কথাসাহিত্যের অনুরাগী। দুজন দুর্মতি কুচক্রী তো পথ চলতে সর্বত্রই অস্তি কিন্তু তাই ব'লে কি বলব মহামতি উদার সুজনদের চরিত্র চিত্রণ নাস্তি—অবাস্তব? এ আমার কথা নয়, হাল আমলের বাস্তববাদীদের জিগির। মানি—বাস্তববাদ (realism) আজ প্রায় যুগধর্মের সামিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাই তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সেই জন্যেই আরো চাই না কি সত্যের অঙ্গীকারে শিব সুন্দরের চিত্রণ?

আমি এদেশে ওদেশে অজস্র লোকের সঙ্গে মিশেছি—দহরম মহরম করেছিও বহু বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গেই। (রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন—সঙ্গীত যত সহজে অপরিচিতের আড়াল সরিয়ে পরকে আপন করতে পারে তত সহজে আর কোনো কারুকলাই লক্ষ্যবেধ করতে পারে না।) তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট সুজনের দেখা পেয়েছি সর্বত্রই, যদিও কম, আরো কম—মহাপ্রাণ মহাত্মা আদর্শবাদী। কম, কিন্তু তা ব'লে অবাস্তব বলা চলে কি? অন্ততঃ শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজি, রোঁলা, রাসেল, তুহামেল, কৃষ্ণপ্রেম নেতাজি—প্রমুখ মহাজনদেরকে চাক্ষুষ করার পরেও এমন কথা বলা আমার পক্ষে হবে অক্ষমণীয় অপরাধ। রবীন্দ্রনাথেরই তুটি চরণ মনে পড়ে:

> "যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
> যা দেখেছি, যা শুনেছি—তুলনা তার নাই।"

যে অতুলনীয় তীর্থযাত্রীদের আমি দেখেছি শুধু নয়, কাছে পেয়েছি। তাঁদের খবর আমি দিতে চেয়েছি প্রথমতঃ স্মৃতিচারণের, দ্বিতীয়তঃ রমন্যাসের ছাঁদে। স্মৃতিচারণ পড়ে ইতিহাসের কোঠায়, রমন্যাস কল্পনাকে ডাক দেয় রসোত্তীর্ণ হ'তে চেয়ে—কেননা কল্পনার মিশেল না থাকলে গল্প রসাল হয় না। কিন্তু তা ব'লে আমার রমন্যাসে এমন কোনো কল্পনাকে তলব করি নি যা অসম্ভব। তাই ভরসা রাখি—অভিজ্ঞ তথা দরদী পাঠক প্রতি ছবিটির মধ্যেই পাবেন সত্যের ঝঙ্কার—ring of truth; কেবল তবু বলব—পুনরুক্তি মার্জনীয়—যে রমন্যাসগুলির বিচার হবে খতিয়ে গল্পের নিরিখেই, অর্থাৎ কাহিনী হিসেবেও রমন্যাসগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি না এই বিচারে। আমার মন বলে—দরদী পাঠক রায় দেবেন: "হয়েছে"—যদিও বেদরদী ক্রিটিক বলবেনই বলবেন: "উঁহুঃ, এ-তেল-নুন-লকড়ির জগতে বাস্তবে মানুষ কখনই এমন ঊর্ধ্বমুখী বা কৃষ্ণৈকান্ত হ'তে পারে না।" কিন্তু রসবিচারে ভাবুক দরদীই জহুরি, রুক্ষ ক্রিটিক নন।

অন্ততঃ এই ভরসায় বুক বেঁধেই এ-দীর্ঘ রমন্যাসটি দরদী পাঠককে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি। গভীর কথা এতে প্রচুর আছে (যোগের কথা অগভীর হবে কেমন ক'রে?) কিন্তু তা ব'লে যোগব্যাখ্যার অজুহাতে গুরুগম্ভীর অবাস্তরদের উড়ে এসে জুড়ে বসতে দিই নি—লিখে গেছি তুর্নিবার আনন্দের প্রেরণায়ই। সে-আনন্দের কিছুটাও যদি দরদী পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে পেরে থাকি তাহ'লে আমার গল্প বলা ও চরিত্রচিত্রণ সার্থক মনে করব।

লক্ষণীয় : শেষার্ধে আমি সর্বপ্রথম তপতীর ব্যক্তিরূপের পূর্ণিকাবিকাশের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে ওর যোগসাধনাকে ঠিক পর্দানসীনা ক'রে না রাখলেও ওর নানা অঘটনী যোগবিভূতি তথা চরিত্রমহিমার কথা খোলাখুলি লিখি নি।

উপক্রমণিকা

সোফিয়া লিখল তপতীকে :

দিদি,

স্বামী প্রেমানন্দের কথা শুনে আরো মুগ্ধ হয়েছি দাদা কাহিনীটিকে নাট্যাকারে পরিবেষণ করেছেন ব'লে। পড়তে পড়তে বারবারই মনে হয়েছে যে, দাদা যে এ নাটকটিকে "নাট্যোপন্যাস" নাম দিতে চেয়েছেন সে নাম সার্থক হয়েছে এই জন্যে যে, এ-নাটকটির নানা দৃশ্যে নাট্যরস অপর্যাপ্ত মিললেও দাদা নানা সংলাপ সাজিয়েছেন খানিকটা তাঁর স্বকীয় রমন্যাসের ঢঙে। কে না জানে উপন্যাসের পট-ভূমিকা নাটকের চেয়ে অনেক বড়? এর প্রধান কারণ—উপন্যাসে নানা বর্ণনা বিশ্লেষণ স্বগতোক্তি ইত্যাদি ফোটাতে পারা যায় লেখকের নিজের জবানিতেই, যেখানে নাটকে ছবিটি ফোটাতে হয় কেবলমাত্র সংলাপের মাধ্যমেই। অবশ্য অভিনয় হ'লে রঙ্গমঞ্চে নটের নানা ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু ফলিয়ে তোলা যায় বটে, কিন্তু তবু বলব নাটকের আসল রস খতিয়ে সংলাপের কাব্যরস তথা প্রাণবত্তা—নটের নৈপুণ্য নয়। এইজন্যেই দেখতে পাই যেসব নাটকের সংলাপে বিশেষ কাব্যরস বা প্রাণশক্তি নেই, হাজার প্রতিভাবান্ অভিনেতাও তাকে দাঁড় করাতে পারেন না, দু দিন হৈচৈ ক'রে মানুষকে একটু হকচকিয়ে দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু তার পরেই তারা মৌসুমী ফুলের মতনই ঝ'রে যায়—রং যায় মিলিয়ে, ঢং যায় ঢিমিয়ে, হৈ চৈ ধুমধাম হ'য়ে ওঠে একঘেয়ে। উদাহরণ হাতের কাছেই পাবেন : দেখুন না কেন, ইবসেন-যে-ইবসেন—অতবড় দিক্‌পাল নাট্যকার, তার নাটকও আজ কোনো রঙ্গমঞ্চেই ঠাঁই পায় না—কেমন যেন মনকে আর তেমন স্পর্শ করে না। কেন করে না? কারণ, তাঁর সংলাপ ছিল একটা বিশেষ যুগের বিশেষ স্ফুরণের বা মুডের প্রকাশ। কাজেই সে-যুগ চ'লে গেলে সে-স্ফুরণের ছবি আর তেমন মন টানতে পারে না, তেমন জীবন্ত হ'তে পারে না। মানি—সফক্লিস, ইউরিপিডিস, এস্কাইলাস—শেক্সপীয়রের তো কথাই নেই—আজও সুধীসমাজে আদরণীয়। কিন্তু কেন? তিনটি কারণ আছে। প্রথম : এঁরা সংলাপের মধ্য দিয়ে কোনো স্থানীয় বা

বিশেষ যুগের ছবিই আঁকতে যান নি, নানা বিশ্বজনীন প্রবৃত্তির সংঘাত নিয়েই মশগুল হয়েছেন, তাই সে-ছবিতে আমরা আজও মশগুল হ'তে পারি। দ্বিতীয় কারণ—তাঁদের গল্পাংশের বাহার। মানুষ নাটকে শুধু চরিত্র-চিত্রণই চায় না, গল্পও চায়। তৃতীয়—আর হয়ত এইটিই সবচেয়ে বড় কারণ—তাঁদের কবিত্ব।

একটা জিনিষ বড় চোখে পড়ে দাদা: কবিত্ব কোনো যুগেই বেশি লোকে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। কিন্তু তবু দেখুন কবিত্বই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী; এ-কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ শেক্সপীয়র। তিনি যদি তাঁর নাটকগুলি আদ্যন্ত গদ্যে লিখতেন, মনে করেন কি কেউ পড়ত আজ? বলতে কি, তাঁর নাটকে নানা স্থানে খাসা গদ্য সংলাপও তো আছে, কিন্তু কয়েকটি উদ্ধৃতি ছাড়া কি যেসব কারুর মন টানে আর? সে-গদ্যের মরুভূমি আমরা আজও পেরুই—শুধু তারপরেই তাঁর কবিত্বের ওয়েসিসের দেখা মিলবে ব'লে। এই কবিত্বই তাঁকে চিরজীবী ক'রে রেখেছে—তাঁর নাটকের নানা নাটকীয় রসও নয়, সংলাপও নয়, এমন কি গল্পাংশও নয়। বলতে কি, তাঁর গল্পাংশ অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বলভিত্তি। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি নাটকের ক্ষেত্রেই এ কি চোখে না প'ড়ে পারে? হ্যামলেটের সমস্ত নাটকীয় সৌধ দাঁড়িয়ে আছে এক ভূতের আত্মপ্রকাশে। সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির অজস্র ভূতুড়ে কাহিনী আছে—অনেকেই হয়ত মানেন যে, তাদের মধ্যে সত্য আছে যথেষ্ট—কিন্তু কোনো ভূতই আজ পর্যন্ত এসে বলেনি কে তাকে খুন করেছে। যদি বলত, তাহ'লে শার্লক হোমসের বা স্কটল্যাণ্ড য়ার্ডের দরকারই হ'ত না। অথচ এই ভূতের মুখেই তো হ্যামলেট খবর পেলেন তাঁর পিতৃহন্তা কে—আর এই খবর পাওয়ার বিস্ফোরণেই যত নাটকীয় ভূমিকম্প! ম্যাকবেথেও তাই। কোথায় এক মাঠের কয়টি ডাইনির বিচিত্র ভবিষ্যদ্বাণীই হ'ল ম্যাকবেথের কাল—সে খুনের পর খুন ক'রে চলল শুধু তাদের হসনীয় ভবিষ্যদ্বাণীর 'পরে ভর ক'রে। এ-পরিকল্পনাকে কে বলবে রিয়ালিস্‌টিক? অথচ তবু হ্যামলেট বা ম্যাকবেথ আমাদের কাছে নীরস মনে হয় না কেন? আমি বলব তার কবিত্বের জন্যে ও সংলাপের প্রাণবত্তার গুণে। কিন্তু সংলাপের গুণপনা আরো অনেক নাট্যকারই দেখিয়েছেন, যথা ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, গলসওয়ার্দি, সমর্সেট মম (শ-র সংলাপ উৎরে গেল বারো আনা তাঁর আশ্চর্য রসিকতার প্রসাদে) তবে? উত্তর দিয়েছেন মম, ঠিকই বলেছেন গদ্য নাটক স্বভাবতই ক্ষণায়ু—এক কবিত্বই তাকে দীর্ঘায়ু করতে পারে।

কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা আমার মনে হয়েছে—বিশেষ ক'রে আপনার সদ্যজাত নাটক "স্বামী প্রেমানন্দ" প'ড়ে। কথাটা এই যে, কবিত্বের আদর কম হ'লেও সে যে-কারণে নাটককে দীর্ঘায়ুতার বর দিতে পারে, ঠিক সেই কারণেই ধর্মও নাটককে দীর্ঘজীবী করতে পারে। কেন? কারণ ধর্ম নিত্য-কালের বস্তু, সাময়িক—topical—গালগল্প নয়। তাই ধর্মের নানা ভাব বিভাব রস রং নিয়ে নাটক লিখলে সে-নাটক বেশিদিন বাঁচার কথা। অবশ্য এখানে খতিয়ে আসে নাটকীয় নৈপুণ্যের কথা: অর্থাৎ নাট্যকারকে শুধু খাঁটি ধার্মিক হ'লেই চলবে না, সেই সঙ্গে হ'তে হবে নিপুণ নাট্যকার। ঠিক যেমন বড় গায়ক হ'তে হ'লে শুধু পণ্ডিত গীতবিৎ হ'লেই চলে না, হ'তে হবে সুরেলা সুরকার। তাই আমার অনুরোধ—আপনি নাটক আরো লিখুন। লোকে হয়ত ধর্মীয় নাটক এ যুগে নেবে না; নাই নিল। ক্ষতিপূরণ মিলবে আগামী যুগে যখন এ-যুগের নানা টপিকাল নাটকের রসকষ উবে যাবে দুদিন পরে। তখন আমার মনে হয় ধর্মীয় নাটকই মান পাবে—ঠিক যেমন কবিত্ব মান পায় কালের দরবারে। আর যদি কবি ধার্মিক ও নাট্যশিল্পী এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গম হয় তাহ'লে তো কথাই নেই। আপনার মধ্যে আমরা দুবোনে অন্ততঃ দেখতে পেয়েছি এই ট্রিনিটির স্ফুরণ। তাই আপনি একে লালন করুন এই অনুরোধ করছি আমরা তিনজনে কোরাসে।

আর, রহুন—অতিষ্ঠ হবেন না দাদা, প্রেমল বৈরাগীকে নিয়েই লিখুন এর পরের নাটক। রাজীব প্রায়ই বলে, "শুভস্য শীঘ্রং"। আমিও বার্বারা দোয়ার দিই শেক্সপীয়রের ভাষায়: fiery-red with haste!

ইতি—

আপনার স্নেহের বোন সোফিয়া

পুনশ্চ। রাজীব ধরেছে—জুড়ে দিতেই হবে: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—তারপর ভুলে গেছে—তার উপনিষদটা খুঁজে পাচ্ছে না। পেলে বাকিটা লিখবে পরের মেলে।

* * * * *

তপতী: সোফি নাটক নিয়ে কী দুর্দান্ত মাথা বকিয়েছে দাদা! ও তো দেখছি সামান্যি মেয়ে নয়?

অসিত (চিন্তিত স্বরে): সে তো হ'ল—কিন্তু উস্কে দিতে চায় যে।

তপতী: ভালোই তো।

অসিত: না। নাটক লেখবার মেজাজ নেই এখন। বিশেষ প্রেমলের সম্বন্ধে নাটক? অসম্ভব।

তপতী: কেন অসম্ভব?

অসিত: সোফিই তো লিখেছে সেকথা। নাটকের পটভূমিকা—.anvas—ছোট। উপন্যাসই হ'ল এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—কারণ কেবল উপন্যাসেই কবিত্ব, নাট্যরস ও বর্ণনা এই ত্রিপুটীর সমন্বয় হ'তে পারে এবং হয়েছে—মানে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে।

তপতী: (চিন্তিত) নাট্যরস—অর্থাৎ কথাবার্তা, উদ্বেগ ও সংঘর্ষ এ সবই উপন্যাসে হ'তে পারে। বর্ণনার তো প্রধান আখড়াই গল্প। কিন্তু কবিত্ব হয় শুধু নাটকেই—এবং ছন্দে।

অসিত: কেন? গদ্যে?

তপতী: সন্দেহ।

অসিত: কেন? চোখে পড়ে না কি—এযুগের একটি নবধর্ম হচ্ছে—গদ্যে কিছুটা অন্ততঃ কবিত্বের রস আমদানী করা?—না, টুকো না আমায়। আমি বল'ছি না—ছন্দ বিনা কবিত্বের শ্রেষ্ঠ রূপ ফুটতে পারে। কিন্তু গদ্যে ছন্দ না থাকলেও এমন গাঢ়বন্ধ ও প্রসাদগুণ আনা যেতে পারে যে, কাব্যের—ঐ যে বললাম—কিছুটা রস আনা সম্ভব।

তপতী: দু-আনা মানে তো পনের আনা নয়।

অসিত (হেসে): না। তবে দুই-কে চতুর্গুণ করা চলে। অর্থাৎ তোমার কথাও থাক আমার কথাও থাক—গদ্যে আট আনা কাব্যরসের ঢেউ বেশ স্বচ্ছন্দেই তোলা যেতে পারে। মনে রেখো, উপন্যাস এসেছে সবে সেদিন—মানে খাঁটি উপন্যাস। আগের যুগে ছিল কাব্যকথিকা বা এপিক।—না, প্রেমলকে নিয়ে আমি লিখব, কিন্তু নাটক নয়। অন্ততঃ এখন নয়। আগে রমন্যাসের পাঠ দেওয়া যাক, পরে দেখা যাবে নানা পর্ব নিয়ে কয়েকটি আলাদা কাব্যনাট্য লেখা চলে কিনা। তবে মুস্কিল কি জানো? কাব্যনাট্য লিখতে হ'লে চাই খুব জোরালো প্রেরণা।

তপতী : (হেসে) কিন্তু যদি বলি ধর্মের অনুভূতিও কাব্যনাট্যের প্রেরণা দিতে পারে ?

অসিত (ভ্রূকুটি ক'রে) : আমার মন্তব্য দিয়েই আমাকে কাবু করা ? কিন্তু আমি কাবু হবার পাত্র নই। প্রেমল প্রায়ই বলত : 'Never say die ! আমি ধর্মের নানা ভাব বিভাবকে নিয়েও কাব্যনাট্য লিখেছি—আরও লিখবার আশা রাখি—যদি না হঠাৎ ডাক পড়ে অবশ্য।

তপতী (আলোভরা মুখে ছায়া এসে পড়ে) : কী যে অলক্ষুণে কথা বলো। যা—ও।

অসিত (হেসে) : আচ্ছা আচ্ছা, আর বলব না। হয়েছে কি জানো ? (মুখে ছায়া নেমে আসে) সে হঠাৎ চ'লে গেল…অসময়ে…

তপতী : কিন্তু তিনি কি বলতেন না উঠতে বসতে : খাঁটি সত্যের সাধক যারা তারা কেউই চ'লে যায় না—যেতে পারে না ?

অসিত : সে এপার থেকেই ওপারের খবর রাখত। আমি রাখি না তো।

তপতী : বাজে বোকো না। সোফিয়া ঠিকই বলে : তুমি চাও সকলকে এগিয়ে দিয়ে নিজে আড়ালে ঘুপটি মেরে থাকতে—ধরা না দিয়ে।

অসিত : এ-বিদ্যাও আমার প্রেমলের কাছেই শেখা : কত কী-ই যে শিখেছি তার কাছে…

তপতী : তবে ব'সে যাও লিখতে।

অসিত : অগত্যা। আনো এক দিস্তে কাগজ, আর এক কেটলি চা।

এক

মথুরায় নামতেই অসিতকে ধরল এক পাণ্ডা: কোত্থেকে আসছেন···কি বৃত্তান্ত···

অসিতের মনে কৌতুহল জাগে। বলল: "শুনেছি তোমরা যাত্রীদের পূর্বপুরুষদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখো?"

পাণ্ডা একগাল হেসে বলল: "রাখি, বাবুজি। চলুন, আমি ব'লে দিতে পারব—আমিই আপনাদের কুলের পাণ্ডা না আর কেউ।"

অসিত গেল তার সঙ্গে। গিয়ে দেখে—অবাক্ কাণ্ড—সত্যিই তার পিতৃদেব, পিতামহ ও প্রপিতামহের স্বাক্ষর তার দপ্তরে! কাছের আর এক পাণ্ডা দেখাল তার দপ্তরে—বন্ধু জ্ঞানেশ ও শ্যামঠাকুরের পিতৃপুরুষদের স্বাক্ষর ও তাঁদের জন্মের তারিখ।

পাণ্ডাযুগলকে মোটা দক্ষিণা দিয়ে অসিত জিজ্ঞাসা করল মথুরায় কোন্ ঘাটে স্নান করা নিরাপদ।

তাকে বিশ্রাম ঘাটে পৌঁছে দিয়ে পাণ্ডাযুগল স্টেশনের দিকে উধাও হ'ল আর এক দল যাত্রীর দরবারে হাজিরি দিতে।

নীল যমুনার শোভা দেখে অসিত মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে। কী অপরূপ দৃশ্য! ও-দিকে এক ঝাঁক পাখী সার বেঁধে উড়ে চলেছে। এ-দিকে সারি সারি ঘনপল্লব গাছ বাতাসে হাততালি দিচ্ছে। নবারুণের ঝিকিমিকিতে জ্যৈষ্ঠ শেষের যমুনা ঝলমল ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে এক এক বিশাল মেঘের জাহাজ ভেসে এসে সূর্যকে হারিয়ে দিয়ে যমুনার জলে ভাসাচ্ছে তাদের ছায়ার দ্বীপ। দ্বীপ তো নয়—যেন প্রসারিত উত্তরীয়! নীল জলের সঙ্গে স্নিগ্ধ ছায়ার লুকোচুরি! এদিকে আলো ওদিকে কালো। অসিতের বুকে বেজে ওঠে অতুলপ্রসাদের একটি গানের অন্তরা: "আলো কালো করে হোলি-খেলা।" স্নান সেরে যাবে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশনে—স্বামী দেবানন্দ তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু তার আগে মথুরায় যা কিছু দেখার সেরে যেতে চায়। তাই ওর বিছানা ও তোরঙ্গ স্টেশনে রেখে এসেছে স্নান করতে বিশ্রাম ঘাটে। কিন্তু জলে নামবে কি? নীল যমুনার কথা বইয়েই পড়েছে, কখনো চোখে দেখে

নি তো। ভালোই হ'ল—ঠিক সময়ে মথুরায় এসেছে—'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'র ঠিক এক সপ্তাহ আগে। বর্ষা নামলেই যমুনা দেবীর নীল শাড়ীতে ছোপ লাগবে ধূসর পাটল গৈরিক রঙের। প্রতি রঙেরই স্বকীয় শোভা আছে, আছে সুর তাল রেশ। কিন্তু নীলের কাছে কেউ নয়। আকাশেও কত রঙই তো ধরে! কিন্তু নীল ছাড়া আর কোন্ রঙে মন ভ'রে ওঠে বলো তো—শুধায় ও নিজেকেই।

মনে হঠাৎ যেন ভাবের জোয়ার উঠল জেগে। গুনগুন ক'রে ধরল স্বামী কৃষ্ণানন্দের অবিস্মরণীয় কীর্তন :

যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী?
(ও যার) বিমল তটে রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্ত মণি!

দেখতে দেখতে জোয়ার-এ দুলে উঠল বান। ও পকেট ডায়রি খুলে লিখতে ব'সে গেল :

হেথা বেজেছিল তাঁর বাঁশি
এই নীল যমুনার তীরে,
নিতি গাহিত যে : "ভালোবাসি,
তাই যুগে যুগে আসি ফিরে।"

বঁধু, আমরা সে-কথা ভুলি'
আজো কত সুরে উঠি দুলি',
সব চাহি না সঁপিতে প্রেমে
এই নীল যমুনার তীরে।

তুমি ছুঁয়েছিলে লো যমুনা;
তার চরণের বনভূমি,
তাই তোমার নীল করুণা
বুঝি আমরা আদরে চুমি'
সেই সুরে কান পাতি ফিরে
এই নীল যমুনার তীরে!

মন শুনি' বলে কলহাসি' :
"আজো বুঝিবি না তুই কিরে—
আলো স্বপন-বাসর-বাঁশি
কালো জাগরে আসে না ফিরে ?"

প্রাণ শোনে, তবু শোনে না তো,
বলে : "তারি তরে মালা গাঁথো,
বিনা সে-বনমালীর দিশা
বলো, ফিরিব সে-কোন্ তীরে ?"

সে যে বিরহে মিলন মণি,
সে যে মরণে জীবন-ক্ষুধা
আজো যমুনা কলস্বনী
বহি' তারি অফুরান ক্ষুধা।
সেই সুরে কান পাতি ফিরে
এই নীল যমুনার তীরে।

গানটি বেঁধে বিভোর হ'য়ে তখনি তখনি সুর দিয়ে গাইছে—ঘাটে তখনও স্নানার্থীরা আসে নি—এমন সময়ে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল বাঁদিকে বাঁধানো ঘাটের পৈঠা পেরিয়ে এক গৌরকান্তি গৈরিকধারী বৈরাগী আকণ্ঠ জলে সূর্যের দিকে চেয়ে অঞ্জলি ক'রে জল ছড়াচ্ছে থেকে থেকে। অসিতের বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না যে, সে বিদেশী—সম্ভবতঃ ইংরাজ। একটু কৌতূহল হ'ল বৈকি, কিন্তু ইংরাজেরা সহজে অপরিচিতের সঙ্গে মিশতে চায় না ব'লে অসিত তার দিকে বেশি তাকিয়ে না থেকে, মাথায় তেল মেখে জলে নামতে যাবে এমন সময়ে সে তর্পণ শেষ ক'রে উঠে এল পৈঠা বেয়ে—মাঝপথে দেখা হ'তে হেসে নমস্কার ক'রে পরিষ্কার বাংলায় বলল : "আমার তর্পণ আজ ভালো হ'ল না আপনার গানের জন্যে।"

অসিত চমকে প্রতিনমস্কার ক'রে বলল : "মাপ করবেন, আমি জানতাম না আপনি তর্পণ করছিলেন। বলতে কি, আপনাকে প্রথমে আমি দেখিই নি।"

"জানি। আমি তো ঘাটকে পাশ কাটিয়ে স্নান করি—তাই আপনি দেখতে পান নি। আপনার গানটি বড় সুন্দর।"

"আপনি কি—"

"হ্যাঁ, ইংরেজ—যার নাম দেন আপনারা ম্লেচ্ছ। তবে সে কেবল দেহেই। মন আমার নির্জলা হিন্দু।"

"সন্ন্যাসী ?"

"বলতে পরেন। অন্ততঃ নাম পেয়েছি প্রেমল বৈরাগী।"

"এত ভালো বাংলা শিখলেন কোত্থেকে ?"

প্রেমল : কেম্ব্রিজে এক বাঙালী বন্ধুর কাছে প্রথম তালিম নিই। তারপর এখানে এসে দিন রাত কথা বলা স্বরু করি মা-র সঙ্গে—গুরুমা—তিনি বাঙালী। কী ? এখনো অবাক লাগছে ?"

অসিত : একটু লাগছে বৈ কি। একে সাহেব তার ওপর সন্ন্যাসী, তার ওপর বাংলা বলছেন অনর্গল—

প্রেমল : (হেসে) আমার গুরুমাকে দেখলে এত অবাক্ লাগত না হয়ত। আমার সাহেবি অভিমান তিনি সব ভেঙেচুরে দিয়েছেন—শুধু আমার নয়. আমার এক বন্ধুরও।

অসিত আরো আশ্চর্য হ'ল। ইংরাজ যুবক তো এত সহজে আত্মপরিচয় দেয় না! তাছাড়া কেম্ব্রিজের ছাত্র? বলল : "আপনি কেম্ব্রিজে ছিলেন কোন্ বৎসর ?"

প্রেমল : যে-বৎসরে আপনি ট্রাইপস প্রথম পার্ট পাশ করেন। তাই আপনাকে আমি চিনি। (ফের হেসে) আমি আপনাদের মজলিসে যেতাম প্রায়ই—শুধু আপনার গান শুনতে।

অসিতের মন প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। বলল : "ও, তাই বুঝি তর্পণে মন বসেনি ?"

সে হেসে বলল : "না, আরও কারণ ছিল। হয়েছে কি, আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে—তাই যতবারই আওড়াই : 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্'—ততবারই সেই কাঁটাটা খচ খচ করে। কাজেই বুঝুন কেমন বৈরাগী—একটা কাঁটা যাকে এমন পাকে ফেলে।"

"সে কি ? কাঁটাটা কি তোলেন নি ?"

"না। ফিরে গিয়ে তুলব। ঘাটে আসতেই বিঁধল কি না। বলে না—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি? যমুনার জলে স্নান সেরে তর্পণ ক'রে পুণ্যবান্ হ'য়ে ফিরব ভাবতেই ঠাকুর বাদ সাধলেন কাঁটা হ'য়ে বিঁধে।"

অসিত হেসে বললেন: "আমি শ্যামঠাকুর নামে এক বৈরাগীকে জানি তিনি ভারি মজার মজার ছড়া কাটেন। একটি এই:

খুনী হ'য়ে খুন করে শ্যাম, পুলিশ হ'য়ে ধরে চেপে,
পুরুত হ'য়ে বলে: "মাভৈঃ", জজ হ'য়ে দেয় ফাঁসি ক্ষেপে।

বৈরাগী একগাল হেসে বলল: "রহ্মন, এ-ছড়াটা আমি মুখস্ত ক'রে নিই। বলুন তো আর একবার। কিন্তু না, আগে আপনি স্নান সেরে নিন, আমি অপেক্ষা করছি।"

"কিন্তু কাঁটাটা—"

"ও ফিরে ঘরে গিয়ে তুললেই হবে—আর একটা কাঁটা দিয়ে—কে বলতেন জানেন তো?"

অসিত খুশী হ'য়ে বলল: "আপনি 'কথামৃত' পড়েছেন?"

"অনেকবার। এ-যুগের গীতা হ'ল কথামৃত—বলেন আমার গুরুমা। বলতে কি, বাংলা শিখেছি আমি কথামৃতেরই প্রাসাদে।"

"তাহ'লে বনবে আমাদের। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা ডুব দিয়ে নিই।"

"ওদিকে—বড় বেশি কচ্ছপ। কিছু বলে না বটে—তবু কাজ কি? চলুন ঐ বাঁদিকে—আমি নিয়ে যাচ্ছি। যমুনায় আগে স্নান করেছেন কি?

"না। আমার দৌড় গঙ্গা পর্যন্ত।"

সে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল: "আহা, মা গঙ্গা! ত্রিভুবনতারিণি, তরলতরঙ্গে! গঙ্গাস্নানে সব স্নানেরই ফল পাওয়া যায়।"

"আপনি এ-ও বিশ্বাস করেন?"

"বলিনি—আমার প্রাণ হিন্দু, দেহ—তবে দেহ তো আমি নই—কিন্তু দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, আসুন এদিকে—আমি যেখানে স্নান করি। একটিও কচ্ছপ পাবেন না।"

অসিতের আপত্তি সত্ত্বেও বৈরাগী পৈঠার ওদিকে লাফ দিয়ে নেমে সন্তর্পণে তাকে নামিয়ে নিল।

তুই

অসিতের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে বৈরাগী তাকে বলেছিল—তার গুরুমা-র নাম শান্তিমা, কন্যা-শিষ্যার নাম ললিতা! বলেছিল হেসে: "যেখানে আমরা উঠেছি তাকে বাংলো বা কুটির কোনো নামই দেওয়া চলে না। টিনের ছাদ তুটি ঘর মাত্র। আগে নাকি এখানকার এক শেঠজির গোয়ালঘর ছিল। ঘরে জানালা আছে, কিন্তু দোর ভেঙেচুরে এমন অবস্থা হয়েছে যে, ভিতর থেকে খিল পর্যন্ত দেওয়া যায় না।"

অসিত স্নান সেরে পথে এক টঙ্গা ধ'রে সোজা গেল স্টেশনে। সেখানে লগেজ-রুম থেকে ওর তোরঙ্গ ও বিছানাপত্র নিয়ে সোজা স্বামী দেবানন্দের কাছে। স্বামীজি ওকে ঘরে বসিয়ে সাদরে চা নিয়ে এলেন স্বহস্তে। জলযোগে গল্প জমে উঠল।

প্রেমলের কাহিনী শুনতে না শুনতে স্বামীজি বললেন: "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁকে জানি বৈ কি। প্রথমবার বৃন্দাবনে উনি আমাদের এখানেই ছিলেন যে! মাঝে মাঝেই এখানে আসেন। বৃন্দাবনের উনি বিষম ভক্ত। (হেসে) খাস সাহেব যখন হিন্দু হন তখন কি আর রক্ষে আছে মশাই? হিন্দুদের তুয়ো দেন হিঁতুয়ানিতে—এদেশকে দেখেন ওরা তো চর্মচক্ষে নয়, দিব্যনেত্রে।"

অসিত: উনি বললেন—ওর গুরুমা-র নাম শান্তি দেবী। কিন্তু আশ্রম কোথায় বলেন নি। জানেন কি?

দেবানন্দ: আপনি লক্ষ্ণৌয়ে তো যান মাঝে মাঝে—শোনেন নি? শান্তিদেবীর স্বামী লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ডাক্তার—তিনি স্ত্রীর জন্যে আলমোরার এক গহন অরণ্যে একটি মন্দির গ'ড়ে দিয়েছেন—সেখানেই প্রেমল মহারাজ কায়েমী হ'য়ে সাধনায় বসেছেন—শুনতে পাই।

অসিত: লক্ষ্ণৌয়ের ডাক্তার?—নাম কি?

দেবানন্দ: শ্রীমহেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—খুব ধনী।

অসিত: মহেন্দ্রবাবু? তাঁর সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত-সভায়। তিনি আমার ভজন শুনে (হেসে) আমাকে একটি সোনার মেডেল উপহার দিতে চেয়েছিলেন—জানেন?

দেবানন্দ (হেসে) : আকবর শা হ'লে দিতেন গলার মুক্তামালা মশাই! অবিশ্যি ভজন গাইলে দিতেন না—গাইতে হ'ত আপনাকে মিঞা মল্লার বা দরবারী কানাড়া। তবে এসব ওস্তাদি গানেও তো আপনি পাকা।

অসিত (হেসে) : ছিলাম একসময়ে। তবে এখন গাই বেশির ভাগ ভক্তির গান, জানেনই তো—মানে, ভজন কীর্তন! কাজেই এখন মহেন্দ্রবাবু যদি রাতারাতি আবুহোসেনের মতন হারুন-অল-রসিদ হয়ে আমাকে ডাক দেন তবে আমার আর মুক্তামালা পাবার কোনো আশাই নেই।

দেবানন্দ (প্রসন্ন) : জানি অসিতবাবু। আর বলতে কি, আপনি যদি ঐ ওস্তাদির চরকিবাজি ছুড়তেন গলার আগুনে তবে আমি ভরসা ক'রে আপনাকে আমাদের আশ্রমে নিমন্ত্রণ করতেই পারতাম না।

অসিত (হেসে) : কেন? লঙ্কাকাণ্ডের ভয়ে? আমি ঠিক বীর হনুমান নই।

দেবানন্দ (হেসে) : না, বীর হনুমানের এখানে অভাব নেই—ঐ দেখুন না সামনের গাছে। কিন্তু লেজের আগুনের চেয়েও বিষম আগুন হ'ল ওস্তাদির আগুন। উঃ—এক ওস্তাদ—

অসিত (হাত তুলে) : মাপ করবেন স্বামীজি। ওস্তাদি গান গাওয়া ছেড়ে দিলেও ওস্তাদি গান শুনতে আমি এখন ভালবাসি। শিখিও—সুবিধে হ'লেই।

দেবানন্দ (সবিস্ময়ে) : এখনো শেখেন ওস্তাদি তা না না না না না! বলেন কি অসিতবাবু?

অসিত : আচ্ছা, আপনাকে একদিন শোনাব—তা না না না নয়, দুচারটি ধ্রুপদ। আপনারও ভালো লাগবে—মিলিয়ে নেবেন। কিন্তু সে যাক্, বলুন আর একটু প্রেমল মহারাজের কথা। আমার ওঁকে ভারি ভালো লেগে গেছে।

দেবানন্দ : (হেসে) আপনার রুচিকে দোষ দেওয়া চলে না এজন্যে—যদিও একথা সত্যি নয় যে, সকলেরই ওকে ভালো লাগে।

অসিত : সংসারে অজাতশত্রু কি কেউ আছে স্বামীজি?

দেবানন্দ : যা বলেছেন। তবে কি জানেন? জানেনই তো, আমাদের মধ্যে ঈর্ষা বৃত্তিটি একটু বেশি ব্যাপক বলেই দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন স্বামীজি আমেরিকা থেকে? বৃন্দাবনে আবার তার ওপর একদল গোঁড়া আছেন—তাঁদের নাম করব না—যাঁরা মনে করেন যবন দেহ অশুচি। দুঃখের কথা বলব

কি অসিতবাবু, প্রেমল মহারাজের মতন মহাভাগকেও অনেক মন্দিরে ঢুকতে দেয় না পূজারীরা, ভাবতে পারেন?

অসিত: সে কি বলুন? ওর সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে আমার তো মনে হয়েছে—এমন মনেপ্রাণে হিন্দু হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। আর মুখে এমন আলো সাধকের মধ্যেও বেশি দেখি নি স্বামীজি, মাপ করবেন।

দেবানন্দ (উদ্দেশে নমস্কার ক'রে): মাপ করব বলেন কি, অসিতবাবু? প্রেমল মহারাজ যে মস্ত আধার এ শুধু গোঁড়া অন্ধরা ছাড়া কি আর কেউ আছে যে দেখতে পায় না? তাহ'লে বলি শুনুন ওর একটি কাহিনী—আমার স্বচক্ষে দেখা। (থেমে) আপনাকে বলেছি—উনি মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে এসে থাকেন। সেবার—প্রথমবার—এসে আমাদের মিশনেই ছিলেন এই ঘরেই। তখন ললিতা দেবী ওঁর শিষ্যা হন নি তো, কাজেই ঝাড়া হাত পা।

অসিত: ললিতা দেবী কে?

দেবানন্দ: উনি বলেন নি আপনাকে? শান্তি দেবীর মেয়ে। শুনেছি তিনিও না কি মা-র মতনই খুব উচ্চকোটির সাধিকা—

অসিত: রক্ষুন, প্রেমল মহারাজ আপনাদের অতিথি হ'য়ে কতদিন ছিলেন বৃন্দাবনে?

দেবানন্দ: তা দশবারো দিন হবে।

অসিত: ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হ'ল কোথায়?

দেবানন্দ: সে এক ইতিহাস অসিতবাবু! কী ভাবে যে ঠাকুর লীলা করেন কেউ কি জানে, না জানবে কোনদিন? হ'ল কি শুনবেন? আমি গিয়েছি নাসিকে। হঠাৎ দেখি গোদাবরীতে এক উজ্জ্বলকান্তি দীর্ঘকায় সাধক কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তর্পণ করছেন। বুঝতে বাকি রইল না যে, সাধকটি খাস সাহেব। আকৃষ্ট হলাম বৈকি। স্নান করতে করতে কেবলই চেয়ে চেয়ে দেখি। মাঝে মাঝে তাঁরও চোখ পড়ে আমার দিকে। বুঝলাম—এরই নাম শুভদৃষ্টি—Who ever loved that loved not at first sight? আলাপ করতে ইচ্ছা হ'ল, ভাবছি কী ক'রে এগোই—এমন সময়ে বিধাতা কল্পতরু হ'য়ে ওঁকে পাঠালেন নদীর পাড়ে এক গণেশ মন্দিরে। তিনি ঢুকতে যাবেন এমন সময়ে মন্দিরের পূজারী হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল—ম্লেচ্ছ যে! আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ধমকালাম গোঁড়া পুরুতকে: "ভেবেছ কি? আমি

ম্যাজিস্ট্রেটের বন্ধু, তাঁর কাছে রিপোর্ট করব···ইত্যাদি। সে ভয় খেয়ে স'রে দাঁড়াল—আমরা দুজনেই মন্দিরে ঢুকে গণেশজিকে প্রণাম ক'রে বেরুলাম। বলা বাহুল্য আলাপ জ'মে উঠল। আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ করলাম বৃন্দাবনে আসতে। এসে উঠলেন আমাদের মিশনে। তখন ধরলাম একদিন—কিছু বলতেই হবে। উনি রাজী হলেন। এমন চমৎকার বললেন যে, বহু শ্রোতা ধরল—আরো ভাষণ শুনবে। উনি তখন বিপন্ন কণ্ঠে আমাকে বললেন: 'এ আমি পারব না স্বামীজি। আমি বৃন্দাবনে এসেছি বৈষ্ণবদের কাছে অনেক কিছু শিখতে—বক্তৃতা দিয়ে লোকশিক্ষা দিতে নয়। তাছাড়া আমার 'চাপরাশ' নেই তো।"

অসিত: আমাকেও আজ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন একটু ঘুরিয়ে: এ দেশের মাটিও চিন্ময়—এখানে এসে শুধু ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে হয়, এহেন পুণ্যভূমিতে এসে বিদেশীরা কী বলবে তাদের যারা এ-আবহে মানুষ?" ব'লে আওড়ালেন ভাগবতের বিখ্যাত শ্লোক—উদ্ধব বলছেন: আমি যেন পরজন্মে বৃন্দাবনের গুল্ম লতা ঘাস হ'য়ে জন্মাই, তাহলে গোপীদের পায়ের ধুলোয় ত'রে যাব—শ্লোকটি জানেন নিশ্চয়ই?

দেবানন্দ: জানি? বিলক্ষণ! কতবারই তো আমাদের মিশন হলে বক্তৃতা দিতে উঠে ফাটিয়ে দিয়েছি আওড়ে:

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং······সঙ্গে সঙ্গে জাঁকালো ভাষ্য ক'রে—এখানকার ভক্তবৈষ্ণব—বিশেষ ক'রে সুপণ্ডিতা বৈষ্ণবীদের হাততালি কুড়িয়েছি।

অসিত (হেসে): বৈষ্ণবীরাও হাততালি দেন নাকি?

দেবানন্দ: বাঃ চোরা গোপ্তা দেন বৈকি। তাঁদের কি সন্দেহ আছে এতটুকু যে, ব্রজবাসী হ'তে না হ'তে যদু মধু যাদবী মাধবী সবাই রাতারাতি গোপ-গোপী ব'নে যান—দ্বাপরযুগে যাঁদের পূর্ব সংস্করণের হাততালিতে ঠাকুর আমাদের নেচে কুঁদে অস্থির হ'তেন?

অসিত (হো হো ক'রে হেসে): এ একটা কথা বলেছেন বটে—আমার ডায়রিতে টুকে রাখবার ম'ত। কিন্তু সে থাক। বলুন, তারপর? আমি ওঁর সম্বন্ধে আর একটু জানতে চাই।

দেবানন্দ: বলতে পারি—কিন্তু রসুন—ওঁকে ধরুন যদি একদিন ডাকি এখানে প্রসাদ পেতে? অবশ্য আপনার ভজনের লোভ দেখিয়ে তবে।

তারপর ভজন তথা ভোজনান্তে সবাই চ'লে গেলে আপনি বেশ সাধ মিটিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করবেন। এ কেমন প্রস্তাব ?

অসিত (উল্লসিত): একেবারে অনবদ্য। তবে আমাকে উনি কাল ডেকেছেন ওঁদের ওখানে খেতে আর বলেছেন আপনাকেও খেতে হবে। ওঁর শিষ্যা ললিতা দেবী না কি চমৎকার রাঁধেন—বলছিলেন।

দেবানন্দ: বলেন কি ? ললিতা দেবী যে ছিলেন ফ্যাশনেব্‌ল মেয়ে।

অসিত: আপনি এত খবর রাখেন !

দেবানন্দ: রাখব না ? বাঃ। লক্ষ্ণৌয়ে ওঁদের বাড়ীতে একদিন খেয়ে এসেছি যে। তখন ললিতা দেবীর শাড়ী ব্লাউজের কী বাহারই যে ছিল ! আর ওঁর মা শান্তিদেবী ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের মহিলাসমাজের leader of fashion —ডাকসাইটে dame de salon যাকে বলে—bobbed hair, ইংরাজী বুলির খই ফুটছে মুখে—না খইয়ের সঙ্গে সিগারেটও। তাঁর মেয়ে এলেন কিনা বৃন্দাবনে, আর রয়েছেন লুকিয়ে গোয়াল ঘরে ? ঠাকুরের লীলা বটে—বলিহারি !

অসিত (হেসে): শুনেছি ঠাকুরের বাঁশির ডাকে সাড়া দিতে না দিতে মানুষের মনের প্রাণের রঙ বদল হয় বহুরূপীর মতন হয়ত ললিতা দেবীও সাড়া দিয়ে থাকবেন। লালাবাবুর ইতিহাস তো জানেন ?

দেবানন্দ (মাথা নেড়ে): লালাবাবু ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মান না অসিতবাবু। বৃন্দাবনে আমি বোষ্টম বৈরাগী দেখেছি কি কম ? কিন্তু তাদের মধ্যে কত যে মেকি—স্রেফ ফাঁকা, অসিতবাবু—শুধু বুলিসার। দুচারটে চোস্ত সংস্কৃত শ্লোক, চৈতন্য চরিতামৃতের বা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুপ্রাস নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ—কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

অসিত: কিন্তু ললিতা দেবী হয়ত ঠিক তাঁদের দলে পড়েন না।

দেবানন্দ (জিভ কেটে): ছি ছি ! আমি কি অমন ইঙ্গিত করতে পারি কখনো ? তাছাড়া আমি কি জানি না অসিতবাবু যে, এক কথায় ত্যাগ করতে পারে তারাই যারা ভোগ করেছে চুটিয়ে ? ললিতা দেবীর কথা অবিশ্যি বলতে পারি না। তবে শান্তিদেবীর মেয়ে যখন তখন ভোগ বেশ কিছু করেছেনই করেছেন—অবধারিত। আমার কেবল আশ্চর্য লাগে ভাবতে ওঁরা বৃন্দাবনে এসে এক ভাঙা গোয়ালঘরে রইলেন এতে শান্তিদেবী মত দিলেন কেমন

ক'রে? (থেমে) অবিশ্যি শুনেছি শান্তিদেবী মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন কয়েক বছর আগে—

অসিত: মাথা মুড়িয়ে?

দেবানন্দ: বাঃ! কুলীন সন্ন্যাস দীক্ষায় যে মাথা না মুড়োলেই নয়—যদিও (হেসে) ঘোল ঢালা শাস্ত্রীয় কিনা বলতে পারি না। কিন্তু না, প্রগল্‌ভতা ঠিক নয়। কারণ শান্তি দেবী সত্যিই মস্ত সাধিকা—আমার গুরুদেবের মুখে শুনেছি। তিনি ওঁকে বহুদিন থেকে জানতেন যখন উনি কুমারী ছিলেন। মস্ত আধার। নৈলে কি স্বামী বিবেকানন্দ ওঁকে কুমারী পূজো করতেন?

অসিত: বলেন কি?

দেবানন্দ: একেবারে অক্ষরে অক্ষরে অসিতবাবু। গুরুদেবের মুখে শুনেছি শান্তি দেবীর না কি ছেলেবেলায় একবার স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল।

অসিত (উদ্দীপ্ত): বটে? তারপর?

দেবানন্দ (হেসে): আপনার কৌতূহল মেয়েছেলেদেরও হার মানায়, অসিতবাবু! আমার কি ছাই মনে আছে গুরুদেব আরো কী কী বলেছিলেন ওঁর সম্বন্ধে? তবে একথা সবাই জানে যে, বছর পাঁচ-ছয় আগে তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে সংসার ছেড়ে প্রস্থান করেন হিমালয়ে। আলমোরার গহন অরণ্যে এক মন্দির বানিয়ে সেখানে নাকি সেই থেকে অশ্রান্ত জপ ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তবে আমার লোকমুখে শোনা। এর বেশি যদি খবর চান তো আমি নিতে পারি অবশ্য। কিন্তু আপনি তো কাল যাচ্ছেন ওখানে—হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন আর? প্রেমল বাবাজিকেই জিজ্ঞাসা করবেন না।

অসিত (একটু পরে): ঠিক বলেছেন। তাই করব।

তিন

রামকৃষ্ণ মিশনে অসিত ছিল একটি সুন্দর নির্জন ঘরে। এই সব কথাবার্তার পরে দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটি আরামকেদারা বারান্দায় টেনে সবে বসেছে এমন সময় ঝমাঝম বৃষ্টি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখে—মেঘচমূদের আস্ফালন প্রায় প্রায় দানবিক হ'য়ে উঠেছে। কড় কড় কড় কড়! উঃ!—ঐ ফের চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ! কিন্তু কি সুন্দর নীলাভ মেঘ! মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে আর মনে একটি বিখ্যাত গানের দুটি চরণ গুনগুনিয়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের:

"আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে।
জল ভরেছে ঐ গগনের নীল নয়নের কোণে।"

এমন ওর কতবারই তো হয়েছে—ভালো প্রিয় গানের চরণ স্মৃতির তারে ঝঙ্কার দিতেই যেন সে-ঝঙ্কার টেনে আনে নানা অনুরূপ গুঞ্জন! ওর মনে রণিয়ে উঠল—অমনি পকেট ডায়রি খুলে লিখল:

ঐ বহিল ধারা
ছিল নিরুদ্ধ যত নীর সুপ্তিহারা—
দেখ, বহিল তারা!
দূরে গগনে কে দেয় তান মেঘ-আঁখরে,
বলে নিরাশার নাগরিকে: "জাগো জাগো রে,
ছিলে যার লাগিয়া আশা পথ চাহিয়া
তুমি বন্ধ্যা তৃষায়—আমি তাহারি তরে
নীল ঝারিটি ভ'রে
দেখ এনেছি বহিয়া শ্যামলের ইসারা—
তারি বহিল ধারা।

"তারি আকাশ-আকুলতার অকূল বাঁশি
করে ঝরঝরি মাটির মর্মে উদাসী।
যারে অবনী যাচে—রাজে আমারি মাঝে,

নিতি তাই তো মাটির ডাকে নামিয়া আসি,
আমি ভালো যে বাসি,
তাই তরল প্রণয়ে ভাঙি পাষাণকারা—
তারি বহিল ধারা।”

ঝর ঝর ঝর ঝর···বৃষ্টি দেখতে দেখতে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। আরামকেদারাটি বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে টেনে নিতে হয়। পায়ের কাছে ছাটের লুটোপুটি! চারদিক ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে···আশ্চর্য—ভাবে অসিত—আশপাশের তাপ বা শীতলতার সঙ্গে সঙ্গে মনও কী চমৎকার তাল রেখে চলে। গ্রীষ্মে যে-মন আইঢাই করে, সে এক মুহূর্তেই বর্ষার প্রসাদে গান গেয়ে ওঠে সব-পেয়েছির-দেশের সুরে দোয়ার দিয়ে।

ঝর ঝর ঝর ঝর···চারিদিকে ধারাবর্ষণের দুলন্ত বেগে এক বৈরাগী আনন্দের সুর জেগে ওঠে। মাটি থাকে আকাশের কাছে হাত পেতে—এ তো কথার কথা নয়! দুদিন তাপ বাড়লে মানুষ কী ছুটোছুটিই না করে একটু ঠাণ্ডায় জুড়োতে···কখনো ছোটে শৈলাচলে, কখনো নদীস্নানে, কখনো সাগরতীরে। বাইরের তাপ মনেও সংক্রমিত হয় আর্তি হ'য়ে যেন। সত্যি মানুষ কি অসহায়! স্বাবলম্বী হবার পথে বাধা কি একটা? আকাশ বাতাস মেঘ সূর্য শিলাবৃষ্টি ঝড়তুফান বিদ্যুৎ রাজ সব কিছুই হ'তে পারে সাধনার বাধা, করতে পারে মানুষকে আর্ত, ক্লিষ্ট, পঙ্গু! সে আপ্রাণ চেষ্টা করে বটে জপ করতে:

“এই কথাটা ধ'রে রাখিস্ মুক্তি তোকে পেতেই হবে, খুসি হ'য়ে ঝড়ের হাওয়ার ঢেউ যে তোকে খেতেই হবে”···কিন্তু এ-পাওয়া কি সোজা পাওয়া? পারে কজন? আর যারা পারেও তারা কত সাধনার পরে তবে পারে—তাও হয়ত দুদিনের জন্যে। দুটো ঘা-র পরে তিনটে বাজতেই আর টাল সামলাতে পারে না।

ঝর ঝর ঝর ঝর······ঐ সামনে কদম গাছের তলায় জল জমে···দেখতে দেখতে সামনের শুকনো মাটির 'পরে জলের সতরঞ্চ কাঁপতে থাকে···

ঝর ঝর ঝর ঝর···ফুট ফুট ক'রে বৃষ্টির ধারায় জলের আস্তরণে হিল্লোল জেগে ওঠে···থেকে থেকে হূ হূ হূ হূ শব্দে ঝাঁপটা আসে দমকা হাওয়ার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, আর মনে হয় ঠিক যেন সামনের মাটিতে সবে-জাগা পুষ্করিণীটি

হেলছে দুলছে পরমানন্দে—থেকে থেকে ছুটে-আসা ভিজে হাওয়ার ইসারার তালে তালে।

কড় কড় কড়াৎ···দিগন্তে দীপ্ত বিদ্যুতের ছুরি ঝল্‌কে ওঠে···আবার ঐ মেঘের টঙ্কার···বুকের রক্ত ওঠে দুলে। অনেকে বাজ পড়লে ভয় পায়। কিন্তু কেন? চম্‌কে ওঠা বোঝা যায়। কিন্তু কত আনন্দই তো চমকের মধ্যে দিয়েই নিজেকে জানান দেয়। অসিতের মনে পড়ে—একবার বাঙ্গালোরের কাছে নন্দী পাহাড়ের অতিথিশালায় ছিল। ভোরে বৃষ্টি হয়েছে। ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের বুকে মাঝে মাঝে নীলিমার নীল চাহনি দেখা যাচ্ছে। অসিত বেরিয়েছে এম্‌নি বেড়াতে। ভিজে মাটির গন্ধে মনে শিহরণ জেগে উঠেছে···হঠাৎ ও কী? মস্ত সাপ! শির শির ক'রে ওঠে স্নায়ুতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে—কী সুন্দর! কাছ থেকে এক মেঠো বাঁশির সুর ভেসে আসে আর সাপটি ফণা তুলে শোনে। কী চমৎকার! এক ফালি নরম সূর্যের আলো পড়ে তার ফণায়। আলো ঠিকরে ওঠে। এ স্বচক্ষে দেখা। প্রথমে চমক—ভয়, কিন্তু তার পরেই সাপেরও ফণায় যেন মণি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ওখানকার এক মন্দিরের পূজারীর কাছে শুনেছিল তারা নাগপঞ্চমীতে সাপের পূজো করে। পূজারী বলেছিল: "সাপকে সত্যিই পোষ মানানো যায়, বাবুজি! সত্যিই আমরা তাকে দুধ কলা দেই মাঝে মাঝে।" অসিতকে পরে সে বলেছিল যে সে এই বাস্তু সাপটিকেই দেখেছে। কারণ সে প্রায়ই বাঁশি শুনলেই ফণা তুলে দোলে।

ঝর ঝর ঝর ঝর···জলের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্বন্ধ। এক সময়ে তো আমরা জলচরই ছিলাম। তারপর উভচর। তারপরে না মাটির মানুষ এল। অন্ততঃ এই রকমই তো গুজব। মরুক গে···আমরা কবে কী ছিলাম না জানতে পারি, কিন্তু এটা জানি যে, জল দুলে ওঠে আমাদের মাটিছাড়া করতে, যেমন মাটি ডাকে জল ছেড়ে তার কোলে ঠাঁই পাওয়ার প্রার্থনা জাগাতে। আমাদের শরীরের বারো আনা তো শুনি নিছক জল। তাই কি এত ভালো লাগে বর্ষার ঝর ঝর ঝর ঝর?

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা আসে। দেখে এক চমৎকার স্বপ্ন:

যমুনায় চলেছে এক নৌকোয় প্রেমলকে নিয়ে। হঠাৎ আকাশে ঘনঘটা অসিত মাঝিকে বলে নৌকো তীরে ভিড়াতে। প্রেমল বাধা দেয়: "না না, বেশ তো—নদীতে বৃষ্টি বড় চমৎকার!"

"কিন্তু ঝড় উঠল ব'লে—"

"তাহ'লেই বা ভয় কি ?" বলে প্রেমল, "ঠাকুর তো আছেন !"

বলতে না বলতে এক দম্‌কা হাওয়ায় নৌকো উল্টে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেমল মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল: "ভয় কি ? ঐ দেখ সামনে অশ্বত্থ গাছের লম্বা শিকড়। বলি নি—ঠাকুর আছেন ?"

শিকড় চেপে ধরতেই অসিতের বুকে ভরসা জেগে উঠল। বলল: "সত্যিই তো ! কিন্তু মাঝদরিয়ায় শিকড় !

প্রেমল ব'লে ওঠে: "ঠাকুর সব হ'তে পারেন কেবল শিকড় হ'তে পারেন না ?"

ঘুম ভেঙে যায়। আনন্দে শান্তিতে মন ছেয়ে গেছে।

চেয়ে দেখে তখনও সমানে চলেছে বৃষ্টি:

ঝর ঝর ঝর ঝর...

হঠাৎ স্বামীজির ডাক: "এই যে চা, অসিতবাবু ! উঃ ! কী বৃষ্টি !"

অসিতের হঠাৎ মনে পড়ে প্রেমলের কথা। বলে: "কিন্তু স্বামীজি, ভাবুন তো, এ-দারুণ বৃষ্টিতে ওঁরা ছুটিতে কী ভাবে আছেন এখন ! সে-ভাঙা গোয়াল ঘরে নাকি একটা দোর পর্যন্ত নেই।"

স্বামীজি হেসে বললেন: "কিন্তু বৈরাগী মহারাজের অগাধ বিশ্বাস। কথায় কথায় বলেন—ঠাকুর আছেন।, তাঁকে বৃষ্টি কী করবে ?"

অসিতের মনের মধ্যে সম্ভ্রম জেগে ওঠে। মনে প'ড়ে যায় স্বপ্নের কথা। বলে: "জানেন স্বামীজি ! আমি এইমাত্র একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি।

ব'লে স্বপ্নটির বর্ণনা করে খুঁটিয়ে।

স্বামীজি: কিন্তু তাঁর এই প্রিয় বুলিটি কি আপনি তাঁর মুখে আজ সকালে শুনেছিলেন ?

অসিত: এখন মনে পড়ছে—শুনেছিলাম। হয়েছিল কি, ওঁর পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। উনি বলেছিলেন স্নান সেরে ফিরে গিয়ে কাঁটাটি তুলবেন—ঠাকুরের ভাষায়—আর একটা কাঁটা দিয়ে। আমি বললাম: "না দাঁড়ান, আমার কাছে সেফটিপিন আছে। এই ঘাটেই কাঁটাটি তুলে না দিয়ে ছাড়ছি নি। আপনি আমাকে কচ্ছপের হাত থেকে বাঁচালেন, তার কিছুটা অন্ততঃ প্রতিদান না দিলে

চলে ?" ব'লে ঘাটে ব'সেই ওঁর পা থেকে কাঁটাটি তুলে দিলাম। উনি হেসে বললেন: "দেখলেন? বলি নি ঠাকুর আছেন? তিনি এলেন সেফটিপিন হ'য়ে—হা হা হা!"

দেবানন্দ (চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে): আমার কী যে ভালো লাগে ওঁর খোলা হাসি অসিতবাবু, কী বলব? কিছু যদি মনে না করেন, তো বলি—আপনাকে এত ডাকাডাকি করিও ঐ একই কারণে—আপনিও হাসতে জানেন ব'লে। কি জানেন অসিতবাবু, বৃন্দাবনের অনেক সাধকদের সঙ্গেই মিশতে কেমন যেন ভয় ভয় করে—মনে পড়ে স্থকুমার রায়ের ছড়া: 'রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাঁদের মানা।' বলতে কি, বৈরাগীজিকে আমি এক আঁচড়ে চিনে নিই প্রথম তাঁর হাসি দেখেই।

অসিত (চায়ে চুমুক দিয়ে): কী রকম?

দেবানন্দ: উনি সেবার আমাদের এখানেই উঠেছিলেন—বলেছি। জানেনই তো, হাজার গেরুয়া পরলেও সাহেবকে দেখে চট্ ক'রে দিশি মনে হয় না। তাই আমি বেশ একটু সমীহ ক'রে চলতাম ওঁকে। তাছাড়া আমিও তো একটা কেওকেটা নই। কাজেই কথাবার্তা কইতাম একেবারে নিখুঁৎ অষ্টাবক্র সংহিতা। অর্থাৎ পান থেকে চুনটি পর্যন্ত যেন না খসে সাহেবের সামনে—এই ভাব। তখন কি জানি—কিন্তু না, শুনুনই না কী হ'ল। এই গল্পটিই সকালে বলতে গিয়ে কথার মোড় ঘুরে যেতে আর বলা হয় নি।

একদিন চলেছি আমরা যমুনায় স্নান করতে—হঠাৎ পথে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা—মাধব মৈত্র। মানুষটি খুবই ভক্ত ও নম্র, কিন্তু একটু গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারি মানুষ। কাজেই আমার সঙ্গে ওঁকে দেখেই প্রশ্ন ক'রে বললেন: "মহারাজ, আপনার দেশ কোথায় বলবেন কি দয়া ক'রে?" আমি ভাবলাম: এই সেরেছে রে! এর পরে জিজ্ঞাসা করবেন বাপের নাম। কিন্তু মহারাজ ধরা দেবার পাত্র নন তো, পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসলেন: "আমার সত্যিকার দেশ, না মিথ্যে?" মাধববাবু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন: "তা—ইয়ে—সত্যিকার দেশই অবিশ্যি।" বৈরাগী মহারাজ হেঁট হ'য়ে বৃন্দাবনের একমুঠো রজঃ তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ধ'রে বললেন: "এই।" মাধববাবু তো থ। বললেন: "আর—ইয়ে—মিথ্যে দেশ?" উনি হো হো ক'রে হেসে বললেন: "ডাক্তারবাবু! মানুষ মিথ্যা থেকেই সত্যে উঠতে চায় সিঁড়ি

বেয়ে। তার পরে ফের কে নামতে চায় মিথ্যের খবর পেতে? (হেসে) সেদিন আমারও চৈতন্য হ'ল—সত্যি বলছি। কী গেরো! এঁকে সাহেব মনে ক'রে কেবল শাস্ত্র কথা আওড়ে এ-কয়দিন মিথ্যে মিথ্যে হাসি গল্পের রস থেকে বঞ্চিত থেকেছি কী দুঃখে? বৈরাগী মহারাজ বোধহয় টেলিপ্যাথি জানেন, বললেন: "কী স্বামীজি, তটস্থ ভাব কেটে গিয়ে ভরসা এসেছে তো, না আপনাকে ব্যাখ্যা ক'রে তবে বোঝাতে হবে যে, যেমন পাখা থাকলেই পাখী হয় না, তেমনি দাঁত নখ থাকলেই তাকে নখী দন্তী ব'লে দেগে দেওয়া চলে না?" (হঠাৎ) কিন্তু অসিতবাবু, একটা কথা মনে হ'ল হঠাৎ যে তাহ'লে তো সাঁতার জানলেও তাকে জলচর বলা চলে না। এ-প্রলয়-পয়োধি-জলে বৈরাগী মহারাজের গোয়াল ঘরটির আজ না জানি কী অবস্থা!

অসিত: একথা আমারও মনে হয়েছিল স্বামীজি! যে-ঘরে শিষ্যাকে নিয়ে উনি ঘরকন্না করতে এসেছেন তাকে এখন হয়ত উপাধি দিতে হবে ঘরবন্যা।

দেবানন্দ: বটেই তো। কিন্তু—কী করি বলুন তো? আমাদের এখানে যে সব ঘরই অতিথিতে ভরতি। কাল এসেছেন দুটি আমেরিকান, একটি পোল আর একটি কাশ্মিরী ভক্ত। আমাদের অতিথিশালা না বাড়ালে···

অসিত (একটু ভেবে): আপনাদের কোন ভক্তের বাড়ীতে ব্যবস্থা হয় না?

দেবানন্দ: খাস সাহেব যে অসিতবাবু!

অসিত (আতপ্ত কণ্ঠে): আপনার মুখে যা শুনেছি আর স্বচক্ষে যা দেখেছি তার পরেও কি ওঁকে সাহেব বলা চলে, স্বামীজি?

দেবানন্দ: তা বটে। তবু—জানেনই তো গোরা মুখ তো—ভয় করে, বিশেষ এখানকার ভক্ত-সম্প্রদায়—তাদের আবার ছোঁওয়া ছুঁইয়ির বাতিকও আছে তো—বিশেষ বৃন্দাবনে।

অসিত (ভেবে) আচ্ছা, ঐ ডাক্তার মাধববাবু—যাঁর কথা বললেন—তাঁর বাড়ীতে ব্যবস্থা হয় না?

দেবানন্দ (লাফিয়ে উঠে): ঠিক ঠিক, এই দেখুন—ঠাকুরের উপমা মনে পড়ে না—এক মুসলমান টিকে ধরাতে আগুন চাইতে গেছে পাশের বাড়ী। তারা তো অবাক: "সে কি মিঞা? তোমার হাতে লণ্ঠন জ্বলছে যে!"

মাধববাবু বিলেত-ফেরৎ—বাড়ীও বড়, গৃহীণীটিও সুশীলা। ওঁর ওখানেই তুলি। রসুন আমি এক্ষুনি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি ওঁরা রাজী কি না? আহা বৈরাগী মহারাজের ঘর হয়ত এখন মানস সরোবর হ'য়ে গেছে!

চার

অসিত আকাশের দিকে তাকায়। বৃষ্টির হুম্‌কি থেমেছে বটে, কিন্তু দু'তিন দল মহাকায় মেঘ আকাশ পাহারা দিচ্ছে—হাওয়াও বন্ধ, গুমট মতন। আবার বৃষ্টি নামল ব'লে। আহা, বৈরাগীজি কী করছেন এখন শিষ্যাকে নিয়ে! "ঠাকুর আছেন" ব'লে নিশ্চিন্ত আছেন কি এখনো? কে জানে? কাঁটা ফুটলে দার্শনিক হওয়া শক্ত নয়, কিন্তু শূল বেদনা হ'লে? ওর মনে পড়ে এক বন্ধুর কথা। সে জ্বর হ'লে কুইনিন খেত না, বলত: "জ্বর যখন ঠাকুরই দিয়েছেন তখন সারাবার ভারও তাঁর।" কিন্তু একবার তাঁর দাঁতে ব্যথা হ'তে অধীর হ'য়ে ছুটেছিলেন দন্ত-ধন্বন্তরির কাছে। হয়ত মানুষ কিছুদূর অবধি সইতে পারে—আর যতক্ষণ পারে জাঁক করে শরণাগতির। কিন্তু ব্যথা বাড়তে বাড়তে তার মনও বদ্‌লে যায় ভয়ের চাপে। ভাবতে ভালো লাগে যে, এ-বিদেশী যোগীটি ঘোর বৃষ্টিতেও সমান নির্বিকার আছেন—কিন্তু যদি ঘর ভেসে গিয়ে থাকে?··· এই রকম সাত পাঁচ চিন্তা।···

*　　*　　*　　*

স্বামীজি ফিরে বললেন সোল্লাসে: "ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন: 'উনি আমাদের অতিথি হ'লে আমরা তো ধন্য হ'য়ে যাব স্বামীজি। আমি এক্ষুনি মোটর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার হঠাৎ পা মচকে গেছে আজ সকালে। তাই আপনি কি অসিতবাবু গিয়ে নিয়ে আসুন ওঁদের'।"

অসিত (খুশী): সাবাস স্বামীজি! কিন্তু দেখুন ফের বৈরাগী বাবাজীই জিৎলেন—এবার ঠাকুর দেখা দিলেন সাধুজির তৎপরতা আর ডাক্তারের করুণার কম্পাউণ্ড হ'য়ে।

দেবানন্দ (হেসে): না। জুড়ে দিন—প্লাস প্রত্যুৎপন্নমতি অতিথির দৈবী প্রেরণা। কিন্তু যেহেতু আমাকে যেতে হচ্ছে আশ্রমের ডিস্পেন্সারিতে

—একঘর লোক অপেক্ষা করছে—সেহেতু আমি বলি কি, মোটরে ক'রে আপনি নিজে গিয়ে গুরু-শিষ্যাকে গ্রেপ্তার ক'রে গছিয়ে দিন ডাক্তারবাবুর—না, তাঁর স্ত্রী তারার—হাতে। সে ভারী চমৎকার মেয়ে। খুব ভক্তি করে বৈরাগী মহারাজকে। দেখেছে তো তাঁকে—করবে না ভক্তি? কিন্তু আর দেরি না —বৃষ্টি সবে একটু কমেছে, কিন্তু আকাশের অবস্থা তো দেখেছেন। দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ুন শৃঙ্গধ্বনি ক'রে—বিপদ কেটে যাবে। ভাগো আপনি ডাক্তারবাবুর নাম করেছিলেন! তা আপনি হ'লেন কবি তথা গুণী, জাত সাপ যাকে বলে—আপনাদের কল্পনা থাকবে না তো থাকবে কি আমাদের মতন শুক্‌নো সাধুর!'

পাঁচ

অসিতকে পথে সারথি বলেছিল যে, গোয়াল ঘরটি এক বাঙালী ব্যবসায়ীর সম্পত্তি—তাঁর বাড়ী থেকে আধমাইল দূরে। অসিত একটু অবাক্ হ'য়ে তাঁর নামধাম জিজ্ঞাসা করতে সারথি বলেছিল সে বেশি জানে না, তবে এটুকু জানে যে, তিনি এক শেঠজির কাপড়ের ব্যবসার দোকান কিনে বৃন্দাবনে ব্যবসা বাড়িয়ে প্রচুর টাকা করেছেন। তাই জাতে বাঙালী হ'লেও শেঠজি নামেই তিনি পরিচিত। আসল নাম সারথি বলতে পারল না।

অসিত (ভেবে): ব'লে বড় ভালো করেছ ভাই। চলো আগে তাঁর কাছে—পারি তো তাঁকে নিয়েই যাব সাধুজির কাছে। শেঠজি এখানকার সব জানেন শোনেন, সুবিধে হবে।

মোটর গাড়ীবারান্দার নিচে গিয়ে থামতেই দারোয়ান সেলাম ক'রে বৈঠকখানায় অতিথিকে বসিয়ে খবর দিলে চেঁচিয়ে—"ডাগ্‌দর বাবুকি মোটর আঈ।"

শুনবামাত্র শশব্যস্ত শেঠজির অভ্যুদয়।

বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। কাজেই উপায় কি? এ ও তা কথাবার্তা সুরু হ'ল।

অতঃপর অসিত পাড়ল আসল কথা—যেজন্যে আসা: "শুনলাম আপনার এখানে একটি গোয়ালঘর আছে। সত্যি?"

শেঠজি: পোড়ো ঘর জী। তবে মাঝে মহাত্মারা এসে থাকেন, তাই দুটো দড়ির খাটিয়া রেখে দিয়েছি। আর কোণে একটি উনুন। মহাত্মারা স্বপাকে খান তো।

অসিত: এক মহাত্মা আমাকে আজ সকালে বললেন তিনি সেখানে উঠেছেন।

শেঠজি: হ্যাঁ। আমার দারোয়ান বলছিল সেদিন। শুনলাম একেবারে খাস সাহেব। সত্যি?

অসিত: জাতে খাস সাহেব বৈকি, কিন্তু আসলে আপনার আমার চেয়েও হিন্দু, শেঠজি। আলমোরায় তাঁর আশ্রম আছে—মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। পূজারী তিনিই। বৃন্দাবনে আসেন শুধু এখানকার পুণ্য রজঃ ছুঁয়ে জপতপের প্রেরণা পেতে।

শেঠজি: অ্যাঁ! বলেন কি জী?

অসিত: আর বলি কি! তার ওপর হিন্দু শিষ্যা জী! বড় ঘরের মেয়ে।

শেঠজি: শিষ্যা? বৈষ্ণবী? মানে, কণ্ঠিবদল?

অসিত (জিভ কেটে): ছি ছি! তাঁর কন্যাশিষ্যা "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব" অর্থাৎ শিষ্যশিষ্যাদের কাছে গুরু একাধারে বাপ মা। জানেন তো স্তবটি?

শেঠজি (একগাল হেসে): আপনার মুখেই একবার শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল জী! আহা, কী গানই গান আপনি অসিতবাবু! এবারও গান হবে তো?

অসিত: হবে বৈ কি। আজই স্বামীজি বলছিলেন যে, কাল কিম্বা পরশু সবাইকে ডাকবেন রীতিমত নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে।

শেঠজি: বেশ বেশ জী। কেবল আমি যেন বাদ না পড়ি। আপনার ভজন—আহা, যেন মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং……কিন্তু জানেন (হেসে) যে-ঘরে সাধুজি অছেন সেটা সত্যি সত্যিই গোয়াল ঘর ছিল আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের। তিনি গত হওয়ার পর গরু গেছে, কেবল গোয়াল আছে। (ব'লে নিজের রসিকতায় হেসে কুটি কুটি)

অসিত: কিন্তু সেখানে বৈরাগী মহারাজ উঠেছেন কি আপনাকে জানিয়ে?

শেঠজি: না। ওটা তো এখন পোড়ো বাড়ী—অনেক সাধু মহাত্মা এসে থাকেন। তাই—বললাম না—কয়েকটি দড়ির খাট রেখে দিয়েছি। কিন্তু দোর সব ভেঙে গেছে—মেরামত করব করব ক'রেও করা হয়নি।

অসিত মনে মনে হাসল, কিন্তু কিছু বলল না। জানত তো "মহাত্মাদের" জন্যে বিষয়ীরা কী রকম মহান্ ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। হৃষীকেশ-এ একবার দেখেছিল স্বচক্ষে—পোড়ো বাড়ীতে তাঁদের জন্যে এক এক খাটিয়া আর উনুন জুগিয়ে মহাত্মাভক্ত পুণ্যাত্মারা খালাস। ভাবটা—মহাত্মারা যখন মহীয়ান্ তখন তাঁরা সুখে থাকতে চাইবেনই বা কেন? সে যাক, অসিত শেঠজির অশ্রান্ত প্রশ্নবাণের উত্তরে বলল যে সাহেব মহাত্মা ও তাঁর শিষ্যাকে নিয়ে যেতেই ওর আসা।

এই সময়ে শেঠজির চাকর দুপেয়ালা চা এনে ধরল একটি ট্রে-তে। সঙ্গে ঝুরিভাজা ও ফুলুরি।

"এ হাঙ্গামা আবার কেন শেঠজি!"

"বলেন কি জী? আপনি অতিথি, মেহমান—সাক্ষাৎ দেবতা—আর বর্ষায়ই তো চাই এসব—নিন জী। তাজা ফুলুরি। ওঃ—কী হাওয়াই দিচ্ছে!—ও কী! দেখুন দেখুন জী! শিল পড়ছে!

অসিতের মন খারাপ হ'য়ে গেল। সত্যিই শিলাবৃষ্টির সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। সশিষ্যা বৈরাগী মহারাজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে ক্রমশঃ মনের মধ্যে উদ্বেগ জ'মে ওঠে। চা ফুলুরি কিছুই মুখে রোচে না। তবু কথাবার্তা চালাতে হয়। না চালিয়ে করে কী—যখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই?...

একটু বাদে বৃষ্টির তোড় কমতেই অসিত উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু শেঠজি হাঁ হাঁ ক'রে লাফিয়ে উঠে করজোড়ে বললেন: "অমন কাজটি করবেন না। এ-ঝড় না থামলে বেরুবেন না। চারধারেই বুড়ো গাছ—কখন কার ডাল ভেঙে পড়ে—বুঝলেন না? (থেমে) আর একটু চা আনাই?"

অসিত: না শেঠজি, ধন্যবাদ। (হঠাৎ) কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে শেঠজি।

শেঠজি: সে কি কথা? মনে করব কেন! বলুন যা প্রাণ চায়।

অসিত : প্রাণ আমার নিদারুণ কিছু চাইছে না। কেবল একটা কৌতূহল জেগে উঠেছে। আপনি তো আচারী হিন্দু, পরম ধার্মিক, সদাশয় দাতা শুনতে পাই। সাধুসন্তদের মহাত্মা ব'লেও মানেন। দারোয়ানের মুখে শুনেওছিলেন যে, বৈরাগী মহারাজ আপনার গোয়াল ঘরেই উঠেছেন। কিন্তু তবু এই ঘোর বৃষ্টিতেও তাঁকে কেন নিয়ে এলেন না আপনার এখানে ?

শেঠজি : (আমতা আমতা ক'রে) আনতাম জী···তবে···মানে কি জানেন···উনি সাহেব তো···আর আমার গিন্নি···মানে জানেনই তো মেয়েদের শুচিবাই—

অসিত : কিন্তু আপনার তো মস্ত বাড়ী—বাইরে কোনো ঘরেও ওঁদের রাখতে পারতেন।

শেঠজি (অপ্রতিভ) : তা পারতাম···তবে···বর্ষা এমন হঠাৎ এল···ঝুপ ক'রে···

অসিত আর জেরা করল না। কী হবে মিথ্যে এদের সাধুভক্তিকে অপদস্থ ক'রে ? তাছাড়া আতিথ্য তো স্বভাবে স্বয়ম্ভূ—জোর ক'রে কাউকে দরদী কি বদান্য করা যায় কি ? কিন্তু মন ওর ভারি হ'য়ে উঠল। কী কথা কইবে এ-জাতের ধনীর সঙ্গে—যারা ছুঁৎমার্গী, স্ত্রৈণ, ভয়-কাতুরে ?

তবু একথা সেকথা চালাতে হয়।

* * *

মিনিট পনেরো বাদে ঝড় বৃষ্টি দুইই থেমে গেল। অসিত উঠল : "নমস্কার শেঠজি ! অনেক ধন্যবাদ।"

"সে কি কথা জী ? বসুন আমার দারোয়ানকে নিয়ে যান—মহাত্মাজির মালপত্র মোটরে তুলতে হবে তো !"

অসিতের হাসি এল শেঠজির মহাত্মার প্রতি হঠাৎ-জাগা ভক্তির বহর দেখে।

ছয়

শেঠজির গোয়াল ঘরটি ছিল কাছেই। মোটর পৌঁছল দু মিনিটেই।

কিন্তু এ কী ব্যাপার! টিনের ছাদওয়ালা গোয়াল ঘরটির ভিৎ অদৃশ্য··· আশপাশের মাঠে নিচু জমিতে জল থই থই করছে!! সত্যিই মনে হচ্ছে ঘরটি যেন একটি দ্বীপে দাঁড়িয়ে!!!

প্রায় দুশো গজ হাঁটুজল ভেঙে অসিত শেঠজির দারোয়ানকে নিয়ে পৌঁছল প্রেমল বাবাজির আস্তানায়। দোর ভূমিসাৎ—কাজেই স্পষ্ট দেখতে পেল—পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় ব'সে গুরু শিষ্যা ধ্যানস্থ।

একটু কুণ্ঠিত হ'য়েই অসিত কেশে ডাকল: "মহারাজ··· !"

ঘরে এক বিঘৎ জলের পুকুর। প্রেমল বাবাজি চোখ মেলে চম্‌কে উঠলেন: "এ কি আপনি?"

"হ্যাঁ। এসেছি আপনাকে আর—ওঁকে নিয়ে যেতে, ডাক্তারবাবু মাধব মৈত্র পাঠিয়েছেন আমাকে।

প্রেমল (এক গাল হেসে): বড় সময়েই এসেছেন। তবে বলি নি—ঠাকুর আছেন? (ললিতাকে) কী? আর করবে অবিশ্বাস?

ললিতা (পিঠ পিঠ): কিন্তু ভাগ্যে ওঁর সঙ্গে সকালে বিশ্রাম ঘাটে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। যদি না হ'ত, ঠাকুর কী ব্যবস্থা করতেন শুনি?

প্রেমল (হেসে): "হঠাৎ দেখা" মানে? ঠাকুরের ইচ্ছা না থাকলে কি দেখা হ'তে পারত এমন দরদীর সঙ্গে? কবি কি বলেন নি:

The stormy deeps God's Love outrules,
Coming as an angel bark:
Still, calling it an accident fools
To His miracle Grace never hark:

ললিতা: আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে, হার মানছি—কবিদের তলব ক'রে আর আমাকে কাবু করতে হবে না। কিন্তু—তোমাকেও মানতে

---

* তুফানের ভয় কাটে, এল পারী বেয়ে তারিণীর তরণীখানি:
মূর্খেরা গায়: "দৈবাৎ!"—জানে অঘটনী কৃপা কেবল জ্ঞানী।

হবে যে, তুমিও হার মানলে—পারলে না টিঁকতে এখানে ঠাকুরের অতিথি হ'য়ে।

অসিত: কিছু মনে করবেন না। কিন্তু ডাক্তারবাবুও তো ঠাকুরেরই হাতে গড়া—কাজেই সেখানেও কি তাঁরই অতিথি হ'য়ে থাকা হবে না?

ললিতা: আপনি জানেন না গুরুজির কী ভীষণ গোঁ। এবার খুব জাঁক করেছিলেন যে, একেবারে একলাটি—খুড়ি দোকলা—এখানে থাকবেন—কিন্তু ঐ দেখুন, আপনাকে ভিতরে আসতে বলিই বা কোন প্রাণে? বসাই কোথায় ছাই?

প্রেমল: কেন? আমার খাটিয়ায়। এসো ভাই জল ভেঙে। বাইরে এক হাঁটু জল ভেঙে যখন এসেছ, এখানে এক বিঘৎ জল ভাঙতে বেগ পেতে হবে না—বড় দীক্ষার পরে ছোট দীক্ষা সয় সহজেই। এসো চ'লে—এখন থেকে তুমি বলার পর্ব শুরু হ'ল। এমন দরদী বন্ধুকে কি আপনি বলা মানায়? তুমিও আমাকে তুমি ব'লো।

অসিত (হেসে): আচ্ছা সে হবে—কিন্তু শুভস্য শীঘ্রং জানোই তো—তাই তোমরাই বেরিয়ে এসো। এই কিঙ্কর এসেছে—তোমাদের মালপত্র নিয়ে মোটরে তুলতে।

প্রেমল: একটু বসবে না?

ললিতা (হেসে): তুমি যে কী বাপী! বসবেন কোথায় শুনি? (অসিতকে) (অসিতকে) না, আপনি ঠিকই বলেছেন দাদা, দেরি করা নয় আর। ওঁর experiment হ'য়ে দাঁড়াল—যাকে কথায় বলে পথে বসানো—আমাকে দেখুন দেখি (খিল খিল ক'রে হেসে) জলে বসিয়েছেন—একেবারে প্রলয় পয়োধি জলে। আর দেরি করলে বসা ছেড়ে সাঁতার দিতে হবে—ঐ দেখুন ফের বৃষ্টি স্থরু হ'ল! বাতাসও উঠল ফের।

অসিত (দারোয়ানকে): উঠাও সামান।

দারোয়ান ঘরে ঢুকে ওদের একটি তোরঙ্গ ওঠায়। অসিতও ঢোকে—প্রেমলের খাটিয়া থেকে তোলে দুটি কম্বল। পরে ললিতার দুটি কম্বলও পাট ক'রে কাঁধে ফেলে। ললিতা ও প্রেমল ঘরের দু চারটে তৈজস তুলে পুটলি বেঁধে জল ভেঙে এগোয় মোটরের দিকে। মোটরে বসতেই ফের তোড়ে বৃষ্টি নামে।

প্রেমল: কার মোটর?

অসিত : ডাক্তারবাবুর ছাড়া আর কার ? তাঁর পা আজ সকালে মচকে গেছে ব'লে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

অসিত সারথি ও দারোয়ানের পাশে সামনের আসনে বসতে যাবে এমন সময়ে প্রেমল লাফিয়ে তার হাত ধ'রে টেনে ঠেলে ললিতার পাশে বসিয়ে নিজে বসল তার ওপাশে।

কিন্তু কী বিপদ—মোটর ষ্টার্ট নেয় না। গোঁ গোঁ করে, কিন্তু নিশ্চল।

ললিতা (হেসে) : এবার বাপী ? ঠাকুর যে থেকেও নেই ? নামো, ঠেলো মোটর।

দারোয়ান (ব্যস্ত হ'য়ে) : নহি নহি মাজি ! অভি চলেগি মোটর।

প্রেমল তার কথায় কান না দিয়ে নেমে মোটর ঠেলা সুরু করল। দেখে অসিতও নামল। দারোয়ান তখন আর কী করে ? নেমে তিনজনে মোটর ঠেলতে থাকে। একটু ঠেলতে মোটরের ঘর্ঘর গ'র্জে ওঠে, মনে হয় বুঝি চলল বা—কিন্তু হায়রে ! তার পরেই ফের যথাপূর্বং তথা পরং···

বৃষ্টিতেও মোটর ঠেলতে ঠেলতে ওরা যখন গলদঘর্ম কলেবর হ'য়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ মোটর জেগে উঠল।

প্রেমল (হাততালি দিয়ে ললিতাকে) : কী এবার ?

ললিত : এবার মানে ? মোটর চালালেন কিনি ?

প্রেমল (অসিতকে ফের ঠেলে মোটরে তুলে পাশে ব'সে ললিতাকে) : আর কিনি—তিনি ছাড়া ?—

কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ—মোটর চক্র তো কা কথা—হা হা হা।

অসিত ও ললিতা দোয়ার দেয় ওর খোলা হাসির।

সাত

ডাক্তারবাবুর ওখানে মোটর পৌঁছতেই তাঁর গৃহিণী তারা দেবী এসে প্রেমল ও অসিতকে প্রণাম ক'রে ললিতার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন অন্দরে। অসিত প্রেমলকে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে একটি সোফায় বসতেই ডাক্তারবাবু লাঠি ধ'রে ঘরে ঢুকলেন সন্তর্পণে। অসিত ও প্রেমল উঠে দাঁড়াতেই তিনি শশব্যস্ত হ'য়ে বললেন : "করেন কি ? বসুন বসুন।"

অসিত ও প্রেমল তাঁর দু হাত ধ'রে বসিয়ে দেয় একটি আরামকেদারায়। ডাক্তারবাবু কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজে থেকে চোখ মেলে বললেন: "মাপ করবেন সাধুজি! পা-টা একটু বেশি মচকে গেছে কি না—"

অসিত: কোনো fracture—

ডাক্তারবাবু: না, এক্সরে ক'রে দেখা গেছে হাড়টাড় ভাঙে নি। ও কিছু নয়। দুদিনেই ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু (অনুযোগের স্বরে) আমাকে একটু আগে বললে সাধুজির এত কষ্ট পেতে হ'ত না।

অসিত: আমার সঙ্গে সাধুজির (ঘড়ি দেখে) মানে এখন সাড়ে সাতটা তো!—ঠিক বারো ঘণ্টার আলাপ—আজই সকালে বিশ্রাম ঘাটে স্নান করতে গিয়ে শুভদৃষ্টি হয়েছে।

ডাক্তারবাবু (প্রেমলকে): কিন্তু আপনি তো আমাকে চিনতেন সাধুজি! এই বৃষ্টিতে কি আমাকে একটু খবর দিতে নেই?

প্রেমল: কি জানেন? এবার গুরুমাকে ব'লে এসেছিলাম বৃন্দাবনে একলা থাকব যমুনার তীরে। ললিতাও ধরল আমার সঙ্গে থাকবে। তবে সে প্রথমে গোয়াল ঘরে থাকতে রাজী হয়নি—বিশেষ দোষ নেই দেখে। কিন্তু (হেসে) আমি এত জোর দিয়ে বলেছিলাম—ঠাকুর যখন দ্বারী তখন দোর নাই থাকল—যে, তারপরে এ-দারুণ বর্ষা নামতে একটু লজ্জায়ই প'ড়ে গিয়েছিলাম।

ডাক্তারবাবু: লজ্জা কিসের সাধুজি? আর কি জানেন? (হেসে) ঠাকুর দ্বারী হয়েছিলেন একবারই ত্রেতা যুগে—বলিরাজের। কলিযুগে তিনি কারুর দোরে পাহারা দেন না—চারিদিকে আমরা যে অজস্র পাহারাওয়ালা মোতায়েন করেছি, তিনি পেন্সন নিয়ে দিব্যি বসে দেখছেন আমরা কেমন সুখে শান্তিতে থাকি দারোয়ানদের দৌলতে। কিন্তু সে যাক্। শুধু একটি নিবেদন (হাত জোড় ক'রে) যখন কৃপা ক'রে এসেছেন এ-দীনের ঘরে—দুদিন থাকুন। আর ঐ গোয়াল ঘরে ফিরে যাবেন না বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে।

অসিত: না। ওকে যেতে দেব না কিছুতেই। তাই ওর কাছে আর কাকুতি মিনতি করার দরকার নেই—আরো এই জন্যে যে, (হেসে) ললিতা দেবীরও গোয়াল ঘরে থাকার সাধ মিটেছে।

প্রেমল: অসিত ঠিকই বলেছে ডাক্তারবাবু। আপনাকে তাই অভয় দিতে পারি যে আমরা থাকব—আর মাত্র দুদিন নয়—অন্ততঃ দশ বারো দিন—

কেবল একটি সর্তে : যে. অসিতও থাকবে আমাদের সঙ্গে। নৈলে যখন তখন সাধ মিটিয়ে ওর গান শোনা হবে না।

ডাক্তারবাবু (সোল্লাসে) : এ আর কথা কি সাধুজি? অসিতবাবু এখানে থাকলে আমার গিন্নীও যে কী খুশী হবেন—তারা—ও তারা!

তারা (পাশের ঘর থেকে) : যাই, চা নিয়ে আসছি।

ডাক্তারবাবু: উনি অসিতবাবুর গান বলতে পাগল।

প্রেমল : তাঁর মাথার দোষ নেই। কারণ ললিতারও ঐ এক অবস্থা—মাত্র একবার ওর গান শুনে লক্ষ্ণৌতে··· ।

অসিত (সকুণ্ঠে) : কিন্তু এভাবে আমাকে কোণঠেশা করলে আমি রাজী নই এখানে থাকতে।

তারা ও ললিতার প্রবেশ। তারার হাতে দুটি পাথরের রেকাবীতে মিষ্টি ও ফল, ললিতার হাতে দুপেয়ালা চা। প্রেমল ললিতাকে বলল: "আর তোমার?"

তারা : নিয়ে আসছি (প্রস্থান)

ডাক্তারবাবু : উঠতে পারলাম না মা, কিছু মনে করবেন না।

ললিতা : কী বলছেন? আমি আপনার মেয়ের বয়সী। আমাকে তুমি বলবেন।

তারা ললিতার জন্য চা, ফল ও· মিষ্টি এনে কাছের একটি তেপায়া টেবিলে রেখে ওকে বসালো এক চেয়ারে।

ললিতা : এ কী করেছেন দিদি! (প্রেমলকে) দেখো বাপী, কেমন ভাব ক'রে নিয়েছি চোখের পাতা না পড়তে।

অসিত (হেসে) : তা হবে না কেন? শাস্ত্রে বলেছে :

বাপকি বেটী সিপাই কি ঘোড়ী
কুছ নহি হৈ তো থোড়ী থোড়ী

যার বাপী বন্ধু পাতাতে না পাতাতে তাকে চাপায় তার ভক্তিমান host-এর ঘাড়ে, তার কন্যা তথা শিষ্যা ভক্তিমতী hostess-এর সঙ্গে সই পাতাবে—এ আর বিচিত্র কি!

তারা (সকুণ্ঠে) : কী যে বলেন দাদা! ভক্তির কী জানি আমি? এ দয়া ক'রে মান দেওয়া বৈ তো নয়।

ললিতা (পিঠপিঠ) : না দিদি, ফের ভুল হ'ল। এ দয়া ক'রে মান দেওয়া নয়, মুগ্ধ ক'রে কাবু করা।

তারা (স্থমিষ্ট কোপে) : কী যে বলেন—

ললিতা : ফের ! 'তুমি' বলবেন—কথা দেন নি।

তারা : দিইছিলাম কিন্তু এই সর্তে যে, আপনিও আমাকে তুমি বলবেন।

অসিত (টুকে) : বলুন—তুমিও আমাকে তুমি বলবে—নৈলে চলবে তকরার সমানে।

তারা : আচ্ছা। (ললিতাকে) এবার স্থরু করুন—থুড়ি, করো। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রেমল : কিন্তু আমার সর্তটাও জুড়িয়ে যায় যে ! মানে, অসিতের এখানে থাকার ?

তারা : আপনি থাকবেন দাদা ? এ আর কথা কী ?

ললিতা : আমাদের দুজনের ভার, তার উপর—

তারা : আপনারা—তোমরা বলি কেমন ক'রে—সাধুজিও যে রয়েছেন—

প্রেমল (হেসে) : আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাকরণের মীমাংসা পরে হবে। আগে আসল সমস্থার সমাধান হোক তো।

ডাক্তারবাবু : সমস্থা আবার কি। আমার দুই ছেলে কলকাতায়। তাদের দুটো ঘরই খালি প'ড়ে রয়েছে। একটিতে অসিতবাবু—

তারা : কী যে বাবু বাবু করো ? বলো দাদাজি !

ডাক্তারবাবু (হেসে) : আচ্ছা আচ্ছা। বলছিলাম কি একটি ঘরে দাদাজি আর পাশের ঘরে বাবাজি। বাঃ—রাজযোটক বলে আর কাকে ? শুধু স্বভাবের মিলে নয়, উপাধির মিলেও।

অসিত : উপাধির মিল শুধু উচ্চারণেই। কারণ আসলে ও হ'ল খাঁটি সাধু, আমি এখনো সংসারী—

প্রেমল (হেসে) : তুমি সংসারী ? তোমারই একটি গান শুনেছিলাম কেম্ব্রিজে :

(আমায়) রাখতে যদি আমার ঘরে বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই।
স্বজন যদি হ'ত আপন হ'ত না মোর আপন সবাই ॥

লক্ষ্ণৌতে অতুল সেনের মুখে এ গানটি পরে যখনই শুনতাম মনে হ'ত তোমার কথা।

অসিত : কী যে বলো! ঘর না থাকলেই কি বিশ্বঘরে ঠাঁই পাওয়া যায়? তার জন্যে চাই সব আগে সাধু হওয়া। নৈলে এ-মুরুব্বিয়ানা হয় কবিয়ানা, গান—মুখস্থ পদাবলী।

ললিতা : দাদা, বলব একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন?

অসিত : কী?

ললিতা : আপনি কোন্ মুখে বললেন—আপনি সংসারী? সংসারে থাকলেই কি মানুষ সংসারী হয়, না জলে সাঁতার দিলেই মাছ হওয়া যায়? আমাদের কারুর একবারও মনে হয় নি আপনাকে সংসারী কি বিষয়ী। মনে হয়েছে সংসারিয়ানা আপনার মুখোষ। মানে, বাইরের লোকের কাছে—যাদের চোখ নেই তাদের দৃষ্টিতে—আপনি কবি গাইয়ে বা দেশের দশের একজন হ'তে পারেন, কিন্তু যারা জহুরী—তলিয়ে দেখতে পারে—তারা আপনাকে মান দেবেই দেবে বৈরাগী তখমা দিয়ে। আর এ-কথা আমাকে কে প্রথম বলেছিলেন জানেন? মা—যাঁর মানুষ চিনতে কখনো ভুল হয় না।

অসিত (আশ্চর্য) : তোমার মা? তিনি তো লক্ষ্ণৌয়ে মাত্র একবারই আমার গান শুনতে—

ললিতা : না, আমরা দুজনেই চার পাঁচবার আপনার গান শুনেছি। তবে তখন বাপী ছিল না।

প্রেমল : কিন্তু আমি শুনেছি তারও আগে—কেম্ব্রিজে। কাজেই আমি ওকে চিনেছি মা-রও আগে।

ললিতা : আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে গো হয়েছে। আমারই হার তোমারই জিৎ—হ'ল? (অসিতকে) মা বলেছিলেন কী জানেন? যে, আপনি স্বভাবে সাধক—মানে সব আগে যোগী, তার পরে আর সব। কেবল আপনি এখনো চিনতে পারেন নি নিজেকে—কারণ—

প্রেমল : ব্যস, আর বোলো না।

ললিতা : কেন বলব না? বলবই বলব। বলেছিলেন মা যে, আপনি নিজেকে চিনবেন—যেদিন গুরু পাবেন।

অসিত (ঈষৎ ক্ষুণ্ণ) : আমার কোথায় গুরু? কত খুঁজেছি—

প্রেমল: গুরুকে খুঁজে পাওয়া যায় না ভাই—তিনি আপনি আসেন যথাকালে।

ডাক্তারবাবু (তারাকে): কিন্তু শোনো, অসিতবাবু—থুড়ি দাদাজি—এখানে থাকবেন—স্বামীজিকে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি আমি—তুমি মোটর পাঠিয়ে দাও তাঁর মালপত্র সব নিয়ে আসতে।

অসিত: না না—স্বামীজি হয়ত—

ডাক্তারবাবু (হেসে): স্বামীজি সাধুপুরুষ—কিচ্ছু বলবেন না। জানেন? আমি আমার গুরুদেব শ্যামঠাকুরের কাছে—

অসিত (চমকে): বলেন কি? আপনার গুরু শ্যামঠাকুর?

ডাক্তারবাবু: হ্যাঁ দাদাজি। আমাকে সবাই বড় গম্ভীর বলে ব'লেই হয়ত তিনি আমাকে কৃষ্ণমন্ত্রের সঙ্গে হাসির মন্ত্র জপের দীক্ষা দিয়েছিলেন। যখনই তাঁর কোন অসুখবিসুখ করত আমাকে হাসিয়ে লজ্জায় ফেলতেন এই ব'লে:

সংসারী হায় যবে ভোগে—ধরে সাধু বা গুরুর চরণ কেঁদে:
সাধু গুরু যবে পড়ে রোগে—নেয় চিকিৎসকের শরণ সেধে!
অতএব শোন বলি দুনিয়ায় ভাই,
চিকিৎসকের সমান কেউই নাই।

প্রেমল (হেসে): আর চিকিৎসক যখন প'ড়ে গিয়ে পা ভাঙেন তখন?

অসিত (পিঠপিঠ):

তখন সে ধরে একজোটে হায় সাধু ও গুণীর চরণ কেঁদে,
সাধুর বচনে পেতে সান্ত্বনা, গুণীর ভজনে শান্তি পেতে।

ললিতা (হেসে গড়িয়ে পড়ে): বা বা বা, দাদা! এইই তো চাই। এমন না হলে কবি! (তারাকে) দিদিজি, এহেন দাদাকে আমাদের চাইই চাই। স্বামীজি রাগ করেন করুন।

তারা (ডাক্তারবাবুকে): আমিই টেলিফোন করি—কী বলো? স্বামীজি আমাকে না করতে পারবেন না।

ললিতা (হাততালি): এমন না হলে দিদি?

প্রেমল: ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আট

কিন্তু শান্তিপাঠ করা যত সহজ শান্তিকে ডাক দেওয়া ঠিক তত সহজ নয়। বৃন্দাবনে প্রেমল ললিতাকে টেনে আনার পরে একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। সে চেয়েছিল শিষ্যাকে আধুনিকী শিক্ষার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। তাই আরো চেয়েছিল সনাতনী কৃচ্ছ্রসাধনার দীক্ষা দিতে। "কিন্তু চাইলে হবে কি ভাই?" একদিন সে বলেছিল অসিতকে সদীর্ঘশ্বাসে, "ললিতা চেষ্টা করে, কিন্তু মেনে নিতে বেগ পায় বিষম। তাই গোয়ালঘরে প্রায়ই টুকত: 'এ কখনো হয় যে, দেহকে নাহক দুঃখ দিলেই ঠাকুর একগাল হেসে ছুটে আসবেন ধরা দিতে?' আমি ওকে বলি: 'সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের লালসা আমাদের পেয়ে বসে ব'লেই মুনি-ঋষিরা চাইলেন আমরা দেহকে দুঃখ দিয়ে সইতে শিখে সে দুঃখকে জয় করব।' ও বলে পিঠ পিঠ: 'কিন্তু ঠাকুর কি স্বভাবে এতই অবুঝ যে, আমাদের এক রাজ্যের প্রজা ক'রে গ'ড়ে তুলে চাইবেন আর এক রাজ্যের আইনের চাপে পিষে মারতে! এর উত্তর কী দেব বলো—যখন ওর অনুযোগের মধ্যেও কিছু সত্যও আছে অস্বীকার করতে পারি না?"

ললিতা যে প্রেমলের সঙ্গে নিষ্পরোয়া হ'য়ে তর্কাতর্কি করত এ সকলেরই চোখে পড়েছিল। কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটি সহজ নিষ্ঠা ও ভক্তির রাজযোটক ছিল যার সুষমায় সবাই মুগ্ধ হ'ত। কিন্তু তবু এই সব ছোটখাটো বেবনতি সময়ে সময়ে অস্বস্তির আভাস আনত বৈ কি। একদিন যমুনায় স্নান নিয়ে তর্ক উঠল। ললিতা সরল ভাবেই ব'লে বসল: "যমুনাস্নান করার মধ্যে কী মহিমাই বা থাকতে পারে বাপী যে, তুমি রোজ যাবে একমাইল পথ হেঁটে? আর যাওই যদি, দিদির মোটরে গেলে কি পুণ্যি কমবে?" প্রেমল উত্তর না দিয়ে গম্ভীরমুখে পদব্রজে চ'লে গেল। অসিত সঙ্গ নিতে যাবে কিন্তু ললিতা যেতে দিল না। বলল: "না দাদা, বোসো। আমাকে বুঝিয়ে দাও আগে একটা কথা: শিষ্যা হ'লে কি তাকে গুরুর চলার তালে তালে পা ফেলতেই হবে?"

এ-ও ঠিক শান্তি নয়—তর্কের তাপে শান্তি উবে যায় না কি?

তারপর ঘটল আর এক বিচিত্র অঘটনে নতুন অশান্তি।

স্বামী দেবানন্দকে তারা যখন টেলিফোন ক'রে বলে যে, অসিত মিশন ছেড়ে তাদের ওখানেই থাকবে তখন তিনি কতকটা বাধ্য হ'য়েই রাজী হয়েছিলেন। কারণ তিনি চান নি মোটেই—অসিত প্রেমলকে পেয়ে তাঁকে একেবারে ভুলে যায়। একদিন তাঁর এই চেপে-রাখা ক্ষোভ কথায় কথায় ফাঁশ হ'য়ে পড়েছিল আচম্‌কা।

ব্যাপারটা সামান্য কিন্তু বলবার ম'ত।

ডাক্তারবাবুর পায়ের একটা ছোট হাড়ে ঘা লেগেছিল। ফলে তাঁকে প্রায় শয্যা নিতে হয়। এ-ঘর থেকে ও ঘরে আসতেন গানের সময়ে—কিন্তু চেয়ারে ক'রে আনা হ'ত। কথা বলার সময় যন্ত্রণা থাকত না, কিন্তু উঠতে বসতে খচখচ করত কখনো কখনো দম্‌কা ব্যথা—spasm—আসত। এজন্যেও অশান্তির ছায়া উঁকি দিত আনন্দ সভায়, কিন্তু প্রেমলের উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপের আলোয় টিকতে পারত না। দেখে অসিতও তারস্বরে গান গাইত সকাল সন্ধ্যায়। এত আনন্দের চাপে অশান্তি মাথা তোলে কেমন ক'রে?

কিন্তু স্বামীজি চাইতেন অসিত সন্ধ্যায় মিশনেও মাঝে মাঝে গায়। কিন্তু ডাক্তারবাবুর অতিথি হ'য়ে সে কেমন ক'রে তাঁকে ফেলে যায় মিশনে? স্বামীজি মুখে বলতেন অবশ্য উদারভাবেই যে, ভজন কোথায় গাওয়া হচ্ছে সে নিয়ে তো কথা নয়—ঠাকুরকে শোনালেই হ'ল—যে চায় শুনে প্রসাদ পাবে। কারণ নিবেদিত হ'লেই ভজন-ভোগ হ'য়ে দাঁড়ায়—অর্ঘ্য, প্রসাদ।

শুনতে চমৎকার। কিন্তু অসিতকে একদিন বলেছিল স্বামীজির এক গুরু-ভাই যে, স্বামীজি এমন অনেক বৈষ্ণবকে ভরসা দিয়েছিলেন ডাকবেন—যাঁরা যেতে চান না ডাক্তারবাবুর ওখানে—সংসারীদের আস্তানায় তাঁরা মাথা গলান না।

আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল—যদিও অসিত প্রথমদিকে আঁচ পায়নি একটুও। তবে একদিন একা যমুনায় স্নান করতে গিয়ে শেঠজির সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি হঠাৎ মুখ ফস্‌কে ব'লে ফেলেছিলেন: "সাহেব সাধু বৃন্দাবনে এসেছেন দিশি সাধুকে নেটিভ বলতে বুঝি?"

অবিশ্যি বৃন্দাবনে ভক্ত বৈষ্ণব অনেকেই প্রেমলকে দেখে মুগ্ধ হ'ত বৈ কি। অসিতের কাছে তারা বলত আন্তরিক ভক্তির স্বরেই: "কী ত্যাগ! শুধু দেশ ছাড়া নয়—বেশভূষা চালচলন—এমন কি মাতৃভাষারও মায়া

কাটানো! দিন রাত হয় সংস্কৃত, না হয় বাংলা হিন্দি—এ কি সহজ কথা!"… ইত্যাদি।

সত্যি, অসিতেরও মনে হ'ত এ-ভাবে পুরোপুরি হিন্দু বনতে দেখে নি ও কোন বিদেশীকে। তারা তো প্রেমলের হিন্দু আচার-নিষ্ঠা দেখে উচ্ছ্বসিত। এ কী ব্যাপার? হয় স্বপাকে খাবে, নয় শিষ্যা ললিতার হাতে! স্বামী দেবানন্দ এতটা আচারী হওয়া পছন্দ করতেন না, কিন্তু ওর নিষ্ঠার তারিফ না ক'রে করেন কি?

ললিতা তারার সঙ্গে "বকুল" সই পাতিয়েছিল দিদি বলাও ছেড়ে দিয়ে। বয়সের বেশি তফাৎ ছিল না তো: তারার ত্রিশ, ললিতার পঁচিশ। ডাক্তার বাবুকে ললিতা ডাকত দাদা, অসিতকে কখনো দাদাজি কখনো দাদু। তারা দাদাজি ব'লেই খুশী, দাদু ব'লে আরো কাছে আসতে ভরসা পেত না। "বকুলের মতন সহজিয়া হ'তে পারে কজন?" বলত তারা সইয়ের গুণকীর্তনে বড় গলা ক'রেই। এ-সখিত্বে এতটুকুও ঈর্ষার আমেজ ছিল না। ললিতা যেমন তারার ধৈর্য, গৃহিণীপনা, স্নেহশীলতা প্রভৃতি গুণকে বড় ক'রে দেখত, তারাও তেমনি ললিতার ব্যক্তিরূপের গুণগান করত অকুণ্ঠেই। ভালোবসার সঙ্গে শ্রদ্ধার যোগ না থাকলে এ-ধরণের সহজ সখিত্বের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে না— বলত প্রেমল প্রায়ই অসিতকে—বিশেষ ক'রে ওদের সহজ সই-পাতানোর মাধুর্যকে মান দিতে।

* * *

সেদিন রথযাত্রা। প্রেমল চৈতন্যদেবকে গভীর ভক্তি করত; ধরল ডাক্তারবাবুকে: "আজ সন্ধ্যায় ঘটা ক'রেই কীর্তনের আসর বসাতে হবে, বিশেষ যখন অসিত হাজির।" ডাক্তারবাবু সানন্দেই সাড়া দিয়ে পঞ্চাশ ষাটজন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। তারা রাঁধল পায়সভোগ, ললিতা— মালপো।

বাধল শেঠজিকে নিয়ে। ললিতা বলল: "চৈতন্যদেব প্রেমের ঠাকুর, শ্রীক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর প্রিয় রথযাত্রার পার্বণে কাউকে বাদ দিলে অন্যায় হবে।" তারা বলল: "শেঠজি বড় দাম্ভিক ও বিশ্বনিন্দুক। যেখানে সেখানে সাধুজিকে ম্লেচ্ছ সাধু ব'লে হাসিঠাট্টা করেন।" ললিতা তুড়ি দিয়ে বলল: "বাপীকে ম্লেচ্ছ বলবে? ঈ—শ্! করো ওঁকে নিমন্ত্রণ—দেখি ওঁর কত মুরদ।"

প্রেমল তো হেসেই উড়িয়ে দিল: "আমাকে ম্লেচ্ছ বলছে? বলুক না। Words break no bones. তাছাড়া শেঠজি তো আমাকে খাতির করতে আসছেন না, আসছেন চৈতন্যদেবের পূজোয়। তাঁকে যদি ভক্তি করেন তো আমাকে অভক্তি করলেনই বা—কী আসে যায়?"

অসিত মুগ্ধ হ'য়ে বলল: "ভাই প্রেমল, তোমার বৈষ্ণবমন্ত্র নেওয়া সার্থক হয়েছে। এরই তো নাম তরুর মতন সওয়া, তৃণের মত নিচু হ'য়ে থাকা।"

* * *

কিন্তু মানুষ নিত্যই ভাবে এক, হয় আর। সে-দিন সকাল থেকেই নামল কী যে বৃষ্টি! অম্বুবাচী যেন এল দুদিন আগে এগিয়ে—পুণ্য উৎসবকে মাটি ক'রে। শুধু বৃষ্টি নয়, সেই সঙ্গে প্রবল হাওয়া। নিমন্ত্রিতরা কেউই আসতে পারলেন না। সন্ধ্যায় এলেন কেবল সস্ত্রীক শেঠজি তাঁর মস্ত "ডেম্‌লার" মোটরে, আর স্বামীজি—ডাক্তারবাবু মোটর পাঠিয়েছিলেন ব'লে। নৈলে তিনিও আসতে পারতেন না।

প্রেমল আরো খুশী, বলল: "দেখলে তো অসিত, ঠাকুর ভাবগ্রাহী—জানতেন আমরা কী চাইছিলাম। মানে নিরালায় নিত্যানন্দ।"

ললিতা কুটুস্ ক'রে কাটল: "আমরা ব'লে দাদাকে দলে টানতে চাইছ কেন বাপী? জানো না কি—দাদা চান সমজদার শ্রোতা—audience? ভিড়ের মধ্যেই যে দাদা ফুলটি হ'য়ে ফুটে ওঠেন।"

প্রেমল অসিতের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বলল: "সত্যি না কি অসিত? ললিতা নাড়ী টিপতে জানে ব'লে ভারি বড়াই করে। তাই তুমি ওকে লজ্জা দাও শপথ ক'রে যে, তুমি তোমার কীর্তনে ভিড় না দেখলেও বিকশিত হ'তে পারো।"

অসিত আতপ্ত স্বরে জবাব দিল: "যদি কীর্তনের শ্রোতা চাই-ই তো তাতে অপরাধ হয় কোন্‌খানে? ঠাকুরের নাম তো ভিড়কেও শোনানো চাই। মহাপ্রভু কি বিরাট্ জনসংঘের মধ্যেই তাঁর নামগানের হরির লুট বিলোতেন না! না, ভিড়ের মধ্যে ভক্ত মেলে না বলতে চাও?"

প্রেমল: মহাপ্রভুর সঙ্গে কার তুলনা ভাই? তিনি গান ধরতে না ধরতে তন্ময় হ'য়ে যেতেন—যেখানে আমরা হই audience-conscious; তাই ভুলে

যাই নাম শোনাচ্ছি—ভক্তকেও নয় অভক্তকেও নয়—কেবল ঠাকুরকে আর ঠাকুরকে আর ঠাকুরকে—first and last and in the middle.

ডাক্তারবাবুঃ কিছু মনে করবেন না সাধুজি! কিন্তু আপনাদের দেশে গির্জায় চ্যাপেলে যে-স্তব গাওয়া হয় সে তো ভিড়ের জন্যেই।

প্রেমলঃ ওদেশে গির্জায় গান সার্মন প্রভৃতি ঠিক আদর্শ ভজন নয় ব'লেই ভক্তরা অনেক সময়েই আসেও না রবিবাসরিক ভাষণে। তাছাড়া আমাদের দেশে মন্দির-ভজন আর ওদের দেশে গির্জা-স্তব এ-দুইএর মধ্যে তফাৎ আসমান জমীন।

শেঠজিঃ মাফ করবেন সাধুজি, কিন্তু আপনি "আমাদের দেশ" বললেন কেন? এ-দেশের নাম হিন্দুস্থান—অর্থাৎ হিন্দুদের জন্মভূমি—জানেন না কি?

প্রেমলঃ আপনিই আমাকে মাফ করবেন জী। কারণ যে যেদেশে জন্মায় সেই দেশই তার স্বদেশ একথা মেনে নেওয়া চলে না। যে-সাধক কোনো দেশকে তার চির-আপন ব'লে চিনতে পারে, সে সেই দেশকেই তার স্বদেশ ব'লে সনাক্ত করার অধিকারী।

দেবানন্দঃ রাগ করবেন না সাধুজি, কিন্তু আপনি স্বদেশের একটা নতুন সংজ্ঞা দিতে চাইছেন না কি?

প্রেমলঃ শুনুন স্বামীজি! আমার এক মাসিমা আদৌ শিশু ভালবাসতেন না। বিবাহের পরে তাই চান নি সন্তান। কিন্তু খুব সাবধান হওয়া সত্ত্বেও একদিন হঠাৎ অবাঞ্ছিত অতিথির অভ্যুদয় হ'ল। মাসিমা বিরক্ত হ'য়ে তাকে সঁপে দিলেন এক বিধবা বোনের হাতে। নিঃসন্তানা মাসী চাঁদ হাতে পেল। ছেলেটিকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত কে তার মা, সে মাসিমাকে দেখিয়ে দিত। এ-ক্ষেত্রে ছেলেটির সত্যি মা বলবেন কাকে?

দেবানন্দ (তার্কিক ঢঙে): এ আপনাদের দেশের কথা সাধুজি—আমাদের দেশে খাটে না।

প্রেমলঃ না, স্বামীজি, এ হ'ল একটি বিশ্বজনীন সত্য যে, মানুষ আপন হয় প্রেমের টানে, সম্বন্ধের বা রক্তের টানে নয়। নজিরও রয়েছে হাতে হাতেই। মহাভারতে নেই কি—কর্ণ মা ব'লে কুন্তীকে স্বীকার করে নি, মেনে নিয়েছিল রাধাকেই যে তাকে লালন করেছিল? কিন্তু ঐ যে বললামঃ খতিয়ে এ তর্কের কথা নয়—অভিজ্ঞতার—experience-এর কথা যে, ভালোবাসাই পরকে আপন

ক'রে নেয়—ঠিক যেমন অপ্রেম আপন জনকে পর ক'রে দেয়। আপনার মনে থাকতে পারে—আমি ডাক্তারবাবুকে প্রথম দিনই বলেছিলাম রাস্তায় যে, বৃন্দাবনের মাটিই আমার মনের প্রাণের জন্মভূমি। শুনুন আরো একটু বলি—যখন তর্ক তুললেনই।

বছর দশেক আগে—যখন এদেশে প্রথম আমি প্রফেসর হ'য়ে আসি—তখন আমি বছর দুই অন্তর একবার করে বিলেত যেতাম আমার বাবা মা-র কাছে। সেখানে আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠত প্রতিবারই—আর যেই ফিরে আসতাম এ-দেশে মন আমার গান গেয়ে উঠত—যেন খাঁচার পাখী খাঁচা থেকে ছাড়া পেল—এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, বিশ্বাস করুন। (সবাই নিশ্চুপ)

(থেমে) আমার বাবা মা এখনো বেঁচে, তাঁরা আমাকে দেখতেও চান, প্রায়ই চিঠি লেখেন ফিরে আসতে—আর কেন বিদেশে থাকা? কিন্তু আমি কেবল আমার গুরুমাকেই বলি "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।" বলবেন কি—ভুল করি?

শেঠজি : আপনি উড়ো তর্ক করছেন জী, মাফ করবেন। কে কার বাপ মা মাসী পিসী তা নিয়ে তো তর্ক ওঠে নি—কোন দেশ কার আপন এই-ই হ'ল প্রশ্ন—আপনাদের কবির ভাষায় (বিজ্ঞ ভঙ্গিমায়) that is the question.

প্রেমল : না জী। এ, to be or not to be-র প্রশ্ন নয়। দেখুন, সংসারে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সাড়ে পনেরো আনা মানুষই বাপ মা-কেই সবচেয়ে আপন ব'লে জানে। সেই বাপ-মাও পর হ'য়ে যায় স্ত্রীকে বেশি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে। একথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে প্রমাণ হয় না কি যে আপন পরের নিরিখ ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না?

শেঠজি : আপনার কথা শুনে ধাঁধা লাগছে জী! বাপ-মাকে মানুষ সবচেয়ে আপন ব'লে জানে বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলছেন—মাসিমা বাপ-মার চেয়েও আপন হ'তে পারে। যে-দেশে জন্মেছি, খেলা করেছি, যে-দেশের ভাষায় কথা বলেছি সবপ্রথম, সে-দেশের চেয়ে বিদেশ আপন হ'য়ে দাঁড়ালো দুদিনে—এ কখনো হয়? মন যে শুনলেই হেসে উড়িয়ে দেয় মিথ্যে ব'লে।

প্রেমল : শেঠজি! বড় কারে পড়ে গেলেন। অনেক কিছুই অজ্ঞান মন মিথ্যে ব'লে হেসে উড়োয় যাকে জ্ঞানীরা চেনেন সত্য ব'লে। তাঁদের

উপদেশ মেনেই অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আমরা জ্ঞানের আলোয় উঠি। তাই তাঁদের কাছেই দরবার করিঃ "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" ঐ দেখুন, প্রদীপ জ্বলছে গৃহবিগ্রহের সামনে। যে শিখাটা আলো দিচ্ছে সেটা জ্বলছে ঐ প্রদীপেই বটে, কিন্তু শিখা কি তাই বলে সত্যি ঐ মাটির আত্মীয়, না সেই আলোর যে জ্বলছে কোটি কোটি সূর্য চন্দ্র তারায়?

শেঠজি (বিব্রত): এ সব লম্বা লম্বা কথা সাধুজি। তাছাড়া উপমা কিছু যুক্তি নয়।

ললিতা (টুপ ক'রে): কিন্তু বুঝবার মস্ত সহায়। আপনি শুনেছি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি কি উঠতে বসতে উপমার ফুলঝুরি কাটতেন না?

দেবানন্দ (খুশী): একথা ঠিক। (প্রেমলকে) শেঠজির কথায় কিছু মনে করবেন না জী। আপনি যে আমাদের দেশকে মা ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এতে আমাদের মধ্যে এমন কোন্ মূর্খ আছে যে খুশী না হবে?

শেঠজি: এ আপনার অন্যায় স্বামীজি। আপনি যাকে ঠিক মনে করেন আর কেউ যদি তাকে বেঠিক মনে করে তবে তাকে মূর্খ বলা চলে না।

তারা (উদ্বিগ্ন): থাক থাক এ সব তর্কাতর্কি। আপনার গান সুরু করুন দাদা। আজ রথযাত্রার দিনে কেন এ-সব হাবিজাবি কথা।

ডাক্তারবাবু: হাবিজাবি নয় তারা! প্রেমল মহারাজ বড় চমৎকার বুঝিয়ে দিয়েছেন—(প্রেমলকে) জানেন সাধুজি, আমার নিজেরও সত্যি সময়ে সময়ে মনে হ'ত যে…কী ক'রে বোঝাব…প্রত্যেকেরই তার নিজের দেশ নিজের ধর্মকেই আপন ব'লে মনে করা উচিত। স্বামীজি সেদিন একটি ভাষণে মহাভারত থেকে একটি শ্লোক বলেছিলেনঃ

> ন জাতু কামান্ ন ভয়ান্ ন লোভাদ্
> ধর্মং ত্যজেদ্ জীবিতস্যাপি হেতোঃ

শেঠজি (সোৎসাহে): ঠিক ঠিক ডাক্তারবাবু। বাঁচালেন আপনি। সাক্ষাৎ মহাভারতের কথা—কাটবার জো নেই।

প্রেমল (হেসে): রহুন রহুন শেঠজি। আগে স্থির হোক ধর্ম কী বস্তু। আপনি বলতে চাইছেন—যে যে দেশে জন্মেছে তার সেই দেশের ধর্মকেই নিজের ধর্ম মনে করা কর্তব্য, এই না? আচ্ছা। কিন্তু যদি বলি আফ্রিকায় এখনো এমন জাত আছে যারা ধর্ম মনে করে মানুষকে বেঁধে খাওয়া?

দেবানন্দ : এ কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে জী। আপনি উদাহরণ দিচ্ছেন তাদের যারা অসভ্য, আদৌ ভাবতে শেখেনি।

প্রেমল : না স্বামীজি। যারা ভাবতে শিখেছে তাদের মধ্যেও ধর্ম সম্বন্ধে ঠিকে ভুল হ'তে পারে। বিল্বমঙ্গল এক বণিকের অতিথি হ'য়ে চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। বণিক্ অতিথিসৎকারকে ধর্ম মনে ক'রে স্ত্রীকে হুকুম করেছিলেন অতিথিকে দেহদান ক'রে তুষ্ট করতে। মহাভারতে এক ধার্মিক রাজা আরো এক কাঠি বেশি গিয়েছিলেন : নিজের ছেলেকে কেটে অতিথিকে পরিবেষণ করেছিলেন অতিথি চেয়েছিলেন ব'লে। এ ভাবা না-ভাবার কথা নয়, শুভবুদ্ধির একটা স্তরে ওঠার কথা—সে-স্তরে না উঠলে ঠিকে-ভুল হবেই হবে। অত দূরে যাবার দরকার কি? আমাদের এ-শিক্ষাদৃপ্ত যুগেও এই সেদিনই কি হিটলার জর্মনজাতকে Herrenvolk ব'লে ঘোষণা ক'রে বলেন নি যে, জর্মনদের স্বধর্ম কর্তা হওয়া, আর সব জাতের স্বধর্ম জর্মনদের তাঁবেদার হওয়া? বলবেন কি জর্মন জাতি অসভ্য? কিন্তু এর চেয়ে আরো সাংঘাতিক অধর্ম মানুষকে যুগে যুগে পেয়ে বসেছে ভূতের মতন—heretic ব'লে কত নিরপরাধ ধার্মিককেও ইনকুইসিটরেরা পুড়িয়ে মেরেছে, এক এক ক'রে হাড় ভেঙেছে চাকার নিচে।

দেবানন্দ (কোণঠেশা হ'য়ে ঈষৎ আতপ্ত স্বরে) : এ আপনি কী বলছেন জী? রাজনীতি রাষ্ট্র ইনকুইসিটর এসব তো অবান্তর।

প্রেমল : অবান্তর কিসে স্বামীজি? আপনি বলছিলেন কেবল অসভ্যেরাই ধর্মকে অধর্ম থেকে তফাৎ করতে পারে না। আমি দেখাতে চাইছি এ ঠিক সভ্যতা—ওরফে সভ্যভব্য যুক্তির—কথা নয়। এ বড় জটিল প্রশ্ন। মানুষ বহু সাধনায় তবে প্রজ্ঞার বোধির আলো পায় আর তখনই কেবল সে চিনতে পারে সত্যের স্বরূপ। মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তই দেখুন না একবার ভেবে। স্বামী বিবেকানন্দের বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে ভেবে কি তিনি মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেন নি বিবাহ ভেঙে দেবার জন্যে? আর স্বামীজির মাতৃদেবীর কি ভাবতেন না যে, ছেলের সন্ন্যাসী না হ'য়ে গৃহী হওয়াই ধর্ম? তাহ'লেই দেখুন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাকে ধর্ম বা সত্য মনে করতেন স্বামীজির মা তাকে অধর্ম অসত্য ভাবতেন। এখানে স্বামীজির ধর্ম বা কর্তব্য কী ছিল—গর্ভধারিণী মা-র কথা শোনা, না দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনা? (শেঠজিকে) মহাভারতের ঐ শ্লোকটি আওড়ে আহ্লাদে আটখানা হ'লে আরো বিপদে পড়বেন শেঠজি।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হ'য়ে জন্মে তপস্যা ক'রে ব্রাহ্মণ হয়েছিল ব'লে বলবেন কি তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মকে হেনস্থা ক'রে পাপ করেছিলেন? স্বয়ং কৃষ্ণ কি গোপীদের ঘরছাড়া ক'রে স্বামীপুত্রকে পর মনে করবার দীক্ষা দেন নি? অত কথায় কাজ কি—যুগাবতার চৈতন্যদেবও কি সন্ন্যাসী হ'তে চেয়ে গৃহত্যাগ করেন নি নিশুত রাতে—মার স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে? শেঠজি, কোন্‌টা কার ধর্ম আর কতদূর পর্যন্ত সে-ধর্মের কোন বিধান মান্য বা অমান্য বুঝতে হ'লে চাই জ্ঞানের তপস্যা। এই জন্যেই মহাভারতেই যুধিষ্ঠির বলেছিলেন: ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌। আর তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র, মনে রাখবেন।

ললিতা (খুশী হ'য়ে হাততালি দিয়ে): চমৎকার বলেছ বাপী। একা ল'ড়ে হারিয়ে দিলে শুধু শেঠজিকে নয়, স্বামীজিকেও করলে কোণঠেশা।

দেবানন্দ (অপ্রসন্ন): না, কোণঠেশা আমি হইনি মা। আর তোমার গুরুদেবকে তুমি বাহবা দিলেই যে সবাই সাবাস বলতে বাধ্য এমন কথাও মানতে পারি না। যে-শ্লোকটি তিনি আওড়ালেন তাকেই আমি হানতে পারি তাঁর বিরুদ্ধে—যে, হিন্দুর ধর্মতত্ত্ব বোঝা চাট্টিখানি কথা নয়। শুনেছি প্রেমল মহারাজ ছোঁওয়া-ছুঁইয়ি মানেন। স্বামী বিবেকানন্দ একে নাম দিতেন ছুঁৎমার্গ। লোকাচারকে তিনি মনে করতেন অত্যাচার। বলবে কি—স্বামীজিকেও প্রেমল মহারাজ কোণঠেশা করেছেন? কেউ অব্রাহ্মণের রান্না খাওয়াকে দূষ্য বললে তিনি হাসতেন, বলতেন অত্যাচারী গোঁড়াদের যে, তাঁদের ধর্ম গিয়ে ঠেকেছে ভাতের হাঁড়িতে। এখানে কে বেশী জ্ঞানী বলবে আমায়? স্বামী বিবেকানন্দ, না প্রেমল মহারাজ?

প্রেমল (হেসে): কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধাচার মানতেন, অব্রাহ্মণের হাতের রান্না খেতেন না—তাঁকে কি বলবেন অজ্ঞান?

দেবানন্দ (উষ্ণ): আমাদের উপনিষদে বলেছে নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া। আপনি দেখছি মনে করেন তর্কাতর্কিই জ্ঞানের পথ।

প্রেমল: না স্বামীজি। রাগ করবেন না। আমি যদি তাই মনে করতাম তবে আপনাদের শাস্ত্রকেই মেনে নিতাম না ধর্মের দিশারি ব'লে—আর এ-ধর্মের শাস্ত্রের বিধিবিধানের ভাষ্য চাইতাম না গুরুর চরণে শরণ নিয়ে—তাঁর উপদেশই শেষ কথা ব'লে শিরোধার্য ক'রে। প্রাশ্চাত্য দেশে তর্কাতর্কিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ব'লেই ধর্মের আলো নিভে এসেছে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের

আপ্তবাক্য এ নয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া"—"হৃদয়ে হি এব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি" এই-ই হ'ল হিন্দুধর্মের সবচেয়ে অচল ভিৎ, অমল মুকুট। আমি আচারকে মেনে নিয়েছিও নিজের বিচার মেনে নয় —গুরুবাক্য মেনে—ভাগবতের কথ য় আমার অন্তরাত্মার সায় আছে ব'লে যে, আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ। গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্, তাঁর মধ্যে সর্বদেবের অধিষ্ঠান—এ তর্কাতর্কির আলোয় পাওয়া বাণী নয়, অন্তরে অবতীর্ণ গুরুকরুণারই বাণী, মহারাজ!

তারা (করজোড়ে): এবার ভজন সুরু হোক সাধুজি। আমার সত্যি মন খারাপ হ'য়ে গেছে।

প্রেমল (উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীজির কাছে করজোড়ে): আমি অপরাধ করেছি স্বামীজি! তর্কাতর্কি করা নিন্দনীয় ব'লে তবু রোখের মাথায় তর্কাতর্কিই করেছি। তবে জানেন তো আত্মাভিমান কেমন "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী"। তাই নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন—ছোটমুখে বড় কথা বলেছি ব'লে—গুরুমা শুনলে দুঃখ পাবেন যে, আমি গুরুজনের, সাধুর, কথা কাটতে চেয়েছি রোখের মাথায়।

দেবানন্দ (আর্দ্রস্বরে): কী বলছেন সাধুজি! আপনি যে কত বড় সাধক আমি জানি না কি? সাক্ষী দিন অসিতবাবু।

অসিত (হেসে): হ্যাঁ হ্যাঁ। দিচ্ছি। (প্রেমলকে) উনি সত্যি প্রথমদিনই বলেছিলেন আমাকে যে, তুমি যে এদেশে এসে এমন অকুণ্ঠে গুরুকে মেনে নিতে পেরেছ এ একটা আশ্চর্য কীর্তি—দেখলেও মনে সম্ভ্রম আসে।

ললিতা (গাঢ়কণ্ঠে): ঠিক দাদাজি! বাপীর কি তুলনা আছে?

দেবানন্দ (হেসে): না, সত্যিই নেই মা! আজ থেকে তুমি সর্বত্র রটিয়ে দিতে পারো যে, তোমার এ-মতে আমি সই দিয়ে ওঁকে বরণমালা দিতে রাজী আছি আমাদের মিশনে।

প্রেমল (হেসে): মানে, আমাকে বৃন্দাবন থেকে তাড়াতে চাচ্ছেন এই তো?

তারা (খুশী): না সাধুজি—বাড়াতে বাড়াতে বাড়াতে চাইছেন। তাই না মহারাজ?

দেবানন্দ (হেসে): একেবারে ষোলো আনা।

শেঠজি (অপ্রসন্ন): বাড়াতে চান বাড়ান আপনাদের মিশনে মহারাজ। কিন্তু মনে রাখবেন—বৃন্দাবন এখনো বৃন্দাবন। এখানে অনেক জ্ঞানী ভক্ত আছেন যাঁরা ধর্মত্যাগকে নেকনজরে দেখেন না, বলেন—যে যে-ধর্মে জন্মায় সে-ধর্ম ছাড়া তার পক্ষে মহাপাপ। তাই হিন্দুরা কাউকে কনভার্ট করতে চায় না খৃষ্টানদের মতন।

ললিতা: কিন্তু খৃষ্টান তো হিন্দুরাও হয় দলে দলে।

শেঠজি: দলে দলে তো লোকে গুণ্ডামিও করে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে। তাই ব'লে কি সেটা ভালো বলতে হবে?

প্রেমল: এ আপনি কী বলছেন শেঠজি? বিশ্বাসের টানে কেউ কোনো বিশেষ ধর্মে দীক্ষিত হ'তে চাইলে হবে না কেন?

শেঠজি: হিন্দুরা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হ'তে চায় কি বিশ্বাসের টানে, না মিশনরিদের ঘুষে?

অসিত: এ আপনার রাগের কথা শেঠজি। অনেক সদাশয় হিন্দুকেই আমি জানি যাঁরা খৃষ্টদেবের পুণ্য প্রভাবের টানেই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

শেঠজি: অবোধ লোকে কী না করে, অসিতবাবু? সত্যিকার সাধু পুরুষ করে কি—এই-ই হ'ল প্রশ্ন। দেখেছেন কাউকে যে নিজের ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান হ'য়ে সত্যিকার সাধু বনল? আমি চ্যালেঞ্জ করছি—

তারা: শেঠজি—

অসিত: দাঁড়াও তারা, গাজোয়ারি চ্যালেঞ্জের উত্তর দেওয়াই চাই।

শেঠজি (আতপ্ত): গাজোয়ারি? সত্যিকার সাধু কি কখনো ধর্ম বদলাতে পারে? কোন প্রমাণ আছে?

অসিত: আছে শেঠজি। মহাসাধু সুন্দর সিং-এর নাম শুনেছেন কি?

শেঠজি: না।

অসিত: তাহলে একটু খোঁজ নেবেন। শুনুন, তিনি ছিলেন শিখ—গোঁড়া শিখ। দিনরাত গুরুগ্রন্থ পড়তেন। বাপও ছিলেন তেমনি গোঁড়া। ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন এক মিশনরি স্কুলে। সেখানে বাইবেল পড়তে হ'ত ব'লে ছেলে ঘরে ফিরে এলেন রাগ ক'রে।

শেঠজি (সোৎসাহে): আমিও তো তাই—

অসিত: রসুন রসুন, শুনুন আগে। এহেন ধার্মিক গোঁড়া শিখ—যিনি

আশৈশব গুরুগ্রন্থ প'ড়ে মানুষ—তিনি বাইবেলকে হেনস্থা ক'রে একটুও শান্তি পেলেন না। যখনই ধ্যান-ধারণা আসন প্রাণায়াম করেন ততই মন বিষাদে কালো হ'য়ে আসে। শেষে একদিন আর সইতে না পেরে ভাবলেন—এই বাইবেলই যত নষ্টের গোড়া—দাও ফেলে আগুনে। কিন্তু বাইবেল পুড়িয়ে মন তাঁর আরো খারাপ হ'য়ে গেল। সারারাত ঘুম হ'ল না, পরদিন সকালে উঠে অশান্ত মনে প্রার্থনা করতে বসেছেন গুরুগ্রন্থের সামনে—এমন সময় ঘর ভ'রে গেল পাতলা মেঘে—যাকে পাতঞ্জল নাম দিয়েছেন "ধর্মমেঘ।" আর সেই মেঘের মাঝে দেখলেন খৃষ্টদেবের দিব্য মূর্তি।

খৃষ্টদেব তাঁকে বললেন: "আমাকে তুমি কেন খেদিয়ে দিচ্ছ?" সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সিং-এর দেহ উঠল শিউরে, চোখে নামল জল, আর মনে বিছিয়ে গেল অপার শান্তি। সে কী অপূর্ব শান্তি! যাকে বলে peace that passes all understanding—

শেঠজি: বাজে কথা—গুজব।

অসিত: না শেঠজি। আমি কেম্ব্রিজে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেছি। আমার ঘরে তিনি পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। কী চমৎকার সাধু যে কী বলব! সমস্ত বিশ্ব ঘুরেছেন খালি হাতে, আলখেল্লা প'রে। তিব্বতে বারবার প্রাণকে পণ ক'রে খৃষ্টমহিমা কীর্তন করেছেন, দু' তিনবার তিব্বতীদের হাতে মরতে মরতে বেঁচে যান খৃষ্টদেবের অঘটনী করুণার প্রসাদে। এসব আমি তাঁর মুখে শুনেছি। তাঁর দুটি জীবনী আমার কাছে আছে—পড়তে চান তো দিতে পারি।

ললিতা: আমিও মা-র কাছে শুনেছি তাঁর কথা, দাদু। মা বলেন, এমন নিরভিমান নির্মল ভক্ত তিনি কমই দেখেছেন জীবনে। আর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্যে তাঁকে তাঁর বাপ-মা তাড়িয়ে দেন এক কাপড়ে। ধনীর সন্তানকে গাছতলায় অনশনে কাটাতে হয়েছে কতদিন--আমিও পড়েছি তাঁর জীবনী, শেঠজি!

শেঠজি (রুষ্ট): আমি চললাম, ডাক্তারবাবু। আমি এখানে এসেছিলাম চৈতন্যদেবের স্তব শুনতে—খৃষ্টানিটির গুণকীর্তন শুনতে নয়।

তারা (করজোড়ে): রাগ করবেন না শেঠজি, কিন্তু বৈরাগী মহারাজের মতন সাধুজির সামনে এ-ভাষায় কথা বলা কি—

প্রেমল (বাধা দিয়ে): না মা, আমি কিছু মনে করি নি। শেঠজি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সত্যিই ভক্তি ক'রে তাঁর নামকীর্তনে যোগ দিতে এসে থাকেন, তবে তাঁকে আমি বরণ ক'রে নেব পরম বন্ধু ব'লেই। অসিত, গাও তাঁর গান—মহাপ্রভুর স্বরচিত পদাবলীটির যে অনুবাদ তুমি করেছ—সেই, আহা,

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বচনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ?

অসিত। (শেঠজিকে): শুনুন শেঠজি, আজই এ-শ্লোকটির তর্জমা করেছি এ-উৎসবে কীর্তনে গাইব ব'লে (গুন গুন ক'রে গায়):

(কবে) আঁখিনীর বুকে উছলিবে, মুখে ফুটিবে না কথা তব স্মরণে ?
উঠিবে শিহরি' তনু কবে মরি, তোমার নামের উচ্চারণে ?

প্রেমল (গাঢ়কণ্ঠে): আহা! এরই তো নাম প্রেম—তাঁর নামের উচ্চারণেই এই চক্ষে ধারা! শেঠজি, আমারই অন্যায় হয়েছে। আজ রথযাত্রা। —আমার মনে রাখা উচিত ছিল—এ-পুণ্যদিনে তকাতর্কি শুধু অশোভন নয়, মহাপাপ। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আসুন এ-শুভদিনে দুজনে মিলে তাঁর ছবির সামনে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা করি—যেন তাঁর মহাবাণী মনে রাখি যে, সাধককে হ'তে হবে "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা"—তৃণের চেয়েও নিচু, আর তরুর মতন সহিষ্ণু—আর সবার উপরে ভক্তির কাঙাল—দীন হ'তে দীন— (উঠেই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে)

শেঠজি (গ'লে গিয়ে): আপনি সত্যিই মহাত্মা জী! আমারই অন্যায় হয়েছে—আপনিই আমাকে ক্ষমা করুন।

ললিতা (আলিঙ্গনবদ্ধ যুগলমূর্তির দিকে চেয়ে): উলু উলু উলু—বলো ভাই বকুল! উলু উলু উলু—

তারা (সানন্দে): উলু উলু উলু। (ডাক্তারবাবুকে) বলো না।

ডাক্তারবাবু (একগাল হেসে): উলু উলু উলু। গানের পালা এল, জয় গুরু, জয়!

অসিত (মহোল্লাসে নিত্যানন্দের বাণী গায় পদাবলীর নানা পদের সঙ্গে):

মেরেছ কলসীর কানা
তা বলে কি প্রেম দিব না ?

অপরূপ জ্যোতি গৌরাঙ্গ মূরতি দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে…

দন্তে তৃণ ল'য়ে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দাস্য মুক্তি যাচে প্রভু বারেবারে…

আয়, কিশোরীর প্রেম নিবি আয়…

প্রেমের জোয়ার যায় ব'য়ে যায়…

নিতাই ডাকে : "আয়"

গৌর ডাকে "আয় !"

(দেখ্) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়…

(প্রেম) কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়…ইত্যাদি

প্রেমল : ঠিক ঠিক…তাঁর সবই অদ্ভুত—গাও অসিত তুকড়াদাসের ভজনটি —অজব তমাশা তেরা সাঁবল…

অসিত (হারমনিয়ম বাজিয়ে ধরে দেয়)

অজব তমাশা তেরা সাঁবল অজব তমাশা তেরা :

তূ দুনিয়ামে, দুনিয়া তুঝমে উলট পলটকা ফেরা !

তূ হী ভূত অভূত জগতকে, তূ হীনে জগ ঘেরা

তূ হী কীনা, তূ হী জীনা, সুখ দুখ সব হী তেরা।

(পরে ঐ সুরেই)

তোমার লীলার, শ্যামল, কে পার পায়—জাগে বিস্ময় !

বিশ্বে তুমি, তোমার মাঝেই বিশ্ব জেগে রয়।

আলোও তুমি কালোও তুমি, নয়কে করো হয়।

অনাগত, আজ, কাল—সব হয় তোমাতেই লয়।

দিতেও তুমি, নিতেও তুমি, অকিঞ্চন অক্ষয়।

বেদনায়ও চিরচেতন—প্রেমানন্দময়।

ললিতা : দাদা, এ-গানটি কিন্তু আমাকে শিখিয়ে দিতেই হবে। আমি গাইবই গাইব—তাতে যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব।

প্রেমেল (হেসে) : মা ভৈঃ। ঠাকুর ভাবগ্রাহী—প্রাণ যাবে না। ভুল হ'লেও বর দেবেনই দেবেন।

ডাক্তারবাবু: কিসের? সুরের?

ললিতা : নয় তো কি অসুরের? তার জন্যে তো বরের দরকার নেই।

তারা (করজোড়ে): না, আর কথা নয় বকুল, লক্ষ্মী দিদি আমার! বেসুরের পর মহাপ্রভুর কৃপায় সুর এসে গেছে—রেশটা না মিলিয়ে যায় ফের অসুরের আবির্ভাবে।

প্রেমল : তারা ঠিক চিনেছে। তর্কের নামে আমি বিতণ্ডার সৃষ্টি ক'রে অসুরকেই ডেকেছি সুরের আসরে। (চৈতন্যদেবের ছবির সামনে মাথা নিচু ক'রে প্রণাম ক'রে) তবে ঠাকুরের কৃপায় পড়বার ঠিক আগে চৈতন্য হয়েছিল, তাই হোমাপাখীর মতন ধূলিসাৎ হবার আগেই মাটিমুখো পাখী ফের আকাশের দিকে ফিরেছে। (অসিতকে) তুমি গাও ভাই তাঁর একটি গান। জয় শ্রীচৈতন্য! আগে গাও একটি স্তব দেবভাষায়—দেবমানবের তর্পণে।

অসিত (স্বরচিত সংস্কৃত স্তব ধ'রে দিল) :

প্রার্থয়ে চৈতন্যসুন্দর! তব চরণরতিমবিচলাম্।
প্রেমকোমল! দেবমানব! দেহি ভক্তিং সুবিমলাম্।
তব-কৃষ্ণলীনং চিত্তং
চিরকৃষ্ণপদযুগবিত্তং
শরণ্যং মে দেহি কৃপয়া কৃষ্ণনিষ্ঠামচপলাম্।
প্রেমকোমল! দেবমানব! দেহি ভক্তিং সুবিমলাম্॥

ভ্রান্তের্মুক্তিং তব হরিকথা প্রাণগেহায় দত্তে।
নিত্যাং শান্তিং নয়নমভয়ং চিত্তলোকে বিধত্তে।
তাপক্লিষ্টং বিধুরহৃদয়ং কীর্তনে তে প্রফুল্লং।
শ্লিষ্যত্যন্তে তব পদতটং স্বর্গশুভ্রং হতুল্যম্॥

তব সাধনরতমক্ষমবলমুদ্ধর কৃপয়া।
চরণাগতময়ি! দেহিশরণমাননবিভয়া।
প্রিয়! বাঞ্ছিত! চিরবন্ধো!
বহুদুর্লভ! করুণেন্দো!
যুগশোচনমিহ মোচয় তব লোচনশিখয়া॥
প্রেম্ণা স্ববশমবশং বিধাতুং তূর্ণং শমিতুং চিরক্ষুধাম্।
অনাথবেশ ইহাগত ঈশ উদাসী দাতুং প্রেমসুধাম্॥

তারা (করজোড়ে): দাদাজি, দেবভাষা খুবই চমৎকার—ঝঙ্কারেও মনে আবেশ আসে, মানি। কিন্তু একটি বাংলা গৌরকীর্তন না হ'লে মেয়েদের অবোধ মন মানে না।

ললিতা: আমি বকুলের সঙ্গে একমত দাদু। কি জানেন? যতই কেন না স্তব গাই দেবভাষায়, মনের সব জানলা খোলে কেবল মাতৃভাষার টোকায়। লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের মুখে শুনতাম—কী চমৎকার:

কী যাদু বাংলা গানে!—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ডাক্তারবাবু (হেসে)। এ কথা কাটবার জো কি? (অসিতকে): তবে সংস্কৃত গানটির তো আপনি বাংলা অনুবাদ করেছেন—স্বামীজি বলছিলেন—

অসিত: ঠিক অনুবাদ নয়—ভাবানুবাদ।

প্রেমল (একগাল হেসে): তোমার কথা শুনে মনে পড়িল এক বিখ্যাত ছড়া:

Strange that such high dispute should be
'Twixt Tweedledum and Tweedledee

দেবানন্দ: (হেসে) আমাদের ঘরোয়া ভাষায় উপমা বোধহয় আরো সরেস: "তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল।"

ললিতা (হাততালি দিয়ে): কিন্তু আরো সরেস ডি. এল. রায়ের "ধপাস ক'রে পড়ে, না প'ড়ে ধপাস করে?"

ডাক্তারবাবু: কিন্তু ভজনের দেরি হ'লে ভোজনের পালা আসবে না—মনে রাখা ভালো।

শেঠজি ঃ ঠিক ঠিক। গান অসিতবাবু, এর অনুবাদ, থুড়ি ভাবানুবাদই সই।

অসিত মহানন্দে গায় তার প্রাণের নিবেদন ঃ

আজ প্রার্থনা করি—অন্তরে হরি, করো একান্তমতি।
এসো গৌরগোপাল, প্রেমের দুলাল, ঝরায়ে অপার জ্যোতি।
স্মরি' কৃষ্ণ, আপনহারা,
তুমি ভাঙিলে পাষাণ কারা,
গেয়ে ঃ "প্রেমতন্ময় নামে হয় লয় শোক তাপ ক্ষয় ক্ষতি।"

ডাকি যেমনি ব্যথায় "কৃষ্ণকথায় দাও সন্ধ্যায় দিশা,"
আসো বিছায়ে শান্তি, ঘুচায়ে ভ্রান্তি, মিটায়ে ক্লান্তি তৃষা।
নাথ, মাটির মানুষ ম্লান
জাগে শুনি' তব নামগান
আঁখি তোমার চরণ করিতে বরণ চেয়ে থাকে অনিমিষা।

যেই অন্ধ নিশায় কাঁদি ঃ "কোথা হায় অরুণানন্দ-আলো ?"
দাও ঠাঁই রাঙা পায় কান্ত, কৃপায়—এসো কাছে বেসে ভালো"—
তুমি অমনি হে দীনবন্ধু,
বহু- দুর্লভ সুধা-ইন্দু,
আসো মরণ-হরণ রূপে বিমোহন, বিদলি' কুরূপ কালো।

গান গাইতে গাইতে অসিতের ভাব এসে যায়। বুকে ভক্তি, চোখে জল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আঁখরও যুগিয়ে দেয় ঃ

তুমি ব্রজের ব্রজেশ্বর এলে নদীয়ায় সুন্দর !
দিতে প্রেমহীনে নামমণি চির- কাঙালে করিতে ধনী।
এলে ভুবনমোহন রূপে অচিন্তনীয়
ধূলি- ধরায় ঝরাতে নৃত্যগীত অমিয়,
ওগো দেবতা-দিশারি এলে বলো এত রূপ কোথা পেলে ?
আমরা দেখেও দেখি না শুনেও শুনি না, দেবতা দীপালি জ্বেলে
এলে তাই প্রেমপাখা মেলে !……

বৃন্দাবনে কোনো ভজনের আসরেই ওর এমন ভাব জমে নি। গাইতে

গাইতে গাইতে সত্যিই মনে হল যেন মৃন্ময়কে চিন্ময়ের দীক্ষা দিতেই শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন। তাই না পেলেন যুগল উপাধি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। বদ্ধ জীবকে মায়ার ম্লান কূল থেকে হরিনামের অম্লান অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে ভক্তির প্রসাদে জীবন্মুক্তির স্বাদ দিতেই বুঝি তিনি আরাম-নিলয় সংসার স্বজন সব ছেড়ে ধূলায় পেতেছিলেন প্রেমের শেজ, ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রেমের ভিখারী হ'য়ে নামের আলোয় চির-অভিরামের পথদিশা দেখাতে জ্বেলেছিলেন দেবতা-দীপালি! এমন প্রেম এ-কলিযুগে আর কার মাঝে রূপ নিয়েছে—মাটির নিচুটান কাটাবার দীক্ষা দিয়েছে বৈকুণ্ঠের ডাকে সাড়া দিতে, উড়ে চলার একান্তমতি দিয়েছে শরণাগতির মন্ত্রদীক্ষায়? কিন্তু তবু মন প্রশ্ন করে এ-ও কি সম্ভব? মাটির মানুষ কি পারে অমরাবতীর সভাসদ হ'তে? কামনাবিলাসী জীব পারে কি নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্ব ফিরে পেতে, অকিঞ্চন হ'য়ে অমৃতের অধিকারী হ'তে?

* * *

অসিত গান শেষ হ'তে চেয়ে দেখল ললিতা দুহাতে মুখ ঢেকে; তারার চোখে জল—দৃষ্টি নিবদ্ধ চৈতন্যদেবের ছবির পানে; ডাক্তারবাবু মাটির দিকে চেয়ে; আর প্রেমলের প্রায় ভাবসমাধির অবস্থা—চোখের দৃষ্টি উত্তান, যুক্তপাণি ঠিক চিবুকের নিচে ন্যস্ত—প্রার্থনার মুদ্রা। কিছু কি দেখেছে "দর্শন"? হবে। ও কখনো ভুলেও বলে না তো নিজের কোনো অনুভব উপলব্ধির কথা। বলে গুরু ছাড়া কারুর কাছে এসব গুহ্য কথা বলার প্রত্যবায় আছে। অসিতের মন সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এক আধবার ললিতা ওকে ঈষৎ আভাস দিয়েছে বটে, কিন্তু সে কণিকা-প্রসাদে কি আশ মেটে? ললিতা শুধু বলেছিল যে, প্রেমল কেবল পথের দিশাই নয় পাথেয়ও পেয়েছে অঢেল—গুরুর প্রসাদে—তাই উঠতে বসতে বলে জোর দিয়েই যে, এ-সংশয় গহন জীবনের নৈমিষারণ্যে গুরু বিনা গতি নেই। কিন্তু অসিতের গুরু কোথায়? আজ পর্যন্ত কাউকেই মনে ধরল না কেন? নাম শুনেছে প্রেমলের স্বামী স্বয়মানন্দের, তাঁর লেখা "ভাগবতী বাণী" প'ড়ে আশাও জেগেছে বহুবার, কিন্তু শুধু যে তাঁর কাছে ধর্ণা দিতে প্রাণ চায় না তাই নয়, "কেন চায় না"—এ প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। তাই সময়ে সময়ে বিষাদে মন ছেয়ে যায় দুর্লভ মানব জন্ম কি বৃথাই যাবে?

হঠাৎ চম্‌কে ওঠে কান্নার শব্দে। এ কী? শেঠজির স্ত্রীকে ওরা কেউ লক্ষ্যই করে নি। তিনি ঘরের এককোণে মাথা হেঁট করে চুপ ক'রে বসেছিলেন ব'লে সবাই মনে করেছিলেন পর্দানসীনা বুঝি।

তাঁর চাপা কান্না ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'য়ে উঠতে সকলেরই দৃষ্টি পড়ল তাঁর 'পরে। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাই নয়, সারা দেহে সে-কান্নার ঢেউ খেলে যায় হু হু ক'রে! প্রেমল-যে-প্রেমল সেও ভাব সামলে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ব্যাপার: তিনি হঠাৎ উঠে প্রেমলের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন: "আমাকে মাপ করুন প্রভু। আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনার কত নিন্দা করেছি···বলেছি ম্লেচ্ছ, অনাচারী অহংকারী···আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি দেখলাম···দেখলাম···" কিন্তু কথা শেষ হয় না, অশ্রু এসে ফের তার কণ্ঠরোধ করে। প্রেমল তাঁর মাথায় হাত রেখে বলল: "মন খারাপ কোরো না মা। আমরা ঝোঁকের মাথায় রোখের ঝাঁজে ভগবানকেও গালমন্দ করি না? তাতে ঠাকুর যখন রাগ করেন না তখন আমি কে বলো তো?"

শেঠগিন্নি: না প্রভু, আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন না। আমি যে দেখলাম স্বচক্ষে···

ললিতা (কাছে এসে তাঁকে তুলে): বলো ভাই, কী দেখলে?

শেঠগিন্নি (অশ্রুল কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে): দেখলাম দিদি···মহাপ্রভুর ছবির কপাল আলো হ'য়ে উঠল···আর···আর সেখান থেকে একটি···নীল রশ্মি এসে··· প্রেমল মহারাজের কপাল ছুঁলো। আমায় ক্ষমা করুন ঠাকুর। আমি পাপিষ্ঠা···

শেঠজি (সঙ্গে সঙ্গে এসে প্রেমলের পায়ে প'ড়ে): আমাকেও—আমাকেও ঠাকুর—আমাকেও—ক্ষমা—

প্রেমল (তাঁর মাথা কোলে টেনে নিয়ে একটি হাত তাঁর পিঠে রেখে, অন্য হাত শেঠগিন্নির মাথায় রেখে): ক্ষমার কোনো প্রশ্নই ওঠে না মা! আর, আমি ঠাকুর টাকুর নই—সামান্য ভক্ত মাত্র—

দেবানন্দ: মহারাজ! একটি শ্লোক হঠাৎ মনে পড়ল—ঠাকুর অর্জুনকে বলেছিলেন যে, যারা আমার ভক্ত তাদের আমি ভক্ত বলি না, বলি তাদের যারা আমার ভক্তের ভক্ত—

> যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
> মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তা হি তে নরাঃ॥

তাই ওদের মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন না যে, এতে কিছু যায় আসে না। তাছাড়া অনুতাপ খুব ভালো জিনিষ, আগুনের মতনই শোধন করে।

শেঠগিন্নি: ঠিক কথা, স্বামীজি! আমি নবদ্বীপের পণ্ডিতের মেয়ে—কতবারই তো শুনেছি বাবার মুখে যে ঠাকুর আর সব অপরাধ ক্ষমা করেন কেবল বৈষ্ণব অপরাধ—মানে ভক্তের অপমান—ক্ষমা করেন না। তাঁর কাছে শুনতাম অম্বরীষের কাহিনী তাই (প্রেমলকে) আমাকে ক্ষমা করুন, ঠাকুর। আমি আর কখনো এমন পাপ করব না, করব না, করব না। তিন সত্যি করছি।

প্রেমল (স্নিগ্ধস্বরে): কোথায় অম্বরীষ আর কোথায় আমি মা! কী বলছ তুমি? যে-দুর্বাসা কৃত্যা রাক্ষস সৃষ্টি ক'রে তাঁকে মারতে চেয়েছিল, তিনি তার হ'য়ে করেছিলেন প্রার্থনা নারায়ণের আজ্ঞাবহ শাস্তা সুদর্শন চক্রের কাছে:

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতি বিজ্বরঃ

(অসিতকে) বলো তো অসিত—এর যে অনুবাদ কাল শোনালে? মনে আছে?

অসিত: আছে, আমি যে কালই করেছিলাম এ-অনুবাদ ললিতা শুনতে চেয়েছিল ব'লে (ব'লে একটু থেমে আবৃত্তি করে)—

আমি যদি হরিপ্রেমপ্রার্থী হই তনুমন প্রাণে।
স্বধর্মে অটল হই মিথ্যামাঝে নিত্যের সন্ধানে,
ভক্তি শুধু চেয়ে থাকি, অষ্টসিদ্ধি মুক্তি মোক্ষ নয়,
আমার চিরপাথেয় হয় যদি প্রেমেরি অভয়,
কুলদেব আমাদের হয় যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ
হোক করুণায় তব তাপিতের তাপনিবারণ।

প্রেমল (আবার স্নিগ্ধ স্বরে): ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দশ

রাত্রে পায়স-প্রসাদ পেয়ে অসিত ঘরে এসে চুপ ক'রে জানলার কাছে একটি আরাম-কেদারা টেনে নিয়ে চেয়ে থাকে আকাশের পানে। মেঘ কেটে কয়েকটি তারা ফুটেছে। ভিজে হাওয়া এমন স্নিগ্ধ লাগে! কোথা থেকে ভেসে আসে মেঠো বাঁশি! মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা। নিশুদা বড় সুন্দর বাঁশি বাজাত। মনে পড়ে তার কৃষ্ণভক্তি। বলত কথায় কথায়—শ্রীগৌরাঙ্গদেব এসেছিলেন কৃষ্ণের অবতার হ'য়ে একাধারে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভাষ্য নিজের জীবনে মূর্ত ক'রতে। বৈষ্ণব পরিভাষায় বুঝি একে বলে বিষয় ও আশ্রয়ের গলাগলি। কিন্তু এসবই ওর কাছে চিরদিন "কথা কথা কথা"ই হয়েছে। প্রেমলকে ওর এত ভালো লেগেছে আরো এইজন্যেই তো—সে-ও ওর সঙ্গে একমত, বলে যে, কথার মায়া, পরিভাষার আড়ম্বর প্রায়ই সরল উপলব্ধির অমল আলোকে ঢেকে দেয়। তৃণাদপি সুনীচেন—বলে প্রেমল প্রায়ই! আজও বলল। শুধু বলল না—হাতে কলমে ক'রে দেখাল। মহাপ্রভুকে সে এত বড় মনে করতো তো আরো এই জন্যেই—"আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়"। তাই না মহাপ্রভু জীবকে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন নিজের দৃষ্টান্তের আলোয়। প্রেমলের মধ্যেও ও দেখতে পেয়েছে এই নিবিড় আন্তরিকতা—intense sincerity—শাস্ত্র বেদ গীতা সবই সে মানে, কিন্তু সব আগে মানে গুরুবাক্য—বলে নাকি উঠতে বসতে? গুরুকরণ অসিতের হয় নি আজও তাই হয়ত সে ঠিক বুঝতে পারে না—কেন গুরুর ঘটকালি বিনা ইষ্টের কৃপা পাওয়া অসম্ভব। অবশ্য "অসম্ভব" এতটা বলে না প্রেমল, তবে বলে গুরুবিনা সাধনায় কৃতকৃত্য হয় "কোটিতে গোটিক" one in a million—যেমন রমণ মহর্ষি। বাকি সকলের গুরু বিনা গতি নেই নেই নেই। একথা অসিতের মন নিতেও পারে না অথচ ঠেলতেও পারে না। কারণ গুরু কৃপা বিনা পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছে এমন কোন মহাত্মাকে ও তো চাক্ষুষ করে নি। রমণ মহর্ষির ও দেখা পায় নি আর পেলেই বা কী? ব্যতিক্রমের পথ তো গড়পড়তার পথ নয়—হ'তেই পারে না। আহা, যদি জানতে পারত গুরুকরণ ক'রে প্রেমলের ঠিক কী ধরণের উপলব্ধি হয়েছে! আজ কী দেখল ও? ভাব যে ওর হয়েছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

মেয়েদের মধ্যে অনেক সময়েই সরল দৃষ্টি খুলে যায় দেখা গেছে। তাই শেঠ-গিন্নী নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখেছিলেন যার ফলে তাঁর সমস্ত ধারণা ওলট পালট হ'য়ে গেছে। *প্রতি বড় উপলব্ধি কিছু-না-কিছু ওলট-পালট আনে। অন্ততঃ* কিছুদূর এগিয়ে দেয় নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রেমল গুরুকৃপার প্রসাদে কতটা এগিয়েছে? মনে ওর ক্ষোভ জেগে ওঠে। কেন বলতে চায় না ও? গুরুর বারণ? কেন গুরু বারণ করেন? মানুষ অন্তহীন দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির খবর রটিয়ে বেড়াতে পারে কেউ বারণ করে না, কেবল সুন্দর অনুভূতি গভীর উপলব্ধি—দর্শন শ্রবণ স্পর্শন—যার প্রভাবে তার পথের বাধা কাটে, আঁধারে আলোর দিশা মেলে, সবার উপর আত্মাভিমানের অষ্টপাশ থেকে মুক্তি লাভ হয়, সেই সব সৎকথা বলাই মানা? অসিত বার বার সংকল্প করেছে—ওর যদি কোনো মহৎ দর্শন হয় ও গোপন করবে না, বলবে সবাইকেই ডেকে ডেকে—কোথায় কবে কী দেখেছে যার ফলে ও নানা পিছুটান কাটাতে পেরেছে। কী? গুরু যদি নিশেধ করেন? মন ওর বিমুখ হ'য়ে ওঠে: তাই তো ও চায় না গুরুবাদী হ'তে। আমার কিসে ভালো হবে জানতে আর কারুর কাছে ধর্ণা দিতে হবে কেন? তাছাড়া গুরুরও কি ভুল হ'তে পারে না? To err is human! গুরুও মানুষ তো। নাঃ। প্রেমলের গুরুভক্তিকে ও আন্তরিক শ্রদ্ধা করলেও ঈর্ষা করে না। গুরুর পায়ে দাসখৎ লিখে দেওয়ার কথা ভাবতেও ভয় করে!

কিন্তু দাসখৎ না লিখে দিলে যদি সারা জীবন শুধু ঝিনুক কুড়িয়েই কেটে যায়, মুক্তার হদিশ না মেলে—তবে? শূন্যতাও কি ভালো হ'তে পারে শুধু এই যুক্তিতে যে, আমি নিজের কর্তা থেকেই খালি হাতে চলছি—যেখানে দেখা যাচ্ছে যে গুরুকে কর্তা করার ফলে প্রেমলের ম'ত কত শত মহাসাধকের শূন্য জীবন পূর্ণ হয়েছে, পতিত জমিতে সোনা ফলেছে? কিন্তু—রোসো রোসো, ফলেছে কি সত্যিই? দৃষ্টান্ত কই? শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? কিন্তু এঁদের তো ও চাক্ষুষ করে নি—কেবল বইয়েই পড়েছে। কিছুই দেখলাম না শুনলাম না, সরাসরি মেনে নিলাম! এ কখনো হয়? এ যে পারে সে পারুক—অসিত পারবে না, পারবে না, পারবে না। সে আগে দেখবে বুঝবে চিনবে তবে মানবে—করবে আত্মসমর্পণ। নইলে নয় নয় নয়।

কিন্তু দেখতে পায় কে? না, যে সত্যি দেখতে চায়। অসিত সত্যিই দেখতে চায়। তাই কি ও প্রেমলের দেখা পেল? মোহন মহারাজের?

শ্যাম ঠাকুরের? অমলের? শ্যাম ঠাকুরের গুরু আনন্দগিরিকে দেখতে ইচ্ছে হয়। হয়ত দেখবে কোনোদিন। খৃষ্টদেব বলেছেন: যে খোঁজে সে পায়ই পায়। অসিতের একটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ সংশয়ের লেশও নেই—কোনোদিনই ছিল না—যে ও সন্ধানী, জিজ্ঞাসু—দেখার তৃষ্ণা ওর সত্য। তাই হয়তো হঠাৎ প্রেমলের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হ'ল এমন হঠাৎ? কিছু ও দেখতে পেয়েছে বৈ কি তার মধ্যে। শুধু অসিতই নয়, আরো অনেকে: দেবানন্দ, তারা, ডাক্তারবাবু, এমন কি শেঠ-দম্পতিও—ললিতার তো কথাই নেই যে তার পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছে। এমন তেজী বুদ্ধিমতী মেয়ে কি কিছু না দেখে নত হ'তে পারে? ললিতাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় কী ঠিক দেখেছে। না, প্রেমল ওকেও মুখে চাবি দিতে হুকুম করেছে? কী জ্বালা! যেখানেই গুরু সেখানেই এই এক পরোয়ানা: "খবর্দার!"

হঠাৎ চম্‌কে উঠল: "টক টক টক!"

"কে?"

"আমি দাদা! আসতে পারি?"

অসিত খুশী হ'য়ে বলে: "এসো দিদি এসো।"

ললিতা ঢুকেই প্রণাম করল।

"ব্যাপার কি দিদি?"

ললিতা (মৃদু হেসে): 'ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?'

অসিত (হেসে): আমি কি খুব ভয়াবহ মনিষ্যি?

ললিতা: না দাদা, তবু—

অসিত: তবু—কী?

ললিতা: কিছু বলতে চাই—বা বলার আছে—অবিশ্যি যদি শুনতে চাও।

অসিত (হেসে): গরজ যে আমারই দিদি, শুনতে না চেয়ে পারি? এক্ষুনি কী ভাবছিলাম জানো?

ললিতা: আমি জানি না, তবে বাপী জানে। না—অন্তর্যামী টামী নয়। তবু সে অনেক কিছু ধরতে পারে বৈ কি। সেই কথাই বলতে এসেছি।

অসিত: এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া দিদি। আমি মাঝে মাঝে রেগে উঠি—কেন তোমরা কেউই কিছু বলো না যখন আমি—মানে, শোনবার জন্যে এমন তৃষিত থাকি?

ললিতা : জানি দাদা ! তুমি যে খাঁটি জিজ্ঞাসু—সবারই চোখে পড়েছে। তবু এতদিন বলার বাধা ছিল। আজ কেটে গেছে।

অসিত : কখন ?

ললিতা : তোমার গানের পর। আমি কী দেখেছি জানো ?

অসিত : কী ?

ললিতা : হাসবে না তো ? না, বাজে কথা থাক। শোনো। গানের সময় তোমার মাথা ঘিরে আমি দেখেছি—নীল আলো।

অসিত (প্রফুল্ল) : সেইজন্যেই কি বাধা কাটল ?

ললিতা : না। বাপীও দেখেছে, নৈলে শুধু আমার দেখার জোরে বাধা কাটত না।

অসিত (চমকে) : প্রেমলও দেখেছে ? কী ? নীল আলো।

ললিতা : না, আরো কিছু। কিন্তু বলে নি আমাকে খুলে। কেবল বলেছে তোমায় বলতে কিছুটা অন্ততঃ—যা তুমি জানতে চাও—মানে ওর সাধনার কথা।

অসিত : (সবিস্ময়ে) তোমাকে বলতে বলেছে ? নিজে থেকে !

ললিতা : ঠিক বলতে বলেনি—তবে আমি বলতে চাই একথা ওকে বলায় বলবার অনুমতি দিয়েছে।

অসিত : ও।

ললিতা : কিছু মনে করলে না কি দাদা ?

অসিত (জোর ক'রে হেসে) : মনে করার আমার কী অধিকার দিদি ? বলা না বলা—এ তো জোর-জুলুমের ব্যাপার নয়। মনের আগল না খুললে দোর খোলা যায় কি ?

ললিতা (হেসে) : কিন্তু আমার মনের দোর আজ আপনা থেকেই খুলেছে, তাই তো তোমাকেও দোর খুলতে হ'ল নিশুত রাতে। শোধবোধ।

অসিত (হেসে সুর ক'রে) : আধি রাত প্রভু দরশন দীজে—এ মীরার প্রার্থনা। তাই তুমি ঠিক সময়েই এসেছ দিদি—প্রায় অন্তরযামিনীর মতন।

ললিতা (ফের প্রণাম ক'রে) : অমন কথা বলে ছোটবোনকে—যার সম্বল শুধু অহংকার আর প্রগল্‌ভতা ?

অসিত: দিদি, ও চাল চলবে না। জানো, প্রেমল আমাকে কী বলেছে আজ তোমার সম্বন্ধে? বলেছে— .

ললিতা (অসিতের মুখ চেপে ধ'রে): না দাদা, দুটি পায়ে পড়ি—বোলো না। একেই অহঙ্কারে আমার মাটিতে পা পড়ে না। আরো ফুলে উঠলে হয়ত বেলুনের মতন উড়ে ঘুরে মরব মাটি-ছাড়া গুরু-ছাড়া হ'য়ে—কোথায় কে জানে?

অসিত: না, মরবে না। শুনতেই হবে তোমাকে। ওকে আমি একটু আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও কেমন ক'রে চৈতন্যদেবকে এত ভালবাসতে শিখল। তাতে ও বলল: "তুমিই গাও নি কি আজ যে, ঠাকুরের লীলা তামাশা হ'ল আজব চীজ? তাই ললিতার ছোঁয়াচেই আমার চোখের ঠুলি খুলল—দেখতে পেলাম চৈতন্যদেবের দীক্ষার মর্ম।" আমি হেসে বললাম: "কী দীক্ষা বলবে? না, বলতে এবার শিষ্যার মানা?" ও বলল: "না ভাই, কেবল ওকে বোলো না।" আমি বললাম: "তবে থাক কাজ নেই ভাই ব'লে—এ-চুপ-চুপ hush hush আমার ধাতে সয় না।" ও হেসে বলল: "আচ্ছা, ওকে বলতে পারো, কিন্তু আর কাউকে নয়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম—যেমন প্রাণ জাগে প্রাণের ছোঁয়াচে, তেমনি প্রেম জাগে প্রেমের ছোঁয়াচে। ও ছেলেবেলা থেকেই ভালোবেসে এসেছে মহাপ্রভুকে। সেই ছোঁয়াচেই আমার মনেও দুলে উঠেছে তাঁর প্রেমের দোললীলা। না, শুধু প্রেমের নয়—দীনতার। তাই, সত্যি বলছি তোমাকে: আমি অনেক কিছু পারতাম—কেবল পারতাম না একটি জিনিষ—নিচু হ'তে শোনো: অনেক দিন আগে যখন আমি প্রথম আসি লক্ষ্ণৌয়ে—ছিলাম অধ্যাপক—ব্রিলিয়াণ্ট প্রফেসর—সব কিছুই বুঝিয়ে দিতাম সবাইকে সবজান্তার ঢঙে—তখন একদিন কবি অতুলপ্রসাদের মুখে তাঁর স্বরচিত একটি গান শুনি—যেটি পরে তোমার মুখেও শুনেছি:

> নিচুর কাছে নিচু হ'তে শিখলি না রে মন!
> নয় কো সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন।

"কিন্তু বেশ মনে আছে যে, শুনে মনে হয়েছিল—এ একটা কথাই নয়। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' এইই হ'ল শক্তির প্রথম পাঠ—মৃন্ময়কে বর্জন না করলে চিন্ময়কে অর্জন করা যায় না—যেতে পারে না। কিন্তু তার পরে

বহু পোড় খেয়ে ঠেকে শিখেছি ভাই যে, নিচুর কাছে নিচু হ'তে পারা চাট্টিখানি কথা নয়—দুর্বলের কর্ম নয় অহমিকার টুঁটি চেপে ধ'রে বলা: উঁচু মাথা তোকে নোয়াতেই হবে। আর চৈতন্যদেবের দীনতা কী বস্তু চিনতে পেরে তবেই আমি পেরেছিলাম এ-অসাধ্যসাধন করতে। নৈলে মনে করো কি—আমি তোমাকে শেঠজি-দম্পতিকে ডাকতে পাঠাতে পারতাম? মনে কি আমার হয় নি ভাবো: বিমুখদের ডেকে কাজ নেই, কেনই বা সুরের মাঝে বেসুরাকে টেনে আনা সাধ ক'রে? কিন্তু তখন কি জানতাম যে, দয়াল ঠাকুর পুরস্কার দেবেন—এই বেসুরাই সুরেলার ঝঙ্কার তুলবে এমন আচমকা?" আরো ও বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক এই সময়ে তারা এসে বলল—শেঠজি পাঠিয়েছেন একরাশ ফল আর শেঠগিন্নি—ধূপ চন্দন আর একটি সোনার ধূপদানী। প্রেমল আমার দিকে চেয়ে বলল হেসে: "দেখলে তো ঠাকুরের কাণ্ড? ভাগ্য একেবারে হাতে হাতে!"

ললিতা (চকিতে চোখের জল মুছে): ও এখন বুঝেছি কেন বাপী আমাকে অনুমতি দিয়েছে। ও শুধু বলল: আজ ভজনের সময় ও-ও এমন কিছু দেখেছে যা দেখবার ম'ত—মানে তোমার সম্বন্ধে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) শোনো ভাই, আজ একটু খুলেই বলব—যদিও হয়ত বেশি ব'লে ফেলে ফের বকুনি খাব বাপীর কাছে। কিন্তু কতদূর বলা উচিত আর কোথায় থামা চাই আমি তো জানি না। তাই বাপী আমাকে যখন দূতী পাঠিয়েছে তখন আমার স্বভাবের আর অজ্ঞানের জন্যে আমাকে দূষলে চলবে কেন বলো? কাজেই শোনো মন দিয়ে।

অসিত: কান খাড়া ক'রেই শুনছি দিদি।

ললিতা (খিলখিল ক'রে হেসে): লম্বকর্ণ? (ব'লেই জিভ কেটে) ঐ দেখ—স্বভাব যায় না ম'লে তো—মাপ কোরো ভাই, লক্ষ্মীটি! (ঢিপ ক'রে প্রণাম) এ-সুন্দর অনুতাপের প্রতিদানে কী দেবে আমায় বলো তো?

অসিত (হেসে): একদা এক লম্বকর্ণ বেকার এক ধনী শেঠের কাছে এসে প্রণাম ক'রে বলল: "আপনার মেয়েটিকে, স্যর, আমায় দেবেন?" হবু-শ্বশুর ব্যঙ্গ হেসে বললেন: "আগে বলো, আমি যদি আমার মেয়েকে লক্ষ টাকা যৌতুক দেই তো তুমি কী দেবে?" হবু-জামাই অম্লান বদনে বলল: "রসীদ, স্যর"—হা হা হা!

ললিতা (হেসে গড়িয়ে পড়ে): এই জন্তেই বাপী তোমায় তখমা দিয়েছে মনের মানুষ। হাসির মধ্যে এই একটা মস্ত জাদু আছে: যে, সে সহজিয়া হবার পথ কেটে দেয় অজান্তে। তাই কান নিচু ক'রেই শোনো এবার।

অসিত (হেসে): তথাস্তু। কেবল একটা কথা। প্রেমলের কাছে শুনেছি যে, তোমার বৈরাগ্য এসেছিল অল্প বয়সেই—যাকে বলে যৌবনে যোগিনী। এ হেন তুমি তোমার মা-র কাছে দীক্ষা না নিয়ে প্রেমলের কাছে দীক্ষা নিতে গেলে কেন, বলবে?

ললিতা: সত্যের সোনার সঙ্গে মিথ্যের খাদ মিশিয়ে উত্তর দেওয়া চললে বলতে পারি, নিখুঁৎ সুশীলা সেজে, যে, মা বলেছিলেন। কিন্তু নিখাদ সত্যি কথা যদি বলতে হয় তবে দুঃশীলা হ'তে হবে—তাই ভয় পাচ্ছি।

অসিত: মাভৈঃ। আমি আর যাই হই, দজ্জাল দাদা নই।

ললিতা: ব্যস, ভয় কেটে গেছে। বলি তবে সত্যি কথা: আমি মাকে ধরেছিলাম যে আমি গড়পড়তা আটপৌরে শিষ্যা হ'তে চাই না মা-র নেওটো হ'য়ে। চাই নতুন কিছু করতে—বাপীকেও টেক্কা দিতে। ও যেমন খাস সাহেব লর্ড হ'য়েও মন্ত্র নিল নেটিভ হিন্দুর কাছে, তেমনি আমি শোধ তুলতে চাই কুলীন হিন্দু লেডী হ'য়েও মন্ত্র নিতে সাহেব লর্ডের কাছে। এর পরে শুনলাম—আমার মন ভগবান, মিথ্যে বলেনি—যে, বাপীই আমার নির্দিষ্ট গুরু—যাকে বলে appointed.

অসিত: ঠিক বুঝলাম না—

ললিতা: বাঃ! এ-ও কি তোমার অজানা যে, গুরুকে সমন জারি ক'রে তলব করা যায় না, গুরুই চড়াও হ'য়ে শিষ্য-শিষ্যাকে জাপ্টে ধরেন?

অসিত: হ্যাঁ, প্রেমলও একদিন এই ধরণের কথা বলেছিল বটে, এখন মনে পড়ছে—যে, গুরু নির্দিষ্ট থাকেন।

ললিতা: কেন? কথামৃতেও পড়ো নি কি যে, পরমহংসদেব বলেছিলেন—তিনি শ্রীবিজয়কৃষ্ণের গুরু নন?—স্বামীজিও পওহারি বাবাকে গুরু করতে চেয়ে করতে পারেন নি—ঠাকুর তাঁর দখলদার ছিলেন ব'লে?

অসিত: মনে আছে। তবে আসল ব্যাপারটা কী জানো? আমি দুটি "বাদ" ভালো বুঝি না: গুরুবাদ আর অবতারবাদ।

ললিতা : শেষেরটা আমিও বুঝি না দাদা, তবে প্রথমটা আমাকে বুঝতে হয়েছে প্রাণের দায়ে, না বুঝলে পাছে ঠুঁটো সেজে ব'সে থাকতে হয় বিলিতি রাণীর মতন অবলা হ'য়ে—অর্থাৎ "প্রেষ্টিজ" থাকলেও "পাওয়ার" নেই।

অসিত (হেসে) : কিন্তু gift of the gab তো আছে।

ললিতা : সেই তো একমাত্র বাঁচোয়া ভাই! নৈলে ডবল গুরুর চাপে পিষে ছাতু হ'য়ে যেতাম যে। কিন্তু আর প্রগল্‌ভতা নয়—শোনো যা বলতে এত রাতে চড়াও হয়েছি।

বলছিলাম—গুরু কাকে বলে বুঝতে হয়েছে নিজের গরজেই। একথার মানে কী শুনবে? মানে শুধু এই যে, বাপী মাকে গুরুবরণ ক'রে যখন দুদিনেই ফুলটি হ'য়ে ফুটে উঠল, স্বচক্ষে দেখলাম—তখন বিষম লোভ আমাকে পেয়ে বসল! না, শুধু লোভই নয়—কেমন যেন ভক্তি সম্ভ্রম এসে গেল, কেমন ক'রে—কে জানে? কারণ আমি কোনদিনই কারুর কথায় চলতে পারি নি। ছেলেবেলা থেকেই আমার দুটি নাম রটেছিল—ডানপিটে আর উড়নচণ্ডী। দুদণ্ডও কোথাও ব'সে ভালো কথা শুনতে পারতাম না—যা প্রাণ চায় তাই করতাম—উড়ে উড়ে আজ এখানে কাল সেখানে। মার ভাই বোন অনেকগুলি—আমারও কম নয়। মামা মামী মেসো মাসী দাদা দিদি এদের উদ্ব্যস্ত ক'রে মারতাম—কেউ থাকতেন বাংলা দেশে, কেউ আসামে, কেউ সিমলায়, কেউ বা বিলেতে। আমি এখানে দুমাস ওখানে তিন মাস সেখানে চারমাস ক'রে ঘুরে বেড়াতাম গায়ে ফুঁ দিয়ে। সবচেয়ে আমার ভালো লাগত লণ্ডন আর প্যারিস! কেবল থিয়েটার আর সিনেমা—নাচ আর গান। আমি খুব ভালো নাচতে পারি, জানো কি?

অসিত : শুনেছি—

ললিতা : কিন্তু দেখো নি তো! সুন্দরী আমি নই জানি. কিন্তু যৌবনে আমার চটক ছিল, তাছাড়া আমার নাচ দেখে সবাই বলত—এ মেয়ে বিলেতে জন্মালে ইসাডোরা ডানক্যানের সঙ্গে সই পাতাতই পাতাত। কিন্তু হায় রে কপাল! (কপাল চাপড়ে) কোত্থেকে যে আমাকে বৈরাগ্য চেপে ধরল—একেবারে আচম্‌কা, নোটিস না দিয়ে—যে, আমার সব চঞ্চলতা উবে গেল। ব'সে থাকতাম আমি মনমরা হ'য়ে। এ একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

অসিত : জানি। প্রেমলও আমাকে বলেছে।

ললিতা: কিন্তু তারপরে কী হ'ল কখনোই বলে নি। আমি হঠাৎ *ঝোঁকের মাথায় প্যারিসে বিয়ে ক'রে বসলাম এক শিল্পীকে। সে এক ইতিহাস* —আজ থাক। বলতে গেলে রাত কাবার হ'য়ে যাবে। (থেমে) অসুখী হ'য়ে আমি ফিরে এলাম মা-র কাছে। এসেই দেখলাম বাপীকে।

প্রথম দিকে ওকে কেমন যেন—কী বলব?—ভারি অদ্ভুত লেগেছিল। এ আবার কী ঢং—খাস সাহেব জপমালা নিয়ে বসে, গুরুমার চরণামৃত খায়, মেয়েদের ছায়াও মাড়ায় না সুপুরুষ হ'য়েও!—এ কী ব্যাপার? সত্যি দাদা, মনে হ'ত যেন নাটুকে কাণ্ড! (থেমে) কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে দেখলাম ওর আর এক মূর্তি। সে যে কী সুন্দর, কী বলব! সত্যি, চোখ-জুড়ানো ধার্মিকের রূপ!

বুদ্ধিতে ও যে একজন দিক্‌পাল এ আগেই শুধু আমার নয়, সকলেরই চোখ পড়েছিল। বলতে কি, দাদা এমন ধারালো বুদ্ধি আমি দেখি নি কখনো! (মুচকে হেসে) অবিশ্যি present company excepted.

অসিত (হেসে): না না—spade কে spade না বললে diamond-এর খাতির হবে কেন? ওর বুদ্ধি আমার কাছেও সত্যিই—কী বলব—মনে হয় যেন মাপতে গিয়ে হালে পানি পাই নে।

ললিতা (খুশী): দাদা ভাই, তোমার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগে আমার কী জানো?—এই উদার গুণগ্রাহিতা। অপরকে এত সহজে মান দিতে আমি কাউকে দেখি নি—এমন কি বাপীকেও না। ওকে আমি বলেছি একথা—ও-ও সায় দিয়েছে। বলেছে কী শুনবে?—যে, তোমার মধ্যে ঈর্ষা—green eyed jealousy— জিনিসটা আদৌ নেই ব'লেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

অসিত (হেসে): গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না দিদি—ব'লে চলো। তারপর!

ললিতা (ক্ষুণ্ণ): যাও। ভালো ভেবে বললাম, তুমি উল্টো বুঝলে।

অসিত (সান্ত্বনার সুরে): না দিদি, আমি সোজা মানুষ, সোজাই বুঝেছি। কেবল একটা জানতে চাই। শুনেছি তোমরা পুরোপুরি কেতাদুরস্ত সাহেবি চালেই চলতে। গুজবটা কি সত্যি, না লোকে যেমন বাড়িয়ে বলে এ-ও তেমনি?

ললিতা : সত্যি। সে-লজ্জার কথা বলব কি ভাই? বিলিতি চলন-বলন ধরণ-ধারণ এই-ই যে আমরা দেখে এসেছিলাম ছেলেবেলা থেকে। নাচের পার্টি রে, সালঁ রে, বল ডান্স রে, ডিনার, টেনিস, সুইমিং পুল রে—কী নয় রে? আর কারবার তো শুধু দিশি বিলাতফেরৎদের নিয়েই নয়, বাবা ছিলেন ডাকসাইটে ডাক্তার ব'লে তাঁর সারিয়ে-তোলা সাহেব-পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অনেকে আসত। তার উপর মা-ও ছিলেন দিলদরিয়া, hospitable par excellence, যাকে বলে। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে একটি annexe মতন ছিল—তাকে মা অতিথিশালা দাঁড় করালেন—ওদেশের নানা জাতের সাহেব এসে অতিথি হ'ত। বাবা চাইতেন—আমরা নানা জাতের সঙ্গে মিশে হিঁদুয়ানির শুচিবাই থেকে মুক্তি পাই। তাই আমাদের চার বোনকে গভর্নেস ফ্রেঞ্চও শিখিয়েছিলেন। আর ফ্রেঞ্চ বোলচালে আমি ছিলাম সবার শিরোমণি—মুখে আমার নানা ফ্রেঞ্চ বুলির খই ফুটত—ইংরাজির তো কথাই নেই। এ-হেন আমি দাদা, সেবার বিলেত থেকে ফিরে এসে থ হ'য়ে গেলাম দেখে যে, বাড়ীর হাওয়াও যেন বদলে গেছে। আর এ-বদলের মূলে কে তা কি আর বলার দরকার আছে?

অসিত : প্রেমল?

ললিতা : আর কে? দেখলাম আমাদের অতিথিশালায় সে বেশ কায়েমী হ'য়েই বসেছে। পড়ায় কলেজে দর্শন। সন্ধ্যায় আসর বসে বটে—কিন্তু পার্টি হয় ভজনের, নয় হরিকথার, নয় ওর প্রফেসর বন্ধুদের। তার তাদের সঙ্গে ওর আলোচনা হ'ত কী নিয়ে বলো তো?—বুদ্ধি যুক্তি তর্ক বড়—না বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম বড়?—ব্যক্তিত্ববাদ বড় না গুরুবাদ বড়?—নিয়তি সত্য, না পুরুষকার?—বিজ্ঞানের পথে কতদূর জানা যায় আর শ্রুতি স্মৃতি গীতা ভাগবতের পথে কী লাভ হয়—এইসব। আমার বড় অভিমান ছিল ফরাসী জানি ব'লে। ও চাল চালল ফ্রেঞ্চেই পাস্কাল আওড়ে, "Le coeur a ses raisons que la raison ne connait point......Il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison."*

---

* হৃদয় যে যুক্তি মেনে চলে, বুদ্ধি ও যুক্তি তার খবর রাখে না···বুদ্ধির যুক্তিবাদকে বাতিল করতে যাওয়ার মতন যুক্তিসঙ্গত কাজ আর কিছুই হ'তে পারে না।

(Pensées—Pascal)

অসিত : শুনে তোমার কী মনে হ'ত ?

ললিতা : বললাম না প্রথম দিকে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলাম ! এ যে আমার চেয়ে ঢের ভালো ফ্রেঞ্চ জানে ! ফলে যা হবার : মাথায় চ'ড়ে গেল বিষম রাগ—ঈর্ষা। কারণ দেখলাম মা-ও "তুলাল তুলাল" ক'রে অস্থির ! ওর নাম দিয়েছিলেন "প্রেমল" কিন্তু ডাকতেন ওকে "নন্দতুলাল" বা ছোট ক'রে "তুলাল"।

অসিত : তোমার মা-র কি রকম বদল দেখলে ?

ললিতা : সব বলতে গেলে "আধি রাত" পেরিয়ে ভোর রাত এসে যাবে। তাই সংক্ষেপেই বলতে হবে।

মা-র ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। গাজিপুরে তিনি পওহারি বাবার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে কুমারী পূজা করেছিলেন। এছাড়া নানা সাধু সন্ত তাঁর কাছে মাঝে মাঝেই আসতেন নানা আলোচনা করতে। এককথায়, মা-র চরিত্রের তুটো দিক ছিল : অন্দর-মহলে তিনি ছিলেন খাঁটি সেকেলে হিন্দু, কিন্তু সদরের সভায় তিনি ছিলেন ফ্যাশনেব্‌ল্‌ মেয়ে—আমার যোগ্য মা-ই বলব। বলতে কি, ফ্যাশনে আমার হাতেখড়ি হয় তাঁরই হাতে। ইংরিজি বলতে, ডিনার দিতে—to make a party go—ইঙ্গ-বঙ্গদের মধ্যে তাঁর জুড়ি ছিল না। আমি আর এককাঠি এগিয়ে শিখলাম ফরাসী বুকনি। মা বললেন খুশী হ'য়ে এই-ই তো চাই—মা-কী বেটী সিপাই কি ঘুড়ী···ইত্যাদি।

আমার দিদিদের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল মার আদরের তুলালের আবির্ভাবের আগেই। আমার দাদারাও যে যার কাজে ছড়িয়ে পড়েছিলেন—কলকাতা দিল্লী বম্বে কোচিন। বাড়ীতে কেবল আমিই একটিমাত্র তুলালী—মা-কী বেটী। কিন্তু হা অদৃষ্ট ! একেবারে নিভে গেলাম গা—কিনা ঐ এক নষ্টচন্দ্রের ঝলকানিতে ! মনে ধরল জ্বালা—সে কী জ্বলুনি ভাই, কী বলব ! মা যেন আমাকে ভুলেই গেলেন ঠিক যেমন মেয়েরা মা হ'লে পুতুল ছেলেমেয়েদের ভুলে যায়। এ একটুও বাড়ানো নয়।

কিন্তু তার পরে বাপীর নানা তর্কাতর্কির আসরে ওর কথা শুনতে শুনতে আমার মন একেবারে বদ্‌লে গেল। বলেছি—আমি শেষবার বিলেত গিয়ে পারিসে বিয়ে করি। বিয়ের পরে—মানে, কোনো কারণে—খুব অসুখী হ'য়ে

দেশে ফিরি। যখন ফিরেছিলাম কেমন যেন সবই মনে হ'ত ছায়াবাজি, কিন্তু মা খুশী হ'য়েই বললেন—ঠিক হয়েছে—বৈরাগ্যের ছোপ লেগেছে।

কিন্তু সংসার আর ভালো না লাগলেও বৈরাগ্য শব্দটার 'ব' উচ্চারণ করতেও আমার মন ভয়ে যেন কুঁকড়ে যেত। সর্বনাশ! শেষে কি আমি বিধবাদের মতন হরি হরি করব না কি—মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়ে! কল্পনা করতেও শিউরে উঠতাম—এ-ডেঞ্জার সিগ্‌নালে। ও বাবা! ওদিকে ঘেঁষা নয়।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল আমার নিজেকে নিয়েই। কই, পার্টি-টার্টিও তো আর ভালো লাগে না! এক আধদিন টেনিস খেলি বা সুইমিং পুলে সাঁতার দিই এর ওর তার সঙ্গে—অনেকদিনের অভ্যেস তো—যেমন ষ্টীম বন্ধ করলেও ট্রেন খানিকদূর পর্যন্ত চলে না?—অনেকটা সেইরকম। মানে, ঝোঁক আছে কিন্তু রোখ নেই—নৌকো আছে, কিন্তু না আছে দাঁড়, হাল, কি পাল। গুণ টেনে কতক্ষণ চলা যায় শুনি?

এই সময়ে চোখে পড়ল মা-র মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন! বলি নি—তাঁর মনের অন্দরমহলের হিন্দু গৃহিণীর কথা? এই সময়ে সে হ'ল প্রকাশ। দেখতাম এক বৃন্দাবনের বাবাজি প্রায়ই আসতেন তাঁর কাছে। কিছুদিন বাদে—ওমা, মা হঠাৎ শাড়ী ছেড়ে ধরলেন গেরুয়া! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুলালও হ্যাটকোট ছেড়ে ধরল আলখেল্লা। চম্‌কে উঠলাম শুনে যে, মা দীক্ষা নিয়েছেন বাবাজির কাছে, আর তাঁর আদুরে দুলালটি দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর কাছে।

অসিত: বৈষ্ণব দীক্ষা?

ললিতা: পরে শুনলাম তাই—যখন ঘরে হঠাৎ কৃষ্ণরাধার বিগ্রহ এনে মা বসালেন তাঁর পুজোর ঘরে।

অসিত: আর তোমার বাবা?

ললিতা: সে আর এক কাণ্ড! বাবা অনেক আগেই শক্তি-সাধনার দীক্ষা নিয়েছিলেন এক তান্ত্রিকের কাছে। কিন্তু সে কথা যাক—সব বলার সময়ও নেই। আর একদিন বলব না হয়। আজ বলি মা-র কথা—বিশেষ ক'রে তাঁর আদুরে দুলালটি যেমন ক'রে আমার গুরু হ'লেন।

মা-র ঠাকুরঘরে সচরাচর বাবা যেতেন না। কিন্তু মাকে তিনি শুধু যে ভালোবাসতেন তাই নয়, গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁর দীক্ষায় মত দিয়েছিলেন সানন্দেই। তাঁর নিজেরও তো মনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল আসন

প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা ক'রে—অমত হবেই বা কেন? বলতেন তিনি প্রায়ই—যার যে পথ তাকে সে পথে চলতেই হবে। ফলে বাড়ীর মধ্যে যেন দুটো আলাদা সাধনার মহল গ'ড়ে উঠল—মা বাসিন্দা হলেন বৈষ্ণব মহলের, বাবা তান্ত্রিক মহলের।

তখন আমার কী অবস্থা একবার ভাবো দাদা! অর্থাভাব নেই অবশ্য। বাইরে থেকে দেখতে সংসার চলছে ঠিক তেমনিই। অতিথিও আসে, মোটরও চড়ি, আসরও বসে, এমন কি টেনিসও খেলি মাঝে মাঝে। কিন্তু কোথায় যেন এক বাজিকর জাদু বোতাম টিপে দিয়েছে, যার ফলে সব ভেস্তে গেছে। দুধে এক ফোঁটা টক পড়লে যেমন দুধের স্বাদ থাকলেও রস থাকে না আর, খানিকটা তেমনি।

মন আমার অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। শেষে একদিন আমি বাবাকে গিয়ে সব খুলে বললাম। বাবা হেসে বললেন: "মা, তোর বৈরাগ্য এসেছে। খুবই শুভ লক্ষণ। তবে তোর পথ কী আমি বলতে পারব না—কারণ আমি তোর গুরু নই।" কী করি? মা-র কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলাম। কিন্তু মা-ও ধরা-ছোঁওয়া দিলেন না। বললেন ধৈর্য ধরতে। পরে শুনেছিলাম এই সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন কে আমার গুরু—কিন্তু আমার কাছে ভাঙেন নি।

তারপর সে অনেক কাণ্ড টানা-হেঁছড়া, আগুপাছু, ওঠাপড়া: কখনো বাপীকে মনে হয় চমৎকার, আবার তারপরেই যেন ধাঁধা লাগে, মনে হয়—বড় কঠিন ঠাঁই। তার বুদ্ধি চরিত্র কান্তি দেখে ভক্তি হয়, কিন্তু ভয়ও করে। এই সময়ে ঘটল একটি অঘটন—যাকে বলে miracle! কী অঘটন বলতে পারব না—তবে বাপী হয়ত বলবে যদি তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, সে কখন যে কী ক'রে বসে কেউ জানে না, মা বলতেন প্রায়ই।

আমি সত্যি হতভম্ব হ'য়ে গেলাম ভাই! হব না? ভাবো আমি কী ভাবে গ'ড়ে উঠেছি! মন একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। মা-কে গিয়ে বললাম ফের, কিন্তু যা দেখেছি তা ঠিক না বেঠিক সে সম্বন্ধে মা একটি কথাও বললেন না, শুধু বললেন বাপীকে গিয়ে বলতে।

আমার মন বেঁকে বসল। বাপীর কাছে যাওয়া ছেড়েই দিলাম। তারপর ঘটল আর এক অঘটন। দেখলাম এক স্বপ্ন! কী স্বপ্ন তা বলতে পারব না, কিন্তু পরদিন দেখলাম সে-স্বপ্নও ফলল ঠিক যেভাবে দেখেছিলাম।

অসিত (ক্ষুব্ধ): কিছুই যদি না বলতে পারো তবে এসব অঘটনের কোনো উল্লেখ না করলেই পারতে।

ললিতা (একটু ভেবে): ঠিক বলেছ দাদা। আচ্ছা, শোনো বলি এ-অঘটনটির কথা। স্বপ্ন তো অনেক সময়েই ফলে, কাজেই হয়ত তোমার বিশ্বাস করতে বাধবে না। অন্ততঃ আমাকে 'ম্যাড ক্যাপ' ভাববে না।

অসিত: আমি অঘটনকে ঠিক অবিশ্বাস করি না ললিতা, কি যাঁরা অঘটনের কথা বলেন তাঁদের 'ম্যাড ক্যাপ' উপাধিও দিই না। কারণ আমার জীবনেও কিছু অঘটন ঘটেছে। কেবল বুদ্ধি দিয়ে তার তল না পাওয়া পর্যন্ত ঠিক করেছি ও নিয়ে মিথ্যে মাথা বকাব না।

ললিতা: তোমার এ-কথায় আমার খুব সায় আছে ভাই! কারণ বাপীর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে বুঝতে পেরেছি কেন মানুষ অঘটনের নানা রটনাকে হয় গুজব নয় পাগলামি ব'লে বরখাস্ত করতে চায়! বাপী প্রায়ই পাস্কালের একটি মতের নজির দেয়, বলে—তিনি অত বড় বৈজ্ঞানিক হ'য়েও মিরাকল বিশ্বাস করতেন, কেন না তাঁর বুদ্ধি মনের কোঠা ছাড়িয়ে উঠেছিল ব'লে মনের উপরওয়ালা কোনো আলোর নাগাল পেয়েছিল। তাই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যা সাধারণ বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে পান না।

অসিত: কী দেখতে পেয়েছিলেন?

ললিতা: তাঁর নজরটি ছিল: "Il n'est pass possible de croire raisonnablement contre les miracles"*

কিন্তু একথার অর্থ সহজ হ'লেও যারা অঘটন চাক্ষুষ করে নি তাদের সংশয় কাটে না কিছুতেই। তারা নানা তর্ক ফাঁদে হয়কে নয় করতে—অর্থাৎ যা ঘটেছে তাকে ঘটে নি ব'লে উড়িয়ে দিতে!

কিন্তু আমার পক্ষে এ-রকম তর্ক তোলা অসম্ভব ছিল এইজন্যে যে, আমি স্বপ্নে যা দেখেছিলাম ফলল একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। অথচ ফলল যেন ঠিক উল্টো দিকে। কী হ'ল বলি তাহ'লেই এ হেঁয়ালি পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। স্বপ্নে দেখলাম বাপীর সঙ্গে মা তাঁর পূজোর ঘরে জপ করছেন বিগ্রহের সামনে

---

* অঘটন যে ঘটতে পারে এমন কথা বিশ্বাস না করাটাই অযৌক্তিক। (Pensées—Pascal)

এমন সময় মা হঠাৎ বাপীকে বললেন: "এখন ওর মনের বাধা কেটে গেছে, ওকে তুমি মন্ত্র দিতে পারো।"

ঘুম ভেঙে আমার মন আনন্দে ছেয়ে গেল। তখন ভোর সাড়ে চারটে। আমি উঠে পা টিপে টিপে গেলাম মা-র পূজোঘরের দিকে। সন্তর্পণে দোর খুলেই দেখি মা আর বাপী ধ্যানে বসেছেন। কিন্তু হবি তো হ, হঠাৎ আমার শাড়ীর আঁচল বেধে গেল দোরের হাতলে, আমি ছাড়াতে যেতেই শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মা ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন: "আয় রে মেয়ে। তোর লগ্ন এসেছে। দুলালকে আমি খানিক আগে বলছিলাম তোর মনের সব বাধা কেটে গেছে, এখন তোকে ও মন্ত্র দিতে পারে।"

একথা শোনবামাত্র আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। সে যে কী পুলক-শিহরণ কী বলব? আমি ছুটে এসে হুড়মুড় ক'রে বাপীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললাম: "আর কক্ষনো অবিশ্বাস করব না, কথা দিচ্ছি। তুমি আমাকে দীক্ষা দাও।" ব'লে বললাম আমার স্বপ্নের কথা। বাপী আমার মাথায় হাত রেখে বলল শুধু: "আচ্ছা।" অম্নি মা উঠে চ'লে গেলেন। আমি কেবলই কাঁদি আর কাঁদি—মানে, আনন্দের কান্না অবিশ্যি। সে যে কী আনন্দ—কী বলব দাদা!

বাপী একটি কথাও বলল না, শুধু মাথায় হাত দিয়ে ওর গুরুমন্ত্র জপ করতে লাগল খানিক বাদে আমি মাথা তুলতেই আমার মাথা ওর বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল আমার গুরুমন্ত্র।

সঙ্গে সঙ্গে ভাই, কী বলব তোমাকে আমার মেরুদণ্ডের তলা থেকে শির্ শির্ ক'রে একটা স্রোত উঠল—অসহ আনন্দের। একটু পরেই চোখের সামনে ফেটে পড়ল সে যে কী অপরূপ নীল আলো—আর সব যেন মিলিয়ে গ'লে গেল সে আলোয়। ...শুনলাম আকাশে বাতাসে বাজছে শুধু আনন্দের ঝঙ্কার গুরুমন্ত্রের ধুয়ায় ফিরে ফিরে।......

নীল আলোর কথা বলতে বলতে ললিতার কণ্ঠ অশ্রু-আবেগে প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে। শেষ কথাগুলির রেশ গানের মূর্ছনার মতন যেন আকাশে বাতাসে হারিয়ে যায়।

অসিতের মনে হয়: কী আশ্চর্য! ও ঠিক যখন তৃষিত হ'য়ে উঠেছিল শুনতে যা শুনলে সংশয় কাটে, ঠিক তা-ই যেন অমৃতের ঝঙ্কারে বেজে উঠল এক সুভাগিনীর আত্মকাহিনীর মাধ্যমে! ওর মনে বেজে উঠল ফের খৃষ্টের

অঙ্গীকার : "আকুল হ'য়ে চাইলে পাবেই পাবে।" মনে হ'ল হঠাৎ : কেন মিথ্যে ক্ষোভে অনুযোগ অভিযোগ করে মানুষ ? অমৃত কি কেউ সত্যি চায় ? চাইলে কি প্রাণপাত্র ভর্তি ক'রে রাখত সস্তা মদে ? মনে পড়ল স্বামী স্বয়মানন্দের একটি ভাগবতী বাণী :

প্রাণের পাত্র রাখি যদি রং লালসার মর্ত্য সুরায় ভ'রে,
শূন্য তাকে না করলে নাথ, স্বর্গসুধা ঢালবে কেমন ক'রে ?

ঘরের ঘড়িতে টুং টুং ক'রে বারোটা বাজল। অসিত চম্‌কে উঠে ললিতাকে বলল : "রাত হ'ল। কেবল আর একটা প্রশ্ন আছে।"

ললিতা : কী ?

অসিত : মন্দির গ'ড়ে উঠল কেমন ক'রে ?

ললিতা : মা দীক্ষা নেবার পরেই ঠিক করেছিলেন হিমালয়ে একটি মন্দির গ'ড়ে বাপীকে নিয়ে চ'লে যাবেন সাধনা করতে। বাবা তাঁর এক ধনী বন্ধুকে ভার দিয়েছিলেন আলমোরায় একটি মন্দির গড়তে। বন্ধুটি তাঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি নিজে গিয়ে আলমোরা থেকে ষোলো মাইল দূরে এক নির্জন বনস্থলীতে কয়েক বিঘা জমি কিনে মন্দির গ'ড়ে বাবার হাতে কয়েক লক্ষ টাকা দেন গুরুদক্ষিণা। বাবা সে টাকা মাকে দেন। মন্দিরের খরচ তার সুদ থেকে কুলিয়ে যেত। মাত্র আমরা চারজন তো !

অসিত : চারজন ?

ললিতা : ঐ দেখ, বলতে ভুলে গেছি : যখন আমরা লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আলমোরা যাই, তখন বাপীর এক বাল্যবন্ধু ছিল লক্ষ্ণৌয়ের হাসপাতালের ডাক্তার—নামকরা সার্জন। বাপীর টানেই এসেছিল লক্ষ্ণৌয়ে কাজ নিয়ে। বাপী আমাকে দীক্ষা দেবার পরে সেও দীক্ষা চায়। বাপী তাকে বলল, "আমি তোমার গুরু নই, মা-কে ধরো।" মা তাকে মন্ত্র দিতে রাজী হ'লে সে কয়েক মাস বাদে ডাক্তারি ছেড়ে আমাদের আশ্রমে আসে সাধনা করতে।

অসিত : কী নাম ?

ললিতা : পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সিডনি প্রেন্টিস। মা তাকে আশ্রমের নাম দিলেন—প্রণব। মা-র শরীর তখন খুবই খারাপ, প্রণব আসাতে সুবিধে হ'ল কম নয়। কারণ সে ছিল সত্যিই নিপুণ ডাক্তার। কিন্তু (হেসে) আমাদের এই সংসার ছাড়ার খবরে লক্ষ্ণৌয়ে একের পর এক শুভার্থীদের আক্রমণ

সুরু হ'ল। বাপীকে তারা নাম দিল ম্যাড, আমাকে সেণ্টিমেণ্টাল,মাকে—ক্র্যাঙ্ক। তাদের সবচেয়ে আপত্তি ফেঁপে উঠল ব্রিলিয়াণ্ট প্রফেসরের পাগলামির বিরুদ্ধে। ওকে তারা কত ক'রে বোঝালো যে, কয়েক বৎসর বাদে সে এমন কি য়ুনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলারও হ'তে পারে। ছাত্রদের কাছে সে ছিল "আইডল" যাকে বলে। এহেন বিদ্বান বুদ্ধিমান্ প্রিয়দর্শন পার্সনালিটি কি না এমন স্বর্ণসুযোগ হেলায় হারাবে এক ক্র্যাঙ্কের পরামর্শে। গুরু-ফুরু আবার কী? ও সব সেকেলিয়ানা চলবে না আর এ-বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক যুগে—ধর্মের ধামা বাজায় এখন কেবল অন্ধ গোঁড়া আর উন্মাদের দল···ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে আমার এক স্কচ সখীর পিতৃদেব—ওখানকার নামজাদা ম্যাজিষ্ট্রেট, আই-সি-এস্ আমাকে এসে ধরলেন বাপীকে বলতে যে, এমন পাগলামি না ক'রে থিতু হ'তে —অর্থাৎ আমার সখীকে বিবাহ ক'রে। এমন পরমাসুন্দরী কালচার্ড মেয়ে স্বয়ম্বরা হ'য়ে যার গলায় মালা দিতে উৎসুক সে-ভাগ্যবান কি না দ-য়ে মজবে এক ক্র্যাঙ্ক মহিলার ছলাকলায়! সখীও আমাকে কেঁদে ধরল: বাপীর জন্যেই সে লণ্ডন ছেড়ে লক্ষ্ণৌয়ে এসেছে—ছেলেবেলা থেকেই ওকে ভালোবাসত··· ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাপী শুনে হেসে বলল: সেইজন্যেই তো আমাকে আরো মহাপ্রস্থান করতে হচ্ছে!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের সব সুবুদ্ধি প্রফেসররাই না কি বলছেন যে, এর নাম Sheer madness!" এবার ও হো হো ক'রে হেসে উঠল, বলল: "The boot is on the other leg, madame! এক্ষেত্রে পাগল কে শুনি? যে-সওদাগর রঙিন ঝিনুক সিন্ধুকে পুরে নিজেকে রাজা ব'লে গোঁফে চাড়া দেয় সে, না যে ঝিনুক ছেড়ে মুক্তামণির ডুবারি হয় সে? তুমি প্রফেসরদের "সুবুদ্ধি" উপাধি দিলে ললিতা! করলে কী? এঁরা যদি সুবুদ্ধি হন তবে তো তেলাপোকাকেও পাখী বলতে হয়। সুবুদ্ধি? তুমি জানো কি—এঁরা দর্শনের ক্লাসে বড় বড় ধ্যানীর মিসটিকের দর্শন বাণীর সম্বন্ধে যখন ভাষ্য করেন, তখন সে-সব দর্শনের সত্যতা বা মর্ম নিয়ে কস্মিন্‌কালেও মাথা ঘামান না—শুধু 'নোট্‌স্' দিয়েই খালাস! ধ্যেৎ! তাঁরা ভুলেও ভাবেন না কখনো যে, এই সব দার্শনিক ধ্যানীর দর্শন বাণীর কাছ থেকে কিছু পথের পাথেয় পাবার আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। অমুক পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি,

ডি-লিট-কে জানো তো? তিনি একদিন উপনিষদে মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসার ভাষ্য করছিলেন: যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?'—সে-সব ধনরত্ন নিয়ে কী করব যার প্রসাদে অমৃত হ'তে না পারি? চমৎকার বললেন প্রফেসর, প্যারালাল প্যাসেজও দিলেন চুটিয়ে বাইবেল থেকে: 'What is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul?' বললেন জাঁকিয়েই: 'Man does not live by bread alone'—আরো কত সার সার অনবদ্য কথা— a string of jewelled sayings—কিন্তু ভাবো কি—তাঁর বছরে একবারও মনে হয় যে, দৈনন্দিন আচরণেও তাঁর সঞ্চয় ছেড়ে দানের দিকে ঝোঁকা উচিত? একবারও কি প্রশ্ন ওঠে তাঁর মনে: আত্মা বলতেই বা কী বোঝায় আর তার মঙ্গল মানেই বা ঠিক কী? ক্লাসে বেকন পড়াতে পড়াতে কী নিখুঁৎ গবেষণাই না করেন বোঝাতে——কেন বেকন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন:

'The world is a bubble and the life of man
Less than a span.'

কিন্তু ওঁর কখনো মনে হয় কি যে নিরন্তর তুচ্ছতার বেসাতি করতে করতে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়ই যায়—যে-কথা পাস্কাল বলেছেন একটি মোক্ষম ব্যঙ্গে: 'La sensibilité de l'homme aux petites choses et l'insensibilité pour les grandes choses marque d'un éntrange renversement."

পাস্কালের এ-ধরণের নানা সুন্দর বাণী, গভীর চিন্তা ও আমাকে অনুবাদ করতে বলত যাতে ক'রে তাঁর বৈরাগ্যের নানা অপূর্ব ঝঙ্কার আমার হৃদয়ের তারে রণিয়ে ওঠে। এ-বাণীটির আমি কী চমৎকার অনুবাদ করেছিলাম ছড়ায় শুনবে?

অসিত: ছড়ায় অনুবাদ করেছিলে সত্যিই?

ললিতা: তুমি কি ভাবো এ-বিষয়ে শুধু তুমিই একেশ্বর—আর কেউ পারে না? শোনো তবে পাস্কালের ফরাসী খেদ বাংলা ঘরোয়া ছন্দে মিলে (সুর করে)

মানুষের মতিগতি বিচিত্র, বিস্ময় লাগে ভাবিতে মনে:
নগণ্যদেরই নিয়ে মাতামাতি বরেণ্যদের বিস্মরণে।

আর শুধু পাস্কাল নয়, ও আমাকে নানা ফ্রেঞ্চ বই-ই পড়াত ধমক দিয়ে: "ফ্রেঞ্চ যখন শিখেইছ বাহাদুর বনতে চেয়ে, তখন সত্যি বাহাদুরি দেখাও মপাসাঁ ফ্লবেয়ার প্রমুখ শিল্পসৌখিনদের রেখে এমন সব বই প'ড়ে যাতে তোমার

সাধনার প্রেরণা মেলে। পড়ো মেটারলিঙ্কের Devant Dieu, Sagesse et Destinée, শার্দ্যাঁর Le Milieu Divin, Phénomène Humain. বারবার পড়ো পাস্কালের Pensées—যার তুলনা নেই। আর শুধু আমাকে উস্কে দেওয়াই নয়—দিনের পর দিন এই সব কঠিন বইয়ের পাঠ দিত আমার সাধনার উদ্দীপনা জাগাতে—ভাবতে পারো ?"

এগারো

ললিতা অসিতকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করবার আগে হেসে শুধু বলেছিল, "এত কথা গল্ গল্ ক'রে ব'লে ফেলে ভালো করতে গিয়ে মন্দ করলাম কি না কে জানে ? তবে তোমার আজকের গান শুনে বাপী প্রথম বলল : অসিতের গুরু আসতে না আসতে ওর সব সংশয় কেটে যাবেই যাবে।"

কিন্তু অসিতের মনের অন্ধকার আলো হ'য়ে উঠল কই ! ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল—শুধু শুনলে কি আর হয় ? কিছু দেখা চাই আর দেখা চাই সব আগে—অঘটন। নৈলে দিনের পর দিন শুধু থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়ের বিরস চাপে মনের কালো ঘুচতেই পারে না। অঘটনকে ছোট ক'রে দেখার যে-ফ্যাশন বুদ্ধিমন্ত ইদানীন্তনদের পেয়ে ব'সেছে সে-ফ্যাশন মুহূর্তে উবে যাবেই যাবে যদি তাঁরা সত্যি চাক্ষুষ করেন দৈবী করুণার অসম্ভবকে সম্ভব করা। পাস্কাল ঠিকই ধরেছেন মানুষ দিনের পর দিন কাটায় কেবল তুচ্ছতার ভারবাহী হ'য়ে। ফলে যে-কোনো গড়পড়তা বুদ্ধিমন্তকে শুধাও না কেন, দেখবে তার মন যেন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে মেনে নিয়ে যে, জীবনে এই তুচ্ছতার ছাড়া আর কোনো কিছুর বেসাতি করবার নেই। এই জন্যেই বুঝি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেছেন বড় গলা ক'রেই—

অদ্যাপিও নিত্যলীলা করে গৌররায়।
কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

ওর মন আরো খারাপ হ'য়ে যায় ভাবতে এই দুচারজন বিরল অধিকারীর কথা যাঁদের উপাধি "পরম ভাগবত"। কেন সবাই পাবে না এ-অধিকার ? যাঁর জন্যে আমাদের জন্ম কেন তাঁর সঙ্গেই সবচেয়ে কম পরিচয় ? কেন সে-পরিচয়ের

পথ এত দুর্গম? গুরুকরণ? কিন্তু গুরু তো শুনি কেবল ঐ ভাগ্যবান্‌দের দরবারেই হাজিরি দিতে আছেন: ললিতা, প্রেমল, শান্তিদেবী, মোহন মহারাজ, শ্যামঠাকুর···। তাহ'লে খতিয়ে উপনিষদের দুঃখবাদী শ্লোককেই মেনে নিতে হয় না কি যে, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—তিনি শুধু তাঁদেরই কাছে ধরা দেন যাদের তিনি ছুঁতে রাজী? কিন্তু এই দুচারজন অধিকারী কৃপাধন্য ছাড়া আর সবাই কি বানের জলে ভেসে এসেছে—বড় জোর কালে ভদ্রে একটু ছোঁবে মাত্র—ধরতে পারবে না শতায়ু হ'লেও?

ভাবতে ভাবতে ওর মনে নিরাশা এসে যায় ফের। বিষাদের গান গুণগুনিয়ে ওঠে ক্লান্ত মনে:

সবাই পেল তোমার প্রেমের প্রসাদ,
আমিই শুধু রইব চিরতৃষায়?
সবাই পেল দিশা পারের হে নাথ,
শুধু আমার মিলবে না কূল নিশায়?

সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য ব্যথামধুর শান্তি নামতে ঘুমিয়ে পড়ল শেষ রাতে। দেখল এক আশ্চর্য স্বপ্ন:

একটি সুন্দর মন্দির সমুদ্রের ধারে। ও প্রেমলের সঙ্গে চলেছে নৌকায় পাল তুলে। তটের কাছে এসেই বাতাস ফিরে গেল উল্টো ঝড়ে। হায় হায়, শেষটায় কূলে এসে ভরাডুবি! চেয়ে দেখে ওর আগের অনেকগুলি খেয়া তীরে পৌঁছে গেছে। ঝড় উঠতেই তারা ছুটে মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল। অসিত তাদের ডাকল আর্তস্বরে। কিন্তু উত্তর দিল শুধু ঝড়ের অট্টহাসি। যখন নৌকা প্রায় ডুবুডুবু তখন শুনল: "ভয় কি? সামনে চেয়ে দেখ!" চাইতে দেখে—কী আশ্চর্য: জলের উপরে একটি লোহার দীর্ঘ নল ভাসছে! অসিত প্রেমলকে বলল আশ্চর্য হ'য়ে: "জলে লোহা ভাসে?" প্রেমল বলল, "সমস্যা সমাধান পরে হবে, এখন প্রাণ বাঁচাও তো—ধরো চেপে।" অসিত চেপে ধরতেই নলটি ভেসে চলল গাছের গুঁড়ির মতন। দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছল তটে।

মহানন্দে অসিত ও প্রেমল মন্দিরে ছোটে। সবাই অবাক্ হ'য়ে প্রশ্ন করে, "কেমন করে এলে তোমরা? আমরা যে সবাই স্বচক্ষে দেখলাম নৌকা ডুবে যেতে! এ-ঝড়ে কি সাঁতার দিতে পারে কেউ?"

প্রেমল বলল হেসে : "আমরা সাঁতার দিয়ে অকূলে কূল পাই নি।"

"তবে ?"

অসিত ওদের বলতে যাবে এমন সময় প্রেমল হাত তুলে বারণ করল : "ওরা শুধু যে বিশ্বাস করবে না তাই নয়, মন্দিরের পুরুত ঢুকতে দেবেন না তোমাকে মিথ্যুক ব'লে দেগে দিয়ে।"

অসিতের ঘুম ভেঙে গেল। দিগন্তের কাছে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে। চোখে জল নিয়ে উঠে প্রণাম করে : তারা তো নয়—যেন তুফান-তারিণীর আশিস-চাহনি !

বারো

সকালে ললিতা প্রেমলকে দিল শুধু লেবুর শরবৎ ও একটি আম। আর তারা অসিতকে পরিবেষণ করল চা, ছুটি টোস্ট ও একটু পনীর। ডাক্তারবাবু তখনো ওঠেন নি।

চা খেতে খেতে অসিত হেসে বলল প্রেমলকে : "তোমার শিষ্যা গীতার কথা না মেনে অপাত্রকে ব'লে ফেলেছে তোমাদের সাধনার নানা গুহ্য কথা।"

প্রেমল (হেসে) : তোমাকে বলতে তো আপত্তি নয় ভাই, কেবল তুমি যে সবাইকে ডাক দাও শুনতে যারা চায় না শুনতে, ভয় পায় জানতে, দুঃখ পায় শাস্ত্রের কথা মানতে। এইজন্যেই গীতা বলেছে গুহ্য কথা গোপন রাখতে। ডিমক্রাসির পাঠ মিশ খায় না তো সাধুসন্তের বাণীর সঙ্গে।

অসিত (চায়ে চুমুক দিয়ে) : তুমি সময়ে সময়ে ভারি ভাবিয়ে দাও, সত্যি !

প্রেমল (ভুরু তুলে) : চৈতন্যদেবের ভাষায়—আগে কহ আর।

অসিত তখন বলল ওর স্বপ্নের কথা। ললিতা শুনে হাততালি দিয়ে বলল : "কী চমৎকার !"

তারা : তবু আপনি কেন ঘড়ি ঘড়ি মন খারাপ করেন দাদাজি ?

প্রেমল : কারণ ও যে ভাবে স্বপ্নে পাওয়া বাণী সবই ফ্রয়েড সাহেবের Subconscious-এর খেলা, কাজেই জাগরণে নামঞ্জুর।

অসিত : কী বিপদেই পড়েছি ! জীবনের হাজারো দুঃখ তাপ দ্বন্দ্ব গ্লানি কি স্বপ্নে পাওয়া বাণীতে কাটে, না কাটতে পারে কখনো ?

প্রেমল : তোমাকে নিয়েও কি কম বিপদ ? তুমি চাও সাত চিতে গোলোকধাম। আলো আসে একটু একটু ক'রেই—বিশেষ মনের ওপারের আলো। প্রথম দিকে—না, শুধু প্রথমদিকেই বা বলি কেন, অনেক দিন ধ'রেই এ-আলো আসে স্বপ্ন চেতনায়—অন্ততঃ সাধকদের ক্ষেত্রে। এ আমার কথা নয়—আমার গুরুর মুখে শুনেছি অগুন্তিবার। তোমার এই স্বপ্নটির মধ্যে দিয়ে ঠাকুর ভরসা দিতেই বাজিয়েছিলেন তাঁর বাঁশি, কিন্তু তুমি কান পাততে না চাইলে শুনতে পাবে কেন সে-বাণী ?

ললিতা : কী বাণী বাপী, বলো না লক্ষীটি !

প্রেমল : ওকেই জিজ্ঞাসা করো না।

অসিত : অমন কোরো না, আমি কি জানি এ-সব বাণী-ফাণীর গুহ্য তত্ত্ব, যে বলব ?

প্রেমল (ললিতাকে) : ঐঃ—শুনলে তো ? ঠাকুর ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, যে আলো চায় সে দিশা পায়—তবু ও বলবে ও কিছুই জানে না ! যে জেগে ঘুমোতে চায় তাকে জাগাবে কে বলো ?—এই যে আসুন, ডাক্তারবাবু ! (উঠে দাঁড়ায়)

ডাক্তারবাবু (লাঠি ধ'রে ঈষৎ খুঁড়িয়ে এসে নিজের চেয়ারে ব'সে) : আমি বলতে এলাম সাধুজি যে, আমি জেগে ঘুমোতে নারাজ তাই শুনতে—থুড়ি, শিখতে—এলাম। হ্যাঁ—ঢালো চা—কেবল টোস্ট নয় আজ। কাল পায়েসের পরে আর চলবে না এসব। শুধু এক পেয়ালা চা। (তারা চা ঢেলে দিতে) এবার বলুন সাধুজি। দাদাজির স্বপ্নের কথাটা কানে গেছে—কিন্তু ভাষ্য চাই বৈ কি—বিশেষ এ-যুগে।

প্রেমল : এ ঠিক কথা, ডাক্তারবাবু। কারণ শাশ্বত তত্ত্ব এক হ'লেও দেশ কাল পাত্রের পরিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভাষ্য টীকা ক্রমশঃ ফলাও ক'রে না তুললে যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হ'য়ে ওঠে। এ-বদলের নাম কেউ দেন সংস্কার—মানে reform, কেউ-দেন নবজন্ম renaissance—কেউ দেন পুনরুজ্জীবন—revival—কিন্তু যে-নামই দিন না কেন, মানুষ যুগে যুগে প্রতি সত্যকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রসে রসিয়ে, রঙে রঙিয়ে, রূপে ফলিয়ে

ভোগ করতে চাইবেই নিত্যনতুন ঢঙে। অসিতের স্বপ্নটি অতি চমৎকার। ওর মনে ক্রমাগত প্রশ্ন আসে—সাধনার ভালো কথা কেন সবাইকে বলতে নেই? তারই চমৎকার উত্তর মিলল—কেবল খৃষ্টের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—Those who have ears to hear let them hear.

ডাক্তারবাবু: কিন্তু এরই তো নাম অধিকারিবাদ।

প্রেমল: বাদ কথাটা আমার কর্ণশূল: গুরুবাদ, অদৃষ্টবাদ, শক্তিবাদ, অবতারবাদ···কারণ যে কোনো সত্যকে একটা বাদ-এর কাঠামোয় ফেলে লেবেল মারলেই তার অঙ্গহানি হয়! আমি বলব—অনধিকারী অধিকারীর মধ্যে যে তফাৎ আছে, এই বাণীটিই ঠাকুর ওকে শোনাতে চেয়েছিলেন স্বপ্নের ছদ্মবেশে আর তাই তো সাধুসন্তরা পই পই ক'রে মানা করেছেন অশ্রদ্ধাকে আমল দিতে। কারণ কেবল শ্রদ্ধার প্রসাদেই অন্তঃশ্রুতি খোলে, অন্তর্দৃষ্টি ফোটে। শুনুন বলি আজ আমার একটি সঙ্কট কাটার কথা। (হেসে) কাল ওর চৈতন্য স্তবের পরে আমার মুখও বুঝি খুলল বা। তাছাড়া এখানে তো বৈজ্ঞানিক "জনগণমন" নেই যে আমাকে মিথ্যুক ব'লে দেগে দিয়ে ঠাকুরের মন্দিরের প্রসাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে। এখানে যা বলছি সবাই শ্রদ্ধা নিয়েই শুনবে, অবিশ্বাসের জেরায় কেউ আমাকে নাকাল করতে কোমর বেঁধে আসবে না।

আমি প্রথম মহাযুদ্ধে ছিলাম বোমারু পাইলট। জর্মনিতে বোমা ফেলা ছিল আমার কাজ। পেট্রিয়টদের বাহবার লোভে তোড়জোড় বেঁধে আবাল-বৃদ্ধবনিতার মাথায় বোমা ফেলতে একটুও মন চাইত না, কিন্তু তখন আমার বয়স কম, একটু আধটু ভাবতে শিখলেও পথ খুঁজে পাই নি তো, তাই ভেসে চলতে হ'ত গড্ডালিকা-প্রবাহে। উপায় কি?

ভগবানের কৃপায় অঘটন ঘটে একথা পাস্কালের লেখায় পড়েছিলাম। পাস্কালের নানা বাণী আমার মন খুব বেশি টানত—কিন্তু কেন, ভেবে পেতাম না। কারণ আমি তাঁর মতন খৃষ্টভক্ত ছিলাম না। কিন্তু তাঁর একটি যুক্তি আমার মন নিয়েছিল। তিনি বলতেন মিথ্যাভিত্তি অঘটনই বেশি ঘটে ব'লে বলা চলে না যে, সত্যভিত্তি অঘটন ঘটে না। বলতে কি, সত্যি অঘটন ঘটে ব'লেই সাজানো অঘটন মিথ্যা ব'লে ধরা পড়ে। কেমন? ঐ পাস্কালেরই একটি উপমা দিই—ওষুধ। অনেক বাজে ওষুধেই অসুখ সারে না ব'লে কি বলবে—নেই নেই নেই এমন সত্যি ওষুধ যা অসুখ সারায়? না, বলবে—সত্যি ওষুধ আছে ব'লেই

আমরা অধম ডাক্তারের কাছে না গিয়ে উত্তম ডাক্তারের কাছে যাই? যা একেবারেই নেই, কোনো কালেই ছিল না, তাকে নিয়ে কেউ মাথা বকায় না। যা আছে কিন্তু বিরল, পথে ঘাটে মেলে না, তার জন্যেই মানুষ তৃষিত হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রে থাকে।* তাই পাস্কাল সেণ্ট অগষ্টীনের কথায় পুরোপুরি সায় দিয়েছেন উদ্ধৃত ক'রে :

—অর্থাৎ খৃষ্ট দৈবী অঘটন না ঘটালে আমি কখনই খৃষ্টান হ'তাম না।

(থেমে) কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি দুচারটে ছোটখাট অঘটন চাক্ষুষ করলেও কোনো বড়গোছের মিরাক্‌ল দেখি নি। বড়গোছের মিরাক্‌ল বলতে আমি বুঝছি এমন কোন অঘটন যা আত্মার মঙ্গল করে—ভগবানে ভক্তি বিশ্বাসের খোরাক জোগায়—যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, এজগতে নিষ্ঠুর নিয়তির প্রবল শক্তিকেও নাকচ করতে পারে পারে পারে ভাগবতী করুণা। মা এই সময়ে আমার আর একটা মস্ত উপকার করেন দেখিয়ে দিয়ে যে, অঘটন দুরকমের আছে : এক নেপথ্য শক্তিদের ঘটকালিতে ঘটা মিরাক্‌ল, আর এক ঐশী শক্তির ওরফে দৈবী করুণায় ঘটকালিতে ঘটা মিরাক্‌ল। আমি চাইতাম, এই দ্বিতীয় থাকের ভাগবতী মিরাক্‌ল চাক্ষুষ করতে, যাতে ক'রে আমাদের

* Si jamais il n'y eut eu rémède á aucun mal, et que tous les maux eussent été incurables, il est impossible que les hommes se fussent imaginé qu' ils en pourraient donner ; et encore plus que tant d'autres eussent donné croyance á ceux qui se fussent vantés d'en avolr......

Il en est de mê me des prophéties, des miracles, des divinations par les songes, des sortilèges etcetera. Car si de tout cel á il n'y avais jamais eu rien de véritable, on n'en aurait jamais cru : et ainsi, au lieu de conclure qu'il n'y a point de vrais miracles parce qu'il y en a tant de faux, il faut dire au contraire qu'il y a certainement de vrais miracles, puisqu'il y en a de faux, et qu'il n'y en a de vrais. Il faut raisonner de la meme sorte pour la religion : car il ne serait pas possible que les hommes se fussent imaginé tant de fausses religions, s'll n'y en avait une vèritable.

Blaise Pascal......Pensèes (Les miracles)

মনের একটা গভীর ক্ষোভ কাটে—না, শুধু ক্ষোভ কাটাই নয়, একটা আশ্বাসও পাওয়া যায়—এই আশ্বাস যে, গড়পড়তা মানুষ অসহায় হ'লেও সে সাধনার বলে সত্যি জীবন্মুক্ত হ'তে পারে।—আর যখন যে জীবন্মুক্ত পদবী পায় তখন সে আর নিয়তির হাতের খেলার পুতুল থাকে না ব'লে প্রকৃতির নানা অসংখ্য বিধান—laws—তাকে কিছুতেই আর পিষে মারতে পারে না—নিয়তির চাকার নিচে পড়লেও সে তার উর্ধ্বে উঠবার শক্তি পেতে পারে। কী? বেশি বকছি না তো?

অসিত: না না বলো—খুব ভাল লাগছে।

প্রেমল: এইরকম যখন আমার মানসিক অবস্থা—মনে বেশ ক'রে ছ'কে নাও তোমর, অর্থাৎ যখন একদিকে মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস টলমল ক'রে উঠেছে, অথচ অন্যদিকে ভগবানের কৃপারও কোন প্রত্যক্ষ অকাট্য আশ্বাস মিলছে না—তখন ঘটল যা আমি চাইছিলাম—যাকে বলতে পারি (মৃদু হেসে) প্রোলোগের পরে ড্রামা। শোনো।

তেরো

প্রেমল একটু থেমে শুরু করে:

সেদিনও উড়ে চলেছি রোজকার মতন—জর্মনদের ট্রেঞ্চের উপর বোমা ফেলতে। হঠাৎ দেখি—ডান দিকে পাঁচ ছটা বিমান। চোখের ভুল কি না বলতে পারি না—কিন্তু মনে সন্দেহ রইল না: এ তো আমাদেরই বিমান R.A.F. খুশী হ'য়ে ডানদিকে আমার বিমানের মুখ ঘোরাতে যাব হাতের চাকা ঘুরিয়ে—এমন সময় একটা জোরালো শক্তি আমার কব্জি ধ'রে ঘুরিয়ে দিল উল্টো—মানে বাঁদিকে!

আকাশে বিমান চলে হু হু ক'রে। তিন চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলাম নিজের এলাকায়। ঘাঁটিতে নামতেই এক পাইলট বলল, "কী কাণ্ড! হঠাৎ ডানদিকে এক ঝাঁক নতুন আকাশ গরুড় এসেছে জর্মনদের। তাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ভাবছিলাম—তোমার বিমান নিয়ে তুমি এখন ঘরের ছেলে ঘরে না ফিরলে কী হবে কে জানে?"

(একটু থেমে, ডাক্তারবাবুকে) বুঝলেন তো অবস্থা ? যদি সে-সময়ে এক প্রত্যক্ষ অথচ অদৃশ্য শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমার হাতের চাকা না জোর ক'রে ঘুরিয়ে দিত তো আমি শত্রুদের বিমানবাহিনীর মধ্যে প'ড়ে নিশ্চয়ই মারা যেতাম, কি বন্দী হ'তে হ'ত তাদের এলাকায়। সেই সময়ে প্রথম আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় ভগবানের কৃপায়। (হেসে) এ-কৃপা না থাকলে আজ এ-গল্প বলার কোনো লোক যে আপনার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে আসত না গেরুয়া প'রে—একথা জোর ক'রেই বলা যায়, নয় কি ?

অসিত : আমি তোমার এজাহার পুরো বিশ্বাস করছি প্রেমল। কেবল একটা প্রশ্ন করব তবু—যদি কিছু মনে না করো ?

প্রেমল : (হেসে) জানি—কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছ : এ-অঘটনের আর কোনো ব্যাখ্যা কোনোমতে দাঁড় করানো যায় কি না : যথা, ধরো, কোনো spasm জাতীয় কোনো শক্তি আমার কব্জিকে ঘুরিয়ে দেয় নি তো ? এই না ?

অসিত : (আশ্চর্য) তুমি তর্কের মতন টেলিপ্যাথিতেও পাকা না কি ?

প্রেমল : ঐ দেখ, কিন্তু এই সামান্য টেলিপ্যাথির অঘটনেরও কত রকম জটিল প্যাঁচালো ঘোরালো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমন্তেরা ! কেউ শূন্যে উঠেছে এ-এজাহার সবই বুজরুকি, অটোম্যাটিক লেখা বিলকুল ফক্কিকারি—এই সব। কিন্তু এ-জাতীয় occult phenomena অবিশ্বাস করলে তত যায় আসে না—(যদিও সত্যকে না-মানার প্রত্যবায় আছেই আছে)—যদি ভগবানের কৃপায় যে-অঘটন ঘটে তাকে অবিশ্বাস না করি। শোনো, খতিয়ে মোটামুটি দুরকম অঘটন আছে : আমাদের মধ্যে নানা নেপথ্য শক্তির অবতরণে যেসব অঘটন ঘটে—যেমন কোনো medium-এর মধ্যে দিয়ে। আর এক হ'ল ভগবানের বা গুরুর কৃপার অবতরণে পথের বাধা কাটাতে বা সাধনাকে এগিয়ে দিতে যেসব অঘটন ঘটে। এ-দুই জাতের অঘটনের বাহ্য রূপের মধ্যে অনেক সময় কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আসলে এদের ভাব ছন্দ লক্ষ্যের মধ্যে তফাৎ আসমান জমীন। আর সবচেয়ে বড় অঘটন এমন কি মানুষের কঠিন রোগ সারানোও নয়—যেমন অনেক যোগীরাই সারান সব দেশেই ; সবচেয়ে বড় অঘটন হ'ল—মানুষের মনের প্রাণের বদল—ওরফে তার প্রকৃতিকে স্বভাবকে ঢেলে সাজানো।

ডাক্তারবাবু: কিন্তু স্বভাবকে কি সত্যিই ঢেলে সাজানো যায়, সাধুজি? যে স্বভাবে তামসিক সে হাজার চেষ্টা করলেও সাত্ত্বিক হ'য়ে উঠতে পারে কি? গীতায় ঠাকুর কি বলেন নি: "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি?"

প্রেমল: এই কথাই যদি ঠাকুরের শেষ কথা হ'ত তাহ'লে তিনি কি এত ক'রে বোঝাতেন অর্জুনকে ক্লৈব্য ত্যাগ ক'রে বীর হ'তে, আলস্য ত্যাগ ক'রে যোগী হ'তে—"তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন!" অর্জুন স্বভাবে যে যোগী ছিলেন না তা কি আর বলতে হবে—পদে পদে যাঁর মনে সংশয় আসে, কৃষ্ণ বলেন এক, তিনি বোঝেন আর, এককথায় সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে ধনুর্বাণ ছেড়ে বলেন—আমি পারব না পাপিষ্ঠ কৌরবদেরও রক্তপাত করতে—ইত্যাদি? অবিশ্যি একথা মানি যে, স্বভাবের রূপান্তর কঠিন—শুধু কঠিন নয়, এর চেয়ে দুরূহ সাধনা, অদ্ভুত কীর্তি আর নেই ঠাকুরের সৃষ্টিলীলায়। কিন্তু তবু এই অসাধ্যসাধন করতেই যুগে যুগে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতনের পণ নেন নি কি? ইতিহাসে কি দেখতে পাই না—সাধনায় লম্পট হয়েছে নিষ্কাম, সংশয়ী—বিশ্বাসী, কৃপণ—উদার, দাম্ভিক—বিনয়ী? আর শুধু বরেণ্য মহাভাগদের জীবনেই তো এ-অঘটন ঘটে নি, হাজার হাজার গড়পড়তা সাধকও ভগবানের জন্যে সব ছেড়ে সাধু মহাত্মা হ'য়ে বহু আর্তকে আলো বল আশা দেন নি কি?

ডাক্তারবাবু: কিন্তু এ পেরেছেন তাঁরা কি সাধনার জোরে, না ঠাকুরের আকস্মিক কৃপায়?

প্রেমল: আকস্মিক বলছেন কেন ডাক্তারবাবু? সাধনা না ক'রে ঠাকুরের কৃপা কে কবে পেয়েছেন—দেখাতে পারেন কি একটিও দৃষ্টান্ত? ঝোঁকের মাথায় এক আধটা বড় কাজ করা, বিপদ বরণ করা, এমন কি প্রাণ দেওয়ার কথা বলছি না আমি। কিন্তু দিনে দিনে তিলে তিলে নিজের দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আত্মজয় করার সাধনা বিনা কি কেউ কোনোদিন ভগবৎ কৃপার পরশ পেয়েছে কোনো দেশে? যদি পেত তাহ'লে উপনিষদে গীতায় ভাগবতে সাধনার এত গুণগান রটত কি, না তপস্যা মান পেত? অতদূরে যাবারই বা দরকার কি ডাক্তারবাবু? আমি নিজে তো জানি—আমি কী ছিলাম, আর কী হয়েছি! ভগবানের কৃপার সঙ্গে লড়েছি কি কম? বার বার তাঁর নির্দেশ পেয়েছি গুরুর মুখে, তবু করেছি বিদ্রোহ। বার বার গুরুবলে প্রলোভন জয় করেছি,

তবু রোখ ক'রেই বলেছি—আমি নিজের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়াব—কৃপার কাছে হাত পাততে যাব কেন, গুরুর কথা নির্বিচারে মেনে নেব কেন? কিন্তু বার বার চোখের জলে হার মানা সত্ত্বেও ফের আবার প্রশ্রয় দিয়েছি শয়তানী অহমিকাকে, অন্ধ আত্মাদরকে। কিন্তু তবু ঠাকুরের কৃপা আমাকে ছেড়ে যায় নি, গুরুর প্রসাদ আমার প্রতিবিমুখ হয় নি—যার ফলে তিলে তিলে দিনে দিনে শুদ্ধিলাভ ক'রে আমি যা পেয়েছি তা আশার অতীত। এ-প্রত্যক্ষ পাওয়া সম্ভব হ'ত কি যদি আমার স্বভাবকে গুরুর কৃপা ঢেলে না সাজাতেন। (অসিতের দিকে ফিরে) না অসিত, জানি গুরুর কৃপাশক্তিকে তুমি এখনো সন্দেহের চোখে দেখ—ভাবো এসবের ভর অনিশ্চিত জনশ্রুতি। কিন্তু যেদিন গুরু তোমার হৃদয়ে তাঁর প্রেমের আসন পেতে তোমাকে ডাকবেন তাঁর করুণায় প্রসাদ পেতে সেদিন তুমি ধন্য হ'য়ে বলবেই বলবে মীরার নৈশ্চিত্যের সুরে :

সদ্‌গুরু গোবিন্দ এক সখীরী, জয় গুরু জয় গুরু গাও।
সদ্‌গুরু বিন গতি নহীঁ জগতমে, সদগুরু নাম ধিয়াও॥

অসিত (আতপ্ত সুরে): গুরু কী বস্তু না জানলে তাঁর কৃপাব খবর রাখা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে—অন্ততঃ আমার মতন অধন্য সংশয়ীর পক্ষে। এ-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা না ব'লে থাকতে পারছি না ভাই। আমি শ্যাম ঠাকুরের কাছেও শুনেছি গুরুর স্তব—যে-কোনো গুরুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব উপাধিই দেন তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। অনেকে তাঁকে অবতার ব'লেও ক্ষান্ত হন না বৈষ্ণবদের মতন "অবতারী অবতারী" ব'লে ঢাক পেটান। তুমি জানো, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমি কী গভীর ভক্তি করি। কিন্তু তাঁর এক শ্রদ্ধেয় শিষ্য আমাকে বলেছিলেন অকুণ্ঠেই যে, তিনি শুধু অবতারই নন অবতারকে গ'ড়ে তোলেন —যেমন king and king-maker. আমি তোমার গুরুদেবীকে জানি না। তবে ললিতাকে দেখে ও তোমাকে জেনে মনে হয়েছে—যিনি এমন মেয়ে তথা শিষ্যের প্রাণের প্রণামী পেয়েছেন তাঁকে সদ্‌গুরু বলা চলে। কিন্তু তুমি যদি আমার আর মুখদর্শনও না করো তা'হলেও তোমার মন রাখতে বলতে পারব না যে, তিনি অবতার, অবতারী বা অবতারকে গ'ড়ে তোলেন পটুয়ার মত।

প্রেমল: শোনো—শোনো—

অসিত: না, তুমিই আগে শোনো। আমার কাছে সত্যি অসহ্য মনে হয় এই গুরু বা ইষ্ট নিয়ে বাড়াবাড়ি—গোঁড়ামি। ইনি বললেন কৃষ্ণ ছাড়া গতি

নেই, উনি বললেন শিব ছাড়া ঠাকুর নেই, তিনি বললেন কালী ছাড়া তারিণী নেই—আরো উৎসাহী যাঁরা—যাঁদের নাম শুনি "পরম ভাগবত"—বলেন সদম্ভে : "আমার গুরুর মতন অবতারী বা অবতার-নির্মাতা কখনো ছিল না আর কখনো হবে না।" ভাই, কিছু মনে কোরো না, তুমি এসেছ ওদেশ থেকে, তাই আমাদের মধ্যে অনেক গলদই তোমার চোখে পড়ে নি। আমাদের এক ঘরোয়া প্রবচন আছে : যার সঙ্গে ঘর করি নি সে বড় ঘরণী। এর মানে—যাকে দূর থেকে দেখা যায় তাকে মনে হয় নিখুঁত কিন্তু কাছে যেতে না যেতে মনে হয়—অন্ততঃ অনেক সময়েই—"ও বাবা, কার সঙ্গে ঘর করতে এসেছি? কাজ নেই।" আমাদের দেশে হাটে ঘাটে মাঠে অলিতে গলিতে গুরুকে নিয়ে নাচানাচি করতে করতে ভক্তদের দশা হয়, তাঁরা দেখেন প্রত্যক্ষ যে শুধু তাঁদের গুরুই এসেছেন জগদ্‌গুরু কি কলির কল্কি হ'য়ে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার ভক্তিশ্রদ্ধায় আমি সত্যিই মুগ্ধ হই, কিন্তু আমাদের দেশের বহু গুরুর মধ্যে যে-তামসিকতা নীচতা, মিথ্যাচার কাপুরুষতা, holier-than-thou ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে উঠতে বসতে, তাতে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি সময়ে সময়ে। খাঁটি ভক্তির আবেগ আমার কাছে কোন দিনই দূষ্য মনে হয় নি, কিন্তু অতিভক্তির গোঁড়ামি আমার চক্ষুশূল তা সে ইষ্টকে নিয়েই হোক বা গুরুকে নিয়েই হোক। গুরুর পায়ে দাসখত লিখে দিতে ভয় করে আমার নানা কারণেই, সেসব কারণকে আমি হয়ত একটু বেশি বড় ক'রে দেখছি আজ, হয়ত পরে কোনদিন বুঝব যে, আমার নানা আশঙ্কাই ছিল ভিত্তিহীন। কিন্তু যে-মহাপুরুষকে দেখে আমার মন সাড়া দেয় নি, মনে হয়েছে গতানুগতিক মামুলি ভড়ং—অকূলে কূল পাবার জন্যে তাঁর হাতে আমার মনের প্রাণের হাল সঁপে দিয়ে শুধু তাঁর হুকুমবরদার হ'য়ে কৃতাঞ্জলি তালে দাঁড় বেয়ে অশ্রুমতী রাগিণীতে গান গাইব না কিছুতেই :

"হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার।"

প্রেমল : তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ ভাই, তাই যেন আমার মুখে চাপিয়ে দিলে যা আমি শুধু যে কোনোদিনই বলি নি তাই নয়, বলবার কথা ভাবতেও পারি না। তোমাকে সেদিনও বলেছি—তোমার মনে থাকতে পারে যে, গুরুকে ঠাকুরের প্রতিনিধি মেনে তাঁর শরণ চাওয়া উচিত হ'লেও তাঁকে অবতার বা জগদ্‌গুরু ব'লে হুঙ্কার করা অনুচিত ব'লে আমি মনে করি। তাছাড়া

অতিভক্তির নাচানাচিকে বাড়াবাড়ি নাম না দেবে কে? আর বাড়াবাড়ি মানেই তো নিন্দনীয়, বর্জনীয়। স্ত্রীকে ভালোবাসা উচিত হ'লেও যে স্ত্রৈণ হ'তে হবে, কানা ছেলেকে স্নেহ করলেও যে তাকে পদ্মলোচন নাম দিতে হবে, বাপ মাকে মান্য করলেও যে তাঁদের কথায় তিনটে বিয়ে করতে হবে, কি শ্বশুরকে সর্বস্বান্ত ক'রে পণ আদায় করতে হবে—একথা কি কেউ বলে, না বললেও লোকে বাহবা দেয় আদর্শ স্বামী, মা বা ছেলে ব'লে? কেবল গুরুর যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা ঠিক এত সহজ নয়।

অসিত: কেন নয় শুনি—যদি দেখি তিনিও অন্ধ, বাড়িয়ে বলেন, হুকুম করতে ভালোবাসেন হাকিম হ'তে চেয়ে—তাহ'লেও কি তাঁকে গড় করতে হবে?

প্রেমল (হেসে): কিন্তু যে এমন মিথ্যুক, অজ্ঞান, দাম্ভিক তাকে কি কোনো সত্য জিজ্ঞাসু গড় করতে পারে?—

অসিত: বাঃ! করে না কি? তুমি চলো আমার সঙ্গে বাংলাদেশে আমি নিয়ে যাবো তোমাকে অন্ততঃ এক ডজন এমন ধনুর্ধর গুরুর আশ্রমে যেখানে শিষ্যরা সার সার গড় করে দিনের পর দিন।

প্রেমল: বাংলাদেশে যেতে হবে না ভাই এমন গুরু অন্যত্রও আমারও চোখে পড়েছে। কিন্তু তুমি একটি কথা ভুলে যাচ্ছ: আমি গুণগান করেছি সদ্‌গুরুর, বদ্‌গুরুর নয়। পাস্কালের উক্তিটি মনে করিয়ে দিই ফের। বুজরুকি আছে ব'লে যেমন সত্যি বিভূতি নেই এমন কথা প্রমাণ হয় না, আচারের ব্যভিচার হয় ব'লে যেমন সদাচারের মহিমা নামঞ্জুর হয় না, ঠিক তেমনি বদ্‌গুরু যত্র তত্র মেলে ব'লেই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, সদ্‌গুরুও আকাশকুসুম। তুমি যে-সব গুরুদের তামসিক ব'লে তাঁদের অপদস্থ করতে চাইলে, তাঁরা বদ্‌গুরু ব'লেই তাঁদের বিধতে পারলে, সদ্‌গুরু হ'লে তাঁদের শক্ত সাঁজোয়ায় লেগে ঠিকরে পড়ত তোমার মর্মভেদী বাণ।

অসিত: কিন্তু যদি দেখি অনেক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ সমাজস্তম্ভরাও তাঁদের নিয়ে নাচানাচি করছেন, তা হ'লে কী ক'রে জানব—তাঁরা সদ্‌গুরু না বদ্‌গুরু?

প্রেমল: যদি ধ'রেও নিই যে বদ্‌গুরু থেকে সদ্‌গুরুকে তফাৎ করা কঠিন, তাহ'লেও প্রমাণ হয় না সদ্‌গুরু নাস্তি। কোন্ সাপের বিষ আছে আর কার নেই বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও বিষধর সাপের অস্তিত্ব নামঞ্জুর হয় না। আর কেন হয় না বলবে?

অসিত : কেন হয় না ? বাঃ ! বিষধর সাপে কেটে বহু লোকই মারা গেছে ব'লে।

প্রেমল : অবিকল। ঠিক তেমনি বদ্‌গুরুকে বহু অন্ধ অজ্ঞ সদ্‌গুরু ব'লে ঠিকে ভুল করলেও এমন বহু মহাপুরুষ শিষ্য দেখা গেছে যাঁরা সদ্‌গুরুর ছোঁওয়াতেই ফুলের মতন ফুটে উঠেছেন, নির্দিশায় দিশা পেয়েছেন, নিরাশায় শক্তি পেয়েছেন। তর্কে জিৎবার জন্যে বলছি না একথা—তুমি জানোই জানো। না জানলে মানতে না স্বামী বিবেকানন্দ বহু জিজ্ঞাসুর দিশারি হ'তে পেরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিশা তথা গুরুশক্তি পেয়েই। বিশেষ ক'রে এ-পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহু মহাসাধক মহাজনকে দেখিয়ে দিয়ে জোর ক'রেই বলা যায় যে, তাঁরা বদ্‌গুরুকে সদ্‌গুরু ব'লে ভুল করেন নি, করলে কখনই কৃতকৃত্য হ'তে পারতেন না। শ্রীচৈতন্যের কত শিষ্যই এযুগেও অঙ্গীকার করেছেন বলো তো—যে, তাঁদের জীবনের মোড় ফিরে গেছে সেই মহাপুরুষের ছোঁওয়ায় ? প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, মহাযোগী কাঠিয়াবাবা, মহানুভব সন্তদাস বাবাজি, পরার্থব্রতী সাঁইবাবা, হরিনামে-পাগল হরনাথ—আরো কত মহাতান্ত্রিক মহাবৈষ্ণব সাধুসন্তেরই ছবির সামনে আজো সাধকেরা পূজো করেন, তাঁদের বাণী থেকে বল পান, প্রেরণা পান—তাঁদের ধ্যান ক'রে অশান্তি কাটিয়ে শান্তির আভাষ পান, বলো তো ? আসলে তোমার ভুল হচ্ছে কোথায় জানো ? তুমি ধ'রে নিচ্ছ যে, কোনো নামজাদা বদ্‌গুরুর অঢেল চেলা জুটলেই বা মান্যগণ্য শিষ্যের সার্টিফিকেট থাকলেই তিনি রাতারাতি সদ্‌গুরু পদবী পেয়ে জেঁকে বসতে পারেন। আমি বলছি—না পারেন না। দুদিন একে ওকে তাকে তিনি ধোঁকা দিতে পারেন, কিন্তু মেকি বেশিদিন সাঁচ্চার মুখোস প'রে আত্মগোপন করতে পারে না। তেলাপোকার পাখা থাকলেও সে নিজেকে পাখী ব'লে চালাতে পারে না, বেড়াল বাঘের মাসী হ'লেও বাঘের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে না।

অসিত : কিন্তু তুমিও ভুলে যাচ্ছ না কি যে, এইসব নামজাদা বদ্‌গুরু সদ্‌গুরুর সনদ পেয়ে অনেককে বিপথে টানতে পারেন, এবং টেনেও থাকেন ?

প্রেমল : অনেক মানে কারা ? যারা কৌতূহলী হুজুগে স্বভাবে ধামাধরা তোমার ভাষায়—তামসিক, গতানুগতিক। এরা গিল্টিকে সোনা ভাবে সোনা চায় ব'লে নয়, চকচক করছে দেখলেই খুশী হয়ে যায় ব'লে। আমার

বলবার উদ্দেশ্য—যারা সত্যি স্বর্ণ-জিজ্ঞাসু কোনো দেশধ্বজ, বেশধ্বজ, কেশধ্বজ, বজ্রধ্বজই সনদের জাল জৌলুসে তাদের ভোলাতে পারেন না, বড় জোর একটু চম্‌কে দিতে পারেন প্রথমটায়। কিন্তু খাঁটি জিজ্ঞাসু যারা তারা তুদিন ভুললেও তিন দিনের দিন মুখোসকে মুখোস ব'লে চিনতে পারেই পারে।

অসিত: পারে কি সত্যি? আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি অনেকেই পারে না।

প্রেমল: তারা খাঁটি জিজ্ঞাসু নয়। মানে তারা হয়ত চায় একটু আধটু যোগবিভূতি দেখতে, কি মিথ্যে ভেল্কি দেখে চম্‌কে উঠে বাহবা দিতে—ব্যস্। যারা সত্যি পরমার্থ চায় তারা এসব নিরর্থক জাঁকজমককে অনর্থ ব'লে চিনে তুদিন বাদেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে মোহ কাটিয়ে। আর এ-মোহ কাটে কেন জানো? কারণ সদ্‌গুরু খোদ ঠাকুরের কাছ থেকে চাপরাশ পেয়ে থাকেন। যে এ-চাপরাশ পায় নি তার বুজরুকি তুকতাকে ভেল্কিবাজি তুদিনেই ফাঁশ হ'য়ে হাঁকডাক মিইয়ে আসে—মানে খাঁটি সত্যকামদের কানে। খৃষ্টের এ-কথার মার নেই অসিত যে, যে সত্যি চায় সে পায়ই পায়। আর পায় এইজন্যেই যে, ভগবানের জন্যে যার প্রাণে সত্যিকার তৃষ্ণা জেগেছে তার তৃষ্ণা ঠাকুর না মিটিয়েই পারেন না। না, শুধ্ তৃষ্ণা মেটানোই নয়, তার ভারও ঠাকুর নেনই নেন—একথা গীতায় ভাগবতে বলেন নি কি তিনি বারবারই?

অসিত: (খুশী হ'য়ে) একথা আমিও মানতে রাজী। কিন্তু তাহ'লে গুরুর কী দরকার শুনি? খোদ রাজাবাহাতুর যার খোরপোষের ব্যবস্থা করছেন সে তাঁর খাজাঞ্চির দ্বারস্থ হবে কেন?

প্রেমল: খাজাঞ্চির উপমা দিয়ে পাকে পড়লে বন্ধু! কারণ রাজাবাহাতুর তাঁর টাঁকশালের টাকা নিজে হাতে এসে দান খয়রাৎ করেন না। সে-কাজের জন্যেই তাঁকে খাজাঞ্চিকে বাহাল করতে হয়। কিন্তু তোমার উপমাটা ভুল হ'লেও প্রশ্নটা মঞ্জুর করতে আমি নারাজ নই।

অসিত: আর একটু খুলে বলবে?

প্রেমল: আসল কথাটা কী জানো ভাই? জীবের শিবের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হ'তে পারে না যদি সে শিবের কৃপার জন্যে ষোলো আনা ব্যাকুল না হয়। কেবল মুস্কিল এই যে, ষোলো আনা ব্যাকুলতাও আসে তখনই যখন আমরা

শিবকে মনে প্রাণে ভালোবাসতে শিখি—নৈলে নয়। অর্থাৎ, গুরুর কথা মেনে *নিয়ে গুরুকে ভালোবেসে শিবপ্রেমের দীক্ষা চাইলে* তবেই আশ মেটে, আর মেটে এইজন্যেই যে, গুরুকে—মানে সদ্‌গুরুকে—শিব পাঠান জীবের পথ সাফ করতে, তাকে বল দিতে, দেখিয়ে দিতে—কোন্‌টা পথ, কোন্‌টা বিপথ, আর পথের বাধা দূর করার উপায় কী। এ শুধু যুক্তির ওকালতি নয়। কারণ গুরু দিশারি পদবী পান কোনো সুখ-সুবিধার যুক্তিতে নয়—পান এই জন্যে যে, তিনি আগে ইষ্টের কৃপা পেয়ে তবে সে-কৃপার প্রসাদ বিতরণ করবার অধিকারী হয়েছেন।

(থেমে ঈষৎ হেসে) তাই, এই সব কারণেই গুরুর হুকুম তামিল ক'রে মানুষ অধন্য হুকুমবরদার ব'নে যায় না—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে নিজেও বরেণ্য গুরু ওরফে উদার হাকিম হ'য়ে উঠতে পারে। একে বলা হয় গুহ্য তত্ত্ব—mystic truth. কিন্তু এ-সত্যের নাগাল পেতে হ'লে যুক্তি বিশেষ কাজে আসে না। তার জন্যে চাই বিশ্বাস, নিষ্ঠা, দীনতা ও আন্তরিকতা। নৈলে বড় জোর শাস্ত্রী হওয়া যেতে পারে কিন্তু সাধনার তীর্থপথে চ'লে পরাভক্তি লাভ ক'রে ঠাকুরের লীলাসাথী হওয়া যায় না। (তারার দিকে চেয়ে হেসে) কী বলো দিদি?

তারা : আমি এসব গুহ্য তত্ত্বের কিছুই জানি না দাদা, কেবল জানি যে, আপনি যে আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাতে ধন্য হয়েছি। (চোখের জল মুছে) আমাকে আশীর্বাদ করুন দাদা যেন আমার ভক্তি হয় গুরুর পায়ে।

প্রেমল : (অসিতকে) দেখলে তো ভাই, বিশ্বাস এলো কত সহজে—অজানা অচেনা বিদেশীকে শুধু যে আপন ক'রে নিতে পারা যায় তাই নয়, তাকে প্রণাম ক'রে তার কাছে গুরুভক্তির দীক্ষা চাইতে পারা যায় সরল দীনতায়, চোখের জলে। (তারাকে) কাছে এসো দিদি, তোমাকে আশীর্বাদ করার আমি অধিকারী নই, সে তোমার গুরু করবেন। তবে প্রার্থনা করতে পারি—যেন আমার গুরুর মধ্যে আমি যা দেখেছি তুমিও তোমার গুরুর মধ্যে তাই দেখতে পাও। কারণ এই দেখাই হ'ল সবচেয়ে বড় দেখা। আর এ আমার গাজোয়ারি গুরুগুণগান নয় দিদি, উপনিষদের কথা—যাকে কাটা যায় না :

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

দিদি, লোকে কথায় কথায় ভগবানকে দোষ দেয়—তিনি কেন আমাদের বুঝিয়ে সব কিছু জলের ম'ত সাফ ক'রে দেন না। অসিত প্রায়ই অনুযোগ করে—কেন ভগবান্ গুরুরূপী পূজারী ছাড়া আর কারুর হাতেই দেন না তাঁর প্রেমের আনন্দমন্দিরের চাবি। কিন্তু যে সত্যি এ-প্রশ্নের উত্তর চায় নম্র জিজ্ঞাসু হ'য়ে, সে দেখতে পায়ই পায় তার আন্তরিকতার আলোয় যে, মুনি ঋষিরা নানাভাবেই এই কথাটা বুঝিয়ে বলেছেন যে, সহজ সরল ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘে যে ইষ্ট আর তাঁর প্রতিভূ গুরুকে বরণ করে সে-ধন্যজিজ্ঞাসুর মনের আয়নায়ই শাস্ত্রের নানা গভীর বাণী ও গুহ্য তত্ত্ব আপনা থেকে ঝল্‌কে ওঠে। এই-ই হ'ল উপনিষদের এ-বিখ্যাত ও গভীর শ্লোকটির নিহিতার্থ। আর এ-ভাব যেমন গভীর তেমন প্রাণকাড়া দিদি!

ডাক্তারবাবু (নম্র স্বরে): একথা মানতে তো বাধে না সাধুজি। গোল বাধে—খতিয়ে ভক্তি আসে না ব'লেই। তাই গুরুবরণও সত্য হয় না—আপ্তবাক্যও থেকে যায় পুঁথিপাঠ—booklore।

প্রেমল: একথা সত্যি, ডাক্তারবাবু। আর সেই জন্যেই তো গীতায় ঠাকুর বলেছেন যে জানতে হ'লে সব আগে গুরু বা তত্ত্বদর্শীর কাছে নত হ'তে হয়, তারপর জিজ্ঞাসু; শেষে সেবক হ'তে। এ তিনটি ধাপের পর্যায় একটু একটু ক'রে উঁচু দিকে নিয়ে যায়। শেষ ধাপটি সেবা বলা হ'ল কারণ সেবা করতে করতেই ভালোবাসা আসে, গুরুভক্তি আসে। আর গুরুভক্তি না এলে গুরুশক্তি কিছুতেই শিষ্যকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে পারে না। (অসিতকে) আর তোমার অভিযোগেরও উত্তর এইখানেই মিলবে ভাই: যে, ভগবান্ বর দিতে এলেও মানুষ তাঁকে ফিরিয়ে দেয় যদি তিনি বলেন বর পেতে হ'লে সব আগে অহঙ্কারকে দাবিয়ে চোখের জলে চাইতে হবে তাঁর কৃপা। তুমিইতো কাল গাইছিলে মনে নেই:

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

কেবল মুস্কিল কি জানো? চোখের জলের সঙ্গতে হৃদয়ে ডাক বেজে না উঠলে তাঁর চরণধুলার তলে মাথা নিচু করার ইচ্ছাই হয় না। নাস্তিক বা গুরুবিমুখদের বিদ্রোহের মূলে আছে এই অহঙ্কার যে, আমি আগে জানব

তবে মানব। কিন্তু সাংসারিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্থীর মুখে একথা শোভা পেলেও অধ্যাত্মজ্ঞানার্থীর মুখে একথা সাজে না। কারণ তার কাছে সূত্রটি উল্টে যায়: অর্থাৎ আগে মানলে তবেই জানা যায় গুরুতত্ত্ব—ভগবৎ-তত্ত্ব। কেন ঠাকুর এ-ব্যবস্থা করেছেন সে নিয়ে রাগারাগি তর্কাতর্কি ক'রে লাভ নেই, যাঁরা চিনেছেন জেনেছেন দেখেছেন তাঁদের কাছেই চাইতে হবে—কী কী চিহ্ন দেখে চিনব, কেমন ক'রে জানব, দিব্যদৃষ্টি পাবার উপায় কী —যার বরে দেখা যায় যে, গুরু ভগবানের প্রতিনিধি হ'য়ে আসেন ব'লেই তাঁর কথায় যুগের বন্ধন কাটে, চোখের ঠুলি খ'সে পড়ে, অন্তরের ঘুমন্ত শক্তিরা সব জেগে ওঠে। উপনিষদে তাই বলেছে—সব আগে জানতে হবে এই কথাটি যে, আমি জানি না। কারণ এ-অজ্ঞানের খবর পেলে তবেই সত্যিকার জ্ঞানের ভিৎ গাঁথা যায়। যে জাঁক করে 'আমি জানি' সে জানতে পারে না জ্ঞান বলতে কী বোঝায়, তাই সে অজ্ঞানের চোরাবালির 'পরেই তার নিশ্চিত ধারণার ইমারৎ খাড়া করতে চায়। ফল কী হয় দেখতেই তো পাচ্ছ—জগতের তথাকথিত জ্ঞানীদের 'জ্ঞানগর্ভ' বুলি শুনে—যারা সদর্পে মাথা তুলছে শুধু ধ্বসে পড়তে।

অসিত (খুশী): এই তো ভাই, তোমার মুখে খই ফুটেছে ভালো ভালো কথার। আমরা সবাই শুনতেও তো চাই এইসব জ্ঞানের কথাই, যে দেখিয়ে দিতে পারে অজ্ঞানের নিজমূর্তিকে। কিন্তু তুমি চাবি দিয়ে মৌনীবাবা হ'য়ে ব'সে থাকো—এইজন্যেই তো খেদ করি। পথের খবর পেয়েও বিপথকে বিপথ ব'লে চিনিয়ে দাও না কেন নিজের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির খবর দিয়ে?

প্রেমল (হেসে কপাল চাপড়ে) কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলম্ রে ভাই! সেধে গুরুবরণ করার পরেও গুরুর বারণ না মেনে করি কি বলো? তিনি যে পই পই ক'রে মানা করেন এসব 'ভালো ভালো কথার' ফুলঝুরি যার তার কাছে না কাটতে। কাটলে যে উল্টো উৎপত্তিই হয় বেশি—দেখতে পাও না কি? ইদানীন্তনেরা এসব কথা শুনে হয় আমাদের মিথ্যুক নাম দিয়ে বরখাস্ত করে, না হয় ভ্রান্তদর্শী ব'লে হাসাহাসি করে—সত্যদর্শনকে কল্পনাবিলাস নাম দিয়ে। দেবে না? যার সুরের কান নেই সে কি সঙ্গীতের মর্ম বোঝে? পেটুককে যদি বলো—ঠেসে খাওয়ার চেয়ে ধ্যান ক'রে ঢের বেশি নিবিড় ও স্থায়ী আনন্দ পাওয়া যায়—সে কি তোমাকে পাগল ব'লে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে পারে?

তারা : কিন্তু তাই ব'লে দাদা, আপনারা যদি আপনাদের ধ্যানজ্ঞানের কথা কিছুই না বলেন, তাহ'লে আমরা জানতে পারব কেমন ক'রে—কার এজাহার মেনে ?

প্রেমল : দিদি, জানা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে খবর পাওয়া বা খবর রাখা। কিন্তু ভগবৎতত্ত্ব তো তথ্য নয় যে, রিপোর্ট পড়লেই রাতারাতি তত্ত্বদর্শী হওয়া যাবে ? চেতনার একটা বিশেষ স্তরে উঠলে তবেই সে-স্তরের সত্য আলো হ'য়ে মনের সব কালোকে ঘুচিয়ে দেয়। এই দেখ না, আমি যদি তোমাকে বলি গুরুকে সেবা করলে সে-সেবা ইষ্ট গ্রহণ করেন তুমি কি সত্যি কিছু বুঝবে, না তোমার সংশয়গ্রন্থি একটুও আলগা হবে ? যে গুরুকে কখনো ভালোবাসে নি তাকে কী বোঝানো যায়—প্রেমের টানে কীভাবে গুরুকে সব দিয়ে ফকির হ'য়েও মানুষ আমীর বনতে পারে ? শোনো দিদি, আমার একটা ঠেকে শেখা অভিজ্ঞতা।

তোমাদের বলেছি আমার পাইলট হ'য়ে অঘটনের অভিজ্ঞতা। সেই থেকে আমার মনে কে যেন বলত যে, আমরা মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে যা যা দেখছি তার ওপারের খবর কিছু না পেলে অন্ধকারে ঘুরে মরাই সার হবে—আর এই জিজ্ঞাসা জাগাতেই অঘটনটি ঘটিয়েছে তাঁর করুণা।

তারপর আমি কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়া সুরু করলাম নানা দর্শন। দর্শনে ডিগ্রিও পেলাম। কিন্তু বহুপাঠী হ'য়ে বুদ্ধির তোষাখানায় কিছু লাভ জমা হ'লেও অহঙ্কার আমাকে মোক্ষম পেয়ে বসল যে, বুদ্ধি দিয়ে সবকিছুই জানা যাবেই যাবে। কিন্তু হায়রে, বহু ভেবেচিন্তেও কোনো কূলকিনারা পেলাম না—কেন আমার কব্জি ঘুরে গিয়েছিল যার ফলে আমি বেঁচে গেলাম। একটা জায়গায় আমার বাঁচোয়া ছিল—বুদ্ধিবাদীদের চলতি বুলিবাজি যে ফাঁকা এটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধি আমার হয়েছিল! কিন্তু তবু বুদ্ধির কাছে হাত পাতলে কী পাওয়া যেতে পারে জানতে আমি কম মাথা বকাই নি।

এই সময়ে উপনিষদ হাতে এল। সব কথা বলা সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন হঠাৎ তুফানে তারা ফুটে উঠল। হ'ল কি, তৃষ্ণা আমার জেগেছিল ব'লেই উপনিষদের বাণী আমার কাছে এল যেন মরুভূমিতে ওয়েসিসের মতন। তারপর চোখে পড়ল যে, আমাদের দেশের দর্শনের সঙ্গে এ-বৈদিক দর্শনের কিছু মিল থাকলেও, বেদের শুধু যে বাণী আলাদা তাই নয়,

লক্ষ্য ছন্দ ঝঙ্কার রেশ সবই আলাদা'। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ প'ড়ে এ-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'ল। মনে হ'ল—পরম জ্ঞানের পথের পাথেয় মিলতে পারে কেবল বেদান্তের কাছে।

কিন্তু তবু বেদান্তের দিশায় কিছুকিঞ্চিৎ আলো পেলেও রাত পোহালো কই? তৃষ্ণার দুঃখ কাটলেও তাপ জুড়োলো না তো? এ কী ব্যাপার? এই সময়ে আমি কয়েকটি স্বপ্ন দেখি পর পর। সে-সব স্বপ্নের মধ্যে আবছা অনেক কিছু থাকলেও একটি ইঙ্গিত ছিল সুস্পষ্ট: যে, আমাকে সব আগে ছাড়তে হবে বুদ্ধির অহমিকা—শিখতে হবে নত হ'তে।

পণ নিলাম—বুদ্ধির ঝাঁজকে কিছুতেই আমল দেব না আর। তা তো হ'ল, কিন্তু নত হব কার কাছে? ভগবান্? তিনি কী বস্তু না জানলে তাঁর কাছে নত হ'বই বা কেমন ক'রে? প্রণাম? ও তো কথার কথা। স্বপ্নে আবার আভাষ এল হেঁয়ালিরই ছন্দে: সুরু করলাম প্রার্থনা—বেদান্তের: অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়···কিন্তু ফলে একটু আধটু আশ্বাস এলেও শান্তি এল না। এমন সময় গীতায় পড়লাম: জানতে হ'লে যেতে হবে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর কাছে—কেন না তাঁরাই ভগবানের প্রতিভূ ব'লে তাঁদের মধ্যে দিয়েই ঠাকুর কথা কন, পথ দেখান, সন্দেহ ভঞ্জন করেন। কিন্তু গীতা বলল তত্ত্বদর্শীদের কাছে শুধু তাঁদের জেরা করলেই চলবে না চাই সব প্রথম তাঁদের গড় হ'য়ে প্রণাম করতে শেখা আর সবশেষে তাঁদের সেবা করতে চাওয়া। মনে হ'ল এইই তো পথ। কিন্তু সাধুর সেবা ক'রে এ-পথে চলা মানেই তো গুরুবাদ মেনে নেওয়া—ভাবতেই বুদ্ধি ফের শিরপা তুলল। এ হ'তেই পারে না—প্রণাম করতে পারি জিজ্ঞাসা করতেও নারাজ নই—যদি বেশি ভুগি—কিন্তু তাঁদের সেবা করতে যাব কী দুঃখে? যাঁকে জানি না চিনি না ভালোবাসি নি তাঁর সেবা করতে সাধ হবেই বা কেন? কিন্তু এ-অনিচ্ছাকে বাতিল ক'রে দিল দুটি প্রবল ইচ্ছা বা আগ্রহ: এক—ভারতবর্ষে গিয়ে on the spot তদন্ত করতে হবে গীতা উপনিষদের মর্ম; দুই—সেখানে এমন কোনো গুরু মেলে কি না যাঁকে ভালোবেসে সেবা করা সম্ভব। এককথায়, দোমনা আর কি: গুরু চাই না, কিন্তু গুরু কী বস্তু একটু খোঁজ নিলে ক্ষতি কি? এ-ও তো হ'তে পারে যে, আবার গুরুবিমুখতার মূলে গাঢাকা হ'য়ে আছে আমার বুদ্ধির অভিমান—যে চায় না তার খেয়াপারের হাল আর কারুর হাতে

সঁপে দিতে? ফের বেঁচে গেলাম মনটা একটু খোলা ছিল ব'লে—যার নাম **sincerity.**

তা তো হ'ল। কিন্তু শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ফসল ফলে কিসের চাষে? গীতায় বলেছে—"শ্রদ্ধা না বাতি ধরলে জ্ঞানের দিশা মেলে না, সংশয়াত্মাকে কোনো বুদ্ধির দাওয়াই দিয়েই বাঁচানো যাবে না।"

যাহোক ভাবতে ভাবতে এলাম লক্ষ্ণৌয়ে প্রফেসর হ'য়ে! বুদ্ধি ছিল, পড়াশুনো ছিল, যাকে বলে gift of the gab —বোলচালের কসরৎ—তাও কিছু ছিল। কাজেই নামডাক হ'ল বৈকি। ছাত্ররাও খুশী, প্রফেসররাও সদয়। তাঁদের মধ্যে বন্ধুও মিলল—যদিও বহিরঙ্গ বন্ধু, অন্তরঙ্গের দেখা পাই নি।

কী করা? আর কি? তর্কাতর্কি। বুদ্ধির লকড়ি খেলা। এতে অল্পস্বল্প আনন্দ পেতাম বৈ কি। কিন্তু দিনের পর দিন সে-আনন্দের উল্টোপিঠে জমতে থাকে অভিমান—আমি বুঝি, জানি, চিনি, দেখতে শিখেছি, ভাবতে পারি, কিসে কী হয় বুঝতে পারি—পাকা জহুরী না হ'লেও কাঁচা সমজদার নই—হুঁম্!

এমন সময় দেখা পেলাম গুরুমার—মানে শান্তিদেবীর। যেম্‌নি দেখা অম্‌নি আমার বুকের তার বেজে উঠল: এই এই এই—এই-ই তো খুঁজছিলাম! এম্‌নি সময়ে (অসিতকে) রেডিওতে তোমার একটি গান শুনে মনে হয়েছিল—যেন তুমি ঠিক সময়ে ঠিক গানটি গেয়েছিলে আমার জন্যেই। গানটির কেবল প্রথম লাইনটি মনে আছে:

"এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি?"

মাকে বললাম একথা। মাও বললেন—কিন্তু না, সেকথা বলা চলে না। (তারাকে) দিদি, এমন কথা আছে যাদের বলতে গেলেই মনে হয় হাল্কা ক'রে ফেললাম। সাধে কি শাস্ত্রে মন্ত্রগুপ্তির কথা বলেছে এত ক'রে? অদিতিকে নারায়ণ বলেছিলেন: দেবতার বাণী গোপন রাখলে তবেই ফলে—"সর্বং সম্পত্স্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্"—উপায় কী, বলো? গুরুর মহিমা যে উপলব্ধি করেছে সে সে-মহিমার কথা কেমন ক'রে বলবে তাদের কাছে যারা সে-উপলব্ধিকে অন্তরে পায় নি পাবার মতন ক'রে? (হঠাৎ) মনে পড়ল ঠিক এই সময়েই পড়েছিলাম কবীরের একটি দোঁহা—মনে হয়েছিল আমার গুরুকে দেখে আমার যা মনে হয়েছে তার precedent আছে—কেন না কবীরেরও হয়েছিল।

তারা : কী দোঁহা দাদা ? তাও কি বলা মানা ?

প্রেমল : না, বলতে পারি—কেবল (শ্লেষ দিয়ে) এখানে একজন আছে সে যদি রুখে ওঠে তাই ভয় করে।

অসিত (হেসে) : আমি কি এম্‌নিই দুরাচার ভাই ?

প্রেমল (জিভ কেটে) : ছি ছি ! অমন কথা বলে ? এই মাত্র বলি নি কি—তোমার গান শুনেই তোমাকে প্রথম ভালোবেসেছিলাম ? তবে কি জানো ! প্রেমে যে পড়ে নি তার কাছে প্রেমিকের উচ্ছ্বাস যেমন সেন্টিমেণ্টাল মনে হয়, গুরুকে পেয়ে যে পারের পারানি পেয়েছে তার গুরুভক্তিকে একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়ই তাদের কাছে যাদের অন্তরে গুরু স্বপ্রকাশ হন নি।

ললিতা : হোক গে। তোমাকে বলতেই হবে কবীরের দোঁহা—আমার মন আনচান করছে জানতে। কই, আমাকে তো বলো নি ?

প্রেমল : বলি নি—পাছে ভাবো তোমাকে শাসাচ্ছি নিজের গুণ গেয়ে। যাহোক তবু এ-রিস্ক এখন নিতেই হবে যখন ব'লে ফেলেছি। কবীর গেয়েছিলেন :

সব ধরতী কাগজ করূঁ, লেখনি সব বনরায়,
সাত সমুন্দকী মসী করূঁ গুরু গুণ কহা ন জায়।*

কিন্তু সে-অপরূপ অনুভবের কথা কী বলব—যার আলোয় যুগের আঁধার কাটে ? (অসিতকে) তুমি মাঝে মাঝেই সাধুসন্তদের দোষ দাও যে, তাঁরা সংসারের সঙ্গে ননকোঅপারেশন করতেই কোমর বেঁধে নিজেদের তফাতে রাখেন যতটা পারেন—শুধু কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেই নয়, চলনবলন ধরণধারণ সব বদলে—এমন কি পূর্বাশ্রমের নাম পর্যন্ত মুখে আনতে চান না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবে যে, এ তাঁরা না ক'রেই পারেন না অনেকগুলি কারণে : প্রধান কারণ এই যে, গুরু বা ভগবানের কৃপা পেলে কৃপাধন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়ই যায়, আর দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে জীবনের ধারাও বদলাতে বাধ্য। একটা মাত্র উদাহরণ দেই। যে-গুরুর কাছে দাসখৎ লিখে দিতে তোমার এত ভয় করে পাছে তিনিও তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নেন যা তুমি সত্য ব'লে মানো না, সেই গুরুকে যে-শিষ্য শুধু যে সত্যস্বরূপ ব'লে চিনেছে তাই নয়,

---

* ধরিত্রী যদি হয় পত্রিকা, লেখনী বেণুর বন,
সাত সমুদ্র হয় কালি, গুরুগুণ না যায় লিখন।

জেনেছি প্রিয় হ'তে প্রিয়, সবচেয়ে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু দিশারি সারথি পারের পারী ব'লে—সে কেমন ক'রে আত্মীয় স্বজন স্ত্রীপুত্র ছেলে মেয়ে বাপ মাকে ঠিক আগেকার চোখে দেখবে, বলবে—তারা গুরুবরণের আগেও যেমন আপন ছিল গুরুবরণের পরেও ঠিক তেম্‌নিই আছে? সে-গুরুভক্ত যে দেখেছে কবীরের মতনই যে "সদগুরু বিন কো হৈ সগা? সাধু সম কো দাত?" অর্থাৎ "গুরুর মতন কোথায় স্বজন কে দাতা সাধুর ম'ত?"

ললিতা (অসিতকে) একথা সত্যি দাদা! তোমাকে আমি বলতে ভরসা পাই নি কাল—পাছে বাপী রাগ করে এই ভয়ে। কিন্তু যে-মাকে আমি এত ভালোবাসতাম যে—মানে, খুবই ভালোবাসতাম—বাপীকে গুরুবরণ করার পরে তাঁকেও আর তেমন আপন মনে হ'ত না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। অথচ আমার মন যে এতটা বদলে যেতে পারে বাপীর দীক্ষা পেতে না পেতে—একথা যদি দীক্ষা নেবার আগে কেউ আমাকে হলপ ক'রেও বলত আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। (ব'লে প্রেমলের দিকে সভয়ে তাকায় চকিতে)

প্রেমল (হেসে): ভয় নেই, আমি বকব না। কারণ আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। ললিতা জানে প্রথম প্রথম এদেশে আসার পরে আমার বাবা মার জন্যে কী ভীষণ মন কেমন করত। টাকা জমাতাম মাইনে থেকে প্রতি দুবছর অন্তর বিলেত ঘুরে আসতে। কিন্তু মা-র কাছে দীক্ষা নেবার পরে শুধু যে বাবা মার কাছে যেতে ইচ্ছে হ'ত না তাই নয়, ভাবতাম কী কথা বলব তাঁদের সঙ্গে? (অসিতকে) আমাকে ভুল বুঝো না ভাই, লক্ষীটি, যদি বলি যে, অন্তরে নানা অদ্ভুত অনুভূতির মহলের দোর যখন হঠাৎ খুলে যায় তখন এমন একটা আশ্চর্য আলোর বান ডেকে যায় যে, তার স্রোতে বাইরের জগতের নানা বদ্ধমূল ধারণা ও মতিগতি ভেসে যায়ই যায়! শুধু তাই নয়, সে-আলোর পাশে যাকে তোমরা বলো বাস্তব আলো বা বুদ্ধির জ্যোতি তাকে সত্যিই মনে হয় ছায়াময়। কিন্তু যাঁরা এ-জগতের আদৌ খবর রাখেন না তাঁরা প্রায়ই মিস্‌টিক বল্‌তে বোঝেন "মিসটি"—কি না ধোঁয়াটে। (হেসে) যেন সেই লজ্জায়ই যোগীরা বলতে চান না—তাঁরা কী দেখেছেন শুনেছেন জেনেছেন চেখেছেন। তবু বলবই বলব আজ একটা ঘটনা—যা থাকে কপালে।

সবাই একটু অবাক হ'য়ে তাকায়।

প্রেমল (ব'লে চলে) : আমরা আলমোরার আশ্রমে যাই বছর সাতেক আগে—ললিতা আমার কাছে দীক্ষা নেবার ঠিক ছমাস পরে। প্রথম প্রথম আমার নানারকম উপলব্ধি অনুভূতি হ'ত। কিন্তু ক্রমশ সব যেন থিতিয়ে গেল—বা থেমে গেল বলাই ভালো। মনের মধ্যে একটা চলনসৈ শান্তিমতন ছিল, কিন্তু নানা দর্শনের চমক-গমক আর ভুলেও উঁকি মারত না। মনে ভারি ক্ষোভ এল। ভাবলাম—হয়ত গুরুর উপরে বেশি নির্ভর ক'রেই ঝিমিয়ে পড়ছি—একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ভাবতেই উৎসাহ এল প্রচণ্ড—মা-কে বললাম। তিনি বললেন "ব্যস্ত হোয়ো না দুলাল—মনে রেখো উপনিষদের কথা, পড়েছ তো?—'ন ত্বরমানেন লভ্যঃ'—হাঁকপাঁক করলেই কিছু বস্তুলাভ হয় না।" ঠিক এই সময়েই হঠাৎ অসিতের আর একটা গান রেডিওতে শুনলাম :

ধরিব ধরিব যে বলে সেই তো পায় না :
জানিব জানিব বলিলেই জানা যায় না।

মা-ও শুনছিলেন, বললেন : "ঐ দেখ, অসিত বাবাকেও ঠিক এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে! সেও তো জিজ্ঞাসু।"

আমি বললাম : "কিন্তু তার একটা লেখায় পড়েছি—গুরুবাদে তার বিশ্বাস নেই—তাই হয়ত সে এত হা হুতাশ করে।"

মা বললেন হেসে : "দুলাল, এ পথে এলে হা হুতাশ করতে হবে সবাইকেই, গুরু থাক বা না থাক। তবে গুরু থাকলে এই একটা সুবিধে যে, হা হুতাশ করলেও হতাশ্বাস হ'তে হয় না। কিন্তু যিনি যতবড়ই সাধক হোন না, আর যত বড় গুরুই পেয়ে থাকুন না কেন—সাধনার পথে বহু মরু পার না হ'লে অমৃত ঝর্ণার দেখা মিলতেই পারে না। কবীর-যে-কবীর, অতবড় মহাপুরুষ, তাঁকেও কান্নাকাটি করতে হয়েছিল কি কম বাবা? সাধনায় একটা অবস্থায় তাঁকেও নিজের মনকে বোঝাতে হয়েছিল :

হঁস হঁস কান্তা ন পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়
হাঁসী খেলে পিউ মিলেঁ, তো কৌন দুহাগিনি হোয়?*

---

* মেলে না কান্তে হাসির মেলায়, কান্নায় মেলে তারে শুধু
সাধ ক'রে হ'ত দুঃখিনী সে কে—হেসে খেলে পাওয়া গেলে বঁধু।

আমার মনে রোখ চাপল। না কাঁদলে দেখা দেবেন না তিনি? কিন্তু কান্না তো কাপুরুষের স্বধর্ম। আমি নিজেকে মনে করতাম শুধু বুদ্ধিমান্ নয়, বলীয়ান্। পণ নিলাম—বিপর্যয় ধ্যান ক'রে ঠাকুরকে নামিয়ে আনবই আনব। শাস্ত্রে বলে নি কি "তপসা বিন্দতে মহৎ"?—তপস্যায় সব কিছুই পাওয়া যায়।

ভেবে গুরুর মত না নিয়ে সব কাজকর্ম ছেড়ে ধ্যানে বসলাম। কিন্তু বৃথা? যত ডাকি তত তিনি দূরে স'রে যান। অবশেষে অন্ধকারে যখন হাঁপিয়ে উঠলাম তখন মা-কে গিয়ে কেঁদে সব বললাম: "মাপ করো মা—যা পেয়েছি সব বুঝি খুইয়ে বসেছি অহঙ্কারের ফেরে প'ড়ে।"

মা হেসে বললেন: "গুরুর কাছে যে দরবার করে অহঙ্কার তার ঘোচেই ঘোচে।"

আমি বললাম: "না মা, অথই জলে অহঙ্কারের জাহাজ চালাতে গিয়ে ঝড়ের ঘায়ে পাল মাস্তুল সব ভেঙে ডুবতে বসেছি ব'লেই এসেছি তোমার চরণ-তরীর life-boat-এ ঠাঁই পেতে।

মা খানিকক্ষণ ধ্যান ক'রে বললেন:

"যাও বৃন্দাবনে, থাকো দুচারদিন যমুনার তীরে। কিন্তু কারুর বাড়ীতে নয়। ঠাকুরের উপর নির্ভর ক'রে যাও সেখানে—গাছতলা গাছতলাই সই ব'লে।"

আমি বললাম: "জো হুকুম।"

ললিতা শুনে প্রথম কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল: "গাছতলায় থাকবে কি বাপী?"

আমি বললাম: "তাতে কী হয়েছে? আলমোরায় দুবৎসর মাধুকরী ক'রে সেই ভিক্ষান্নেও নাদুস-নুদুস হ'য়ে উঠি নি কি? গুরুকৃপায় কী না হয়? তাঁর চরণতরীতে সাগর পার হওয়া যায়।"

ললিতা পিঠপিঠ বলল: "তবু ভালো যে কারে প'ড়ে গুরুর কথা মনে পড়ল। কিন্তু শোন, তুমি যদি যাও আমিও যাব।"

আমি বললাম: "সে কি হয়? গাছতলায় আমি থাকতে পারি, কিন্তু"—

ও বলল: "ঈ-শ্! তুমি যদি পারো আমি পারব না? পারব পারব পারবই।" ব'লে সে কী কান্নাকাটি! কী করি? মা-কে বললাম ওকে

বোঝাতে। মা বললেন হেসে: "আমি অনধিকারচর্চা করি না বাবা। ও তোমার চেলী, আমার নয়। আমি কেন কোনো কথা বলতে যাব? ওর দায়িত্ব যখন নিয়েছ তখন ওকে বোঝাবার ভারও তোমারই—আমার নয়।"

অগত্যা ওকে নিয়ে আসতে হ'ল। এসে এক গাছতলায় কম্বল আসন বিছিয়ে বসেছি যমুনার ধারে, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি। মা-কে ডাকলাম ব্যাকুল হ'য়ে—বিশেষ ক'রে ললিতার জন্যে। এমন সময়ে হঠাৎ দেখি একটু দূরেই একটা টিনের ঘর। উঠে দেখি—একটা গোয়াল ঘর। কিন্তু কী আশ্চর্য—দুটো দড়ির খাটিয়া আছে! দোর নেই কিন্তু ছাদ আছে! আর আছে একটা কাঠের উনুন।

ললিতা উনুন দেখে খুশী হ'য়ে রান্না সুরু ক'রে দিল।

একটু বাদেই বৃষ্টি থেমে গেল। আমরা ফের উঠে গিয়ে বসলাম গাছতলায় —গোয়াল ঘরের চেয়ে গাছতলাও ভালো তো। (তারাকে) তারপর সে কী বলব দিদি? হঠাৎ মেরুদণ্ডের নিচে থেকে বিদ্যুৎ-এর স্রোত উঠতে লাগল ধ্যানে বসতে না বসতে। কী আনন্দ! চারদিক থেকে আনন্দ ঝরছে। আকাশে আনন্দ, বাতাসে আনন্দ, গাছপালা, ঘাস ফুল বৃন্দাবনের রজঃ—সব যেন চিন্ময় হ'য়ে উঠল, আর আমার দেহচেতনা একেবারে উবে গেল।

তারা: আর একটু খুলে বলুন দাদা, লক্ষীটি!

প্রেমল: সে-অনুভূতি বোঝাব কেমন ক'রে দিদি? যার হয়েছে কেবল সে-ই জানে। কেবল এইটুকু বলতে পারি—হয়ত একটু আভাষ পেলেও পেতে পারো—যে, দেহের যে-একটা স্থূল ভার আছে তার লেশও রইল না। মনে হ'ল—আমি তো দেহ নই, আমি শুধু এক আনন্দঘন সত্তা—ভিতরে বাইরে যেন এক হ'য়ে গেছে। (অসিতকে) তুমি মুখ ভার করো যে, সাধুরা তাঁদের চমৎকার চমৎকার অনুভবের কথা বলতে চান না ব'লেই সাধারণ মানুষ তাদের তুচ্ছতাকে আঁকড়ে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলে সারাজীবন—কোনদিন জানতেও পারে না যে এ-দৈনন্দিন জীবনের বাইরের তুচ্ছতাই ঢেকে রেখেছে আড়ালের আনন্দতত্ত্ব। কিন্তু যাদের চেতনা বাহ্যকেই একান্ত ক'রে দেখে, ইন্দ্রিয়জগতকেই মনে করে বাস্তব real—ধ্যানে পাওয়া জগতকে কল্পনা—ধরো, যদি আমি তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে খুলেই বলতাম যে, আমি যমুনার তীরে সাতদিন ধ'রে আমার দেহচেতনার মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়ে উপলব্ধি করেছিলাম যে, বাইরের জগতের সঙ্গে

অন্তরের আলো এক হ'য়ে গেছে subject object-এর পার্থক্য লুপ্ত হ'য়ে। ধরো যদি তাদের বোঝাতে গিয়ে শ্রীধর স্বামীকেও টেক্কা দিয়ে ভাষ্য করতে চেষ্টা করতাম ভাগবতের একটি বিখ্যাত শ্লোকের যাতে এ-উপলব্ধিটির কথা আছে। তাহ'লেও, মনে করো কি তারা বুঝতে পারত আমি কী বলতে চাইছি? না, বলত: "You are talking through your hat—লম্বা লম্বা কথা ব'লে আমাদের ধোঁকা দিতে চাইছ?

ডাক্তারবাবু: ভাগবতের শ্লোকটি কী সাধুজি, বলবেন? আমি আর একটু মন দিতে পড়তে চাই ভাগবত।

প্রেমল: পড়বেন ডাক্তারবাবু—ভাগবতের সত্যি তুলনা নেই। মা আমাকে নিজে পড়িয়েছিলেন ভাগবত—ফলে আমি কত কী যে শিখেছিলাম বলতে পারি না—বলতে কী, I was swept off my feet: জ্ঞান ও ভক্তির এমন বিচিত্র সমন্বয় কৃষ্ণের জীবনচিত্রের ভাষ্যে—ভাগবত সত্যিই কল্পতরু, যে যা চাইবে সে তাই পেতে পারে এর অগুন্তি বাণীর ঝঙ্কারে।

ললিতা: ঐ দেখ বাপী, ভাগবতের কথা বলতে বলতে ভাগবতের বাণীর কথাই ভুলে বসলে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন ভাগবতের কোন্ শ্লোকের মধ্যে পাওয়া যায় তোমার এ-অনুভূতির খবর।

প্রেমল: পুরো শ্লোকটি মনে পড়ছে না। দশম স্কন্ধে পাবে শ্লোকটি: কৃষ্ণ যখন মথুরার কারাগারে জন্মালেন তখন বসুদেব স্তব করেছিলেন, তার একটি শ্লোকে আছে, "অনাবৃতত্বাৎ বহিরন্তরং ন তে" অর্থাৎ তুমি যখন আমাদের কাছে নিজেকে খুলে ধরো তখন মনে হয় তোমার আর আমার সদর ও অন্দরমহলের মধ্যে কোনো ভেদই নেই, অর্থাৎ ভিতর বাহির সব একাকার হ'য়ে গেছে। (অসিতকে) কিন্তু মনে করো কি—আমি হাজার ব্যাখ্যা করলেও গড়গড়তা বাস্তববাদী আন্দাজ করতে পারবে এ-উপলব্ধির আনন্দবাণী বা নিহিতার্থ? অসম্ভব। আর অসম্ভব ব'লেই মুনি ঋষিরা মানা করেছেন বেনাবনে মুক্তো ছড়াতে।

অসিত: কিন্তু যারা দেখতে পায় না তাদের দৃষ্টিদানের দীক্ষা দিতে, যারা বুঝতে পারে না তাদের বোধশক্তিকে টেনে তুলতে, যারা শুনতে শেখেনি তাদের সুর শুনিয়ে সুরেলা ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে না? শুধু নিজে পেয়ে খুশী থাকাটাই পন্থা, আর যে-আনন্দ গগনগঙ্গার মতন নামল আমার অন্তরে,

অপরকে তার সরিক করতে চাওয়াটা ভুল—এই-ই কি জ্ঞানের চরম বাণী? ভাগবতের কথা পাড়লে। কিন্তু ভাগবতেই প্রহ্লাদ কি বলেন নি নৃসিংহ দেবকে:

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মৌনং চরতি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো নান্যং ত্বদন্যশরণ্যং ভ্রমতোহনুপশ্যে*

ভাগ্যবান্ অধিকারী মুনিঋষিরা নিজে পেয়েই বলেন: ব্যস্। কিন্তু যারা দুর্ভাগা অনধিকারী হ'য়ে জন্মেছে তাদের অধিকারী ক'রে তোলাও কি মহাসাধকদের একটি মহৎ কর্তব্য নয়? পরমহংসদেব কি বলতেন না যে, যারা কোনো অচিন বনে ঢুকে আম খেয়ে ফিরে এসে মুখ মুছে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, তিনি তাদের দলে নন—তিনি লোক ডেকে বলতে চান: ওরে, অমুক বনে চমৎকার আম ফলেছে, আম খেয়ে তৃপ্ত হয়েছি, যা তোরাও খেয়ে খুশী হ।

ললিতা (খুশী হ'য়ে): তুমি যতই বলো না কেন বাপী, এখানে আমি দাদার দিকে। কারণ আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি যে চাইব না আম খেতে? না দাদাভাই, তুমি বাপীর কথা শুনো না। আম তুমি যখনই খাবে অন্ততঃ আমাকে তলব করবে—আমি ছুটে যাবই যাব যেখানে আম ফলেছে।

প্রেমল: তোমার একথা আমিও মানি অসিত। কিন্তু কি জানো? আমার এখন মনে হয়—জানি না পরে এ-দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে কি না—যে, সাধনার অবস্থায় আম খেতে চাওয়াই ভালো—সে-আমের খবর পাঁচজনকে দেওয়া চলে যখন হাত বাড়ালেই আমের নাগাল মেলে। পরমহংসদেবেরই আর একটি বিখ্যাত উপমা মনে করিয়ে দিই: এক সন্ন্যাসী কাঠুরেকে বলেছিল এগিয়ে যেতে। সে যতই এগিয়ে যায় ততই সন্ধান পায় রূপোর খনি, সোনার খনি, হীরের খনি। অল্পস্বল্প উপলব্ধিতে খুশী থাকা ঠিক নয়—এগিয়ে যেতে যেতে যখন মানুষ কোন মহৎ স্থায়ী উপলব্ধির মহলে পৌঁছয়, কেবল তখনই সে অধিকারী হয় মানুষকে ডাকতে তার সরিক হ'তে। পরমহংসদেব ছিলেন এক লোকোত্তর

* তাপসমুনি যারা দেখেছি প্রায় তারা আপন মুক্তিরই সাধনা করে
জগৎ ত্যজি' হ'য়ে মৌনব্রতী—প্রাণ কাঁদে না তাহাদের পরের তরে।
তাপিত পানে যদি না চায় ফিরে তারা—কে দিবে তাহাদের শরণদান
না দিলে তুমি? ত্যজি' তাপিতে আপনার চাহে না মোক্ষও আমার প্রাণ।

মহাপুরুষ, তাই তিনি চেয়েছিলেন অপরকে বলতে কী পেয়েছিলেন। কিন্তু কতবার এমন হয়েছে—তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর অনেক অপূর্ব উপলব্ধির কথা কিন্তু—হায় রে, মা মুখহল্‌সা ছেলের গলা টিপে ধরেছেন, বলতে দিচ্ছেন না। আরো দেখ, তিনি বারবারই বলতেন না কি যে, আদেশ না পেলে লেকচার দিয়ে কোনো কাজ হয় না? বলেন নি কি শশধর তর্কচূড়ামণিকে: "বাবা, আরো একটু সাধন ক'রে আগে বল বাড়াও, তারপর প্রচার করতে ছুটো?" বেশ দুপয়সা সঞ্চয় না ক'রে দান খয়রাৎ করার ঝোঁককে কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ বলবে?

তারা (ললিতাকে): আমার মন কিন্তু দাদার এই কথাই নিচ্ছে। আগে পাই তবে তো বিলোবো?

ললিতা: কিন্তু বাপী তো পেয়েছে।

প্রেমল: কী পেয়েছি? তামার খনি?

ললিতা: কেন মিথ্যে সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছ বাপী! তুমি যে কত বড় আধার মা-র মুখে কি শুনি নি?

প্রেমল: চুপ করো—

ললিতা: না, করব না। আমার গুরুকে ছোট করতে দেব না—যে-গুরু তার ওপরে মা-র আদরের দুলাল। (অসিতকে) শোনো ভাই, বলি কী হয়েছিল গোয়ালঘরে। বাপী এইমাত্র ওর যে-উপলব্ধির কথা বলল, তার পরেই হ'ল কি—ও মা—

প্রেমল: কী ছেলেমানুষি করছ ললিতা? চুপ করো।

ললিতা: না, করব না—বলবই বলব। তুমি সবাইকে ভুল বুঝিয়ে আমার গুরুর মান হানি করবে আর আমি মুখ বুঁজে থাকব? (ডাক্তারবাবুকে) কী হ'ল জানেন? এর পরে বাপীর চোখের দৃষ্টিই যেন বদলে গেল। এদিকে তাকায় ওদিকে তাকায় আর চোখ জলে ভ'রে আসে। কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে—কিছুই বলতে চায় না কী দেখেছে। কেবল মাঝে মাঝে বলে গদগদ কণ্ঠে: সব একাকার······কেবল ঠাকুর······ঠাকুর······দুই নেই আর······শুধু এক এক এক। (প্রেমলকে হাত তুলে নিরস্ত ক'রে) না, তুমি থামো, আমি বলবই বলব। তারপর হঠাৎ দেখি—এক সাংঘাতিক কাঁকড়া বিছে খাটিয়ার পায়ার কাছে আস্‌ছে। আমি মারতে যেতেই বাপী আমার হাত চেপে ধরে

ভাবমুখে বলল: "কাকে মারছ? ছি ছি! ঠাকুর যে!" ব'লেই এক বইয়ের মলাটে সাদরে তাকে তুলে বাইরে নিয়ে এক বাবলা গাছের নিচে ফেলে দিয়ে এসে ব'সে ব'সে আপন মনে হাসতে লাগল। লোকে দেখলে নিশ্চয় বলত পাগল। কিন্তু আমাকে বলেছিল পরে—

প্রেমল: ব্যস, হয়েছে। আর না। না ললিতা। মা বলতেন একটা কথা মনে নেই—যে যতটুকু হজম করতে পারে তাকে তার বেশি পরিবেষণ করতে নেই!

অসিত (হেসে ললিতাকে)। তুমি ঠিকই বলেছ দিদি: স্বভাব না যায় ম'লে—ও হচ্ছে ইন্‌করিজিব্‌ল—সেই গল্প জানো তো? মেকুরের?

ললিতা: না। বলুন না দাদা। তত্ত্ব কথা ঢের হয়েছে।

অসিত: পূর্ববঙ্গের লোক বেড়ালকে মেকুর বলে। এক বাঙাল কলকাতায় এসেছে। তাকে কিছুতেই বেড়াল বলানো যায় না। শেষে তার এক বন্ধু ধরল শেখাবেই শেখাবে। বলল: "বলো তো ব-য়ে একার কী হয়?" সে বলল "বে।"—"তারপর ড়-এ আকার দিলে?"—"ড়া।"—"তার পর ল বসালে কি দাঁড়ায়?" সে বলল "মেকুর।"

প্রেমল (কোরাসে হাসি থামলে): আমি আরো এক কাঠি যেতে পারি: হ্যামলেট বলেছিল তার incorrigible কাকাকে নিশানা ক'রে:

> Let Hercules himself do what he may:
>
> The cat will mew and the dog will have his day.

এমন সময় হাসি থেমে গেল ডাকহরকরার আবির্ভাবে। তারা উঠে গিয়ে একটি চিঠি নিয়ে প্রেমলের হাতে দিল প্রণাম ক'রে।

প্রেমল চিঠিটি খুলে প'ড়েই ললিতাকে বলল: "মা গতকাল রওনা হয়েছেন কাশী, আজ সন্ধ্যায় পৌঁছবেন। আমাদের যেতে বলেছেন।"

ললিতা (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে): অসুখ?

প্রেমল (পড়ে): মা লিখেছেন শোনো: "দুলাল! আমার পায়ের ব্যথাটা একটু বেড়েছে। এখানে বর্ষা নেমেছে। প্রণব বলছে পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর থাকা ভালো নয়। তাই আমরা কাল কাশী রওনা হচ্ছি—

---

* যত চেষ্টাই করুক না কেন পালোয়ান রামমূর্তি—
করবেই মিউ মিউ বিড়ালেরা, কুকুরেরা শুধু ফুরতি।

তোমরা পারো তো এসো। ভাবনার কোনো কারণ নেই। জানোই তো, বাতের ব্যথা—কখনো বাড়ে কখনো কমে ঠাকুরের ইচ্ছায়। তোমার ডাক্তার বন্ধুকে আর তারা মা-কে আমার আশীর্বাদ দিও। হ্যাঁ, ললিতা লিখেছে অসিতের কথা। তাকে যদি ধ'রে কাশী নিয়ে আসতে পারো তবে একটা কাজের মতন কাজ হয়। তার আমাকে মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে তার গান আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না—গেয়েছিল সে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কালোয়াতী সঙ্গীত সভায়। ওস্তাদী গানের লম্ফঝম্পের পর তার মীরাভজন "সুনী মৈ হরি আওনকী আওয়াজ" শুনতে শুনতে সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন কুরুক্ষেত্রের পরে দেখা পেলাম ধর্মক্ষেত্রের।"

ললিতা (হাততালি দিয়ে): চলো দাদা! যেতেই হবে। না যদি যাও বেঁধে নিয়ে যাব—মা বলেছেন—আমার গুরুর গুরু। কাজেই তোমার আর নিস্তার নেই।

অসিত (হেসে): কাঙালকে শাকের খেত দেখানোর পরে ধাক্কা দিতে হয় না দিদি, সে ছোটে—নিজের গরজেই, লোভের টানে।

প্রেমল: একটু ভুল হ'ল। কারণ যে-কাঙাল বৃন্দাবনে পায়েস-প্রসাদে নধরকান্তি হয়েছে, তাকে কাশীতে বৈরিগিদের শাকভাত খেতে ডাকলে সে লোভে পড়ে না। তাই তাকে ভয় দেখানোই বিধি।

ললিতা (অসিতকে): না দাদা! বাপীর কথা তুমি শুনো না। ওরা যা খায় খাক শাকভাত—আমি তোমার জন্যে দুবেলা পায়েসই রাঁধব কথা দিচ্ছি—কেবল তোমাকেও কথা দিতে হবে যে, তুমি এখানকারই মতন রোজ ভজন শোনাবে।

তারা (বিষণ্ণ): কিন্তু আমাদের বাড়ী যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে, বকুল!

ললিতা: তোমরাও চলো না কেন?

তারা (ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে): সে কি হয়?

প্রেমল: খুব হয়। ডাক্তারবাবুর পটি তো কাল খুলে দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তারবাবু: কিন্তু—আমরা এতজনে—

ললিতা: ওঃ! আমাদের মস্ত বাড়ী জায়গার অভাব হবে না।

ডাক্তারবাবু: জায়গার কথা নয়! তোমার মাতৃদেবীর অসুখ—

ললিতা : পায়ে ব্যথা কি আবার একটা অসুখ নাকি ? তাছাড়া এক্ষেত্রে ডাক্তারকেই তো চাই। আপনার নাম ধন্বন্তরি—না জানে কে ? একটি পুরিয়ায় বা পিল-এ সব সারিয়ে দেবেন।

ডাক্তারবাবু : শোনা কথায় কি কান দিতে আছে দিদি ?

ললিতা : এবার হেরে গেলেন দাদা ! বাপী আর আমি যখন গোয়াল-ঘরের খাটের দ্বীপে ব'সে ধ্যানের নামে হাপুস নয়নে কাঁদছি, তখন আপনি আমাদের তলব করলেন কেন শুনি ? বাপী একটি প্রচণ্ড সাধু এই শোনা কথা বিশ্বাস ক'রেই তো।

প্রেমল (হেসে) : কী করো ললিতা ? তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

ললিতা : পারবে কোত্থেকে বাপী—নিজেই নজির আওড়ানোর পরে যে, হার্কিউলিসও পারেন না বেড়ালকে মিউ মিউ করা থেকে ঠেকাতে।

প্রেমল : আর কিছু মানি বা না মানি, তুমি যে নম্র মানতেই হবে। মনে পড়ল অসিতের একটি ভজন লাইন :

চরণকি কিংকিনী বনী ব্রহ সিরকা তাজ হো গঈ

(অসিতকে) এর কী বাংলা করেছিলে তুমি একটু গেয়ে শোনাও না ভাই লক্ষ্মীটি !

অসিত (সুর ক'রে) :

গুরুর পায়ের পায়েল হ'য়ে বাজতেন হায় যিনি
হ'লেন পলে মাথার মুকুট তার কেমনে তিনি ?

ললিতা (ফের হাততালি দিয়ে পাদপূরণ করে) :

পারে যে সে আপনি পারে—নাম তারি মোহিনী।

চোদ্দ

ললিতা রোখালো মেয়ে : এ তো শ্বশুর বাড়ী নয়, বাপের বাড়ী। অনুমতি চাইবে কি? তাছাড়া সে সাহেব গুরুকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর ও বকুলের স্কন্ধে চার চার সপ্তাহ ভর করে নি কি? সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর সামাজিক দায়িত্ব না-ই থাকলো যাদের আদরযত্নে সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও রাজার হালে কেটেছে তাদের স্নেহের শ্রদ্ধার ঋণের কিছুটা অন্ততঃ শোধ তো দেওয়াই চাই। তারা তর্ক তুলেছিল : "ঋণ আবার কি? এমন মহাত্মা আমাদের কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—এর নাম কি ঋণ, না দান?" ডাক্তারবাবু স্বভাবে উচ্ছ্বাসী নন তবু তাঁরও গলা ধ'রে এসেছিল বলতে বলতে সে এমন বিমল আনন্দে তিনি কখনো কাটান নি দিনের পর দিন। শুধু ভজন ও হরিকথাই তো নয়—প্রতিদিন সকালে উঠেই রোমাঞ্চ—এতবড় সাধু তার ত্যাগী শিষ্যাকে নিয়ে শুধু যে ওদের আতিথ্য স্বীকার করেছেন তাই তো নয়—সহজ স্নেহে অপার করুণায় সংসারীদেরও কাছে টেনে নিয়েছেন! ভগবানকে যারা কিছুতেই আপন মনে করতে পারে না এমন বিষয়ীদের তিনি কী দিয়েছেন দিনের পর দিন? অনাবিল স্নেহ, পুণ্য আশীর্বাদ—সবার উপর তাঁর আনন্দময় সঙ্গ। এ-সংসারে আনন্দের দেখা মেলে কদিন—আর মিললেও তার রেশ থাকে কতক্ষণই বা? ওরা কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, না চাইতে পাবে এমন অফুরন্ত অবিমিশ্র আনন্দ—নিত্যনতুন ছন্দে?

গুরুশিষ্যার কথা শুনতে শুনতে অসিতেরও মনে হয়েছে কতবারই : "সত্যিই তো—না-চাইতে-পাওয়া দানের মূল্যও কত বেশি! তোড়জোড় বেঁধে এ-ও তা গ'ড়ে তুলে আনন্দ—সৃষ্টির আনন্দ—খুব দামী একথা মেনেও বলা যায় না কি যে, সাধুর কাছ থেকে যা মেলে তা রোজগার নয়. মাইনে নয়—পুরস্কার, নিছক হরির লুট কুড়োনো—শুধু হেঁট হ'য়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। সব নির্মলিন প্রীতি স্নেহ প্রেম ভালবাসাই এমনি ঠাকুরের দান বটে; কিন্তু তবু একটা কথা আছে : সংসারের সবাই যা দেয় তার বদলে কিছু-না-কিছু চায়। কিন্তু সাধুরা—মানে প্রেমলের মতন নির্ভেজাল সাধুরা—সত্যিই তো কিছুই চান না প্রতিদান! যদি কখনো কিছু চান সেও যেন দান—মানুষ কৃতার্থ বোধ করে সাধু ভিক্ষা চাইলেন ব'লে। সাধুর ভিক্ষা কি আর হাত-পাতা? ছদ্মবেশে দানই তো। নয় তো কি! সেদিন প্রেমল যমুনায় স্নান করবার আগে ঘরে

গিয়ে যখন তেল মাখছিল তখন তারা অসিতকে একলা পেয়ে বলেছিল: "দাদা, আমাদের সেবা উনি নিলেন—সত্যি বলছি এ যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। কতবারই যে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে যখন সাধুদাদা আমাকে টুকিটাকি রাঁধতে বলেছেন—পাটিসাপটা, মোচার ঘণ্ট, ছানার ডালনা কমলালেবুর পায়েস! মনে হয়েছে—ঠাকুরের জন্যে যে সব ছেড়েছে সে যখন গৃহীদের ঘরে আসে তখন সে তো পদার্পণ নয় দাদা—আবির্ভাব, আবির্ভাব—হ্যাঁ, ঐ কথাটিই খুঁজছিলাম। কিন্তু তার ওপরে ভাবুন তো—আমাদেরও নেমন্তন্ন করা—ওঁদের সঙ্গ আরো দুদিন পেতে। তাছাড়া ওঁর গুরুমাকেও দেখব—এই দেখুন দাদা, আমার গায়ে ফের কাঁটা দিচ্ছে।...দেবে না? যাঁর ছোঁওয়ায় খাস সাহেব হ্যাট বুট ছেড়ে তিলক কণ্ঠীধারী বোষ্টম হ'য়ে চোখের জলে হরিনাম করে...উঃ সেই সাক্ষাৎ ভানুমতীকে দেখব এবার—এতদিন যাঁকে শুধু তাঁর হাতে-গড়া শিষ্যের মধ্যে দিয়েই জেনেছি, চেখেছি।

প্রেমলের এই সময়ে ওঘর থেকে সহুঙ্কার অভ্যুদয়: "সত্যিই পুরো বৈষ্ণব বনেছি বটে। তাই না আড়ি পেতে তোমার কথা শুনতে এতটুকু সাহেবি চিত্তগ্লানি হ'ল না, শুধুই বৈষ্ণব হর্ষ আর আত্মপ্রসাদ এই ভেবে যে, আমি তো তাহ'লে দেখছি সোজা সাধু নই—এমন স্নেহময়ী দিদিও যার বোঝা ব'যে নিজেকে হাল্কাই বোধ করেন। অঘটনকে আমি বরাবরই খাতির করি। তাই এ-অসম্ভবকে সম্ভব করেছি ব'লে আমারও—তোমার ভাষায়—গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, দিদি, এই দেখ না। কাজেই শোধবোধ।" ব'লেই অসিতকে: "এবার যমুনাস্নানে চলো, অসিত। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি তোমার আর ললিতার অত্যাচারে। আজ বারোটার মধ্যে খেয়েই দিবানিদ্রার ব্যসন চাই। সাধুর কৃপায় দেখবে সে-ব্যসনও হ'য়ে উঠবে অঞ্জন—দিব্যাঞ্জন—দেখবে হয়ত আরো অভয় স্বপন যার ফলে হবে সংশয়ভঞ্জন—কে বলতে পারে? তন্ত্রে কি সাধে বলেছে ভাই, যে, তাঁর সঙ্গে সত্যিকার যোগ হ'লে

'ভোগো যোগায়তে দেবি! দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি।'

(তারাকে): এর মানে ঠাকুরের কৃপা পেলে ভোগও যোগ হ'য়ে দাঁড়ায়, পতন ও উত্থানের সিঁড়ি—সবশেষে সংসার—জীবন্মুক্তির আনন্দমেলা। এসো অসিত, ঢের তেল মাখা হয়েছে।"

পনেরো

কিন্তু এবার যমুনায় স্নান করা হয়ে উঠল দুর্ঘট। এ-একমাসের বর্ষায় আষাঢ়ের শেষে যমুনার আর সে তন্বী তরুণী নীলকান্তি নেই। তিনি হয়ে উঠেছেন এখন ধুসর প্রবীণা গর্জমানা অশান্তি। ললিতা ও তারা ভয় পেয়ে নামল না জলে, ঘটি ক'রে জল নিয়ে পৈঠার উপরেই স্নান সারল। অসিত নামল বটে, কিন্তু হাঁটুজলের বেশী নামতে সাহস হ'ল না; প্রেমল হাসল, "ও কি! অবগাহন স্নান না হ'লে কি স্নানযাত্রা হয়?" ব'লেই ঝাপিয়ে পড়ল! ভয় পেয়ে তারা চিৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু প্রেমল হেসে চেঁচিয়ে বলল: "কোনো ভয় নেই দিদি, যমুনায় কালিয় নেই। তাছাড়া আমি কাশীতে প্রায়ই সাঁতরে গঙ্গা পার হ'তাম।" ব'লেই দীর্ঘ বাহুসঞ্চালনে পরের ঘাটে গিয়ে উঠল। ললিতা সগর্বে বলল: "এ তো বাপীর কাছে কিছুই নয়। কাশীতে ওর চিৎসাঁতার দেখে অনেকে ওকে ঠাট্টা ক'রে বলত ত্রৈলঙ্গস্বামী।" তারা তবু আপত্তি করে: "তা হোক—বর্ষার জলে সাঁতার দেওয়া মোটেই ভালো নয়। আমি যদি জানতাম তো আসতাম না।"

অসিত (হেসে): না এলে কি আর ও সাঁতার দিত না?

তারা: তবু চোখে তো দেখতে হ'ত না দাদা! আমার বুকের মধ্যে এখনো টিপ্ টিপ্ করছে। ওঁর জীবনের কত দাম—এভাবে বিপন্ন করা কি উচিত?

ললিতা: বাপী বলে প্রায়ই—যারা অষ্টপ্রহর ভাবে তাদের জীবনের দাম বেশি—জানবে তারা নিজেকে ভোলাতে চায় ব'লেই এমন কথা ভাবে।

তারা: কী যে বলো বকুল! ওঁকে দিয়ে ঠাকুর কত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন—পরে আরো নেবেন—

ললিতা: বাপী প্রায়ই কে এক ভাবুকের কথা আওড়ায় বকুল: "We all of us are wanted by the Lord, but none of us is wanted much." অর্থাৎ আমাদের সবাইকেই ঠাকুর চান তাঁর কাজে বহাল করতে কিন্তু এমন কেউই নেই যাকে না হ'লে তাঁর চলে না।

অসিত (হেসে তারাকে): তাছাড়া একটা কথা ভুলো না দিদি: ও দীক্ষায় বোষ্টম হ'লে কী হবে, রক্তে যে এখনো গোরা গর্জাচ্ছে। দুদিন নিরামিষ খেলেই কি আর বাঘ ভেড়া ব'নে যায় আমাদের ম'ত?

ললিতা: এবার একটু ভুল হ'ল দাদা। কারণ এ-গোরা সে-গোরা নেই আর—"খোকা আমার সে-খোকা আর নেই তো"—হ'য়ে দাঁড়িয়েছে খাস গর্ডন গোরা থেকে ভেতো গোরা—যে-গর্জন ছেড়ে করে শুধু বোষ্টম হুঙ্কার, লম্ফঝম্প—যার ডাকে ঠাকুর-যে-ঠাকুর তিনিও উড়ে এসে সাড়া দেন তার হাতে জগঝম্প হ'য়ে। ডি এল রায় লিখেছিলেন তাঁর একটি হাসির গানে:

উঠলাম প্রেমে দিয়ে লম্ফ,
ভাবলাম হ'ল ভূমিকম্প,
(প'ড়ে) গেলাম নিয়ে জগঝম্প,
(হ'য়ে) ত্রিভঙ্গ মুরারি।
(আমরা) প্রেম করেছি ভারি॥

তারা (কৃত্রিম কোপে): রোসো, গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা! উনি আসুন ফিরে এ ঘাটে—যদি আমি সব ফাঁশ ক'রে না দেই তবে আমার নাম তারা নয়।

অসিত (হাত তালি দিয়ে): সাধ্বী, সাধ্বী! এই তো চাই এ-যুগে:

তারা হ'লেন ধুমাবতী,
কলিতে তাঁর এ-ই প্রগতি!

দ্বিতীয় পর্ব

(দুদিন পরে)

এক

কাশীতে গঙ্গার ধারে মহেন্দ্র ডাক্তারের সুরম্য নিলয়ে এসে ওরা আরো চম্‌কে গেল। এই বিলাস ছেড়ে শান্তি দেবী প্রয়াণ করেছেন কিনা আলমোরার নৈমিষারণ্যে? প্রেমল দুটি বৎসর রোজ ভিক্ষা ক'রে চালডাল এনে স্বপাকে রেঁধে খেয়েছে!! এ তো শুধু অঘটনই নয়, তার উপর রোমান্স যে! ট্রেনে ললিতাকে অসিত ডাক্তারবাবু ও তারা তিন জনে মিলে কত প্রশ্নই যে করেছিল প্রেমল ও তার গুরুমার আগেকার জীবনের সম্বন্ধে! প্রেমল তাতে মোটেই প্রসন্ন হয়নি। তিন চার বার টুকেছিল: "সাধুদের পূর্বাশ্রমের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। শাস্ত্রেও আছে যে, সেইদিনই আমাদের সত্যিকার জন্ম যেদিন গুরু দীক্ষা দেন। তার আগের জীবনের খবর জানতে চাওয়া কেন?" কিন্তু ললিতা ওকে আমল দেয়নি। বলেছিল: "তুমিই তো বলো বাপী, যে, শাস্ত্র শাস্ত্রীরা কী বলেছেন তার সদর্থ বুঝতে হ'লে আগে জানা দরকার—কাকে ব'লেছেন, কবে বলেছেন আর কোথায় বলেছেন। তাই এযুগে শাস্ত্রের অনেক কথাই অমান্য করা চলে কারণ দেশ কাল পাত্র সবই বদ্‌লে গেছে।"

ফলে প্রেমলের আপত্তি সত্ত্বেও ট্রেনে অসিত ললিতার মুখে শুধু যে তার পূর্বাশ্রমের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাই নয়, অনেক কিছু বুঝবার কিনারায় এসেছিল যা আগে ঠিক ধরতে পারে নি। ললিতা বেশ ফলিয়েই বলেছিল মহেন্দ্রবাবুর ইতিহাস।

বিচিত্র মানুষ! গুপ্তযোগী—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। নৈলে কি স্ত্রীকে ও মেয়েকে এক কথায় ছেড়ে দিতে পারেন—সংসারের সাজানো বাগান ছেড়ে তাদের বনবাসের প্রস্তাবে সায় দিয়ে? ললিতা তার সরল বিজ্ঞ স্বরে বলেছিল, "সংসারীদের মধ্যেও অনাসক্ত-মানুষ দেখা যায়—যদিও খুব কম। আর কম ব'লেই না এত দামী! মা বাবাকে গভীর ভক্তি করেন কি সাধে দাদা? বলতে কি, মার মুখেই শুনেছি যে বাবাই ছিলেন ওঁর প্রথম গুরু—বৃন্দাবনের বাবাজি পরে মাকে গ'ড়ে পিটে নিতে পেরেছিলেন বাবা তাঁর মনকে বৈরাগ্যের রঙে আগে রঙিয়ে তুলেছিলেন ব'লেই না! তাছাড়া বাপীও তাঁর কাছেই প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল গায়ত্রীমন্ত্রের, যার ফলে তার এক বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল।"

তারা তাঁর উদ্দেশ কপালে হাতজোড় করে নমস্কার ক'রে বলেছিল: "এমন দু-চারটি মানুষ সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায় ব'লেই ভাই আজও চন্দ্র সূর্য উঠছে। আমার দাদামশায়ও ছিলেন এম্‌নি মহাপুরুষ। তাঁর একটিমাত্র ছেলে যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে যায় রামকৃষ্ণ মিশনে তখন তিনি তাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। কিন্তু হ'লে হবে কি"—বলেছিল তারা সরলভাবেই—"আমার দিদিমা কেঁদেকেটে একেবারে কুরুক্ষেত্র ক'রে বলেছিলেন: 'কৃতার্থই হয়েছি বটে বাবা কেবল বংশলোপ হ'ল ভেবে ভয় করে পাছে আমার সাতপুরুষকে নরকে যেতে হয়।"

শুনে প্রেমলের সে কী হাসি! বলেছিল: "দিদি, একটা নতুন দুশ্চিন্তায় ফেললে তুমি। এক পুরুষ হ'লেও বা কথা ছিল, কিন্তু উপরওয়ালা সাত পুরুষকে নরকে গরম তেলে ভাজা হ'তে দেখলে হয়ত যুধিষ্ঠিরের মতনই মাকে বলতে হ'ত: 'আমি তাঁদের দুঃখের সরিক হ'তে নরকেই বসবাস করব।'

অসিত বলেছিল পিঠপিঠ: "সাধু, সাধু! কারণ তাহ'লে যুধিষ্ঠিরের মতনই তোমার মাতৃদেবীর নরকদর্শনে তাঁরা সবাই সরাসরি ইন্দ্রের বিমানে ক'রে উড়ে গিয়ে স্বর্গের গঙ্গায় স্নান ক'রে দেবদেহ পেয়ে নন্দনকাননে মলয় হাওয়া খেয়ে বিহার করবেন!"

তারা একটু অপ্রতিভ হ'য়ে পড়তে প্রেমল তাকে মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের কথা বলে: কীভাবে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন: "যুধিষ্ঠির স্বর্গে পৌঁছে তাঁর ভাইরা সবাই নরকে তেলেভাজা হচ্ছেন শুনে রুখে উঠে বলেন যে, স্বর্গে তিনি একলা সুখে না থেকে নরকে ভাইদের দুঃখের সরিক হয়েই থাকবেন। ভাবো দিদি, একবার ভাবো মহত্ত্বের এমন কল্পনা কি আর কোনো কবি করতে পেরেছেন?

অসিত টুকেছিল: "বটে। কেবল আমার মনে হয়—যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল যখন ধর্ম কুকুর হয়ে স্বর্গের পথে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। এ-অপূর্ব কাহিনীটি আমি যতবার পড়ি আমার চোখে জল আসে। যখন যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে পৌঁছতে চেয়ে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিলেন সহযাত্রী হ'লেন ধর্ম—কুকুরের ছদ্মবেশে। পথে সবাই এক এক ক'রে প'ড়ে গেলেন—ফলে শেষে স্বর্গে পৌঁছলেন কেবল যুধিষ্ঠির আর ঐ কুকুর।

পড়েছ তো?

তারা : পড়েছি, কিন্তু তবু ফের আপনার মুখে শুনতে চাই। বলুন না—কী হ'ল তারপর ?

অসিত : বড় মধুর ছবি দিদি! আমি গুরুবাদ বুঝি না, কিন্তু মহত্ত্বের এমন ছবিতে প্রাণ দুলে না ওঠে কার ? হ'ল কি, বলি শোনো।

যুধিষ্ঠির শুধু আশ্রিত কুকুরটিকে নিয়ে স্বর্গের তোরণে পৌছতেই ইন্দ্র বললেন যে, স্বর্গে পৌছানোর একটি মাত্র সর্ত হচ্ছে কুকুরটিকে ত্যাগ করা। উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন যে, আশ্রিতকে তিনি প্রাণ থাকতে ত্যাগ করবেন না এই-ই হ'ল তাঁর 'নিত্যব্রত'।

তারপর সে কী ড্রামাটিক ডায়ালগ, দিদি! ইন্দ্রও ছাড়বেন না—(কুকুর কোন্ অধিকারে স্বর্গের পাসপোর্ট পাবে ?)—যুধিষ্ঠিরও নাছোড়বান্দা : "নিজের নিটোল সুখের লোভে কেমন ক'রে আশ্রিতকে খেদিয়ে দেব ?"

শেষে ইন্দ্র জেরা ধরলেন : "তুমি পথে পাঁচ ভাই ও স্ত্রী দ্রৌপদীকে ছাড়তে পারলে, অথচ এক তুচ্ছ কুকুরকে ছাড়তে পারছ না এ কেমন মোহ ? তোমার স্বর্গের পথে একমাত্র বাধা হ'য়ে দাঁড়াল কি না পথে-পাওয়া কুকুর !!"

যুধিষ্ঠির অম্লানবদনে বললেন : "আপনার উপমা সুপ্রযুক্ত হয় নি, দেবরাজ ! কারণ আপনি জানেন—এ জগতের বিধান এই যে, মৃতদের সঙ্গে সহবাস হ'তে পারে না। আমার গতায়ু স্বজনদের বাঁচাবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। তাছাড়া আমি তাঁদের ত্যাগ করেছি তাঁদের মৃত্যুর পরে—আগে নয়। কিন্তু এ-কুকুরটি এখনো জীবিত—তথা আমার আশ্রিত। তাই একে যে আমি ছাড়তে চাইছি না, সে কোনো মোহের জন্যে নয়—ছাড়লে ধর্মভ্রষ্ট হব ব'লে।"

তখন কুকুরটি নিজমূর্তি ধারণ ক'রে ধর্মের রূপে যুধিষ্ঠিরকে বললেন : "মহারাজ, আমি তোমাকে একবার বক হ'য়ে পরীক্ষা করেছিলাম দ্বৈতবনে। তুমি সে-পরীক্ষায় পাশ করেছিলে। আজ আবার পাশ করলে। তাই পেলে 'দিব্যাং গতিমনুত্তমাম্' কি না পরমপদ।

প্রেমল : সাধু সাধু অসিত! তাই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি : তুমিও সংশয়ের পরীক্ষা পাশ ক'রে যথাকালে গুরুচরণে শরণ নিয়ে পাবে 'দিব্যাং গতিমনুত্তমাম্'।

দুই

অসিত সাত আট বৎসর আগে শান্তিদেবীকে দু-একবার দেখেছিল লক্ষ্ণৌয়ে। শুনেছিলও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা—ভালো তথা মন্দ। কেউ কেউ বলত: "কী কালচার! আইডিয়াল হোস্টেস্! হাসি গল্প নাচ গান সিগারেট কিছুতেই পেছপাও নন। সাহেব মেমদের সঙ্গে সমানে মেশেন কী নিষ্পরোয়া ঢঙে!"

আর একদল বলত: "বড় বাড়াবাড়ি সাহেবিয়ানা বাপু! বরদাস্ত হয় না। বিশেষ মেয়েদের সিগারেট খাওয়া 'বব্‌ড্‌ হেয়ার, হব্‌ল্‌স্কার্ট ক'রে শাড়ী পরা······" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর বাইরের চেকনাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও মন টানে নি। বরং মহেন্দ্রবাবুকে বেশি ভালো লেগেছিল। বিলিতি হ্যাট-কোট পরতেন বটে। কিন্তু যেমন নিপুণ ডাক্তার, তেমনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—নির্লোভ, অমায়িক, দাতা······নানা গুণ তাঁর—বলত সবাই একবাক্যে। কেবল কেউই জানত না যে, তিনি গুপ্তযোগী। অসিত শুধু শুনেছিল—কে এক থিয়জফিস্ট বন্ধু ওঁকে গুরুবরণ ক'রে গুরু-দক্ষিণা দিয়েছেন সাত আট লক্ষ টাকা। সেই টাকা থেকেই দুলক্ষ টাকা দিয়ে তিনি কাশীর প্রাসাদ কেনেন গঙ্গাতীরে—গঙ্গাস্নানে তিনি গভীর আনন্দ পেতেন ব'লে। বৃন্দাবনে একবার অসিত প্রেমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল সাহেব মানুষের এমন গঙ্গাপ্রীতি হ'ল কেমন ক'রে? তাতে প্রেমল শুধু বলেছিল: "মানুষের বাইরেটা দেখে তাকে বিচার করতে নেই। গুপ্তযোগী সাহেবদের মধ্যেও দেখা যায়।"

তারপর এর ওর তার কাছে শুনেছিল—এম্‌নি জনশ্রুতি—যে, তাঁর নাকি এক মহাত্মা গুরু আছেন তিব্বতে। শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—থিয়জফিস্টদের সম্বন্ধে কত রকম উদ্ভট কথাই তো শোনা যায়—তবে ও এসব কথা নিয়ে বেশি মাথা বকায় নি। গান শোনা, শেখা আর গাওয়া—এই তিনটি প্রেমের চাপে ও ফুর্সৎ পেত না এসব হাবিজাবি জনশ্রুতি নিয়ে মাথা ঘামাবার। কেবল একবার শুনেছিল কোনো সংবাদদাতার কাছে যে, মহেন্দ্রবাবুকে কেউ কখনো মিথ্যাকথা বলতে শোনে নি এবং

এক প্রখ্যাত ইংরাজ মহিলা, জননেত্রী, তাঁকে নাকি এত ভক্তি করতেন যে, তাঁর জুতোর ফিতে বেঁধে দিতেন।

অসিত পরচর্চা ভালোবাসত না ব'লেও বটে, আর গাল-গল্পকে আমল দিতে চাইত না ব'লেও বটে—এ-সব জনশ্রুতিকে গুজব ব'লে সরাসর ডিশমিশ ক'রে দিয়েছিল। মানুষ যে শ্রোতাদের চমকে দিতে অনেক কিছুই স্রেফ বানিয়ে বলে কে না জানে?

কিন্তু তবু যেদিন শুনেছিল যে এক সাহেব প্রফেসর কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপস পাশ ক'রে এসে শান্তিদেবীর শিষ্য হয়েছেন, সেদিন একটু অবাক্ হয়েছিল বৈ কি। অতঃপর আরো অবাক্ হয়েছিল শুনে যে, মহেন্দ্রবাবু কাশীতে গঙ্গাতীরে এক চমৎকার প্রাসাদ কিনে শুধু যে কাশীবাসী হয়েছেন তাই নয়, স্ত্রী শান্তিদেবীকে তার সাহেব শিষ্যকে নিয়ে সন্ন্যাস জীবন বরণ করতে অনুমতি দিয়েছেন। তারপরের খবর আরও চমকপ্রদ: শান্তিদেবী সন্ন্যাসিনী হ'য়ে মাথা মুড়িয়ে আলমোরার এক গহন অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে বৈষ্ণব সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। এ এক অদ্ভুত পরিবার বৈ কি—মনে হয়েছিল ওর—আরো ললিতাকে কাছ থেকে দেখার পরে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক্ লেগেছিল ভাবতে—ফ্যাশনেবল শান্তিদেবী কেমন ক'রে প্রেমলের মতন অসামান্য প্রতিভাধরের গুরু হ'য়ে ওকে ছিনিয়ে নিলেন ইনটেলেকচুয়াল জীবনের মহালোভনীয় রামরাজ্য থেকে! যে-মানুষ হেসে-খেলেই পণ্ডিত গবেষক হ'য়ে কৃতকৃত্য হ'তে পারত—বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে রাজসম্মান পেতে পারত দেশধ্বজদের কাছে, সে কিসের টানে স্বদেশ স্বজন স্বভাষা—সবার উপর শ্বেত সংস্কৃতির আত্মাভিমান ছেড়ে পরাধীন জাতির এক শ্যামচর্ম গৃহিণী গুরুকে এমন নির্বিচারে বরণ ক'রে তার পায়ে দাসখৎ লিখে দিতে পারল? অসিত বৃন্দাবনে ললিতার কাছে এ-খবরও পেয়েছিল—ললিতা বেশ ফলিয়েই বলেছিল—যে, একাধিক শ্বেতাঙ্গিনী স্বদেশিনী প্রেমলকে বরণমালা দেবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করত, কিন্তু ও তাদের সঙ্গে সুভদ্র ব্যবহার করলেও তাদের দিকে ফিরেও তাকায় নি—তাদের কাউকে আস্কারা দেওয়া তো দূরের কথা। অথচ এ-ও সত্য নয় যে, প্রেমল নারীলাবণ্যের সমজদার ছিল না। ছিল ব'লেই ওকে আরো সতর্ক হ'তে হয়েছিল—পাছে এ-সাংঘাতিক দ-য়ে ম'জে ওর প্রাণশক্তির

অপব্যয় হয়। বারবারই ও অসিতকে বলত একটি কথা যা শুনে শুনে অসিতের মনে আরো গেঁথে গেছে: যে, জিতেন্দ্রিয় না হ'লে পূর্ণজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ হওয়া অসম্ভব। "কারণ"—বলত প্রেমল ওর স্বচ্ছ ভঙ্গিতে—"মানুষের প্রাণশক্তির মূল হ'ল তার রেতস্, বীর্য! সেই বীর্যপাত হ'লে রেতস্ কখনোই ওজস্-এর কোঠায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সার্থক হ'তে পারে না। আর ওজস্-এর এ-উর্ধ্বমুখী বিকাশ বিনা আমাদের মর্ত্য স্বভাবের রূপান্তরের আশা দুরাশা। তাই দেশে দেশে যুগে যুগে মহাসাধক তথা সাধুসন্ত মুনিঋষি সবাই একবাক্যে ঘোষণা ক'রে এসেছেন যে, ব্রহ্মচর্য বিনা ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ হ'তেই পারে না।" ওর বিশেষ প্রিয় ছিল ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে দহরবিদ্যার ব্যাখ্যা—যেখানে বলা হয়েছে: "ব্রহ্মচর্যেণ হেবেষ্ট্বা আত্মানম্ অনুবিন্দতে—" ব্রহ্মচর্যের আলোয়ই ব্রহ্মকে খুঁজে পেতে হবে।

অসিত দেখেছিল বৃন্দাবনে বহু বৈষ্ণবীই ওকে প্রণাম করতে এসে নানা সূক্ষ্মভাবে হাতছানি দিত—যার মর্মজ্ঞ হ'তে দিব্যদৃষ্টির দরকার করে না। এদের মধ্যে একটি সুন্দরী "পণ্ডিতা" ওকে নির্জনে তার সাধনার কথা বলতে চেয়েছিলেন। উত্তরে প্রেমল বলেছিল ভদ্র কিন্তু দৃঢ়স্বরে: "মা, আমি একলা কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করি না। তুমি বলতে পারো তোমার যা বক্তব্য—কিন্তু ললিতার থাকাই চাই।" পণ্ডিতা একটু ঠেশ দিয়েই বাঁকা হেসে বলেছিলেন: "কিন্তু আপনার মতন সিদ্ধ মহাত্মাও যদি সহজিয়া হ'তে না পারেন তাহ'লে কার কাছে সহজিয়া তন্ত্রের পাঠ নেব?" তাতে প্রেমল বলেছিল: "প্রথম কথা, আমি সিদ্ধ মহাত্মা নই, জিজ্ঞাসু সাধক মাত্র—সাধকের অধিকার নেই সিদ্ধের চালে চলবার। দ্বিতীয় কথা, যদি সিদ্ধ মহাত্মা হইও কোনোদিন, তাহ'লেও গুরুর নির্দেশেই চলব। তিনি আমাকে বলেছেন কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে হ'লে ললিতাকে ডাক দিতে।" এ কথায় পণ্ডিতা ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব্যঙ্গের তীরন্দাজি করতে চেয়েছিলেন: "কিন্তু ললিতা দিদি কি তাহ'লে পুরুষ বন্ধু?" প্রেমল বলেছিল: "ও আমার মেয়ে। কিন্তু ওকেও আমি বরণ করেছি—গুরুরই নির্দেশে।" পণ্ডিতা বলেছিলেন: "রক্ষাকবচ?" প্রেমল বলেছিল: "তাও বলতে পারেন, আমার মানহানি হবে না, মা। কারণ আমি অনেক পোড় খেয়ে শিখেছি যে, সাধক অবস্থায় নিজের মনের জোরকে বড় ক'রে দেখা কোনো কাজের কথা নয়। যেমন

যে ভাবে সে জানে, সে জানে না—বলেছেন বেদ—তেম্‌নি বলা চলে যে, যে ভাবে সে সবল, দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসে চক্ষের নিমেষে before one can say Jack Robinson." পণ্ডিতা তবু নাছোড়বান্দা জেরার সুর ধরেছিলেন: "কিন্তু তারাদির কাছে শুনেছি ললিতাদি নিজে পুরুষদের ঘরে অনেক রাতেও একলা কথাবার্তা কইতে ভয় পান না।" (তারা শুনে পরে দুঃখ করেছিল যে সে একদা কথায় কথায় তাকে ব'লে ফেলেছিল আচম্‌কা) প্রেমল হেসে উত্তর দিয়েছিল: ওর কথা আলাদা মা! অধিকারভেদে ব্যবস্থাও আলাদা হয়। ললিতা মস্ত আধার—ভোরবেলায় তোলা মাখন—সরলতা ও নির্মলতা যার সহজাত কবচকুণ্ডল—তার কথা যেতে দাও—না আর না মা, তবে একটা কথা বলি: তুমি যদি তোমার সাধনার সম্বন্ধে কোনো সাহায্য চাও তো ওকেই বোলো। এসব ক্ষেত্রে গুরুর কাছে দরবার করাই সবচেয়ে ভালো, তবে গুরু যদি না থাকেন তবে সাধনায় কো-এডুকেশন যত কম হয়, ইভলিউশনও ততই বেশি হয়। আমি চলি মা—আমাকে যমুনাস্নানে যেতে হবে।"

এ রকম যে কত ছোট ছোট দৈনন্দিন ঘটনা ঘটেছে যা থেকে অসিত শুধু যে প্রেমলকে চিনতে পেরেছে তাই নয়, দেখতে পেয়েছে ললিতার আধার কত নির্মল। ওর মনে পড়ে সতীর কথা। কিন্তু সে তো এখন স্বামীর কাছে শিলঙে। কী ভাবে সাধনা করছে কে জানে? কেবল মনে পড়ে—সেও ছিল এমনি স্বভাব-নির্মলা—অন্ততঃ বিয়ের আগে। এখন তার কী অবস্থা জানতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মনে আলো হ'য়ে ওঠে প্রেমলের আন্তরিকতা আর গুরুভক্তি। আন্তরিকতা মন টানে, গুরুভক্তি জাগায় চমক। আন্তরিক মানুষ ও আরো দেখেছে, কিন্তু এমন গুরুভক্তির কথা বইয়ে পড়লেও চোখে দেখবার কখনো সৌভাগ্য হয়নি। গুরুবাদে অবিশ্বাস সত্ত্বেও ও মনে মনে সত্যিই প্রণাম করে ভগবানকে যে, তিনি এ-হেন আশ্চর্য গুরুদাসকে চাক্ষুষ করবার সুযোগ দিলেন ওকে! সংসারে কজন পায় এমন বিরল সুযোগ? ওর মনে পড়ে সতীর একটি কথা: সে-ও দেখতে চেয়েছিল এমন কোনো বুদ্ধিমান চক্ষুষ্মান সাধককে যে এক কথায় গুরুর চরণে শরণ নিয়ে বলতে পারে: "গুরুর মধ্যে আমি ইষ্টকে দেখেছি।"

কিন্তু প্রেমল দেখেছে কি? ওকে জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন সাহস হয়নি। কিন্তু ভয় ভয় করেছিল ঠিক কী জন্যে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উত্তর পায় বিদ্যুৎ ঝিলিকে: যদি ধরো, শোনে সে দেখেছে—তাহ'লে তো আর বলতে পারবে না যে, গুরু আর ইষ্ট অভিন্ন এ-রটনা একটা গুজব মাত্র। ও চায় এ-রটনা গুজবই থাক। এ যে গুজব নয়, কোনো সত্যনিষ্ঠ মহাসাধকের প্রাণে-পাওয়া সত্য, একথা জানলে ওর মন ক্লিষ্ট হয়, ভয় পায়, তাই জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায়নি। হায় হায়! এর নাম কি সত্যার্থী—জিজ্ঞাসু?

তিন

ট্রেনে এই জাতের হাজারো চিন্তা ও সংশয়ের জটলার মধ্যে প'ড়ে ওর রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

পরদিন কাশীতে নেমে অশান্ত মনেই গিয়ে পৌঁছল মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে। প্রথমেই চম্‌কে গেল বিলাসনিলয় দেখে। এত চমৎকার নয়নানন্দ সৌধ ও বেশি দেখেনি—শুধু কাশীতেই নয়, কলকাতায়ও দুচারটির বেশি চোখে পড়েনি বিশেষ, গঙ্গাতীরে। ও আশৈশব গঙ্গাকে ভালোবেসে এসেছে, তাই আরো মুগ্ধ হ'য়ে গেল। মনের অশান্ত হিজিবিজি চিন্তাও এল থিতিয়ে।

তারপরেই চম্‌কে উঠল শান্তিমাকে গঙ্গায় ডুব দিতে দেখে।

এ কী চেহারা? কোথায় সেই dame de salon—যাঁকে দেখে সাহেবরাও তারিফ করত, বাঙালীদের মধ্যে কেউ নিন্দা, কেউ ঈর্ষা! মাথা মুড়ানো! স্থূল কায়া ঝ'রে প্রায় আধখানা হ'য়ে গেছে! স্নান সেরে যখন তিনি তিলক কেটে মালা প'রে তাঁর ঠাকুর ঘরে এসে বসলেন, তখন অসিত বাগানে বেড়াচ্ছিল। ঠাকুরঘরের একটি খোলা জানলার দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল বৃদ্ধা পূজারিণীর 'পরে। তাঁর স্নিগ্ধ মধুর কান্তি দেখে ও শুধু মুগ্ধ নয়, অভিভূত হ'য়ে পড়ল। এ কী ব্যাপার! মনের প্রাণের রূপান্তরের ছবি যেন প্রতি অঙ্গে জ্বল জ্বল ক'রে ফুটে উঠেছে! মুখে সে-পালিশ নেই বটে, কিন্তু কী নিরুপম শান্তি! চোখের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন গ'লে অনুকম্পা হ'য়ে ফুটেছে। হাসিতেও কী অপূর্ব সুষমা! সুন্দরীদের হাসিতে মঞ্জুশ্রী দেখে ও গভীর তৃপ্তি

পেয়েছে তো কতবারই। কিন্তু এ-হাসি সে-জাতেরই নয়। এ যেন—কী নাম দেবে একে? কিসের আশ্বাসে ভরা?—বস্তুলাভের কি? হবে। বলা কঠিন তার পক্ষে যার কৃষ্ণলাভ হয়নি। তবে এটুকু নির্ভয়েই বলা চলে যে, এ-প্রসন্নতার মধ্যে কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই, অথচ আত্মসমাহিত, আত্মরতি। শাস্ত্রে পড়েছিল অন্তর্জ্যোতির কথা। এ-হাসিতে যেন সে-আলোরও অতিপ্রত্যক্ষ ছোপ লেগেছে।

ও চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে দেখছে, এমন সময় ললিতা এসে ডাকল: "মা ডাকছেন, দাদা!"

চার

অসিত শান্তি মা-কে ভক্তিভরে প্রণাম করল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। মা ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "বোসো বাবা।" তাঁর দুপাশে দুটি আসন—একটিতে ললিতা বসল, অন্যটিতে ও বসতে যাবে এমন সময় মা ললিতাকে বললেন: "ওদের সবাইকে ডাক দে।"

ললিতা: ওরা সবাই গঙ্গায়।

মা: সবাই?

ললিতা: হ্যাঁ, কেবল প্রণবদা ছাড়া।

মা: সে কী করছে?

ললিতা: কী আর মোক্ষম ধ্যান—যা ও সময় পেলেই করে।

মা: ওকে দেখে শেখ্ রে মেয়ে, শেখ্—কাকে বলে নিষ্ঠা।

ললিতা: নিষ্ঠা না হাতি! প্রণবদার কেবল এক চিন্তা—আমাদের একহাত দেখিয়ে দেবে ও কেমন ধ্যানে পোক্ত। ও নিজেকে ভাবে বিবেকানন্দের বিলিতি সংস্করণ।

মা (হেসে): দেখলে বাবা? Spoilt child কাকে বলে?

ললিতা: বৈ কি! বাপীর পাশে?

মা: শ্-শ্। গুরু না?

ললিতা: তুমি আমাকে ধম্কাবার কে মা? আমি ওর সঙ্গে লড়াই করলে ও খুশীই হয়, ধমকায় না ভুলেও।

মা (অসিতকে) : দুরন্তপনা দেখে শেখো বাবা—

অসিত : প্রণব বুঝি স্বভাবে ধ্যানী ?

মা : হ্যাঁ বাবা ছেলেবেলা থেকেই ও ধ্যানে আলো-টালো দেখে। তাই দুলালকেও চায় ওর পথে টানতে।

অসিত (হেসে) : পারে না বুঝি ?

মা : দুলালের সঙ্গে পেরে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা বাবা ? বৃন্দাবনে কি ও ধরে নি নিজমূর্তি ?

অসিত (আশ্চর্য) : নিজ মূর্তি ?

মা : একেবারে—কী বলব—প্রতি পদেই নিজের পথ নিজের হাতে পায়ে কেটে চলবে। যদি না পারে তবে ঢুঁ মারতেও রাজী—কিন্তু গতানুগতিক—beaten track—মাড়াবে না কিছুতেই। প্রণবের মতন সব ছেড়ে ধ্যানে বুঁদ হ'য়ে ব'সে থাকায় ও নেই।

অসিত : কিসে ও আছে ?

মা : কিসে নেই তাই বলো না ? পড়বে যখন, তখন পড়ায় ডুবে যাবে। হাসবে যখন, তখন সবাইকেই ভুলিয়ে দেবে যে কান্না ব'লে কিছু আছে এ-জগতে। তারপর জপে যখন বসবে তাতেই মাতোয়ারা। ধ্যানেও তাই। তারপর নামকীর্তন যখন করবে, বাড়ী ফাটিয়ে দেবে ওর উর্ধ্ববাহু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" গমকে। আর কীর্তন ভজন যখন শুনবে—দেখ নি ওকে ?

অসিত : দেখেছি মা, খুব তন্ময় হ'য়ে শোনে।

মা (সগর্বে) : জানো, ওর ভাবসমাধি মতন হয় !

ললিতা : ভাবসমাধি নয় মা—তবে কাছাকাছি বটে।

মা : তুই তো সবজান্তা—কেবল আমার কথা কাটবি।

ললিতা : কথা কাটা ? ভাবসমাধি কী আমি জানি না বুঝি ? তোমাকে দেখি নি ?

মা (মুস্কিলে প'ড়ে) : যেতে দে। তোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে ক'রেই তো আমার—মানে—

ললিতা : পায়ে বাত হ'ল !—হি হি হি !

মা : যাঃ—পোড়ামুখী ! ডেকে আন্ প্রণবকে।

ললিতা : ধ্যান ভাঙিয়ে ?

মা : ফে—র ! হ্যাঁ, আমার দরকার আছে।

ললিতা : আচ্ছা মা। কিন্তু সাধুর ধ্যানভঙ্গ করার প্রত্যবায় আছে—তোমার মুখেই শুনেছি।

মা : যাঃ ! সে অপ্সরাদের পক্ষে। তুই তো আর অপ্সরা নোস।

ললিতা : ঈ—শ্ ! ঢের অপ্সরা দেখেছি। বৃন্দাবনে একজন এসেছিলেন পরমা সুন্দরী, তার ওপর এম-এ পাশ। বাপী তাকে কী বলল জানো ? আমি মস্ত আধার।

মা (হেসে ওর গালে ঠোনা মেরে) : যা বলছি !

ললিতা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মা : তোমাকেও নিশ্চয় দুরন্ত মেয়ে জ্বালাত এম্নি—রাত দিন ?

অসিত : না মা। ও কেবল আনন্দই দিত সবাইকে। ওর নাম হওয়া উচিত ছিল আনন্দময়ী।

মা : ঠিক বলেছ। তবে ওর নাম আমি ললিতা দিয়েছিলাম কেন জানো ? ওর জন্মানোর ঠিক দশমাস আগে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখি।

অসিত : বৃন্দাবনের—?

মা : হ্যাঁ সেই ললিতা—শ্রীরাধার অষ্টসখীর একজন। তাই তো দুলাল ওকে দুটি উপাধি দিয়েছে : অমলা আর সরলা।

অসিত : জানি মা। প্রেমল সেই এম-এ পাশ অপ্সরাটিকে ঠিক এই কথাই বলেছিল।

মা : তাই তো ওকে পাঠালাম প্রণবকে ডাকতে। আর কেউ হ'লে প্রণব সইত না—মানে ওর ধ্যানভঙ্গ। তবে ললিতার সাত খুন মাপ।

অসিত (একটু চুপ ক'রে থেকে) : প্রণব শুনেছি বিলেত থেকে এসেছিল প্রেমলেরই টানে ?

মা : হ্যাঁ। দুলাল ওর যাকে বলে hero—ওরা স্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছে। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়। দুলাল কেম্ব্রিজে যায়—প্রণব লণ্ডনে ডাক্তারি পড়া সুরু করে। পাঁচবৎসর বাদে এফ-আর-সি-এস হ'য়ে ও বহু চেষ্টা ক'রে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের সার্জন হ'য়ে আসে—শুধু দুলাল লক্ষ্ণৌয়ের প্রফেসর হ'য়ে এসেছিল ব'লে।

অসিত : তারপর ?

মা: তারপর সে অনেক কাণ্ড! এক ইতিহাস! বলেনি দুলাল?

অসিত: কিছু বলেছে। তবে ও বলত—আপনার কাছেই শ্রোতব্য যা সব শুনতে।

মা: ওকে আমি বলি হীরের টুকরো ছেলে। অবিশ্যি দুলালের মতন নয়। কিন্তু খুব শুদ্ধ আধার। নৈলে কি যৌবনেই বৈরাগ্য আসে বাবা? বহুভাগ্যে তবে মানুষ বৈরাগী হ'তে পারে—বিশেষ ক'রে যৌবনে—সংসারে ঢুকবার আগে। দুলাল প্রায়ই আওড়ায় জানো তো—বৈরাগ্যমেবাভয়ম্?*

অসিত: ললিতার মুখে শুনেছি—প্রণব হিন্দু হয়েছে কেবল প্রেমলের টানেই।

মা: সেকথা ঠিক। ললিতা ওকে ঠাট্টা ক'রে প্রায়ই আওড়ায় মিলটনের: "He for God only she for God in him"—বলে দুয়ো প্রণবদা, তুমি কি না শেষটা she-দের দলে পড়লে?

অসিত: হ্যাঁ, ললিতা একদিন এ-ঠাট্টা করেছিল বটে। তাতে প্রেমল প্রণবের হ'য়ে বলেছিল: "কিন্তু বৃন্দাবনে এ অপবাদ নয় ললিতা, শিরোপা। কারণ ব্রজের ঠাকুরটির সবই বাঁকা—পুরুষকেও গোপী হ'তে হবে তাঁর রাসলীলায় পাসপোর্ট পেতে। (শান্তিদেবী শুধু মৃদু হাসেন)

অসিত (একটু ইতঃস্তত ক'রে): কিন্তু মা, একথা কি সত্যি? আমরা পুরুষ হ'য়ে জন্মে মেয়ে হ'তে যাব কী দুঃখে? গীতায় ঠাকুর কি 'পৌরুষং নৃণাং' ব'লে পৌরুষের তারিফ করেন নি?

মা: বৃন্দাবনের লীলার অন্দর মহলে না ঢুকলে ঠিক বুঝতে পারা যায় না বাবা, গোপী ছাড়া কেন সাধক গোপীনাথের মধুর ভাবের রস

---

* ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপানাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্।
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।
(ভর্তৃহরি—বৈরাগ্যশতক)

ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বৈভবে ভয় মহারাজের.
মানে—দৈন্যের, বলে—শত্রুর, রূপে ভয়—মোহিনীর মোহের।
পণ্ডিত ভয় বাসে বিদ্বানে, গুণী—খলে, দেহী যমে ডরে,
সকলেই ভয়ে সারা ভবে, শুধু বৈরাগ্যই ভয় হরে।

পেতে পারে না। (থেমে) খতিয়ে এ-ও ঐ অধিকারি-ভেদেরই কথা বাবা, তুমি ফের মুখ ভার করবে, তাই থাকুক এখন এ-আলোচনা। সব কিছুরই একটা লগ্ন আছে। ঠাকুর এখন তোমাকে টানছেন তাঁর ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে। পরে যখন ডাকবেন তাঁর মাধুর্যের রংমহলে তখন এ-তত্ত্ব বুঝতে তোমাকে আর কারুর কাছে ধর্না দিতে হবে না—তোমার প্রেমই তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবে।

অসিত (ঈষৎ ক্ষুণ্ণ): আমার কি সে-অবস্থা কোনোদিন হবে, মা? আমার সংশয় যে রকম প্রবল—

মা: বাবা, এযুগের মানুষের মন সংশয়কে লালন করতে চায় যে। কিন্তু কিছুই অকারণে ঘটে না। সংশয়েরও দরকার আছে।

অসিত: কী দরকার মা?

ললিতা (প্রণবের সঙ্গে ঢুকে): একটু দেরি হ'ল মা, কারণ ও ধ্যানে এমন বুঁদ হ'য়ে বসে ছিল যে, মায়া করল ধ্যান ভাঙতে।

প্রণব (মা-কে প্রণাম ক'রে—অসিতকে): তোমার কথা অনেক শুনেছি মা-র কাছে।

অসিত (আশ্চর্য): মা-র কাছে? প্রেমলের বা ললিতার কাছে বলো?

মা (হেসে): না বাবা। ওদের চেয়ে আমি তোমার বেশি খবর-রাখি ব'লেই এইমাত্র বলছিলাম যে গোপী বলতে কি বোঝায় সময় হ'লে ঠাকুরই তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। দেবেনই দেবেন—তুমি মিলিয়ে নিও, আর তখন আমি ওপার থেকে "টু" ক'রে হেসে বলব "কেমন? বলি নি?"

ললিতা: কী যে বলো মা? তোমার কী হয়েছে শুনি যে, অষ্টপ্রহর এমন কুডাক ডাকো?

মা: সে কেবল দুলাল জানে। আর ওপারে যাওয়ার কথায় তোরা এমন তড়পে উঠিস কেন? এ-দেহটা তো শুধু খাঁচা রে! (অসিতকে) সত্যি বলছি বাবা—এ-দেহটা যে খাঁচা এ আমি চাক্ষুষ করেছি। স্পষ্ট দেখেছি—আমার প্রাণপাখী আলাদা, আর বাইরের এ খাঁচা আলাদা। তবু এম্‌নিই ঠাকুরের মায়া বাবা, যে, মানুষ খাঁচাটাকেই পাখী ব'লে ভুল করে অষ্টপ্রহর।

অসিত: তাহ'লে কি বলবেন মা, যে, খাঁচাটা ভেঙে ফেলাই ভালো—পাখীকে মুক্তি দিতে?

মা : বাবা, যতক্ষণ সে ফর ফর ক'রে এদিক-ওদিক উড়ে খাঁচার মধ্যে দিব্যি খুশী থাকে, ততক্ষণ খাঁচা ভাঙবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া খাঁচা গড়তেও যিনি ভাঙতেও তো তিনিই। তাই খাঁচা ভাঙব বললেই কি কেউ ভাঙতে পারে? কিন্তু মরুক গে, এ হ'ল আসলে মায়াবাদের তর্ক—কেন মায়েশকে জানলে তবেই মায়াকে দুয়ো দেওয়া যায়—কী সে শ্লোকটা প্রণব?

প্রণব : দৈবী হ্যেষা গুণময়ী—তারপর (লাজুক হেসে) ভুলে গেছি মা।

অসিত (পাদপূরণ করে) : মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

মা : হ্যাঁ বাবা। আমাদের জন্মও ঐ জন্যেই—তাঁর এ-মায়ার জগতে এসে মিথ্যে মায়াকে পেরিয়ে লীলার কোঠায় পৌছতে। কারণ এ না পারলে খাঁচার শিকে কেবল পাখার ঝাপটা মেরে মুক্তি পাওয়া যায় না।

প্রণব : মা, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এ খাঁচাটা থেকে মুক্তি চাওয়াই যদি জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, তবে আমাদের এ খাঁচার মধ্যে তিনি পাঠালেনই বা কেন? আমরা তো তাঁর কোলে দিব্যি আনন্দেই ছিলাম খাঁচা বরণ করবার আগে! কিসের লোভে খাঁচার ডাকে সাড়া দিলাম? এসে দুঃখ পেয়ে খাঁচার শিকে ঝাপটা মেরে রক্তাক্ত হ'য়ে মড়াকান্না কাঁদতে?

মা : না বাবা। এ-সংসারটা বাঁধে এ হ'ল এর একটা দিক। কিন্তু বাঁধে কতদিন? না, যতদিন ভাবি খাঁচাটা খাসা নিরাপদ—আকাশে ওড়ার বিপদ আছে। এরই নাম মোহ। এ-মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বন্ধনের, খাঁচার জয়গান গেয়ে, কি 'বৈরাগ্যের পথ বিপথ' ব'লে শাঁখ ফুঁকে! সত্যিকার মুক্তি মেলে কেবল ভক্তিতে—তাঁকে ভালোবাসলে। সেই প্রেমের সাধনা করতেই তিনি আমাদের বন্ধনের মধ্যে খাঁচার মধ্যে পাঠান—বন্ধনের মধ্যে থেকে আরো গভীর সুরে তাঁকে ভক্তিদাতা প্রেমের ঠাকুর ব'লে চিনে বরণ করতে। যে-মুহূর্তে চিনি সে-মুহূর্তে খাঁচা আর খাঁচা থাকে না, হ'য়ে ওঠে অখণ্ড শান্তির নীড়। আর সে যে কী শান্তি বাবা—কী বলব? তন্ত্রে একটি শ্লোক আছে—গণয়সি যদিদং—(প্রণবকে) তার পরে কী রে?

প্রণব : বন্ধনমাত্রং—তারপরের লাইনে—

অসিত (পাদপূরণ করে) : পশ্চাদ্রক্ষ্যসি মোচনদাত্রম্।

ললিতা (চোখ বড় বড় ক'রে) : দাদা! তুমি তো সামান্যি ভণ্ড নও! কথায় কথায় বাপীর কাছে মাথা নিচু করো কী দুঃখে? তুমি নিজেও তো দেখছি কিছু কম বিদ্বান্ নও?

প্রণব : কী করো ললিতা—যা মুখে আসে—

অসিত (হেসে) : না না, ওর কথা আমার বড় মিষ্টি লাগে। আর ও কি শুধু আমাকেই ভণ্ড বলে? প্রেমলের সঙ্গেও কী ঝুটোপুটি লড়াই-ই না করে রাতদিন!

ললিতা : করি কি সাধে দাদা? প্রাণে বাঁচতে হবে তো? self-preservation—

মা : তুই ভারি নেমকহারাম। যে-কর্তা তোকে বাঁচালো তাকে দুষ্‌লি হর্তা নাম দিয়ে?

ললিতা : তুমি বলো কী মা? কর্তা আমার কী হাল করেছিলেন ইচ্ছে ক'রেই লিখি নি তোমায়—শুনলে তোমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত ব'লে। আর তুমিও কম যাও না মা! "যা—গাছতলায় থাক গিয়ে গুরুর সেবাদাসী হ'য়ে"—ব'লে আমাকে পাঠিয়ে তো দিব্যি আলমোরায় শান্তির মধ্যে রইলে খাঁচাকে আনন্দনীড় ব'লে চিনে! কিন্তু সুভদ্রা মেয়ের কী দশা হ'ল বলো তো? রইল কোথায়? না, একটা গোয়ালঘরে—যার দোর ভেঙে গেছে। সেখানে রান্নাবাড়া ক'রে গুরু সেবা করি কপাল চাপড়ে—কিন্তু রান্নাও শেষ হ'ল কান্নায়—ঘরের মধ্যে বান ডেকে যেতে। মেঝেয় এক বিঘৎ জল। দড়ির খাটিয়ায় ব'সে আপ্রাণ জপ করছি :

হরে কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ রক্ষা কৃষ্ণ যদি কৃষ্ণ,
করতে কৃষ্ণ পারো কৃষ্ণ তবেই বুঝব তুমি কৃষ্ণ!
গুরুর পাল্লায় লেডীর কৃষ্ণ কী হাল হ'ল দেখ কৃষ্ণ!
আর দেরি না ক'রে কৃষ্ণ, তার হাত থেকে বাঁচাও কৃষ্ণ!

এমন সময়ে মা, তাঁর উদ্ধব হ'য়ে এলেন এই দাদুদেব—সশরীরে, রাখে-কৃষ্ণ-র দূত হ'য়ে। তাই না মারে-কৃষ্ণর প্রহার থেকে বেঁচে গেলাম! তবু বলবে তুমি—গুরু আমার কর্তাকৃষ্ণ ভর্তাকৃষ্ণ? দুলাল তোমার কাছে গোপালকৃষ্ণ হ'তে পারে কিন্তু আমার কাছে করালকৃষ্ণ মনে রেখো।

মা (হেসে গড়িয়ে প'ড়ে) : কী মেয়ে রে তুই—এ যে ব্লাসফেমি! বিলেত হ'লে তোকে পুড়িয়ে মারত পোপ আর ইনকুইসিটরেরা মিলে।

ললিতা : ঈ-শ্! সাধ্যি কি? আমি দাদাকে ডাক দিতাম হাহাকার ক'রে (সুর করে) :

গান গেয়ে দাও দেখা দাদা, উঠল আগুন জ্ব'লে!
নেভাও শিখা বর্ষা ডেকে মল্লারহিন্দোলে।

অসিত পিঠ পিঠ সুর ক'রে ছড়া কেটে পাদপূরণ করে :

আঁচলে যে বাঁধল দাদায় ডরায় সে কী ব'লে?
অগ্নিপরীক্ষায় হবে পাশ গোলে হরিবোলে।

মা (একগাল হেসে) : টিট ফর ট্যাট, ঠিক হয়েছে বাবা! এ না হ'লে দাদা! কিন্তু আমি তো কই জানতাম না যে, ওরা গোয়াল ঘরে ছিল?

প্রণব : প্রেমল আমাকে লিখেছিল মা, কিন্তু আপনাকে বলতে বারণ করেছিল পাছে আপনি ভাবেন।

মা : না বাবা,! আমি ভাবব কেন? আমি যে চাক্ষুষ করেছি তাঁর লীলা—মুখের কথা বা কল্পনা তো নয়। দিনের পর দিন যে প্রত্যক্ষ দেখেছি—ঠাকুর আমাদের ধ'রে আছেন। (অসিতকে) বিশ্বাস কোরো বাবা, এ পুঁথির বুলি নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—যে, যিনি ওদের গোয়াল ঘরে বান ডাকিয়েছিলেন, তিনিই আবার তোমাকে ওদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ললিতা : কেমন ক'রে মা? দাদার সঙ্গে বাপীর দেখা হয়েছিল মথুরার বিশ্রাম ঘাটে একবার দৈবাৎ—accident যাকে বলে।

মা : ওরে মেয়ে! কতবার তোকে বলেছি বল্ তো, যে দৈবাৎ কিছুই ঘটে না তাঁর লীলায়? আমরা ভুগি কখন? —যখন নিজেকেই কর্তা মনে করি। কিন্তু একবার তিনি যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই কর্তা—আমরা তাঁর হুকুমেই উঠছি বসছি হাসছি কাঁদছি—সে প্রতি ওঠা-পড়ার মধ্যেই দেখে শুধু তাঁর বরাভয়—একহাতে বর, অন্যহাতে অভয়। লক্ষ্ণৌয়ে অতুল সেন একটি গান গাইতেন, আমার কী যে ভালো লাগত বলতে পারি না।

আমারে এ আঁধারে এমন ক'রে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি কিছুই যে গো!

এ-গানটি তিনি তাঁর জীবনের এক কঠিন পীরক্ষার সময় বেঁধেছিলেন বাবা, আমাকে বলেছিলেন।

অসিত: জানি। আমাকেও বলেছিলেন তিনি যে, আরও একটি গান—

"কি আর চাহিব বলো হে মোর প্রিয়
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও"

তিনি বেঁধেছিলেন যখন চারদিক আঁধার হয়ে এসেছিল। তাই আমাকে গান দুটি শেখাবার সময় তিনি বলেছিলেন: এ-দুটি গান যার তার কাছে যেখানে সেখানে গেও না।—গেও শুধু ভক্তের মাঝে—যারা বিশ্বাস করে, প্রতি কথায় তর্ক তোলে না—কেন এমন হ'ল অমন না হ'য়ে।

মা: ঠিক বলেছিলেন তিনি। আর কেন জানো? কারণ তিনি স্বভাবে শুধু কবিই ছিলেন না, ছিলেন ভক্ত—আর আগে ভক্ত, তার পরে কবি—ঠিক তোমারই মতন।

ললিতা: দাদা একথা মানে না। সে ঘড়ি-ঘড়ি বলে যে, সে আগে কবি গায়ক, তার পরে আস্তিক ভক্ত।

মা: ভুল বলে রে, স্রেফ ভুল। (অসিতকে) বাবা, তুমি এখনো নিজেকে চিনতে পারোনি—এ শুধু দুলালের কথা নয়—যা সে আমাকে দু'তিনটে চিঠিতে লিখেছিল—আমিও টের পেয়েছিলাম তোমার গান শুনে—প্রথম দিনই সেই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সে। মনে আছে তোমার কী গান গেয়েছিলে—দুটি ভজন?

অসিত: আছে মা। মীরাবাইয়ের "সুনী মৈ হরি আবনকী আবাজ" আর সুরদাস-এর "ইৎনা তো করো হে স্বামী জব প্রাণ তন্‌সে নিকলে।"

মা: হ্যাঁ বাবা, এই দুটি গান যে তুমি কী দরদ দিয়ে গেয়েছিলে আজও ভুলতে পারিনি আমি। আর শুধু আমিই নই (ললিতাকে), তোর বাবাও শুনে মুগ্ধ হ'য়ে ফিরবার সময় পথে আমাকে কী বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন: "ও মিথ্যে ওস্তাদি গান ওস্তাদি গান ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর স্বধর্ম কালোয়াতি নয়—ভজন ওর বুকের নিশ্বাস, প্রাণের প্রণামী। ও যা খুঁজছে তাকে পাবে এই ভজন কীর্তনের মধ্যে দিয়েই।" বুঝলি?

ললিতা: আমি তো বুঝেছি মা, তোমার আদরের দুলালও বুঝেছেন—কেবল অশান্ত দাদাটিকে বোঝাতে গিয়েই আমাদের যা প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ। ও

কিছুতেই মানবে না—যে-কথা তুমি এইমাত্র বললে—যে ও সব আগে ভক্ত সাধক তারপর কবি, গায়ক, লেখক, Pillar of society !

মা : তোকে নিয়েও বাছা, আমাদের কিছু কম প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়নি মনে রাখিস্—হ্যাঁ !

অসিত : মা, একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই খোলাখুলি। উত্তর দেবেন ?

মা : জানি বাবা, তোমার প্রশ্ন, তুমি কোনোদিন দুলালের মতন একান্তী হ'য়ে সব ছেড়ে শুধু ভগবানকে ডাকতে পারবে কিনা, এই না ?

অসিত (আশ্চর্য) : আপনি কি মনের কথা পড়তে পারেন নাকি মা ?

প্রণব (হেসে) : মা যে কী পারেন না পারেন তার পুরো খবর আমরা কেউ পাইনি ভাই। কেবল এইটুকু বলতে পারি—তুমি যতই দেখবে ততই থ হ'য়ে যাবে।

মা : থাম্ থাম্। অন্ততঃ মা একটি জিনিস পারে না যা ও পারে—গান গেয়ে ঠাকুরের ভাব সকলের মনে চারিয়ে দিতে। গাও তো বাবা একটি গান। কথা তো অনেক হ'ল। এবার গান হোক। প্রণবকে তলব করেছি সেই জন্যেই। কেবল ও-ই তোমার গান শোনেনি কখনো।

অসিত : না মা, গাইছি আমি, কিন্তু আগে আর একটু শুনতে চাই। (প্রণবকে) মার মধ্যে ঠিক কী দেখে তুমি থ হয়েছ বলো তো ?

প্রণব : কী দেখেছি ? (মা-কে) বলব মা ?

মা : বলো। কিন্তু যতটুকু ও বিশ্বাস করতে পারে তার বেশি না। যে যতটা সইতে পারে তাকে তার বেশি বইতে দিলে ফল ভালো হয় না—হয় সে শিরপা তোলে, নয় ভেঙে পড়ে।

ললিতা (অসিতকে) : দেখলে দাদা ? বাপীও ঠিক এই কথাই বলে। মা-ও বলছেন। তবু তুমি যে কী ! কেবলই বলবে সত্য যা তা সকলের কাছেই সত্য।

প্রণব : না অসিত, তা নয়। আমরা যত দেখি বুঝি চিনি আমি ততই বদলে যাই আর আর অন্তরের সেই পরিবর্তনের অনুপাতে সত্যের রূপও বদলে যায় বহুরূপীর মতন। এ শুধু মা বা প্রেমলের কথা নয়, আমি দেখেছি পদে পদে। শোনো বলি একটি অঘটনের কথা—তাহ'লেই বুঝবে কী ভাবে আমার মন বদ্‌লে গেল। (মা-কে) বলি মা—চরণামৃতের কথা ?

মা: না। অসিত চরণামৃতে বিশ্বাস করে না, হয়ত উলটো উৎপত্তি হবে আবার। ও হয়ত ভাববে তুমি ওকে convert করতে চাইছ। প্রপাগাণ্ডা কনভার্শনে আমার আস্থা নেই।

অসিত: মা, আমি অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারি না কারণ দেখেছি আমাদের দেশে অতি বিশ্বাসের কুফল। হাঁচি, টিকটিকি, পঞ্জিকা, টোটকা, ভেল্কি, ভূতপ্রেতদৈত্যদানা—আমরা উদার, সর্বভূক্ সব তাতেই নিরপেক্ষভাবে বিশ্বাস করি। আমি চাই কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পেয়ে তবে বিশ্বাস করতে—কিন্তু চোখ খুলে।

মা (প্রণবকে): ওকে বলো না কী ভাবে তোমার এ-মতের বদল হয়েছিল। তুমিও তো ঠিক এই রকমই ভাবতে এক সময়ে।

প্রণব: কিন্তু আপনার চরণামৃতের অঘটন না বললে আমি কী ক'রে বোঝাব মা আমার a priori ধারণা কেমন ক'রে ঘা খেয়েছিল?

মা (একটু ভেবে): আচ্ছা বলো। কে জানে—হয়ত তোমাব এজাহারে ওর বিশ্বাস আসতেও পারে।

ললিতা: শুধু প্রণবদার এজাহার বলছ কেন মা? বাপী আমি—আর সবার উপরে তুমি—এই ত্রিমূর্ত্তির এজাহারও চাপাব—coroborative evidence with a vengeance, যাকে বলে। তাতেও যদি ও না বোঝে তো ফরাসীদের ঢঙে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলব—tant pis-pour দাদু!*

অসিত: অত তোড়জোড় বাঁধতে হবে না দিদি। তুমি ফরাসী ভাষায় পণ্ডিতা—তাই নিশ্চয়ই পড়েছ Rabelais-এর বিখ্যাত Gargantua—তিনি লিখেছিলেন: "L'appétit vient en mangeant"† প্রণবের কথা শুনতে শুনতে আমার শোনার তৃষ্ণা এত নিবিড় হ'য়ে উঠেছে যে—যে, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না সত্যিই। তাই কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, মা যখন সামনে ব'সে আর অঘটনটা ঘটেছে তাঁর চরণামৃত নিয়ে, তখনও যদি আমি অবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে থাকি তাহ'লে আমি পাষণ্ডী—মানতেই হবে।

প্রণব (নরম স্বরে): না, তা নয় ভাই। আমি কি জানি না—অঘটনে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে কী কী কারণে? আর তুমি তো ভুলও বলোনি যে,

* তাহ'লে দাদুই দুর্ভাগা বলতে হবে।

† খেতে খেতে ক্ষুধা বাড়ে।

মানুষ প্রায়ই কানপাৎলা হ'য়ে যা শোনে তাই বেদবাক্য মনে ক'রে বসে—শুধু তোমাদের দেশেই নয়, আমাদের দেশেও। বলতে কি, বুদ্ধিবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের প্রতিষ্ঠা হু হু ক'রে বেড়ে উঠেছে—মিডীভাল যুগে আমরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বভূক্ হ'য়ে উঠেছিলাম ব'লেই তো। তাছাড়া বুদ্ধিবাদ ও বিজ্ঞানবাদের বাজারে এ-যুগে নগদবিদায় মেলে হাতে হাতে। ফলে মানুষ ভাবে—যে-বিশ্বাসের ফল তখনি তখনি প্রত্যক্ষ না হয় সে নামঞ্জুর। অন্ততঃ আমি এই রকমই ভাবতাম যখন প্রেমলের টানে এদেশে আসি।

মা: কিন্তু সংক্ষেপে বলো। বেশি ফলাও করার দরকার নেই। আলোচনা ঢের হয়েছে, আমি এখন ওর গান শুনতে চাই। (ললিতাকে) তুই ওর হার্মোনিয়মটা এনে ওর সামনে রাখ।

প্রণব (হেসে): গঞ্জনা শিরোধার্য মা। আমি সত্যিই বলতে বলতে উজিয়ে উঠি—জানি হাড়ে হাড়ে। প্রেমলও আমাকে কতবারই যে ধম্‌কেছে।

মা (সান্ত্বনার স্বরে): না বাবা, যা দেখে আমাদের মন অভিভূত হয় তাতে আমাদের উজিয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তুমি বলো, আমি আর টুকব না।

প্রণব (একটু ভেবে): কোত্থেকে স্বরু করব?—হ্যাঁ, প্রথম দিকের কথাটা বাদ দিয়ে যাই যখন বিলেতে প্রেমলের সঙ্গে লড়তাম। ও বলত—বিশ্বাস খানিকটা স্বভাবেই অন্ধ, আমি বলতাম—না, বিশ্বাস চক্ষুষ্মান্‌ও হ'তে পারে।

ললিতা: পারে কি মা? আমার তো মনে হয় বাপীর কথাই ঠিক।

মা: বিশ্বাস অনেক সময় গজায় দেখার ফলে এ কথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু যারা স্বভাবে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস দেখার অপেক্ষা রাখে না। আর, এ সম্পর্কে আর একটা কথা মনে রাখা ভালো: যে, দেখার ফলে যে বিশ্বাস আসে অনেক সময়ে সে উল্টো দেখার ফলে উবেও যেতে পারে। যেমন ধরো, কোনো সাধুর ছোঁওয়ায় দেখলাম অমুকের অসুখ সেরে গেল। অম্‌নি দৈবী শক্তিতে গভীর বিশ্বাস এল ধাঁ ক'রে। কিন্তু তার পরে সে-সাধু বা অন্য কোনো সাধুর ছোঁওয়ায় কিছুই হ'ল না, কোনো রুগী মারা গেল। অম্‌নি ফের ঝাঁ ক'রে সমান জোরালো অবিশ্বাস এসে গেল। সাধু সন্ত মুনি ঋষিরা যে-বিশ্বাসের কথা বলেছেন সে যখন আসে আপনি আসে—বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে দাঁড় করানো যায় না বা গেলেও তখনি ট'লে পড়ে। ধর্মের ক্ষেত্রে এই স্বয়ম্ভূ—মানে ভুঁইফোড়—বিশ্বাসেরই দাম বেশি। গয়ায় মহাপ্রভুর

বিশ্বাস এসেছিল এম্‌নি হঠাৎ আচম্‌কা—পাথরে বিষ্ণুপাদপদ্মের ছাপ দেখে। কারুর বিশ্বাস আসে শোক তাপে, আবার কারুর বিশ্বাস দুঃখে পড়লেই উবে যায়। আমাদের এই অসিতকেই দেখ না কেন। প্রেমল আমাকে লিখেছে যে ও স্বভাবে সংশয়ী ব'লে জাঁক করে, কিন্তু দশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণে বিশ্বাস এসে গিয়েছিল কেন ও কীভাবে ও ভেবে পায় নি। শুধু কৃষ্ণে না. আরো কঠিন গঙ্গাকে পতিত-পাবনী ব'লে বিশ্বাস্ করতে পারা। অথচ (অসিতকে) যে-তুমি ঘড়ি ঘড়ি সংশয়কে আমল দিয়ে কষ্ট পাও বাবা, সে-তুমি কি গঙ্গাকে সাক্ষাৎ মা ব'লে ডাকতে আনন্দ পাও নি?

অসিত: পেয়েছি বৈ কি মা। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে, আমি গঙ্গাকে দেবী ব'লে আন্তরিক বিশ্বাস করি? ঠিক বুঝতে পারি না মা, কোথেকে খাঁটি বিশ্বাসের সুরু হয়—আনন্দ থেকে, কোনো অনামী ঝোঁক থেকে, না কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা—experience—থেকে। (প্রণবকে) তুমি চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস বলতে ঠিক কী বুঝছ আমাকে বলতে পারো? আমার সত্যি ধাঁধা লাগে ব'লেই জিজ্ঞাসা করছি, তর্ক করতে নয়।

প্রণব: ধাঁধা আমারও লাগত—আরো প্রেমলকে দেখে। বলি শোনো—অন্ততঃ বলতে চেষ্টা করি গুছিয়ে। (একটু থেমে)।

প্রেমল যখন মা-কে গুরু করে তখন আমি বিলেতে। ওকে লিখলাম আপত্তি ক'রে। ও বলল: তুমি দেখ নি মাকে তাই তোমার আপত্তি নামঞ্জুর। ব্যস। আর কিচ্ছু না। আমি ঘা খেলাম, কিন্তু কৌতূহলও হ'ল বৈ কি। কারণ প্রেমলের অসামান্য বুদ্ধি ও ধীশক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমীহের অন্ত ছিল না। অনেক চেষ্টা ক'রে লক্ষ্ণৌয়ে একটা সার্জনের কাজ জোগার ক'রে এলাম তো লক্ষ্ণৌয়ে।

এসে প্রেমলকে দেখে প্রথমটা একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। এ যে অভাবনীয়! শুধু তো মালা-তিলক গেরুয়া ভেখই নয়—ওর কথাবার্তা হাসি ঠাট্টা চালচলন সবকিছুই আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলল।

তারপর দেখলাম মা-কে। কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাই প্রেমল দণ্ডবৎ হ'য়ে তাঁকে প্রণাম করে দেখে আরো ঘা খেলাম।

তারপর নানা ওঠা-পড়া আগু-পাছু—সব বলার এখন সময় নেই—তাছাড়া মা-ও বলেছেন সংক্ষেপ করতে। তাই বলি—অনেক পোড় খেয়ে শেষটায়

ঠিক করলাম, প্রেমল যখন মা-কে গুরু করেছে তখন নিশ্চয় কিছু দেখেছে তাঁর মধ্যে যা আমি দেখতে পাই নি ব'লেই আমার মন বাগ মানছে না।

এমন সময়ে হঠাৎ মহেন্দ্রবাবুর অসুখ করল। হার্ট অ্যাটাক্। থ্রম্বোসিস। আমি গিয়ে দেখলাম অবস্থা খুব সঙিন। কিন্তু মা অটল অচল। বললেন: ওষুধ ইঞ্জেকশনে কাজ হবে না। তিনি শুনেছেন (কার কাছে, বললেন না) যে, শুধু নাম জপ করতে হবে তাঁর শিয়রে।

মা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কেবল জপ ক'রে চললেন। আমার মনে হ'ল—"মিডীভাল—ননসেন্স্। এইসব কুসংস্কারের ফেরেই মহেন্দ্রবাবু মারা যাবেন। প্রেমলকে বললাম যে, মহেন্দ্রবাবুকে নার্সিং হোমে নিয়ে না গেলেই নয়—আমি ডাক্তার, জানি তো থ্রম্বোসিস্ কী ব্যাপার! বললাম He is sinking!

প্রেমল আমাকে ভ্রুকুটি ক'রে বলল: "মা যখন বলেছেন তখন তোমার আর কিছু বলবার দরকার দেখছি না। তুমি যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে।"

মনে খুবই কষ্ট হ'ল। যার জন্যে আমি বিলেত থেকে এতদূর এসেছি কাজ নিয়ে সে-ই কিনা আমাকে ধম্‌কালো এমন রূঢ় ভাষায়! বললাম মনে মনে: "সাজা হবে—যখন রুগীর নাভিশ্বাস হবে—আর হ'ল ব'লে।"

কিন্তু পরদিন গিয়ে দেখি—অবাক্ কাণ্ড! নাড়ী ফিরে এসেছে, জ্ঞানও হয়েছে। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার। কেবল দুর্বলতা ছাড়া আর কোনো উপসর্গই নেই!

এ কী মিরাক্ল!! স্বচক্ষে দেখে আর না মেনে করি কি? কিন্তু তবুও বিশ্বাস হ'ল না যে, মহেন্দ্রবাবু মা-র নামজপের প্রসাদেই সেরে উঠেছেন। প্রেমল আমাকে বলল ব্যঙ্গ হেসে: "কী সবজান্তা সায়েন্টিস্ট? যা দেখছি আমারা সব চোখের ভুল—না অটোসাজেস্‌চন?"

আমি মুখে বললাম বটে: "chance!" কিন্তু মনে বিষম চোট লাগল। তবে কী মা সত্যিই ভগবানের কাছ থেকে বাণী পান? সব ছেলে-ভুলোনো রূপকথা নয়?

প্রেমল বলল আমাকে একটু ঠেশ দিয়েই যে, গুরুকরণ না হ'লে এ-সব গুহ্যতত্ত্বের মর্মজ্ঞ হওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলল আমাকে গুরুবরণ

করতে। ফল যা হবার: আমার মন একেবারে বেঁকে বসল। মাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম সত্যিই। কিন্তু জানোই তো, আমরা স্বভাবে একটু স্বাবলম্বী। তাই গুরুর কাছে নত হবার কথা ভাবতেই পারতাম না।

তারপর মনে সে কী অশান্তি—তোলপাড়, ওঠাপড়া, আগুপিছু! আমি এসেছিলাম প্রেমলের সঙ্গে দর্শন-টর্শন প'ড়ে ধর্মজীবনে ফুটে উঠতে। কিন্তু প্রেমল একরকম আমাকে খেদিয়েই দিল। যাকে চিরদিন আমার আদর্শ ব'লে বরণ ক'রে এসেছি—যার জন্যে সাত সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি এ-দুঃসহ গরমে ভাজা হ'তে—সে কি না এভাবে মুখ ফিরোলো! ভাবলাম: আর না—ফিরে যাব লণ্ডনে।

কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেব দেব ভাবছি—এমন সময় প্রেমলের পায়ে কী একটা পোকা কামড়ানোর ফলে ওর সমস্ত পা বিষিয়ে উঠল। ঠিক সে সময়ে মা গিয়েছিলেন ললিতাকে নিয়ে বদরীনারায়ণ। প্রেমল তখন লক্ষ্ণৌয়ের প্রফেসর।

মহেন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে বললেন: রক্ত বিষিয়ে উঠেছে—ইঞ্জেকশনে কাজ হচ্ছে না। প্রেমল যন্ত্রণায় দারুণ কষ্ট পেলেও একটি কথাও বলত না। কিন্তু শেষে ওর অবস্থা সঙিন হ'য়ে দাঁড়াতে যখন আমরা স্থির করলাম অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই তখন ও বলল: "মার অনুমতি চাই।"

আমি বিরক্ত হ'লেও উদ্বিগ্ন হ'য়ে তার করলাম মা-কে। জোর দিয়েই: "এক্ষুনি অপারেশন না করলে প্রেমলকে বাঁচান যাবে না"।

মা তার করলেন: "অপারেশন কোরো না, কোনো ওষুধও দিও না, আমি যাচ্ছি।"

মা ফিরে এলেন ঠিক দুদিন বাদে। ইতিমধ্যে প্রেমলের শুধু পা নয়, উরুও ফুলে উঠেছিল বিষের তাড়সে। অথচ ও অপারেশন করতেও দেবে না। বলল: "মা যখন বলেছেন, তখন তার উপর কথা চলে না।" আমি বললাম: "কিন্তু আর দেরি করলে হয়ত—" ও আমাকে থামিয়ে বলল: "যাই হোক না কেন, আমি জানব ঠাকুরের ইচ্ছা। কারণ গুরুর ইচ্ছার মধ্যে দিয়েই তাঁর ইচ্ছা প্রকট হয়।"

আমি একেবারে চম্‌কে উঠলাম। এ তো rank bigotry। হাল ছেড়ে দিলাম। কেবল মনের মধ্যে সে কী আকুলি বিকুলি! এ হেন বুদ্ধিমানেরও এমন মতিচ্ছন্ন হয় ধর্মের কুসংস্কারে!

এদিকে মা এসে ব্যবস্থা করলেন—প্রতি ঘণ্টায় শুধু দুচামচ ক'রে চরণামৃত। ব্যস, আর কিছু না।

তিন দিনের দিন পা ফুলো ক'মে গেল। মহেন্দ্রবাবু বললেন: বিপদ কেটে গেছে।

তারপর দিন আমি চোখের জলে মা-র কাছে দীক্ষা নিলাম।

ললিতা (অসিতকে): প্রণবদা খুবই সংক্ষেপে বলল দাদা। সে-অসুখের দৃশ্য চোখে দেখতেও কষ্ট হ'ত। ঐ সহিষ্ণু মানুষ বিছানায় কেবল এ-ওপাশ।

দিল্লী থেকে এক স্পেশালিস্টকে ডেকেছিল প্রণবদা কাউকে না ব'লে। তিনিও এসে ব'লে গেলেন "I give him two or three days at most." শেষে আক্ষেপ ক'রে বললেন: "সময়ে অপারেশন করলে রোগীকে বাঁচানো যেত।"

প্রণবদা তখন বলল: "রোগীর গুরু বলেছেন চরণামৃতে সারবে—মানে holy water. দিল্লীর ডাকসাহিটে ডাক্তার মুচকে হেসে গুড্‌বাই ব'লে প্রস্থান।

প্রণব: আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে, প্রেমলকে মার্ডার করা হচ্ছে ধর্মের নামে। চোখের জলে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শুধু একটি কথা: তিনি কি সত্যি শুনেছিলেন কোনো স্বর, না, যাকে আমরা বলি ইনটুইশন—the still small voice?

মা (হেসে): হ্যাঁ বাবা। ওর সংশয় দেখে সে-সংকট সময়েও আমার হাসি এসেছিল।

মানুষ ইচ্ছে ক'রে ঠাকুরের কৃপাকে দূরে ঠেলে রাখে ব'লেই দেখেও দেখতে পায় না। আর এই জন্যেই মহাভারতে বলেছে:

"অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী"—মরুকগে বাবা, সংশয়ের বিতণ্ডা তো যথেষ্ট হ'ল, এবার গানের শান্তিবারি ঝরাও—গাও তোমার সেই স্বরচিত গানটি যেটি প্রেমল লিখে পাঠিয়েছিল। লিখেছিল: এ-গানটি তোমার মুখে শুনে শুধু সে নয়, স্বয়ং মাধববাবা আর দেবানন্দ মহারাজও চোখ মুছেছিলেন—ললিতা ও তারার তো কথাই নেই। এই যে বলতে বলতে ওরা এসেছে—(তারাকে) এসো মা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে,

এসো মাধব বাবা। তোমাদের নাম করতেই এলে। আর প্রেমল, বোস্। এত দেরি?

তারা: (প্রণাম ক'রে) সাঁতার দিচ্ছিলেন মা!

ডাক্তারবাবু: হ্যাঁ। উঃ কী কাণ্ড! এই বর্ষার গঙ্গা! (প্রণাম)

মা: ও অম্‌নি রোখালো। (আর অবাধ্য) সাধে কি ওর শিষ্যা জুটেছে ললিতা? শোধবোধ। (ডাক্তারবাবুকে) বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল বাবা! তাই আমি বলছিলাম কারুর কারুর বিশ্বাস এম্‌নিই আসে—সংস্কারেই বলব। যেমন গঙ্গাকে পাপহারিণী দেবী ব'লে বিশ্বাস।

তারা: দাদা যে কী সুন্দর গঙ্গাস্তব গান!

মা: হ্যাঁ, আমি ওকে সেই গানটিই গাইতে বলছিলাম—প্রেমল আমাকে লিখেছে। ললিতা পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে—যেমন সুর তেমনি গান—একেবারে খাঁটি বাংলা কীর্তন। (তারাকে) তোমাদের সঙ্গে কথা হবে মা পরে। আগে গান শুনি একটু। অবিশ্বাসের জেরায় তর্কে যখন মন শুকিয়ে আসে, তখন কেবল গানের ধারায়ই সব তাপ জুড়িয়ে যায়। আহা গাও তো বাবা, গাও। (প্রণবকে) তোর কথা পরে বলিস। ভালোই হ'ল, ওরাও শুনবে। বলে না—ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যে? ঠিক কথা। এ-তর্কাতর্কি না হ'লে তো ওরা কেউ শুনতে পেত না।

তারা (সকৌতুহলে): কী কথা মা?

ললিতা: চরণামৃতের। (ঠোঁটে হাত নিয়ে) কিন্তু এখন এক্কেবারে চুপ। সেকথা আসছে। এখন গানের পালা।

অসিত হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গায়:

এসো পতিতপাবনী, তৃষ্ণাহরণী, কোলে তুলে নিতে গেয়ে গান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায় দিতে মা, তোমার বরদান॥
কত মিছে কাজে পড়ি বাঁধা হায়!
তাই শুনি না তোমার "আয় আয়"!
যায় বেলা, তবু মায়াদীপ জ্বেলে চাই ছায়ায় আলোর সন্ধান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা, তোমার বরদান॥
গেয়ে আলোকীর্তন হরিনাম
প্রেম-শঙ্খ বাজাও অবিরাম,

ওগো তারিণী, বেদনাহারিণী, আমরা পাতি না সে-স্থরে আজো কান।
এসো ধূসরধরায় নীল করুণায়—দিতে মা, তোমার বরদান ॥
ফিরে তোমার পায়ে মা এসেছি,
যাকে শৈশবে ভালোবেসেছি,
বেজে ওঠে সেই হারা রাগমালা শুনি' তোমার প্রেমের কলতান।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা, তোমার বরদান ॥
আর থেকো না মা ভুলে পান্থে,
দাও শান্তি উদাসী ক্লান্তে,
করো একান্ত তব চরণে, চায় না ভ্রান্তিবিলাস আর প্রাণ।
এসো ধূসর ধরায় নীল করুণায়—দিতে মা, তোমার বরদান ॥

গাইতে গাইতে অসিতের দৃষ্টি পড়ে সামনের নীলাঞ্চলা গঙ্গার পানে। তীর্থের তীর্থ বারাণসী, নদীর নদী গঙ্গা—সবার উপর, শ্রোতা—ভক্ত ও ভক্তিমতী, যাদের মুকুটমণি—কৃষ্ণপ্রাণা বৈরাগিনী! ওর মনে আবেশ ছেয়ে এল দেখতে দেখতে। আঁখরের পর আঁখর তানের পর তান কে যেন ওকে জুগিয়ে দেয় না চাইতেই! এরই তো নাম প্রেরণা যার আভাষ পেয়েছে অগুন্তি সন্ধানী কিন্তু হদিশ পায় নি কেউই—কোত্থেকে সে আসে, কোন পথ বেয়ে—যখন আসে কখন বিত্যুৎঝলকের মতন যুগের আঁধারকেও লুপ্ত ক'রে দেয় মুহূর্তে। কিন্তু না এলে হাজার সাধ্যসাধনা করলেও মেলে না তার প্রসাদ···

গাইতে গাইতে ওর চোখে জল আসে, কণ্ঠে জেগে ওঠে এক নবস্পন্দ যেন আলো হ'য়ে। এক একবার চোখ পড়ে প্রেমল ও মা-র মুখে: একজন শান্ত স্থির, অন্যজন জলভরা চোখে হাত জোড় ক'রে মা গঙ্গার দিকে চেয়ে। এমন শ্রোতা পাবার ভাগ্য মানুষের জীবনে তো বেশি আসে না। সত্যিই ভাগ্যবান্ ও। তবু কেন সংশয় বার বার হানা দিয়ে ওর মনের সব আলো নিভিয়ে দেয়? কেন ও বিশ্বাসকে বিশ্বাস করতে এত বেগ পায়? কই গানের সময় তো অবিশ্বাসের লেশও থাকে না—তখন সত্যিই যেন প্রত্যক্ষ মনে হয় দৈবী কৃপাকে —যার ঢল নেমেছে গঙ্গার পাবনী ধারায়! এ আর এক আশ্চর্য!—গানের সময় ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন আলো জ্বলে ওঠে, কিন্তু তখনও আর একটা অংশ যেন চেয়ে চেয়ে দেখে সে আলো—অবাক হয়, সময়ে সময়ে অভিভূত হয়, কিন্তু থাকে বিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা হ'য়ে। একই মানুষের মধ্যে

পাশাপাশি থাকে দুই দ্রষ্টা বা চেতনা যা-ই নাম দেওয়া হোক না কেন—নাম নিয়ে তো কথা নয়। আবার গানের পরেই ঐ ঘন মেঘ ছেয়ে আসে, আলো-কে তখন মনে হয় আবছা স্মৃতিমাত্র! তখন কথা কয় যে-মানুষ সে-গায়ক মানুষটিকে কেউ সনাক্ত করতে পারে কি অসিত ব'লে? এক কথায় কোন্‌টা আসল অসিত? যে বিশ্বাস করতে শুধু যে চায় তাই নয়, বিশ্বাস ক'রেই নিজেকে ধন্য মনে করে? না, যে বুদ্ধির ঝাঁঝালো অভিমানে বিশ্বাসীর নানা সিদ্ধান্তকে নামঞ্জুর করে ছেলেমানুষি ব'লে?

পাঁচ

গান শেষ হ'লে অনেকক্ষণ কেউই কথা কয় না। শুধু ঘরের দেয়াল-ঘড়ি টিক টিক ক'রে জানিয়ে দেয় যে, সামনের গঙ্গার মতন কালস্রোতও অশ্রান্ত ব'য়ে চলেছে দৃশ্য থেকে অদৃশ্যের পানে। অসিতের মনের মধ্যে শান্তি বিছিয়ে যায়। ললিতাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙে: "মা, যমুনা কিন্তু মা গঙ্গার মতন নন।"

মা (চোখ মুছে): ওরে, গঙ্গার এক নাম—ধর্মদ্রবী, আর এক নাম—ত্রিপথগা মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে বলেছে—ত্রৈলোক্যপাবনী। কিন্তু, বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে এসব উপাধির ভাষ্য কি কেউ করতে পারে? (অসিতকে) আহা কি গানই তুমি শোনালে বাবা! তবু তুমি বলো তুমি সংশয়ী! গান গাইতে গাইতে কি তোমার নিজেরই মনে হয় নি যে, নিজেকে তুমি এখনো চিনতে পারো নি?

ডাক্তারবাবু: কিন্তু মা, গান গায় যে-অসিত সে কি আলাদা মানুষ নয়?

মা: হ্যাঁ-ও বটে, না-ও বটে। আসলে ব্যাপারটা কি জানো বাবা? যেমন যে-কোন দেহও দেখতে বেশ একটি পদার্থ মনে হলেও আসলে বহু অণু-পরমাণুর যোগফল, তেমনি একই মানুষের মধ্যে বহু উল্টো পাল্টামি তাল পাকিয়ে—কী যে হয়েছে কে বলবে? কেবল একটি কথা বলা যায়—এ-হেঁয়ালির তল পেতেই আমাদের জন্ম—চিনতে হবে নিজেকে। আর চিনলেই দেখতে পাবে যে, যে-আমিকে "আমি" নাম দিচ্ছি সে হ'ল

তিনিই—ঠাকুর। তারপর? তারপর আর কী বাবা? (গাঢ়কণ্ঠে) শুধু আনন্দ আর আনন্দ! মীরার একটি গানে আছে না:

সৌদাই কৈসা কর দিয়া, য়ে ক্যা দশা করী?
দেখুঁ জিধর দিখে হরী—হরী—হরী—হরী!

আর এই পাগল হওয়ার যে কী আনন্দ বাবা, কী বলব? ব'লে কি কেউ বোঝাতে পারে—তন্ময় হ'লে মৃন্ময় কেমন ক'রে চিন্ময় হয়? কেমন ক'রে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু এসে হাজিরি দেয়—অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে? (অসিতকে) বিশ্বাসের কথা বলছিলে বাবা—যে ভুল বোঝায়, ভুল দেখায় বিপথে চালায়? কিন্তু সব মেনে নিয়েও বলা যায় যে, নিরানব্বই জন মানুষকে যদি সে অন্ধকারে ঘুরিয়ে মারে, তাহ'লেও বাকি একজনকে পাগল ক'রে দিয়ে যে-আলোর কূলে টেনে তোলে সে-আলো তার নিরানব্বই গুণ অন্ধকারকেও দুয়ো দেয়। কিন্তু এসবও খতিয়ে মায়া তর্ক, বাবা! যে দেখেছে ঠাকুরকে—যেদিকে চায় তাঁর আনন্দকে ছুঁয়ে সে আনন্দের ছোঁওয়ায় পাগল হ'য়ে গেছে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্ক শুনে সে হেসে মরে। সে যে কী আনন্দ, কী শান্তি, বাবা—ঠাকুরকে সর্বত্র দেখা—সে কথা কী ক'রে বোঝাব তোমাদের যারা তাঁকে আজো দেখোনি। তাই তর্ক করতে প্রাণ চায় না; শুধুই ডাকি—ঠাকুর এদেরও দেখাও যা দেখলে আর কিছু দেখার থাকে না, জানিয়ে দাও যা জানলে আর কিছু জানার থাকে না, ভালোবেসে শেখাও ভালোবাসা কাকে বলে···ঠাকুর···ঠাকুর···ঠাকুর!

(বলতে বলতে মাথা নুয়ে পড়ে······কথা জড়িয়ে আসে) আমি ঠাকুর ······তুমি······তু······

(সমাধিতে দেহ স্থির, শুধু চোখের কোণে প্রেমাশ্রু)

সকলে হাতজোড় ক'রে মাথা নিচু করে। তারা ও ললিতা চোখে আঁচল দেয়। ডাক্তারবাবু দণ্ডবৎ করেন।

ঠিক এই সময়ে মহেন্দ্রবাবু ঘরে ঢুকেই "ও!" ব'লে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে। প্রণব উঠে চেয়ার এগিয়ে দেয় মা-র ঠিক পাশেই। মহেন্দ্রবাবু বসেন। ওরা সবাই একে একে তাঁকে প্রণাম করে।

এমন পাগল করল আমায় কে সে, মরি রে!
চাই যেদিকেই দেখি হরি হরি হরি যে!

ছয়

মহেন্দ্রবাবু (অসিতকে মৃদুস্বরে) : কখন এলেন ?

অসিত : আমাকে আপনি বলবেন না। মা আমাকে যেমন তুমি বলেন, আপনিও তেমনি তুমিই বলবেন।

মহেন্দ্রবাবু (প্রসন্ন) : আচ্ছা আচ্ছা। পাশের ঘর থেকে শুনেছি তোমার গান।

ললিতা : সে কি বাবা ? ঘরে এলে না কেন ?

মহেন্দ্রবাবু (হেসে) : ডাক্তার হ'য়ে হাজার পুণ্য সঞ্চয় ক'রে থাকি না কেন, ভজনের রসভঙ্গ করলে সে-পাপের দ-য়ে সব সুকৃতি মজবার ভয় আছে তো ?

প্রণব : আপনার মতন মহাযোগীরও ভয় ? কবে শুনব মা বলছেন—তাঁকেও গঙ্গাস্নানে নির্মল হ'তে হবে !

মহেন্দ্রবাবু : প্রথম কথা—আমি মহাযোগী—এটা নিছক গুজব। দ্বিতীয় কথা : শঙ্করাচার্যের মতন মহাত্মাকেও গাইতে হয়েছিল এক সময়ে মা গঙ্গার কাছে হাতজোড় ক'রে :

রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।

(সুর নামিয়ে) তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—তাঁরও পাপ যদি নাও থাকে, পাপের ভয় ছিলই ছিল। (থেমে) তার উপর, দেখছ তো তোমাদের মা-র অবস্থা ? আমি পাশের ঘর থেকে ওঁর প্রতি কথাটি শুনেছি······আর (অসিতকে) মনে মনে বলেছি—তুমি এতদিনে ঠিক শ্রোতাটি পেয়েছ।

অসিত (হেসে) : তার মানে—আপনি কি বলতে চাইছেন—আপনি ঠিক শ্রোতাদের মধ্যে পড়েন না। বৈষ্ণব কিনা ?

মহেন্দ্র : না বাবা, আমি বৈষ্ণব নই। তবে বৈষ্ণবদের মানি—মানে, যদি খাঁটি বৈষ্ণব হয়।

ললিতা : খাঁটি বৈষ্ণবের ডেফিনিশন কী বাবা ?

মহেন্দ্র : মা-র চৈতন্যচরিতামৃত-পড়া কী শুনলি তবে এতদিন ? মানে (প্রেমলকে দেখিয়ে) ঐ যে দেখছিস না "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ

স্ফুরে—" কি না, যাকে দেখবামাত্র কৃষ্ণের কথা আলো হ'য়ে মনে ঝল্‌কে ওঠে তারি নাম বৈষ্ণব।

অসিত (হেসে): আপনার এক উপাধি শুনেছি "ধন্বন্তরি"। তিনিও কি বৈষ্ণব নন ?

মহেন্দ্রবাবু: সাত জন্মেও না বাবা! বাঘের ছোঁয়ায় আঠারো ঘা হ'লে তবেই ধন্বন্তরির ডাক পড়ে—অর্থাৎ সংসারের নানা তাপে যখন দেহ বিকল হয় হাজারো ব্যাধিতে, তখন তাকে যিনি মেরামত করেন, তাঁর নাম ডাক্তার। যিনি মনের লাখো আঁধি দূর ক'রে ভক্তি জাগান, কেবল তাঁরই উপাধি বৈষ্ণব।

ললিতা: তাহ'লে তো বলতে হবে দাদাজিও বৈষ্ণব—যে গান গেয়ে বাপীর মতন পরম বৈষ্ণবের মনেও ভক্তির বান ডাকিয়ে দিতে পারে ?

মহেন্দ্র: একশোবার। তবে ও এখন গাঢাকা হ'য়ে আছে—অর্থাৎ কিনা গুপ্তবৈষ্ণব।

প্রণব: যেমন আপনি গুপ্তযোগী ?

মহেন্দ্র: কী জ্বালা! আমাকে ছেড়ে দাও না, আমি বেচারী গঙ্গাতীরে কুটির ক'রে কোনোমতে গঙ্গাস্নানের জোরে তরে যেতে চেষ্টা করছি—আমি যদি গুপ্তযোগী হই তবে ঐ—ঐ বাদুড়টাও গুপ্তপাখী।

ললিতা (রুষ্ট): কী যে বলো তুমি বাবা ? তুমি মা-র গুরু নও ?

মহেন্দ্র: সে পূর্বাশ্রমে।

ললিতা (অসিতকে): দাদা, তোমার সঙ্গে বাবার মিলবে ভালো। তবে আমরা দেখব পাল্লা দিয়ে কে জেতে ?

প্রেমল: কিসের পাল্লা ?

ললিতা: আত্মগোপনের। কম্পিটিশন বিটুইন গুপ্তবৈষ্ণব ভার্সাস গুপ্তযোগী—হিপ্ হিপ্—

মহেন্দ্র: শ্—শ্ (মা-কে দেখিয়ে)

ললিতা (লজ্জিত): ভুলে বাবা, ভুলে। (স্বর নামিয়ে) কেবল এজন্যে দায়ী তুমি, মনে রেখো।

মহেন্দ্র: আমি দায়ী ? কিসে ?

ললিতা: কিসে নয় তাই বলো। যে সকলের কাছে মান পেয়ে কথায় কথায় নিজেকে ছোট করে, তার ওপর রাগ হবে না ? শুধু নিজের কথা

ভাবলেই হয় না বাবা। আমাদের কথাও একটু ভাবতে হয়। এই দেখ না, দাদাকে কত পটিয়ে এখানে এনেছি—মাকে আর তোমাকে পাশাপাশি দেখে ধন্য করতে। কিন্তু তুমি সব ভেস্তে দিতে চাইছ—ভাঁওতা দিয়ে—যে, তুমি কিছুই নও। যে কিছুই নয় তার বুঝি র‍্যাংলার সাহেব শিষ্য হয়? তার বুঝি জুতোর ফিতে বেঁধে দেয় বিশ্ববিখ্যাত মেমসাহেব—

মহেন্দ্র: শ্—শ্! (অসিতকে) ওর কথায় কান দিও না বাবা। ও বর্ন পাগলী—মীরার গান বলছিলে না—তাঁকে গোপাল সৌদাই কৈসা কর দিয়া? ও হ'ল সৌদাই—জানো এ মীরাভজনটি?

ললিতা: কথা পালটাচ্ছ কেন বাবা? আগে নিষ্পত্তি হোক তুমি কে, কী বস্তু।

মহেন্দ্র: চট্ ক'রে ধরো এ-যুযুৎসু মেয়ে বড় সর্বনেশে। ধরো ধরো। উনিও জেগেছেন। (মা-কে) শোনো গো, অসিত গাইছে ঐ ভজনটিই। আর দেরি নয়, বাবা!

অসিত অগত্যা গায়:

য়হ ক্যা কিয়া সখী কিসীনে, দেখ ক্যা কিয়া!
পাগল হরীনে মুঝকো ভি পাগল বনা দিয়া!
ঘরবার লে সংসার লে মৈ জী হি রহী থী।
কভী জহর কভী সুধা মৈ পী হি রহী থী।
য়হ কব হুয়া, কহাঁ হুয়া য়হ ক্যা কিয়া পিয়া?
লগী কিনারে নাব থি, জলমে বহা দিয়া।

সৌদাই কৈসা কর দিয়া, য়হ ক্যা দশা করী!
দেখূঁ জিধর দিখে হরী—হরী—হরী—হরী!
ধরা গগন পবন য়হ বন সভী দিখেঁ পিয়া।
মীরাকে শ্যাম ক্যা দিয়া ভলা য়হ ক্যা কিয়া!

মা (গদ্গদ কণ্ঠে): আহা! কী অপূর্ব অবস্থাই হয়েছিল মীরার!
মহেন্দ্র (হেসে): তুমি টের পেয়েছ। কী বলো?
মা (ভাবমুখে): দেখ, দেখ, নীলরঙে ঘর ভ'রে গেছে। (মাথার উপর

চাপড় দিয়ে) না ঠাকুর, ফের বেহুঁশ কোরো না। আমাকে গান শুনতে দাও। গাও বাবা—ধরো ফের।

অসিত : কী গাইব মা ?

প্রণব (মৃদুস্বরে) : আমি হিন্দি শিখিনি ভাই। এ গানটির বাংলা আছে ?

ললিতা : নেই তো কি ? দাদা আমাদের শিখিয়েছিল বৃন্দাবনে। আমাকে আর বকুলকে।

মহেন্দ্র : ·বকুল ?

তারা : আমরা বকুল পাতিয়েছি, কাকাবাবু।

মহেন্দ্র : বেশ বেশ তাহ'লে গাও না মা এ-গানটি তোমরা দুই বকুলে—বাংলায়। অসিত একটি মীরাভজনের বাংলা গেয়েছিল লক্ষ্ণৌয়ে। বড় ভালো লেগেছিল আমার : প্রভুজী, তুমরে দরশ বিনা অব মৈ তো রহ নহি পাউঁ। বলতে কি, আমার বাংলাটা যেন আরো বেশি ভালো লেগেছিল। যতই হিন্দির গুণগান করি না কেন, মাতৃভাষায় গান—বাংলা গান—গাইলে কেমন যেন বুকের তারগুলি সব বেজে ওঠে—(ললিতাকে) গা তো শুনি অসিতের কাছে কেমন শিখেছিস। ওর ঢংটি যদি তুলতে পেরে থাকিস তবেই না।

ললিতা : তুমি কী . যে বলো ! আমরা কি ওর মতন ডাকসাহিটে গাইয়ে ? আমরা গাই শুধু নিজের মনে গেয়ে খুশী থাকতে বৈ তো নয়।

প্রেমল : না। বলো—ঠাকুরকে শোনাতে। হ্যাঁ—হ্যাঁ। তর্ক কোরো না। ঠাকুরকে শোনাতে হ'লে ডাকসাহিটে গাইয়ে হবার দরকার করে না। গাও। আমার তো খুব ভালো লেগেছিল তোমার আর দিদির মুখে গানটি শুনে।

তারা : সে আমাদের ভালোবাসেন ব'লে।

প্রেমল (হেসে) : গান শোনালে আরো ভালোবাসব। গাও—আর কথা না। কথা ঢের হয়েছে—হবেও। ধরো এখন।

তারা ও ললিতা গায় অসিতের হার্মোনিয়ম-সঙ্গতে :

কেমন ক'রে হ'ল আমার এমন দশা হায় !

পাগল হরি করল আমায় পাগল এ-ধরায় !

দুঃখে সুখে কাটছিল দিন আমার সংসারে,
আজ সুধা কাল বিষ ক'রে পান আলোয় আঁধারে,
এমন হ'ল কেমন ক'রে নাথ, বলো আমায় ?
নোঙর কেটে নৌকা আমার চলল এ কোথায় ?

এমন পাগল করল আমায় কে সে—মরি রে !
চাই যেদিকেই দেখি হরি—হরি—হরি যে !
আকাশ বাতাস জলে স্থলে দেখি বঁধুয়ায়
মীরার এ কী করলে বলো, বন্ধু ছলনায় !

সাত

বৃন্দাবনে যে আনন্দের ঢেউ উঠেছিল, কাশীতে সে আনন্দ হ'য়ে উঠল উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ। ভোরে উঠেই সবাই মিলে গঙ্গাস্নান! তার পরেই মা-র পূজাঘরে সবাই একসঙ্গে মা-র স্তোত্রপাঠে যোগ দেওয়া। কখনো কখনো মহেন্দ্রবাবুর মুখে ওদেশের নানা "সেণ্ট"-এর আশ্চর্য কাহিনী শোনা। তারপর চা-পর্বে প্রেমলই সভাপতি। সময়ে সময়ে অসিতের তর্ক বাধত প্রণবের সঙ্গে, বা প্রণবের ললিতার সঙ্গে। সে-সব তর্কের নিষ্পত্তি হ'ত অনেক সময়েই প্রেমলের সালিশিতে। ডাক্তারবাবু এসব তর্কাতর্কিতে প্রায়ই যোগ দিতে পারতেন না—মহেন্দ্রবাবু তাঁকে কোনো না কোনো রুগীকে দেখতে টেনে নিয়ে যেতেন ব'লে। এ-সূত্রে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গ পাবার লোভেই ডাক্তারবাবু আরো সাগ্রহে তাঁর পিছু নিতেন। ফিরে এসে বলতেন তাঁর নানামুখী বিদ্যার কথা। এ শান্ত স্নিগ্ধ মানুষটিকে মা নাম দিয়েছিলেন—"গভীর জলের মীন"। প্রেমল বলল: "Still waters run deep", ললিতা হেসে বলত: "বাবা ছোঁওয়া দিয়ে ধরা দেন না নিজের দর বাড়াবার জন্যে।"

তারপর ঘণ্টাখানেক প্রায়ই ওরা গঙ্গায় নৌকাবিহারে বেরুত মহেন্দ্রবাবুর সুন্দর মোটরবোটে। কখনো কখনো প্রেমল অসিতকে নিয়ে বেরুত, দু-একবার প্রণবও ওকে নিয়ে গেছে। প্রণব ওকে নিয়ে যেত শুধু প্রেমলের

জীবনের নানা কথা বলতে—কেবল ওকে পই পই ক'রে মানা করত যেন এসব কথা বাইরে কাউকে না বলে। প্রেমল মোটেই চায় না—ওর বিদ্যাবুদ্ধি নিষ্ঠা জপ তপ সাধনার বিন্দু-বিসর্গও লোকে জানে। অসিত ওর কাছে যা যা শুনত প্রেমলের সম্বন্ধে প্রায়ই ওর মোটা ডায়রিতে টুকে রাখত। প্রণব কাউকে বলতে বারণ করেছে—করলই বা! ও তো কথা দেয় নি যে ওর নিষেধ শুনবে। এসব কথা ও শুধু যে বলবে তাই নয়, না ব'লে ছাড়বে না। কিন্তু প্রণব বা প্রেমলের কাছে এ-মৎলব ফাঁশ নাই করল। মন্ত্রগুপ্তি চাই বৈ কি। প্রেমল নিজেও তো মন্ত্রগুপ্তিতে বিশ্বাস করে। ঠিক হয়েছে—ও যেমন নিজেকে পর্দানশীন রাখতে চায়, অসিত শোধ তুলবে ওকে বে-আব্রু ক'রে। এ কী অন্যায় আবদার!—এমন মানুষকে কাছ থেকে পেয়েও তার অমৃতময় কথা বলবে না পাঁচজনকে? লোকে জানবে না যে জগতে শুধু নাস্তিক, রাজনৈতিক, বণিক, কেরানী, পুলিশ, উকিল, দালালই গিশগিশ করে না—স্বপনী আদর্শবাদী যোগীও মাঝে মাঝে জন্মায়। লাখে না মিলয় এক? বাঃ, তাই তো তাদের এত দাম। বলতে কি, বিলেত থেকে ফিরে এসে অসিত নানা সাধু সন্তের খোঁজ করলেও তখনো পর্যন্ত তিন চারটির বেশি যোগী যতির দেখা পায় নি। মানে, কাছ থেকে। সময়ই পায় নি। বেশির ভাগ সময়ই যে কেটেছে গান শিখতে, গায়ক-গায়িকার সন্ধানে সারা ভারত চক্র দিয়ে বেড়াতে—ত্রিবন্দ্রম থেকে কাশ্মীর। হঠাৎ বৃন্দাবনে প্রেমলের দেখা পেয়ে গেল, তারপরেই যেন অদৃষ্ট ওর হেসে উঠল—একজোটে প্রেমল, ললিতা, মা ও মহেন্দ্রবাবু! ওর নানা জায়গা থেকে গানের নিমন্ত্রণ আসত। কিন্তু ও পণ নিল এ-স্বর্ণসুযোগ ছাড়বে না। প্রণব প্রায়ই বলত—সে মা-র কথা শুনতে অনেক কাজ ছেড়ে আসত—to make hay while the sun shines। অসিতও ঠিক করল—এইই পন্থা। যতটা পারে এ-চারটি মানুষের কাছ থেকে আহরণ ক'রে নেবে প্রেরণার পাথেয়। ওর ভাগ্য শুধু ভালো নয়—অদ্ভুত! একটি দুটি নয়—পাঁচ পাঁচটি আশ্চর্য মানুষের দেখা পাওয়া একই পরিবারে! এ-স্বর্ণসুযোগ কি ছাড়া চলে?

আট

ওদের দিনপঞ্জিকায় শ্রেষ্ঠ আনন্দসভা বসত সন্ধ্যায়—গানের আসরে। কখনো কখনো সেখানে কাশীর কোনো কীর্তনীও গাইতেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময় অসিতকেই গাইতে হ'ত হিন্দি ভজন, বাংলা কীর্তন বা আধুনিক ভক্তি সঙ্গীত—দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের বা স্বরচিত নানা গান। ললিতার বাঁধা দু-একটি গানও অসিত মাঝে মাঝে গাইত তার সঙ্গে জুড়িতে, আর বিকেলে তাকে কিছুক্ষণ শেখাত স্বরচিত গান বা মীরাভজন। তারাও শিখত ওর সঙ্গে। ললিতা মোটের উপরে ভালই গাইত। তারা—শাদামাটা। তবে দোয়ার দিতে ভুল করত না। তাই ওদের শিখিয়ে অসিতের যে কিছুই লাভ হ'ত না তা নয়—যদিও ললিতাকে ও গান শেখাত বিশেষ ক'রে এই সূত্রে তার নির্মল মনের স্পর্শ পেতে। এমন স্বচ্ছ নির্ভীক সরল অথচ স্বভাব-ভক্তিমতী মেয়ে—সত্যি, বিরল আধার।

ওদের সান্ধ্য সভায় প্রায়ই আসতেন কাশীর এক নামকরা বিদ্বান্। প্রণব তাঁর নাম দিয়েছিল crashing bore। তিনি যত্র তত্র তর্ক তুলতেন নিজের বিদ্যা জাহির করতে। লোকে তাঁকে নিয়ে আড়ালে হাসিঠাট্টা করত—কিন্তু তাঁর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। মা ললিতাকে বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ গায়ে না মাখতে। নিজের মেয়েটিকে তিনি জানতেন তো—কখন কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে কে জানে! কিন্তু ললিতা সময়ে সময়ে চঞ্চল হ'লেও মা-র কথা মনে রেখে নিজেকে সামলে নিত।

সেদিন ছিল গুরু-পূর্ণিমা। প্রেমল ললিতাকে বলল প্রথমে একটি গুরুবন্দনা গাইতে তারার সঙ্গে। ওরা গাইল অসিতের কাছে শেখা একটি গুরুবন্দনা—মীরাভজন:

আঈ শরণ তিহারী সদ্‌গুরু, আঈ শরণ তিহারী
জনম জনম কী দাসী মীরা বার বার বলিহারি।

তারপর মা বললেন অসিতকে গাইতে শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত গুর্বষ্টকস্তোত্র। অসিতের সচরাচর গুরুবন্দনা গাইতে তেমন ভালো লাগত না—আরো এইজন্যে

যে, ওর মনে হ'ত গুরুবাদে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে যে না পারে তার পক্ষে গুরুবন্দনা গাওয়া হ'য়ে দাঁড়ায় গতানুগতিক—কপটতারই কাছাকাছি। কিন্তু মা-র ও প্রেমলের দ্বিবিধ গুরুরূপ ওকে ভরসা দেওয়ার ফলে শঙ্করাচার্যের এ স্তোত্রটি গাইতে গাইতে ও সেদিন কেমন যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়ল—যেন মনে হ'ল আবছা ভাবে যে, এ গানের মাধ্যমে এক অচিন আবির্ভাব ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! এ-ধরণের অদ্ভুত অনুভূতি ওর আগে কোনোদিনই হয়নি, তাই গাইতে গাইতে ওর মধ্যে জেগে উঠল এক অচিন আবেশ। ও গেয়ে চলল নানা তান দিয়ে স্বরবিহারের পাখা মেলে :

"শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরো···ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরো···ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥"

অসিতের গান শেষ হ'লে এ-স্তবটির বাংলা অনুবাদ, গাইল ঐ একই সুরে ললিতা তারা ও প্রেমল দোয়ার দিল :

যদি দেহ হয় তব কান্ত সবল, অতুল কীর্তি যশ মান,
হয় হিমালয় সম দীপ্ত অমেয় তব ধন,
যদি গুরুর চরণকমলে লিপ্ত না রহে তোমার মন প্রাণ—
হবে এ-সকলই ছায়া ছায়া ছায়াবাজি হে সুজন!
যদি বেদবেদান্ত থাকে তব নখদর্পণে ওগো বিদ্বান্,
করো গদ্যে পদ্যে নিখিল চিত্ত রঞ্জন,
যদি গুরুর······হে সুজন!

যদি বিদেশে মান্য স্বদেশে ধন্য হও গৌরবে গরীয়ান্,
রটে বিশ্বসভায় তোমার মহিমাকীর্তন,
যদি গুরুর……হে সুজন !

গানের শেষে এক জিজ্ঞাসু যুবক প্রেমলকে বলল : "কিন্তু সাধুজি, গুরুর চরণকমলে মনকে লিপ্ত রাখব কেমন ক'রে ?"

প্রেমল : একান্তী হ'য়ে প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

যুবক : কী প্রার্থনা করব ? মানে, কিসের ?

প্রেমল : নিষ্ঠা ও চিত্তশুদ্ধির।

যুবক : কার কাছে ? গুরুর না ইষ্টের ?

প্রেমল (হেসে) : গুরু ইষ্ট অভেদ। তাই যার কাছে প্রাণ চায় প্রার্থনা করতে পারো। আন্তরিক হ'লে গুরুর কাছে প্রার্থনা করলেও সে-প্রার্থনা ভগবানের কাছে পৌঁছবেই পৌঁছবে।

তর্কপণ্ডিত এতক্ষণে ছিদ্র পেলেন, বললেন তড়পে উঠে : "কিন্তু এ কেমন কথা সাধুজি ? শাস্ত্রীরা সবাই ভগবানের উপাধি দিয়েছেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'— যেখানে গুরুরা তো দেখতে পাই অগুন্তি গজান অলিতে গলিতে পথে ঘাটে— ব্যাঙের ছাতার মতন। কাজেই শাস্ত্রানুসারে আপনি আপনার মর্জিমাফিক্ রকমারি গুরুর কাছে ধর্ণা দিতে পারেন। তন্ত্রসার বলেন নি কি—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গো পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ।"

ব'লেই নিজের অনুবাদ শুনিয়ে দিলেন :

মধুপ্রলুব্ধ অলি যথা ধায় ফুল হ'তে ফুলে মধুর আশে,
জ্ঞানপ্রলুব্ধ শিষ্য উধাও হবে গুরু হ'তে গুরুর পাশে।

প্রেমলের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। বলল : "জানি তার্কিকজি। এ-শ্লোকটি আমিও পড়েছি স্যর জন উডরফের বইয়ে। কিন্তু আবার তিনিই বলেছেন যে, তান্ত্রিকদের মধ্যেও গভীর মতভেদ আছে। যেমন ধরুন গুরুতন্ত্রে আছে— মহাদেব পার্বতীকে বলেছিলেন :

গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টো, রুষ্টে রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
গুরৌ তুষ্টে শিবা তুষ্টা, রুষ্টে রুষ্টা চ সুন্দরি !

(জিজ্ঞাসুর দিকে তাকিয়ে) অর্থাৎ গুরু তুষ্ট হ'লে হরগৌরী উভয়ই তুষ্ট হন,

তর্কপণ্ডিত (সদাপটে) : কিন্তু মাপ করবেন, আপনি অবান্তরের অবতারণা করছেন, সাধুজি। আমার প্রশ্ন ছিল—শিষ্য যখন জ্ঞানের জন্যে ডজনখানেক গুরুর দরবারে ধর্ণা দিতে পারে শাস্ত্র মেনেও—

প্রেমল (হাত তুলে) : রসুন রসুন। আপনার গোড়ায় গলদ হচ্ছে জী ! কারণ আপনি দ-য়ে মজেছেন শিক্ষক আর গুরুকে সমার্থক ধ'রে নিয়ে। কিন্তু এ-ধরণের গোল হয় পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে ধারণা সাফ না থাকলে—যেমন ধরুন, শিব, শক্তি, পুরুষ, প্রকৃতি, জীবাত্মা, পরমাত্মা, মায়া, লীলা ইত্যাদি। যারা ধ'রে নেয়—গুরুও যা শিক্ষকও তাই, তারা যেতে পারে বৈ কি পথ চলতে জুতোর মতন গুরু বদ্‌লে। কিন্তু যারা বাইরের গুরুর মধ্যে চাক্ষুষ করেছে অন্তরের গুরুদেবতাকে তারা গুরু বদ্‌লাতেই পারে না প্রাণ গেলেও।"

মা হঠাৎ টুক ক'রে ব'লে বসলেন : "সাধু তুলাল, সাধু! তুমি ঠিকই ধরেছ। কারণ যে একবার যথার্থ গুরুর দেখা পেয়েছে সে জ্ঞানার্থী হ'য়ে ডজনখানেক গুরুর কাছে যেতেই পারে না যেমন সতী স্ত্রী প্রেমার্থিনী হয়ে যেতে পারে না ডজনখানেক নাগরের কাছে।"

সভায় এক আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে গেল। তর্কপণ্ডিত রেগে উঠে গজ গজ করতে করতে সভা ত্যাগ করলেন : "এমন প্রগল্‌ভ সভায় আর আসব না" ব'লে।

তর্কপণ্ডিতের প্রস্থানের পর হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে মা অসিতের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিটিয়ে বললেন : "কেমন জবাব দিয়েছি ঠিক তালে, বলো তো বাবা ?"

অসিত (হেসে) : মা, আজ আমি বুঝতে পেরেছি—ললিতা কার কাছ থেকে পেয়েছে দুষ্টুমির দীক্ষা।

প্রেমল : কিন্তু মা নিছক দুষ্টুমি করতে চেয়েই একথা বলেন নি। য়ুরোপে আমেরিকায় সত্যিই হাল আমলে এই ধুয়ো উঠেছে যে, সতীত্ব চিত্তশুদ্ধি ব্রহ্মচর্য এসবই সেকেলে মেকি টাকা, কাজেই এযুগে অচল। এ বিংশ শতাব্দীতে স্বেচ্ছাচারের তাম্র মুদ্রাই মান পায় গিনি সোনার। আর জপমন্ত্র হ'ল—My will, not thine, be done. গুরুর কাছে নত হ'তে যে আমাদের এত

আপত্তি, বিদ্রোহের যুক্তি-তীরন্দাজি—তার মূলে আছে এই স্বেচ্ছাবিহারের প্রচণ্ড আসক্তি।

অসিত: একথা মানতে বাধে না ভাই, কিন্তু গুরুকে যখন ইষ্টের পদবী দিই তখন মন প্রশ্ন টোকে: মানুষের মানবতার নানা দোষ ত্রুটি চ্যুতি সত্ত্বেও তাকে কেমন ক'রে ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসাব? ভগবানের প্রতিনিধি, এজেন্ট, মোহান্ত বলো বুঝি, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্—ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর—বললেই প্রশ্ন আসে—যতদিন কাউকে অভ্রান্ত সনাক্ত করতে না পারি ততদিন তাঁকে ইষ্টের আসনে বসালে কি গুরুকে বেশি মান দিতে গিয়ে ইষ্টের মানহানি হবে না? (মা-কে) কিছু মনে করবেন না মা, আপনাকে দেখে আমার অন্তরে যে-শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে সেখানে কোনো 'কিন্তু কিন্তু' ভাব নেই। এর একটা কারণ—আপনার মধ্যে আমি কোনো holier-than-thou ভঙ্গি দেখতে পাই নি, আপনাকে বলতে শুনি নি যে, আপনি সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী, কাজেই অভ্রান্ত না হ'য়েই পারেন না।

মা (প্রেমলকে): তুই ওকে বুঝিয়ে দে বাবা! আমার কি তেমন বুদ্ধি আছে যে এ-ধরনের দারুণ চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারে?

অসিত: ছি, ছি, এ চ্যালেঞ্জ নয়, মা। আমি সত্যিই জানতে চাই। কারণ আমার গুরুকরণের পথে সত্যিই এই বিষম বাধা খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ প্রেমল ও প্রণবের ধমকে যে, গুরুর সব কথাই নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। আমি যে দেখেছি মা যে, যাঁদের প্রচণ্ড গুরু ব'লে দুর্দান্ত নামডাক তাঁদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে কুযুক্তি দিয়ে চেলাদের ভাঁওতা দেন তাই নয়—সত্যি কালোকে শাদা ব'লে সত্যার্থীকে মিথ্যার পথে চালান গুরুগিরির ঠাট বজায় রাখতে।

প্রেমল: সদ্‌গুরু কখনই বলেন না যে, তিনি অভ্রান্ত। তাঁদের মগজী বুদ্ধি অনেক সময়ে ধারালো না হ'তে পারে, কিন্তু তাতে খুব যায় আসে না এই জন্যে যে, মগজী বুদ্ধি আসলে এ-পথের দিশারি নয়। তবে কালোকে যাঁরা সাদা বলেন চেলাদের ভোগা দিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে গুরুগিরি করতে, তাঁরা দুদিন বাদে ধরা প'ড়ে যানই যান। জগতের আজ পর্যন্ত বহু সাধু সন্ত জন্মেছেন, কিন্তু যাঁরা সত্যি সাধু ব'লে দাঁড়িয়ে গেছেন তাঁদের চিনতে কি কারুর ভুল হয়েছে, না তাঁদের কথা শুনে কারুর অধোগতি হয়েছে? জগতে সত্যিকার

মহাত্মা যাঁরা তাঁরা যুগে যুগে দেশে দেশে এক কথাই বলেছেন: সত্যাশ্রয়ী হ'তে, সরল হ'তে, নিরভিমান, নির্লোভ, নিষ্কাম, নির্মোহ হ'তে। কেউ বলেন নি শঠ হ'তে, মিথ্যুক হ'তে—অধীর অসহিষ্ণু লম্পট কি দাম্ভিক হ'তে। কিন্তু আসলে এসব প্রশ্নের বাধা আমাদের পথ আগলে দাঁড়ায় না। মুখ্য বাধা হ'ল চারটি: শ্রদ্ধার অভাব, বৈরাগ্যের অভাব, তৃষ্ণার অভাব ও আন্তরিকতার অভাব। অর্থাৎ যে সত্যি চাইবে সে দিশা পাবেই পাবে—যদি বদ্‌গুরুকে বরণ করে তাহ'লেও হয় তার মধ্যে দিয়েই পাবে অভাবনীয় ভাবে, নৈলে ইষ্ট স্বয়ং এসে তাকে দিব্য দৃষ্টি দেবেন যার প্রসাদে সে দেখতে পাবেই পাবে যে গুরুজির মধ্যে সং আদৌ নেই, বদই জাঁকিয়ে বসেছে নিজেকে সং জাহির ক'রে।

মা: বাবা, এসব ব্যাপার ঠিক যুক্তি বুদ্ধির স্কুলমাষ্টারি উপদেশের পথে ঘটে না। বদগুরুরা অনেক সময় প্রথম দিকে জেতে বটে, কালোকে সাদা ব'লে কাজ হাসিল ক'রে, কিন্তু শেষমেশ ধরা পড়েই পড়ে। একটা গল্প বলি শোনো বোঝাতে তুটি তত্ত্ব: এক, যারা গুরুবাক্যে সত্যি বিশ্বাস ক'রে ভুল পথকে ঠিক পথ ভাবে, তাদের ভুল পথও আর ভুল থাকে না। তুই, যে-বদগুরু শিষ্যদের ভুল পথে চালায় সে ধরা পড়েই পড়ে বদ্‌গুরু ব'লে।

এক লোভী তান্ত্রিক সাধনা ক'রে কয়েকটা সস্তা বিভূতি পেয়েছিল। তাই ভাঙিয়ে তার খুব নামডাক হয় মহাযোগী ব'লে। অধিকাংশই আসত তার ভেল্কিতে মুগ্ধ হয়ে নানা সিদ্ধাই তুকতাক শিখতে। কিন্তু একদিন এল এক গরিব মুচি যে সত্যিই ভগবান্ ছাড়া কিছু চায় না! সে ঐ বদগুরুকেই সদগুরু ভেবে দীক্ষা চাইল! গুরু গরিব চেলা চাইতেন না, তাই ভাগিয়ে দিলেন তাকে দূর ছেই ক'রে। কিন্তু তার প্রাণ ভগবানের জন্য এতই ব্যাকুল যে, সে বার বার ঘা খেয়েও ফিরে এসে কেঁদে পড়ে: "ঠাকুর, আপনার কৃপা বিনা আমার গতি নেই। কারণ আপনারই শ্রীমুখে শুনেছি যে গুরু ইষ্ট এক, আর গুরুই কেবল ইষ্টের সঙ্গে জীবকে মিলিয়ে দিতে পারে।"...বার বার তার কান্নাকাটি শুনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে শেষে একদিন গুরু বললেন: "যা, তোর ইষ্ট গাধা। গাধা মন্ত্র জপ করলেই তাকে পাবি। এখন পালা—আমাকে আর দিক করিস নি।"

সরল মুচি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে রাতদিন গাধামন্ত্র জপ করতে লাগল—যা কিছু করে তার মধ্যে "গাধা গুরু" জপ ক'রে চলে! জপ করতে করতে

তার চিত্তশুদ্ধি হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে সমাধি ও ইষ্টের দর্শন গাধারূপে। মহানন্দে সে গ্রামে রটিয়ে দিল এ-অঘটনের কথা—যে, "গাধাগুরু" মন্ত্র জপ ক'রে সে পেয়েছে গুরু ও ইষ্টের কৃপা—কারণ দুই-ই অভেদ। বলবামাত্র গ্রামে সবাই হৈ হৈ ক'রে একজোটে "গাধা গুরু গুরু গাধা জয় জয় জয়" অখণ্ড মন্ত্র জপ সুরু ক'রে দিল সিদ্ধ মুচির আটচালায়। কিছুদিন পরে—ওমা, তাদের অখণ্ড প্রার্থনার ফলে বদগুরুর ধড়টা র'য়ে গেল মানুষের কিন্তু মুণ্ডুটা হয়ে গেল গাধার। হবে না? সে যে উঠতে বসতে বলত গুরু ইষ্ট অভেদ—কাজেই গাধা যখন ইষ্ট তখন গুরুও গাধা—এ তো দুই আর দুয়ে চার। অবিশ্যি কেউই ভাবে নি যে এ বিষফল ফলবে গাধামন্ত্র জপসাধনায়। কিন্তু যখন ফলল তারা সইতে পারল না, ঘৃণায় ভয়ে এ না-জন্তু না-মনিষ্যিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে কুলোর বাতাস দিয়ে গ্রাম থেকে দূর ক'রে দিল।

ললিতা (হেসে গড়িয়ে পড়ে): মা গো মা! সত্যিই তোমার তুলনা তুমি। (অসিতকে) কেমন দাদা এবার?

অসিত (হেসে): হার মেনেছি ভাই, কবুল করছি।

নয়

অসিতের নিমন্ত্রণ ছিল জলন্ধরের এক সঙ্গীত সভায়। কিন্তু কাশীতে এসে যেন যুগপৎ পাঁচ পাঁচটা জালে বাঁধা প'ড়ে গেল: প্রেমল, ললিতা, শান্তিমা, প্রণব, মহেন্দ্রবাবু।

মহৎ মানুষ ওর মন টানত আশৈশব। স্বামী বিবেকানন্দের একটি অঙ্গীকার ওর মনে গেঁথে গিয়েছিল তাঁর চিঠি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন: "আমি গৃহস্থ বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না, যথার্থ সাধুতা, উদারতা, মহত্ত্ব যেথায় সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হোক।"

"পত্রাবলী"-তে স্বামীজির নানা পত্রের আন্তরিকতা, তেজ ও মহত্ত্ব ওকে মুগ্ধ করত বটে, কিন্তু এ-পত্রটি ছিল যেন একটি ঝঙ্কৃত বাণী—যে, সংসারে মহত্ত্ব আছে ব'লেই তার দৃষ্টান্তে মানুষ তার ক্ষুদ্রতার পিছুটান কাটাতে পারে।

মাঝে মাঝে অসিতের মনে প্রশ্ন উঠত: প্রণবকে না হয় মহৎ ব'লে সনাক্ত করল—(সে স্বদেশ স্বজন ছেড়ে বিদেশে বিভূঁয়ে এসে নামকরা সার্জনের মোটা আয় ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পায়ে ঠেলে বৈরাগী হ'য়ে বনবাস বরণ ক'রে নিল গুরুসেবা করতে—এ কজন পারে? আর মহত্ত্বের একটি অভিজ্ঞান তো তার অসাধ্য সাধনই বটে)—কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মধ্যে কী এমন মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছে? শুনেছিল অবশ্য যে, বহু দীন দুঃখীর অসুখে উনি শুধু যে দক্ষিণা নিতেন না তাই নয়, দরকার হ'লে তাদের বিনা মূল্যেই ওষুধ দিতেন। একদা ললিতা এমন কথাও বলেছিল যে, তিনি ডাক্তার হ'য়ে যা উপায় করতেন তার অর্ধেক খরচ হ'য়ে যেত দীন দুঃখীর চিকিৎসায়। দীনবন্ধু দাতাকে মহৎ না ব'লে উপায় নেই। কিন্তু ও আকৃষ্ট হ'য়েছিল ঠিক এ দানের মহত্ত্বেও নয়—তাছাড়া এ-দানের কথা তো ওর কাছে জনশ্রুতিই বটে—ও আকৃষ্ট হয়েছিল অন্তরে অনুভব করেছিল ব'লে যে, তিনি শুধু উদার মহৎ নন, ধনমানে অনাসক্ত। অর্থাৎ ইনটুইশন—স্বজ্ঞা। কোনো কোনো মুখ দেখলেই সন্দেহ থাকে না যে এ-মানুষটি সরল বা বিশ্রব্ধ বা স্নেহশীল। এ হ'ল সেই স্বজ্ঞার এজাহার।

কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে ওর একটি নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল তাঁর সম্বন্ধে যাকে খানিকটা অঘটন বলা চলে। অসিতের জীবনে অঘটনের আবির্ভাব হয়েছে যেন প্রতিপদেই—উঠতে বসতে। প্রণব কি ওকে সাধে বলত: চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তুমি তেমনি অঘটনকে টানো ভাই! গুরুলাভও তোমার হবে এমনি অঘটনের মাধ্যমেই, ব'লে রাখলাম—পরে মিলিয়ে নিও।" কিন্তু এ-অঘটনটিকে ও কী নাম দেবে ভেবে পায় না যেন! Revealing, বলা চলে, কিন্তু কোন্ অঘটনটাই বা ঐশীলীলার ভাষ্যকার এই অর্থে revealing নয়? ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে:

ডাক্তারবাবু বৃন্দাবন থেকে কাশী এসেছিলেন খানিকটা তারার ও প্রেমলের জন্যেই। কারণ বৃন্দাবনে তিনি শুধু যে নিজের ক্লিনিকে রোগী দেখতেন তাই নয়, রামকৃষ্ণ মিশনেও তাঁকে প্রত্যহ এক ঘণ্টা ক'রে রুগী দেখতে হ'ত। ডাক্তারের ছুটি নেই, সবাই জানে। তবু তিনি প্রেমলের সঙ্গসুখে এত আনন্দ পেতেন যে, তারা কাশী যাবে ধরতে তিনি রাজী হয়েছিলেন সাগ্রহেই প্রেমলের পুণ্যসঙ্গের জের আরো দুদিন টানতে চেয়ে। আনন্দের এমন স্বর্ণসুযোগ তো

জীবনে বার বার আসে না—Rarely rarely comest thou, spirit of delight!—শেলির এ কথার কি মার আছে?—বলতেন তিনি প্রায়ই। কর্তব্য? অনবদ্য আদর্শ বটে। কর্তব্যপালনে আনন্দও আছে বৈ কি। কিন্তু সাধুসঙ্গের ও ভজনের আনন্দ তৃপ্তির সঙ্গে মুক্তিরও আভাষ দেয় না কি? তাই তিনি বিবেকী ডাক্তার হ'য়েও এককথায় রাজী হয়েছিলেন কাশীতে পাঁচ সাতদিন কাটিয়ে আসতে কর্তব্য থেকে ছুটি নিয়ে আনন্দের রংমহলে দুচারদিন বাস ক'রে একটু রঙিন হ'য়ে ফিরতে। ডাক্তারির ধূসরতা সময়ে সময়ে তাঁর মনকে কেমন যেন নিরঙ একঘেয়েমির চাপে অতিষ্ঠ ক'রে তুলত—বলতেন তিনি অসিতকে প্রায়ই—সদীর্ঘশ্বাসে।

কিন্তু ঢেঁকির স্বভাবও তো দুরতিক্রম—কাজেই কাশীতে দুদিন ছুটি ভোগ করতে এসেও তাঁকে ধান-ভানার কাজেই বাহাল হ'তে হ'ল: মহেন্দ্রবাবু অনেক রোগীর শক্ত রোগ সম্বন্ধে তাঁকে "কনসাল্ট" করতেন। ফলে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে বেরুতে হ'ত। তিনি সানন্দেই রাজী হ'তেন—আরো এই জন্যে যে, এ-সূত্রে তিনি মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গ পেতেন একটু বেশি ঘনিষ্ঠভাবে। (কে না জানে সতীর্থদের মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা হয়?)

একদিন মহেন্দ্রবাবুর ডাক পড়ল এক তিনতলার ঘরে। তখন প্রণব বলল ডাক্তারবাবুকে যে, মহেন্দ্রবাবুর থ্রম্বোসিস আছে, তার উপর রক্তের চাপও মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়, কাজেই বেশি সিঁড়ি ভাঙা ভালো নয় তাঁর পক্ষে। ডাক্তারবাবু মহেন্দ্রবাবুকে বললেন তিনি যাবেন তাঁর বদ্‌লি। কিন্তু এ-রুগীটি ছিল মহেন্দ্রবাবুর প্রিয়বন্ধু, বায়না ধরল—না, আর কোনো ডাক্তারে তার বিশ্বাস নেই। পেটে দুষ্টক্ষত (ulcer) থেকে রক্তস্রাবও হচ্ছে বেশি—পরিবারের সবাই ভয় পেয়ে মহেন্দ্রবাবুকে ছেঁকে ধরল। বলল চেয়ারে ক'রে ওঠাবে।

কিন্তু মহেন্দ্রবাবু চেয়ারে ক'রে উঠতে কিছুতেই রাজী হলেন না, বললেন—খুব ধীরে ধীরে থেমে থেমে উঠবেন জিরুতে জিরুতে। প্রণব তো আপত্তি করলই, ডাক্তারবাবুও বারণ করলেন—(কারণ সম্প্রতি কয়েকটি শক্ত রোগের চিকিৎসায় উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরুন মহেন্দ্রবাবুর রক্তের চাপ ফের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল—তিনি একরকম ডাক্তারবাবু ও প্রণবের

চিকিৎসাধীনে ছিলেন)—কিন্তু এবার তিনি শুনলেন না, দিলেন ফের একই আশ্বাস : "কিচ্ছু হবে না, আমি খুব আস্তে আস্তে থেমে থেমে উঠব।"

কিন্তু কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙতেই তিনি বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ—ইষ্টনাম জপ করতে করতে কোনোমতে উঠলেন তিন তলায়। কিন্তু এই শেষের তলাটিই হ'ল তাঁর কাল—রুগীর ঘরে ঢুকবার আগেই মূর্ছা।

হৈ হৈ ব্যাপার! সবাই তাঁকে গভীর ভক্তি করত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরাধরি ক'রে তাঁকে নিয়ে তোলা হ'ল মোটরে।

গঙ্গাতীরে যখন তিনি পৌঁছলেন তখন দেখা গেল মুখে রক্ত।

* * *

ঘণ্টা দুই পরে তাঁর জ্ঞান হ'ল। প্রণব প্রেমল ললিতা ও অসিত বারান্দায় অপেক্ষা করছিল—মা ঘর থেকে কখন কী হুকুম দেন।

অসিত বারান্দায় একটি মোড়ায় ব'সে ভাবছিল আকাশ পাতাল—এ কী হ'ল···কেন এমন হ'ল পরোপকার করতে গিয়ে···।

হঠাৎ সবাই চম্‌কে উঠল তাঁর "জয় মা!" শুনে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে অসিত দেখে—মহেন্দ্রবাবুর ম্লান মুখ আলো হ'য়ে উঠেছে—তিনি তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে জানালার দিকে। মুখে তাঁর দিব্য হাসি ফুটে উঠেছে। সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি কিন্তু কারুর পানেই না তাকিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জানালার পানে। তারপর তাঁর দু চোখের প্রান্ত থেকে অবিরল ধারা নামল। শান্তিমা গভীর স্নেহেই স্বামীর চোখ মুছিয়ে তাঁর বুকে হাত রেখে অজপা জপ ক'রে চললেন। মুমূর্ষুর মুখ উঠল আরো উজ্জ্বল হ'য়ে, বললেন: "আহা মা···মা···মাগো"···ব'লে একটু থেমে কারুর দিকে না তাকিয়ে অথচ সবাইকেই যেন সম্বোধন ক'রে বললেন, "দেখতে পাচ্ছ না? মা নিতে এসেছেন ছেলেকে তাঁর—বেলাশেষে···মা···মা মা···এসো মা···মাকে কালো বলে কে রে?··· সৌম্যাসৌম্যাতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী···* গাও সবাই মা-র নাম···শুধু তাঁর নাম···"

* দৈত্যনাশিনী করালী, দেবের বরদা, অমৃত শান্তিময়ী!
যা কিছু জগতে আছে সুন্দর তারও চেয়ে তুমি কান্তিময়ী। (চণ্ডী)

আশ্চর্য! কণ্ঠস্বরে জড়তার লেশও নেই! দেহ নিশ্চল পক্ষাঘাতে, কিন্তু মুখে কী আলো, মধুর হাসি !!

মা অসিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "গাও বাবা, মা-ও শুনবেন…"

অসিতের রোমাঞ্চ হয়…মা এসেছেন স্বয়ং! ধরল একটি স্বরচিত গান :

তোমার চরণ যে করে বরণ তুমি যে শরণ দাও মা তারে,
একথা মিথ্যা হ'ত যদি—যেত ডুবে এ-অবনী অন্ধকারে।
জানি না কিছুই—জানি সুনয়নী,
শুধু জানি—তুমি মা, পরশমণি,
ধূলাও তোমার পরশে তারার নামাবলী হ'য়ে জ্বলে আঁধারে,
একথা জেনেছি তোমারি প্রসাদে, পেয়েছি মা তাই পার অপারে।

ঠাঁই রাঙা পায় তোমার যে চায় কোথা ভয় তার ধরণীতলে?
অঝোর রক্তবেদনায়ও তার ওষ্ঠে মা তোমার চেতনা জ্ব'লে।
কাঁটা দেয় তারে গোলাপদীক্ষা,
যে শুধু তোমারি করে প্রতীক্ষা—
পারে কি মা হ'তে হারা মরুপথে প্রাণ-নদী তার দুরভিসারে,
তুমি হাসো ব'লে কোটি তারা ঝলে করি' উপহাস শূন্যতারে।

সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রবাবু ব'লে উঠলেন : "ঠিক মা, ঠিক। সবই তোমার—আলোও তোমার আঁধারও তোমার, ফুলও তোমার, কাঁটাও তোমার, জীবনও তোমার, মরণও তোমার। তুমি দেখিয়ে দিলে মা, দেখিয়ে দিলে। না দেখিয়ে থাকতে পারবে কেন মা? তুমি তো পাতানো মা নও।" ব'লেই ডাকলেন : "প্রেমল, প্রণব, সবাই এসো।… বড় আনন্দের দিন। (ললিতাকে) কাঁদে না মা! তোমাকে দেখছেন—দেখবেন তিনিই (মা কে দেখিয়ে) ওর মধ্যে দিয়ে আর (প্রেমলকে দেখিয়ে) ওর মধ্যে দিয়ে। জানো? তোমার মা আলমোরা থেকে নেমে এসেছিলেন আমারই ডাকে। আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমার ধূলাখেলা সাঙ্গ হয়েছে।"

মা মাথা নিচু ক'রে তাঁকে প্রণাম করলেন, বললেন : "হ্যাঁ। আমিও দেখেছিলাম। আর বলেছিলাম মনে আছে তো—যে, তুমি যা চাইছ তা

পাবে ? কেবল"—ব'লে চকিতে আঁচলে চোখ মুছে।—"এত শীগ্‌গির ডাক আসবে ভাবি নি—(ললিতাকে) কী পাগলী রে! বললেন না উনি—যাবার বেলায় পিছু ডাকতে নেই ? আনন্দ লগ্ন বেজেছে রে—চোখের জল ফেলছিস কি ? গান গা—মাকে বরণ ক'রে।"

ব'লে মৃদুস্বরে ধরলেন রামপ্রসাদের গান :

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ?
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
(এ) দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।

(ললিতা ও তারাকে) ধরো ধরো মা গাও :

দেহের মধ্যে সুজন যেজন তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি!
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি।

(প্রেমল প্রণব অসিত ও ডাক্তারবাবুকে)

তোমরাও দোয়ার দাও বাবা :

সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি
রামপ্রসাদ বলে—দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে ব'সে আছি।

ওদের দোয়ারের রেশ মিলিয়ে যেতেই মহেন্দ্রবাবু বললেন প্রেমলকে : "আমাকে নিয়ে চলো বাবা গঙ্গাতীরে…গঙ্গাতীরে…পতিতপাবনী…অন্তর্জলী… অন্তর্জলী…মা মা মা!"

সবাই ধরাধরি ক'রে কয়েক ধাপ নামিয়ে তাঁকে গঙ্গাতীরে আনতেই বললেন :

"না না, শেজ বিছানা না…মাটি…মাটি…পা ডুবিয়ে দাও :

অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে
অর্ধ অঙ্গ রবে স্থলে… ।

ব'লে গঙ্গাজলে কটি পর্যন্ত ডোবাতেই "আসছি গো মা"—ব'লেই স্থির উত্তান নয়ন।…

মা স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে সকলের মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে ভাবমুখে বললেন: "না না, কান্না নয় নয় নয়। শুভদিনে চোখের জল ফেলতে আছে ?…দেহের খাঁচায় একদিন যে-আলোর পাখী

বন্দী ছিল সে আজ…ঐ যে…মা-র পায়ে মুক্তি পেল…কাশীতে দেহরক্ষা… কাশীতে দেহরক্ষা…কাশীর গঙ্গায় অন্তর্জলী…ধন্য…আহা…জয় মা!” ব’লে অসিতকে: “গাও বাবা শুধু গাও গাও…হ্যাঁ…গাইবে বৈ কি…গঙ্গা গঙ্গার নাম গাও…মা…মা…মা”

অসিত ধরে ফের ধরে সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে আর একটি গঙ্গাস্তোত্র, ললিতা ও তারা দোয়ার দেয়:

এসো গগনগঙ্গা, খরতরঙ্গা, ছন্দসুন্দর গানে।
এসো মূর্ছনে তব উছলিয়া নব রাগমালা-তানে।
আমি অর্পি তব চরণে মা,
নতি অর্ঘ তব বরণে মা,
যত ধূলিধূসর মলিনতা হ’র’ অমল তব বরদানে।
এসো প্রেমমন্ত্রে আজি
ম্লান প্রাণতন্ত্রে বাজি’
করো শূন্য অন্তর মা, নিরন্তর ধন্য তব আহ্বানে।
আমি চাহি না মা শক্তি,
করি প্রার্থনা শুধু ভক্তি,
তব সুচির শরণে জিনিব মরণে নিত্য সাঁঝবিহানে।
এসো শান্তি নির্ঝরি’ মর্মে,
জয় ডঙ্কি নর্মে কর্মে,
এসো পতিতপাবনি! ললিতলাবণি! মধুরিমা-অভিযানে॥

মা-র সমাধি…নিশ্চল…দীপ্ত…আধ নিমীল নেত্র…মুখে হাসি…অপাঙ্গে আনন্দাশ্রু……

সবাই গঙ্গামাটির ’পরে সাষ্টাঙ্গ হ’য়ে মা-কে প্রণাম করে…

তৃতীয় পর্ব

[দু সপ্তাহ পরে]

এক

ভাই প্রেমল,

তোমাকে লিখব লিখব ক'রেও লেখা হয়নি এতদিন—কারণ আমি কাশী থেকে বেরুতে না বেরুতে কর্মভোগের পাকে প'ড়ে অশ্রান্ত ঘুরছি নানা ওস্তাদের খোঁজে। জর্মনিতে যখন ছিলাম তখন তাদের Jugend-Bewegung-এর* টানে দুই জর্মন যুবকের সঙ্গে পিঠে Tornister † এঁটে তিন সপ্তাহ পদব্রজে ঘুরেছিলাম রাইন-উপত্যকায়। (স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জানো তো —পদব্রজে না ঘুরলে কোন দেশকেই ঠিক দেখা হয় না—রেল মোটরে ঘুরে দেখা হ'ল উপর-ভাসা দেখা।) আমার নিয়তি খানিকটা নারদের মতনই বলব —যাঁকে দক্ষমুনি শাপ দিয়েছিলেন যে, তিনি কোথাও "থিতু" হ'তে পারবেন না। আমার নিয়তিও খানিকটা অভিশপ্ত দেবর্ষির ঢঙে আমাকে ঘুরিয়ে মারতে বদ্ধপরিকর মনে হয়। তাই বিলেত থেকে ফিরেই আমি চরকির মতন অশ্রান্ত ঘুরে মরছি—আজ এখানে কাল সেখানে—যদিও আশা করি নারদ মুনির মতন সর্বত্র ঝগড়া বাধিয়ে নয়। তর্ক? হ্যাঁ, আমি স্বভাবে একটু তার্কিক, মানি—(পিতৃদেবের কাছ থেকে পেয়েছি শুধু কণ্ঠই তো নয়—তাঁর উদ্দাম তর্ক-প্রবৃত্তি)—কিন্তু তর্ক মানে কি ঝগড়া? ধরো না কেন, তোমারই সঙ্গে। তর্ক করেছি তো কতই—কিন্তু সে কি ঝগড়া করতে, না শিখতে? সত্যি ভাই, তোমার সঙ্গে তর্কাতর্কি ক'রে কত যে শিখেছি কী বলব? একথা অবশ্য মানি যে, তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়ে যেটুকু ক্ষীণ আলো আসে তাতে ভালো দেখা যায় না। তুমিই বলতে কথায় কথায় যে, এ-আলো যেন প্রদোষের আলো—বড় জোর দুচারটে খানা খোন্দল এড়িয়ে চলতে শেখায়—দূর লক্ষ্য "গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ"-এর খবর দেয় না—যে-পথ চলেছে অচিন দেশে যেখানে বাস চিরচেনা আনন্দের। আমাদের হাজারো সংশয় দ্বিধা দোমনা দোলার কুমন্ত্রণায়ই তো আমরা সে আনন্দলোককে হারিয়েছি। (মা একদিন হেসে বলেছিলেন—মনে আছে কি তোমার—যে, শিশু যখন জন্মায় তখন সব প্রথম কাঁদে—"কঁহা এ, কহাঁ এ—এ কোথায় এলাম, কোথায় এলাম?" ব'লে!)

* য়ুগেন্দ বেভেগুং = যুব-আন্দোলন।   † পৃষ্ঠ-থলি (Knapsack)।

তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া তাই আমার বিশেষ দরকার ছিল ভাই। আমি যেখানেই যাই বন্ধু পাই—অঢেলই বলব। কিন্তু সব দুদিনের সহযাত্রী—দুচার পা এগিয়েই দেখি আর পা পড়ছে না সমান তালে—চলার ছন্দে গরমিল হচ্ছে পদে পদেই। কাজেই দুদিন বাদে—at the parting of the ways—তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলতে হয়েছে শুধু—ঐ জর্মনদের মতন—Wanderlust-কেই* সম্বল ক'রে। বিলেত থেকে ফিরে তাই নানা পথে নানা বন্ধুর সঙ্গ-সাহচর্যে সুখ পেলেও কোনোদিনই তাদের দহরম মহরমকে তেমন আমল দিই নি—তাছাড়া দেবার অবকাশও ছিল না, কারণ আমি দেশে ফিরে কেবল Wanderlust-এর তাগিদেই ভ্রাম্যমাণ হই নি তো, হয়েছিলাম আমাদের দেশের গানের ঐতিহ্যের খবর নিয়ে সঙ্গীতে নব সৃষ্টির প্রেরণা পেতে। চেয়েছিলাম শুধু গাইয়ে হ'তে নয়—সঙ্গীত কোবিদ (musicologue), কবি ও সুরকার (composer) হ'তে।

কিন্তু হায় রে! "শ্রেয়াংসি" যে "বহুবিঘ্নানি"—ফোটার পথে যে হাজারো কাঁটার অন্তরায়—এ-আপ্তবাক্যের মার নেই ভাই। তাই ভ্রাম্যমাণ হয়ে ওস্তাদ ঢুঁড়তে গিয়ে সময়ে সময়ে আমার যে কী হাল হয়েছে—বিশেষ ক'রে এবার কাশী থেকে বেরিয়েই—যে, দেখলে ললিতা নির্ঘাৎ হাপুস নয়নে কাঁদত। জলে-জলময় গোয়ালঘরে আশ্রয় নিতে না হ'লেও ভাঙা তক্তাপোষে কোনোমতে শুয়ে উপরে মশা ও নিচে ইঁদুর ও বিছের সঙ্গে সারারাত ঘর করতে হয়েছে বেরিলিতে এক ওস্তাদের পাশে টিনের ঘরের আতিথ্যে। আর মশা তো নয় ভাই—কঙ্কাবতীর ভাষার "খোক্কস" বলা চলে—যার শ্রান্তিহীন দংশনের ফলে পরদিন ওস্তাদজি আমার কমলাননকে ঝাঁঝরা ব'লে ভুল করেছিলেন।

কিন্তু সবই ট্রাজিডি নয় অবশ্য। ক্ষতিপূরণ মেলে গানে। সেখানেও যে ফুলের চেয়ে কাঁটা বেশি—অসুরদের মধ্যে কালে ভদ্রে এক আধটা সুর-এর দেখা মেলে—একথা বলাই বাহুল্য। তবু—সাড়ে পনেরো খানা ক্ষেত্রে ওস্তাদবৃন্দের কণ্ঠকসরতে মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'লেও বাকি আধ আনার সুধাঝঙ্কারে প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষণীয়—তাঁরা কেউই ভজনের ভ-ও জানেন না, অথচ শুধালেই বলেন: "জানি বৈ কি।" একটি দৃষ্টান্ত দিই। এক বিখ্যাত ওস্তাদ খেয়ালের পরে ভজন গাইতে অনুরুদ্ধ হয়ে ধরলেন মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ক্রন্দিত

* ভ্রমণোৎসাহ

ভজন। গানটির প্রথম চরণ—"দ্রৌপদী পুকারী"। অর্থাৎ দুঃশাসনের উৎপীড়নে বিবসনা হবার ভয়ে দ্রৌপদী হাহাকার ক'রে কাঁদছেন। ওস্তাজী গাইছেন "দ্রৌপদী পুকারী" ঠিকই, কেবল তানের মল্লযুদ্ধে সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে! আর মুখে সে কী একগাল হাসি: "কী ছাদ-ফাটানো তান দিচ্ছি একবার দেখ দেখ দেখ!" তাঁকে আমি গীতার "পরধর্মো ভয়াবহ" বাণীটির মানে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলাম: "আপনার নিজের এলাকা খেয়াল ওস্তাদজী, আপনি ভালো ক'রেই জানেন। তবু কেন খেয়াল ছেড়ে ভজন গাওয়ার এ-বিড়ম্বনা বলুন তো? ভজন গাওয়া তো সম্ভব নয় ভক্তিকে ফলিয়ে তুলতে না পারলে।"

কিন্তু ঠাকুর কৃপাময়। তাই এর পরেই শোনালেন বিষ্ণু দিগম্বরের ভজন—এক রাম মন্দিরে। আহা সে কী ভজন! অতবড় ভারতবিখ্যাত গায়ক—কিন্তু ভজনের সময় যাকে বলে "তৃণাদপি সুনীচেন" অবস্থা—চোখের জলে বুক ভেসে যায়! যখন শেষে গাইলেন তুলসীদাসের

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই!
সখা সহিত সরযূতীর,
বৈঠে রঘুবংশবীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস চরণমে লিপটাঈ!

তখন শ্রোতাদের মধ্যে কত লোকের চোখেই যে জল ঝরেছিল! পরের বার যখন দেখা হবে এ-গানটি মাকে শোনাবই শোনাব।

কিন্তু সে কবে—মাঝে মাঝেই ভাবি। কী আনন্দে যে দু'মাস কাটিয়ে এসেছি বৃন্দাবনে ও কাশীতে। তোমাদের সঙ্গে এভাবে হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হওয়া—ভাবতে যেমন অবাক লাগে, তেমনি প্রাণে ভরসা জাগে। ভাই, আমি কয়েকটি সাধুর সঙ্গে মিশে লাভ করেছি যথেষ্ট, কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠতা এ-পর্যন্ত এক শ্যামঠাকুর ছাড়া আর কারুর সঙ্গে হয় নি।

কিন্তু তোমার সূত্রে কতগুলি লাভ হ'ল বলো তো! শ্যামঠাকুরের মাধ্যমে শুধু তাঁরই পুণ্য চরিত্রের আলো পেয়ে মনের অনেক বিষণ্ণ আঁধার কেটেছে। কিন্তু আর কেউই দেখা দেন নি তাঁর আসে পাশে। শুনেছি তাঁর গুরু আনন্দ-গিরির কথা, তবে তাঁর সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। হরিদ্বারে যাব অবশ্য তাঁর পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হ'তে, কিন্তু কবে যে যেতে পারব কে জানে ভাই? তোমার

মুখেই শুনেছি যে, প্রতি কর্মই আনে কর্মফলের জের—chain of consequences ; আমি গান গান ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি এ-কর্মের ফলে গানের নানা রূপরস আমাকে পেয়ে বসছে না কি ? ওস্তাদি গানে আসক্তিও নিশ্চয়ই আমার মনকে কিছুটা রাঙিয়ে তুলছে। ফলে ভজনের ভাবছন্দ যেন দূরে স'রে যাচ্ছে। একথা মনে হয় আরো এই জন্যে যে, এখানে ওখানে ভজন গেয়ে কই আর তেমন উজিয়ে উঠতে পারছি না তো—যেমন উঠতাম তোমার বা মা র পুণ্য সঙ্গের পরিধিতে ! মা বলতেন প্রায়ই মনে আছে—"ভজন শোনাবে কেবল ঠাকুরকে বাবা—যেন তুমি একা গায়ক আর তিনি একা শ্রোতা।" কিন্তু আমি তোমাদের ওখানে কাশীতে কই সে ভাবে গাইতাম না তো! মনে হ'ত তোমরাও শ্রোতা। ঠাকুর শুনছেন—একথা মা বলতে পারেন যিনি তাঁর হালচালের খবর রাখেন। কিন্তু আমার তো কতবারই মনে হয়েছে যে, ঠাকুর বেজায় অন্যমনস্ক—তাই হয়ত গাইবার সময়ে তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেতাম না। কিন্তু তুমি মা বা ললিতা সামনে থাকলে প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেতাম একথা জোর ক'রেই বলতে পারি—কারণ এ নির্জলা সত্য। তা যদি হয়, তবে ভজনের প্রেরণা ঠাকুরের ভক্তের কাছ থেকেও মিলতে পারে বলব না কেন ? তোমার এবিষয়ে কী মনে হয় বলবে ? আমাকে গোয়ালিয়র মহারাজের অতিথিশালার ঠিকানাই এ চিঠির উত্তর দিও, কারণ আমার কলকাতা ফিরতে হয়ত এখনো একমাস। এখানে দিন দশেক আছি। খুব গান শুনছি দুটি "মশহুর" ওস্তাদের। (মশহুর মানে বিখ্যাত।) আর স্বরোদ বাজনা শুনছি হাফেজ আলি খাঁর কাছে। তাছাড়া তাঁর কাছে ঠুংরিতেও কিছু কিঞ্চিৎ তালিম নিচ্ছি। তিনি মাসখানেক বাদে কলকাতা আসবেন। তখন আমাকে ফের শেখাবেন বলেছেন। ইনি বাজিয়ে হ'লেও গান সবই এঁর মনের মঞ্জুষায় জমা আছে তো—কণ্ঠের কসরৎ না থাকলেও সুর আছে চমৎকার। অন্ততঃ শিখতে আদৌ বেগ পেতে হয় না। কলকাতায় গৌরীশঙ্কর মিশ্র নামে আর এক মশহুর সারঙ্গিবাদকের কাছেও বিশপঁচিশটি ঠুংরি শিখেছিলাম। তিনি প্রায়ই বলতেন জাঁক করেই যে, বাইজিরা সারঙ্গিয়াদের কাছেই তালিম নেন বেশির ভাগ। মনে হয় রটনাটা সত্যি।

হাবিজাবি বকতে এসব গালগল্পের অবতারণা নয়। আমি তোমাকে এ-সূত্রে একটু জানাতে চাইছি—কী ভাবে আমার দিন কাটছে যাতে তুমি ফের

আমাকে ধম্‌কে নির্দেশ দিতে পারো—কেমন ক'রে কী ভাবে জিজ্ঞাসু সাধকের দিন কাটা উচিত।

সাধক বলতে একটা প্রশ্ন মনে এলো। ব'লেই ফেলি। মা বারবারই বলতেন: আমার গুরু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন গাঢাকা হয়ে, যথাকালে তাঁর দেখা পাবই পাব। কিন্তু আমি তো তার কোনো চিহ্ন দেখছি না। বলতে কি ভাই, এ-জগতে কত কিছু "মায়া-সত্যের" তো সাক্ষাৎ পাই উঠতে বসতে—এ-ও-তা-র নাম-সই চোখে পড়ে—গান, বাজনা, স্থাপত্য, চিত্রকলা বিজ্ঞানের কীর্তি সামাজিক হর্‌রা বন্ধুবান্ধবের আদরযত্ন, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ কখনো বা ঈষৎ রোমান্সের আভাষ, রূপরস গন্ধ বর্ণের নানান্ অনামা চমক—কেবল সাধুসঙ্গের বা ঠাকুরের কৃপার কোনো প্রত্যক্ষ আভাষ কই? অথচ আমরা যে জন্মেছি তাঁকে পেতে এ-বিশ্বাস আমার মন থেকে কোনো দিনই উবে যায় নি। তাই হয়ত তোমাদের সাহচর্যে দিনে দিনে এত প্রত্যক্ষ উৎসাহ পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো—হঠাৎ যেন তাঁর কৃপার বাতাস বইল! সে সময়ে প্রাণের খেয়া দিব্যি আশার পাল তুলে চলেছিল আনন্দের হাওয়ায় ভক্তির দাঁড় টেনে, কিন্তু তোমাদের কাছছাড়া হ'তেই যেন আবার সেই যথাপূর্বং তথাপরং—এককথায়, মিইয়ে পড়ছি ফের। কেন এমন হয় বলতে পারো? যাঁর জন্যে জন্ম তিনিই থাকেন সবচেয়ে ঘন মেঘের আড়ালে, আর যারা অবান্তর তাদের ঢেউই আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে নির্লক্ষ্য মোহনার পানে কোন্ নাম-না জানা প্রাপ্তির রসদ পেতে—যে-রসদে পেট ভরলেও মন ভরে না। তুমি আমাকে বলতে—এই শূন্যতাবোধই হ'ল বৈরাগ্যের পূর্বরাগ। হবে। তবে শুধু অতৃপ্তিকে পুঁজি ক'রে তো কেউ খাঁটি বৈরাগী হ'তে পারে না তোমার মতন। তার জন্যে আরো কিছু তোড়জোড় চাই। কী সে-তোড়জোড় একটু বলো না ভাই, লক্ষ্মীটি! তোমার কথার মধ্যে দিয়ে যে দিনের পর দিন কত পথের পাথেয় পেয়েছি তার খবর রাখো কি? তোমার চিঠি থেকে আরো কিছু পাবই পাব—তাই তুমি নানা কাজে ব্যস্ত জেনেও তোমার কাছে দরবার না ক'রে পারছি না। আমাকে ভুলে থেকো না ভাই, ther's a dear!

মা-কে আমার প্রণাম দিও। শেষ দিনে কাকাবাবুর দেহান্ত হবার পরে—তাঁর "আনন্দ আনন্দ" ঝংকার আজো যেন কানে বাজে! মৃত্যুকে এভাবে

নিতে আর কাউকে দেখি নি এ-পর্যন্ত। গীতায় পড়েছি বটে যে, মৃত্যু হ'ল যেন বেশ বদলানো। কিন্তু আমাদের মতন ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীব—যারা বাস করে হামেশা ইন্দ্রিয়লোকে, তারা—আত্মার অবিনশ্বরতার এ-অঙ্গীকার মেনে নিতে পারে কই? অথচ কেউ যে পারে এ-আশ্চর্য সত্যকে চাক্ষুষ করার ফলে অবিশ্বাস ঘা খায়ই খায়—সেটা একটা মস্ত লাভ, নয় কি? তাই তাঁকে আমার প্রণাম দিও—অন্তরের প্রণাম। গুরুবাদের মর্মমহিমা আমি না বুঝলেও মা-কে শুধু যে একজন খাঁটি সদ্‌গুরু ব'লে চিনেছি তাই নয়—তাঁর সেই গুরু গাথার আশ্চর্য প্যারাবল্‌টি কোনদিনই ভুলব না। কারণ এ-কথিকাটির আলোয় আমার চোখের সামনে গুরুবাদের রহস্য সত্যিই বেশ একটু ফিঁকে হ'য়ে এসেছে।

আর ললিতা! কী অপরূপা! স্নেহোচ্ছলা, ভক্তিমতী এমন আনন্দ-নির্ঝরিণী কটা দেখা যায় আমাদের ঊষর জীবনের ধূসর বালুচরে? ঠাকুর তাকে ডেকে নিয়েছেন তোমার মাধ্যমে। প্রার্থনা করি—যেন সে তার গতিসঙ্কুল প্রাণের ছোঁওয়ায় অজস্র তামসিক সর্বহারাকে আলোর ভরসায় বিশ্বাসের আনন্দে জাগিয়ে মাতিয়ে রসিয়ে রাঙিয়ে তোলে।

এতবড় চিঠি লিখব ভাবিনি। তবে অনেক কথা জ'মে ছিল তাই পারলাম না দাবিয়ে রাখতে। যদিও আরো কত কী বলতে ইচ্ছে হয়েছিল বলা হ'ল না। তোমার চিঠিতে যদি একটু ভরসা দাও তাহ'লে বলতে পারি, কিন্তু যদি দমিয়ে দাও তাহ'লে এখানেই ইতি—আর তোমাকে উদ্ব্যস্ত করব না কখনো। সাবধান! ইতি!

তোমার স্নেহধন্য

অসিত

[এক সপ্তাহ বাদে [

ভাই অসিত,

তোমার চিঠির পিঠপিঠ জবাব দেব এমন ভাগ্য ক'রে তো আসি নি। মা-র শরীর ভালো যাচ্ছে না। গুরুদেবের দেহান্তের পরেই তাঁর খুব অসুখ করে। নানা উপসর্গ। তাছাড়া আশ্রমে এখন চার চারটি অতিথি—দুজন স্কচ্, একজন আমেরিকান্, আর একজন কাশ্মীরি। দেখাশুনা করতে হয় আমাকেই বেশি—কারণ প্রণবকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় ডিস্পেনসারি নিয়ে, আর ললিতা রান্নাবাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে মা'র তদারক করে। কাজেই এই division of

labour-এর ফলে আমাকে অষ্টপ্রহর না হোক, অন্ততঃ সাড়ে চার প্রহর সময় নিয়োগ করতে হয় অতিথিদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে। লাগবে না সাড়ে চার প্রহর? সে যে কতরকম প্রশ্ন যদি জান্তে বন্ধু! সবাই তো আর অসিত নয় যে, সাধুসন্তের কাছে আসবে গুরুর বা ইষ্টের খবর চাইতে। সত্যি, এরা যোগ বলতে ভাবে শুধু আসন প্রাণায়ামের রকমারি কসরৎ যার ফলে (মার ভাষায়) এই দেহরূপ খাঁচাটি বেশ মজবুৎ হ'য়ে গড়ে ওঠে। এদের কাছে বৈরাগ্যের, ভক্তির, কি ভগবানের দর্শনের জন্যে ব্যাকুলতার কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথা তুমি প্রায়ই উদ্ধৃত করতে কাশীতে। তিনি নাকি মা কালীকে বলেছিলেন রাগ ক'রে: "এসব কাদের আমার কাছে পাঠাস্ মা—যারা বিষয় নিয়েই মত্ত? যেন একসের দুধে চার সের জল। কত জ্বাল দেব মা—দুধ ঘন হ'তে চায় না, কেবল কাঠের ধোঁয়ায় চোখ গেল মা, চোখ গেল! এ আমি পারব নি।"

চৈতন্যদেবও বলেছিলেন—পড়ছিলাম চরিতামৃতে—"শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কোনো গতি নাই।"

এ-খেদের কারণ আছে বৈ কি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সংসারীরাও কৃষ্ণের জীব। তাই তাদেরও একেবারে বরখাস্ত করা চলে না।

মহাপ্রসাদের মোহনভোগ তাদের হাতে তুলে দেওয়া চলে না মানি, কিন্তু বাতাসার হরির লুটও না দিলে চলবে কেন? (একথায় কিন্তু তুমি আবার ফের মন খারাপ কোরো না যেন 'অধিকারিভেদ' ব'লে আমাকে শাসিয়ে—কারণ সে-শাসন আমি কিছুতেই মানব না—সূক্ষ্মভাবে অধিকারভেদ আছেই আছে—সবাইকে অমৃতের বার্তা দেওয়াও চলে না, আর দিলেও সবাই অমৃত চাইতে পারে না এখনি এখনি)। একটি ইহুদীদের গল্প শোনো: এক 'র‍্যাবি' পুরুতের বাড়ীতে রাত্রে হঠাৎ এক মাতাল অতিথির অভ্যুদয়। পুরুত ঠাকুর তাকে আশ্রয় দেন এই সর্তে যে সে আর মদ খাবে না। সে কথা দিল তৎক্ষণাৎ। গভীর রাত্রে হঠাৎ কর্তা উঠে দেখেন অতিথি পকেট থেকে বোতল বের করে মদ খাচ্ছে। তিনি দারুণ রেগে তাকে নিশুত রাত্রে তাড়িয়ে দেওয়ার পরেই স্বপ্নে শোনেন ভগবানের ভৎর্সনা: "আমি চল্লিশ বৎসর ধ'রে মাতালটিকে আশ্রয় দিয়েছি, তুমি আমার ভক্ত হ'য়ে মাত্র একটি রাতও তাকে সইতে পারলে না?"

তাই সময়ে সময়ে অনেক কৌতুহলী হুজুগে বা বিলাসী অবোধকেও আশ্রমে ঠাঁই দিতে হয়। তারা কিছু অন্ততঃ পায় তো—মনকে এই সান্ত্বনা দিই। হয়ত মিথ্যে সান্ত্বনা—হয়ত তারা আশ্রমে আসার পরেও থেকে যায় যে-তিমিরে সেই তিমিরে। তবু ঠাকুরের কথা তো ফেলতেও পারি না—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কালও ললিতাকে লেকচার দিচ্ছিলাম (জানোই তো লেকচার দিতে একবার সুরু করলে আমি কেমন জাঁকালো বক্তা হ'য়ে উঠি!): "কাউকে যখন সঙ্গ দেবে বা স্নেহ করবে তখন মাথা বকিয়ো না সে তা থেকে কিছু লাভ করল কি না, তোমার স্নেহকে স্নেহ ব'লে চিনল কি না। তারা সমজদার হয় ভালো, না হ'লে বহুৎ আচ্ছা—কারণ কোনো শুভচেষ্টাই ব্যর্থ হয় না—'নেহাভিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।' এও ঐ গীতারই কথা।"

ললিতা তর্ক তুলল: "তাহ'লে আশ্রমে এসে নির্জনবাসের এ-বিড়ম্বনা কেন? সংসারীদের মধ্যে থাকলেই তো পারতে। বৈরাগ্য মানেই তো তাদের কাছ থেকে একটু দূরে স'রে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা।"

মুস্কিলে পড়তে হ'ল বৈ কি। কারণ কথাটার মধ্যে যে কিছু সত্য আছে অস্বীকার করি কী ক'রে বলো? ও সরলা হ'লেও অবলাও নয় বা বোকাও নয় যে, ভয় দেখিয়ে যা বলবে তাই মেনে নেবে। হুঙ্কার শুনে শঙ্কায় মিইয়ে যাবার পাত্রী ও নয়। একেবারে live wire যাকে বলে। কিন্তু ওর আপত্তির ভিত্তি আছে মেনেও বলা চলে যে, মানুষ সময়ে সময়ে শক্তি সঞ্চয় না করলে দান করবে কেমন ক'রে, কাজ করবে কিসের জোরে? সংসার ছেড়ে বনে যাওয়া বা আশ্রমে-বাস-এরও প্রয়োজন আছে নিজেকে তৈরী ক'রে নেবার জন্যে। ওকে তোমার চিঠি দেখিয়ে তোমার দৃষ্টান্ত ওর সামনে ধরলাম ওর প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। বললাম: এই দেখ না, অসিত-যে অসিত সেও লিখেছে কাশীতে মা-র স্নেহসঙ্গে আশীর্বাদে কত কী পেয়েছিলো—কিন্তু তাঁর কাছছাড়া হ'তেই মিইয়ে যেতে বসেছে। বললাম—মা'র কাছে থাকা মানেই খানিকটা তাঁর প্রভাব-পরিধির মধ্যে আসা—সংসারের প্রভাবের কাটান চেয়ে। "জীবনটা তো ফুলখেলা নয় ললিতা," বললাম আমি ওকে গুরুগম্ভীর স্বরে (নৈলে ও মানবে কেন?)—"নানা শক্তি নানা দিকে টেনে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে বিশেষ ক'রেই সেইসব সাধক সাধিকাকে যারা চায়

একান্তী হ'তে। তাই সময়ে সময়ে একান্তী হবার জন্যেই বহুর সঙ্গ ছেড়ে নির্জন সাধনায় উঠে প'ড়ে লাগতে হয়। অর্থাৎ খুঁটি পাওয়া। নৈলে ভেসে যাব যে......" ইত্যাদি আরো কত কথাই বললাম গুছিয়ে। কিন্তু সেসব ওর কাজে এলেও তোমার কাজে আসবে না। তাই লিখলাম না।

তবে দুএকটা কথা বলা চলে। এমনিই বলছি কিন্তু, উপদেশ নয়। আমি মোটেই চাই না de haut en bas ঢঙে কথা কইতে—যেন আমি উপরতলায় উঠেছি, তুমি উঠতে পারছ না, তাই সাহায্য করতে ঝুঁকছি তোমার দিকে—এই ভাব।

তুমি বৃন্দাবনে প্রায়ই বৈরাগ্যের ভাষ্য করতে—সংসারে বিতৃষ্ণা। এ-চিঠিতে লিখেছ পার্থিব জীবনে অতৃপ্তির কথা। আমি বলতাম যে-শূন্যতাবোধের কথা—তার উল্লেখ ক'রে জিজ্ঞাসা করেছ শুধু এই অতৃপ্তিকে সম্বল ক'রে চললে—বৈষ্ণবদের ভাষায়—বস্তুলাভ হয় কি না—শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রেমলের মতন "খাঁটি বৈরাগী" হওয়া যায় কিনা।

প্রথম কথা বলি: "বৈরাগী" লেবেল মেরে আমাকে একটা বিশেষ দলে ভরতি করতে চাও কেন? তোমাকে একবার বলেছিলাম—তোমার মনে থাকতে পারে—যে, আমি গুরুকরণ করার পক্ষপাতী হলেও গুরুবাদ-জাতীয় ইস্‌ম্-এর পক্ষপাতী নই। তুমি আমি যে-বস্তুলাভের জন্যে তৃষিত সে-বস্তু লাভের পথে সব বাদ-ই (ism) মস্ত বাধা। ঠিক তেমনি বৈরাগী। আমি খাঁটি বৈরাগী আর তুমি মেকি বৈরাগী কিসে? আমরা দুজনেই ভগবানকে চাই, খুঁজছি—কোন্ পথে গেলে একটু তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌছন যায়। এই তো বেশ বোঝা গেল। এর পরে তোমার আমার মধ্যে কোন্‌খানে কী তফাৎ তার চুলচেরা হদিস চাও কেন? তুমি যে আমাদের কাছে গান গেয়ে প্রেরণার নগদবিদায় পেয়েছ এতে আমরা সবাই খুশী (ললিতা তো প'ড়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে হাততালি দিয়ে বলল: "হবে না? তুমি আমি মা কি সোজা সমজদার, বাপী?") কিন্তু গোয়ালিয়রে বা অন্যত্র এর ওর তার কাছে গান গেয়ে প্রেরণা পাচ্ছ না—মনে হচ্ছে ভগবানের কাছে গাওয়া হয়ত একটা কথার কথা—এ-ধরনের খেদ করতে আছে কি? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও বটে। কিন্তু যখনই তাঁকে ডেকে, ধ্যান জপ ভজন ক'রে, অন্তরে শান্তি, ভক্তি কি আবেশ নামে, তখনই সে-সাড়া জাগাচ্ছেন তথা

জোগাচ্ছেন যে তিনিই একথা মানতে বাধা কি? এ-পথে প্রথম দিকে অনেক কিছুই সত্য ব'লে মেনে নিলে তবেই সুরু হয় অনুভবের দীক্ষা, মানে, যা মেনে নেওয়া হয়েছে গুরুবাক্য ব'লে তাকে ক্রমশঃ প্রাণের নানা উপলব্ধির নিকষে ক'ষে অন্তরঙ্গ সত্য ব'লে চিনতে পারা যায়—এ-সনাতন সত্যকে কেন বরণ করবে না সত্য বলে? কেমন ক'রে জানবে—এ-উপলব্ধি আসবেই আসবে? কেমন ক'রে জানো—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে কলকাতা থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে চললে দিল্লী পৌছনো যায়? হাজার হাজার যাত্রী এ-পথে চ'লে দিল্লী পৌছেছেন ব'লে। তেম্নি, গুরুবাক্যের নির্দেশে চ'লে হাজার হাজার ছোট বড় সাধক তথা মহাজনের ভগবৎ দর্শন হয়েছে—তাঁরা একবাক্যে এজাহার দিয়েছেন। তাঁদের সাক্ষ্যকে নাকচ করবে কিসের জোরে? যারা গুরু-বাক্য মেনে চলে নি ব'লেই দর্শন পায়নি তাদের নাস্তিক ঘোষণায়? সমুদ্রমন্থন ক'রে বিষের ঝাঁঝ কাটিয়ে যারা অমৃতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের অমৃত হওয়ার ফলে কী জ্যোতির্ময় জীবন হয় আমরা দেখিনি কি স্বচক্ষেই। তবু বলব কোন্ মুখে যে, যে-সব ভয়কাতুরে নিরাপদপন্থী কোনোদিন সমুদ্রের ধারপাশ দিয়েও যায় নি তাদের শূন্যতার এজাহারই বেশি প্রামাণ্য—অমৃত নেই এই ধারণাই সিদ্ধ? তুমি ভালো গানের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ—কত ওস্তাদের কাছে গিয়ে কত অসুবিধা সহ্য ক'রে বিদেশে বিভুঁয়ে দিন কাটাচ্ছ দিনের পর দিন। ফলে তোমার সুরের কান ও গানের গলার সূক্ষ্ম বিকাশ হয়েছে। যারা কোনোদিন কণ্ঠসাধনা করে নি তারা কী জানবে এ-সাধনার সত্যাসত্য, আনন্দ-বেদনা? ভগবানের বাঁশির ডাক যারা শোনে গোপীদের ম'ত তারা তাঁর জন্যে ঘর ছাড়ে এ কি চাক্ষুষ করি নি আমরা? মা-ই তো রয়েছেন সামনে অপ্রতিবাদ্য প্রমাণ—যে, সব থাকতেও মানুষ অনিকেতের ডাকে ঘর ছাড়ে, অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে বিদায় দিয়ে আত্মীয়-স্বজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি সমাজের সমর্থনও ছাড়ে প্রাণকে বাজি রেখে। তুমি লিখেছ—মাকে দেখে কত কি পেয়েছ। খুব সত্যি কথা। আমি আরো একটু বেশি বলব। বলব—তুমি যা পেয়েছ ভাবছ তার চেয়েও যে অনেক বেশি পেয়েছ তাঁকে দেখে, চিনে, তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে এ-সত্যও তুমি একদিন উপলব্ধি করবেই করবে। আর আমার এ-ভবিষ্যদ্বাণীর সবচেয়ে বড় ভর হ'ল তোমার অতৃপ্তি—সব থেকেও, কাব্যে, সাহিত্যে, ওস্তাদি গানে আনন্দ পাওয়া সত্ত্বেও তোমার মন ভরছে না এই

symptom থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে বাঁশির (চরিতামৃতের ভাষায়) "বিষামৃতের" ক্রিয়া শুরু হয়েছে। এম্‌নি ক'রেই ঠাকুর আমাদের ছাড়িয়ে নেন সাংসারিক কামনা-বাসনা-মমতা-আসক্তির নোঙর থেকে। আর গুরুশক্তির টানে এ ছাড়িয়ে-নেওয়া আরো সহজ হয় ব'লেই সাধু সন্তরা আবহমানকাল সঘনে গুরুর গুণগান ক'রে এসেছেন—যদিও তোমার মনে হয়—তাঁরা অত্যুক্তি করেছেন গুরু কৃষ্ণ এক ব'লে। তুমি এখন তর্কের সুর ধরেছ—এদিকে মাটির মানুষের মৃন্ময়তা নানা ভ্রান্তি সীমা চ্যুতিতে ভরা—ওদিকে চিন্ময় ভগবান অভ্রান্ত অসীম অচ্যুত—কাজেই গুরুকে কেমন ক'রে ইষ্টের পদবী দেওয়া যেতে পারে? ভগবান সর্বশক্তিমান কালাতীত সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী—গুরু আমাদেরই মতন কালাধীন রোগশোকের অত্যাচারে জর্জর। কেমন ক'রে এহেন জর্জর গুরুকে নির্জর ভগবানের সমান ব'লে অর্ঘ দিই?

কিন্তু যাক। এ তর্ক যথেষ্ট হয়েছে। আজ কেবল বলতে চাই একটি কথা: যে, গুরুদাস হ'লে কৃষ্ণদাস হওয়া যায় এ কথার মানে নয়—গুরু ঠিক কৃষ্ণের মতনই এই "কালচক্র জগৎচক্র ও যুগচক্রের" চক্রধারী। এ কথার তাৎপর্য শুধু এই যে, গুরুর মধ্যে কৃষ্ণের দৈবী চেতনা ও করুণাশক্তি রূপ নিয়েছে ব'লে তাঁকে ভালোবাসলে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছনো একটু সহজ হয়। না—হ'ল না। গুরুর মহিমা এভাবে দুকথায় বোঝানো যায় না—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় না—কিভাবে তিনি তাঁর আলোয় অন্ধকারে দিশা দেন, তাঁর জ্ঞানাঞ্জনে কেমন ক'রে অজ্ঞানান্ধের চোখ খুলে দেন, কোন্ অচিন পথে অসম্ভবকে সম্ভব করেন—এক হাতে শিষ্যের ঘাড় ধরে অন্য হাতে ইষ্টের পা ধরে তাঁর প্রেমের নায়কতায় শিষ্যকে পৌঁছে দেন ইষ্টের চরণে। আর যেই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এ-ছোঁয়াছুঁয়ি হয়, অমনি পরম দর্শনের বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে—যার উদ্ভাসে শিষ্যের মনের প্রাণের যুগপুঞ্জিত আঁধার কেটে যায়, সে দেখতে পায়—গুরু-ইষ্টের একাত্মতা পুঁথির বুলি নয়—জীবনের একটা পরম দর্শন চরম উপলব্ধি—বিন্দু-সিন্ধু, অণীয়ান্-মহীয়ান্, মূর্ত-অমূর্ত, রূপ-অরূপ, সীমা-অসীমার মহামিলন—যার আভাষ দিয়েছিলেন মীরা একদিকে কৃষ্ণভজনে:

অব তো বাত ফৈল গঈ জানৈ জগ সারা।
সিন্ধু সঙ্গ বিন্দু মিলী এক হুঈ ধারা॥

অন্যদিকে গুরুগুণগানে :

সদ্‌গুরু গোবিন্দ এক সখী রী, মৈ তো ভেদ ন পাঈ।

হরী মিলায়ে সদ্‌গুরু গুরুনে হরিকী রাহ দিখাঈ।

এই দেখ, ললিতা আমাকে কেবলই টুকছে—এসব না লিখতে বলছে—তুমি ফের ভয় খেয়ে চম্পট দেবে; যদি বা আসতে সামনের জন্মাষ্টমীতে, আর আমাদের ছায়াও মাড়াবে না; বলবে হয়ত: "কাজ নেই বাবা, গুরু গোবিন্দকে এক ব'লে স্তব জুড়ে দিতে পারব না আমি—ওরা আমাকে দিয়ে এই কথাটাই বলিয়ে নিতে উঠে প'ড়ে লেগেছে।" ললিতা বলছে: "গুরুর মহিমা বোঝা যায় না আর কারুর এজাহারে তা সে যত বড় বন্ধুই হোক না কেন। এ পরের মুখে ঝাল খাওয়ার কর্ম নয়—বলছে ও হাত নেড়ে। রোসো, ও লিখতে চায় দুটো কথা এই সঙ্গে পুনশ্চ ভঙ্গিতে—নিজের জবানীতেই। তাই আজ যাই ভাই।

মা তোমাকে আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন আর বলছেন জন্মাষ্টমীতে আসতে—তোমাকে গুরুবন্দনা গাইতে হবে না, কৃষ্ণের গান গাইলেই চলবে, বলেছেন একথা লিখে দিতে যেন না ভুলি। কারণ জন্মাষ্টমীতে তোমার আসা চাই-ই চাই। এ-আবেদনে আমাদের সবারই নাম সই রইল। ইতি।

তোমার স্নেহাধীন প্রেমল

(পুনশ্চ)

দাদা,

এটা চিঠি নয়—পুনশ্চ। আমি মোটেই খুশী হই নি শেষের দিকে বাপী গুরু সম্বন্ধে যা যা লিখেছে তার ভঙ্গিতে—মানে tone-এ। আমার মনে হচ্ছে যে, ও যতই বলুক ও নিজের সঙ্গেই কথা কইছে, ওর লেখার ঢঙ এত জোরালো যে যারা অবিশ্বাসী তাদের মন আরো বেঁকে বসে। আমার নিজের মনের মতিগতি দেখে একথা আমি যেন আরো বেশি ক'রে উপলব্ধি করেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, যখন মিশনারি স্কুলে পড়তাম মনে হ'ত—মন্দির টন্দিরে প্রণাম আবার কী? মাটির প্রতিমা তো ছেলে-ভোলানো ব্যাপার। মা আমাকে বার বার বোঝাতেন—প্রণাম করার দীক্ষা ছেলেবেলায়ই হওয়া ভালো। কিন্তু যতই বলতেন ততই আমার মন উঠত রুখে। মনে পড়ত আমার এক খুড়তুত ভাইয়ের কথা। তার বাবা ব্রাহ্ম হবার পর জোর ক'রে তাকে উপাসনায়

বসাতেন সাঁঝ সকালে। সে আমাকে একদিন বলেছিল: বড় হ'লে আমি কী হব জানো? হব শুঁড়িয়াখানার মালিক, কি bar-tender: বাবাও বলতেন প্রায়ই যে, তাঁর দাদা অত্যন্ত পিউরিটান ছিলেন ব'লেই তাঁর ছেলে বিলেত যেতে না যেতে মদ ধরেছিল।

তারপর আরো আছে। শোনোই না যখন কথা উঠল। প্রণবদা না? ও যখন এল আমাকে স্নেহ ক'রে নানা উপদেশ দিত—অবিশ্যি ভালো ভেবেই। কিন্তু আমি ওকে বারবার অকারণ ঘা দিতাম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে। মনে বেশ জানতাম যে, অন্যায় করছি, কিন্তু ভাবতাম ও de haut en bas উপদেশ দেবে কেন? শাদা চামড়া ব'লে? জানতাম—ও সে-জাতের সাহেব নয়, ভারতের প্রতি ওর শ্রদ্ধা আন্তরিক, বাবা মাকে ও সত্যিই ভক্তি করে। তবু নিজের সাফাই গাইতাম তেরিয়া হ'য়ে। একদিন মা বললেন: "ওরে, তুই আমার কথায় তো কান দিবি না, তাই আমি প্রার্থনা করি—ঠাকুর যেন তোর উপর এক ভারিক্কি গুরু চাপিয়ে দেন। তখন বুঝবি ঠেলা।" যেই বলা আমার মন আরো বিমুখ হ'য়ে উঠল। বললাম: "গুরুর পায়ে প্রেমল (তখন বাপীকে প্রেমল বলতাম) দাসখৎ লিখে দিতে পারে কিন্তু আমি সে-পাত্রী নই।" মা বোঝাতে চেষ্টা করলে বলতাম: "তুমি চুপ করো মা। ভগবানে আমার বিশ্বাস আছে ব'লেই চাই না গুরুর ঘটকালি। আমার যদি ভুলভ্রান্তি হয়, ঠাকুরই আমাকে দেখিয়ে দেবেন—দেবেনই দেবেন, কারণ আমি তাঁকে প্রার্থনা করি রোজ আমার ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে, আমার মনের মধ্যে গুরু হ'য়ে এসে। আমি জানি তিনিই আমার গুরু—কোনো মানুষ নয়—নয়—নয়।"

কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে, আমি এত হাঁকডাক ক'রে খোদ ভগবানকে গুরু করতে চেয়েছিলাম জানতাম ব'লে যে, আমি ভুলপথে বেঁক নিলে তিনি সশরীরে সামনে এসে দাঁড়িয়ে মানা করবেন না—যেমন মা মানা করতেন প্রেমলকে। ভাবতাম: "বাপরে! শেষে কিনা প্রেমল গুরু হ'য়ে ফুলে উঠে আমাকে মানা করবে এই ভাবে—এ কোরো না, তা কোরো না? রক্ষা করো—ধর্ম আমার না হয় নেই নেই—গুরু আমি করছি নি।"

কিন্তু দেখ কী কাণ্ড ঘটল! "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়"—বলে না? হ'ল কি, একবার প্রণবদা আমার একটা ইংরাজী ভুল শুধরে দিতে

চাইতেই বলেছিলাম: "রাখো রাখো। বিদ্যে তোমার কত জানা আছে আমার। জানো আমি বিলেতে স্কুলে ইংরাজীতে ফার্স্ট হতাম?"

ব'লেই অনুতাপ হল। কারণ আমি জানতাম এক্ষেত্রে প্রণবদা ঠিকই বলেছিল আমিই ভুল বলেছিলাম। কিন্তু অনুতাপকে ডিশমিশ ক'রে দিলাম প্রার্থনা ক'রে যে, ঠাকুর যদি আমার মনে বিবেকের সুর ধ'রে আমাকে বলেন আমার ভুল হয়েছে, তাহলেই কেবল আমি ক্ষমা চাইব প্রণবদার কাছে, নৈলে নয় নয় নয়।

আমি জানতাম অবশ্য যে, আমি ঠাকুরের কাছে নত হবার এই ভঙ্গি করতাম মনে মনে জানতাম ব'লে যে, লক্ষ্মীঠাকুর দুষ্টু আমাকে শুধরে শিষ্ট ক'রে দেবেন না, এমন কি আমি যদি নয়কে হয় করতে চেয়ে বলি—ঠাকুরই আমাকে একথা বলেছেন আমার মনের অতলে শুভবুদ্ধি হ'য়ে, তাহ'লেও তিনি কথাটি কইবেন না। এমন না হ'লে ঠাকুর? সুবোধ ঠাকুর সহজেই পোষ মানেন। কিন্তু গুরু বড় কঠিন ঠাঁই, ভুল করলে নিজের মনকে চোখ ঠারার পথ রাখবেন না, সাফ্ ব'লে দেবেন—গড়িয়ে চলেছি ঢালুপথে। তাই গুরুবরণ করতে এত ভয় পাই আমি—স্পষ্ট দেখলাম। সারারাত কেঁদে পরদিন জ্বরে প'ড়ে দেখলাম এক অদ্ভুত স্বপ্ন। বৃন্দাবনে তুমিও এম্নি একটি স্বপ্ন দেখেছিলে, মনে, আছে? তবে তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এইখানে যে, তোমার স্বপ্নকে তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে, যেখানে আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। বলি শোনো, আর লিখো—প'ড়ে তোমাকেও হাপুস নয়নে কাঁদতে হয়েছিল কিনা।

স্বপ্নটি মোটামুটি এই:

আমি বিলেতে টেম্‌স্ নদীতে চলেছি পাল তুলে আমার তিনটি সখীকে নিয়ে। তার মধ্যে একটি নাস্তিক, একটি ধার্মিক, আর একটি কম্যুনিস্ট। তিনজনই—ইংরেজ। আমি তাদের খু-ব ভালোবাসতাম।

আমরা তো খুব হর্‌রা করে ভেসে চলেছি। হঠাৎ নাস্তিক লিলি বলল: "আয়, গান গাওয়া যাক্।" বলেই ধরল একটি সিনেমার ছ্যাপলা গান: Swanney, beautiful Swanney! How I love you, how I love you, Swanney……ইত্যাদি। ধার্মিক ডায়না "Shame, Shame" ব'লে ধমকে গাইল: "Saviour, let me walk with thee" শুনে কম্যুনিস্ট নানা "Fie fie!" ব'লেই ধ'রে দিল:

"Man is the Lord and the Lord is a clod :
Only the morons call it God !"

আমার মনটা কেমন যেন হঠাৎ দ'মে গেল। এ-গানটি আমি তিন চারবার শুনেছিলাম নানার মুখে। সে আমার কি ডায়নার মুখে ধর্মের কোনো কথা বা গান শুনলেই এই গানটি গাইত যেন শোধ তুলতে চেয়ে।

এ-গানটি গাইতে না গাইতে উঠল ঝড়।......তারপর হিজিবিজি অনেক কিছু ঘটল মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে আছে একটা হাঙ্গর আমাদের নৌকায় লাফিয়ে উঠে নানার পা ধরে টেনে জলে লাফিয়ে পড়ল। ডায়না বলল : "বেশ হচ্ছে—হবে না? ব্লাস্‌ফেমি?" নাস্তিক লিলি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল : "ক্ষমা করো প্রভু, আমি আর অবিশ্বাস করব না। এসো ললিতা গাই :

Saviour, lead me lest I stray :
Gently lead me all the way......"

কিন্তু আমি বললাম রুখে উঠে : "আমি সুখের দিনে ভগবানকে ডাকি নি, বিপদে প'ড়ে তাঁকে তলব করব কোন্ লজ্জায়? সঙ্গে সঙ্গে ডায়না চেঁচিয়ে উঠল : "ঝড়, ঝড়, ঝড়! পাল নামাও নামাও।"

কিন্তু নামাবে কে? ভয়ে লিলি মুখ ঢাকল, ডায়না মূর্ছা গেল। আমি তখন কেন জানি না কেঁদে ডাকলাম মা-কে : "মা গো, মা গো!" শুধু এই মা—মা—মা! অমনি দেখি ডায়না হ'য়ে গেল মা আর লিলি—বাপী। মা বললেন বাপীকে : "হাল ধরো দুলাল, আমি পাল নামাচ্ছি।" ব'লেই মা ফুঁ দিলেন, অমনি পাল অদৃশ্য! কিন্তু নৌকা বিষম দুলছে, প্রতি দোলায়ই জল উঠছে। মা বললেন : "দুলাল! হাল ধরো, ধরো এক্ষুনি, নৈলে—" বলতেই বাপী হাল ধরল। অমনি যে-ঝড় নৌকাকে ডুবু ডুবু করেছিল সে-ই পৌঁছে দিল কিনারায়...আমি মা-কে বললাম : "মা! মা! বাঁচালে!' মা বললেন : "আমি বাঁচাই নি রে মেয়ে, বাঁচিয়েছে তোর গুরু! আমি কেঁদে বাপীর পায়ে প'ড়ে বললাম : আমাকে মন্ত্র দাও—আমি শুনব তোমার কথা এখন থেকে।"

যেই বলা আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু স্বপ্নে-পাওয়া প্রার্থনার আলো ঢেকে গেল সংশয়ের কালো মেঘে। ভোরে উঠেই মাকে গিয়ে সব বললাম। শুনে মা বললেন :

"এ স্বপ্ন নয় রে—কৃপার বাণী। গুরুর গুরু হুকুম করেন গুরুকে—এইই হ'য়ে এসেছে চিরদিন।"

আমি বুঝতে না পেরে বললাম: "তার মানে—বাপী আমার গুরু, আর তুমি আমার ইষ্ট?"

মা বললেন: "না। ইষ্টকে তুই আমল দিতে চাস নি ব'লেই আমাকে তিনি হুকুম দিলেন দুলালকে হাল ধরতে বলতে।"

যেই বলা অমনি আমার মন বিষম বেঁকে বসল ফের। ইষ্টকে আমল দিতে চাই নি আমি—এ কেমন কথা? গুরুবরণ করতে না-চাওয়ার নাম কি ইষ্টকে বলা—তফাত যাও?

মন বিষম খারাপ হ'য়ে গেল। রাত্রে খুব কেঁদে ডাকলাম ঠাকুরকে। বললাম: "ঠাকুর যদি প্রেমলই আমার সত্যি গুরু হয় তবে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও সেকথা—যাতে আমার বেয়াড়া মনের সব বাধা কাটে।" কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে সেই স্বপ্ন দেখলাম যার কথা তোমাকে বৃন্দাবনে বলেছি—সেই পূজোর ঘরে একমনে জপ করতে করতে মা-র বাপীকে ডেকে বলা যে, আমাকে সে এখন মন্ত্র দিতে পারে, কারণ আমার মনের সব বাধা কেটে গেছে।

যেই শোনা ঘুম ভেঙে গেল। এ কী অঘটন! সত্যিই তো মন নির্মল হ'য়ে গেছে! বাধা কেটে যাওয়া আর কার নাম? কী আনন্দ, কী আনন্দ!

তারপর কী অঘটন ঘটল তোমাকে বৃন্দাবনে বলেছি—অর্থাৎ, আমার উঁচু মাথা হেঁট হ'ল বাপীর পায়ে। সে আমার গুরু হ'যে আমার কানে কৃষ্ণমন্ত্র দিল।

তারপর? তারপর আর কী? শুধু আনন্দ আর আনন্দ! এ-মাটির জীবনে যে এমন আকাশের আনন্দ নামে আমি ভাবতেও পারি নি কোনদিন। কিন্তু সবচেয়ে বড় অঘটন এ-আনন্দও নয়। সবচেয়ে বড় অঘটন এই যে, এই দারুণ রোখালো মেয়ে এক মুহূর্তে পোষ মানল গুরুর পায়ে! গানে আছে না:

আমি তোমার পোষা পাখী, যা শিখালে তাই শিখি,
শিখায়েছ তারা বুলি তাই তো ডাকি তারা তারা।

তাই বলি ভাই, গুরুবাদ না মান্‌তে চাও কিছু যায় আসে না—কেবল গান গেয়ে ডাকো ঠাকুরকে—তিনি যখন গুরুকে পাঠাবেন তখন বোঝাপড়া কোরো গুরুর সঙ্গে। কেবল ব'লে রাখি—সেদিনে তোমাকেও হ'তে হবে পোষা পাখী।

এই দেখ, ঝোঁকালো হবার বিপদ, দাদা! পুনশ্চ দিয়ে দুচারটে লাইন লিখব ভেবে কী কাণ্ড করলাম! ক্ষমা ক্ষমা ক্ষমা!

ইতি

অনুতপ্তা ছোটবোন ললিতা

পুনঃ পুনশ্চ। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলব ঠিক ক'রেছিলাম। কিন্তু এখন গুরু হয়েছে—সে ছিঁড়তে বারণ করল। নিরুপায়। I have made my bed and must lie on it—বলে না? ইতি।

না, পুনঃ পুনঃ পুনশ্চ। মা বললেন, "ওকে লিখে দে তুই ঠিকই লিখেছিস্। কেবল এইটুকু জুড়ে দে: গুরু আসার আগে তার হুকুমে চলতে হবে কি না হবে ভেবে মন খারাপ করার দরকার নেই—he needn't cross the bridge till he comes to it.

হাজার হোক আমার গুরুর গুরুতো—কাজেই—who else can have the last word এবার ইতি। ইতি। ইতি। নিশ্চয় শেষ রজনী।

স্নেহধন্যা ললিতা

[দশদিন পরে]

ভাই প্রেমল,

তোমার চিঠি গোয়ালিয়রে পাই নি। কারণ আমি তিনদিন আগেই গোয়ালিয়র থেকে বরোদায় চ'লে এসেছি হঠাৎ বরোদার সভাগায়ক বিখ্যাত ফৈয়জ খাঁর কাছে দুচারটে খেয়াল ও ঠুংরি শেখার সুযোগ মিলে গেল ব'লে। এখানে আছি এক বন্ধুর ওখানে। ফৈয়জ খাঁ যে খুব যত্ন ক'রে গান শেখাচ্ছেন এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু সে কথা থাক। সব আগে বলি—তোমাদের চিঠি পেয়ে মন হাল্কা হ'য়ে যাওয়ার কথা—বিশেষ ক'রে ললিতার স্বপ্নের বাণী শুনে তথা মা-র আশ্বাসে যে, আগে থাকতে মন খারাপ ক'রে লাভ নেই। বরোদায় মীরাবাই সম্বন্ধে একটি কথিকা শুনলাম। শোনো বলি—অবান্তর হবে না।

মীরার এক দাসী ছিল তের চোদ্দ বৎসর বয়স। একদিন সে তাঁর কাছে এসে সে কী কান্না!

"কি ব্যাপার?"

"রাণীমা, আমার *বিয়ের ঠিক* হয়েছে। বরও ভালো, আমার মনেও ধরেছে। কিন্তু আমি আজ সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাব ব'লে মা যে কী কান্নাকাটি করছেন কী বলব?"

"এই জন্যে মন খারাপ?"

"না রাণী মা, আমার মন খারাপ হয়েছে এই ভেবে যে, আমার যখন মেয়ে হবে, তাকে বিয়ে দেব-তো? আচ্ছা। কিন্তু তারপর? যখন সে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবে—আমার মনও ঠিক এম্‌নিই খারাপ হবে তো? তখন?"

মীরাবাই হেসে বললেন: "কী পাগল! কবে মেয়ে হবে, তার বিয়ে দিবি ভেবে এখন থেকেই কান্না? ধর যদি তোর মেয়ে না হয়ে ছেলেই হয়?"

দাসীর চোখের কোণে হাসি ফুটে উঠল "মা গো মা! তাই তো! এ কথা তো মনে হয় নি আমার একবারও!!"

তাছাড়া একটু একটু ক'রে চিত্তের কুয়াশা কাটছে বৈ কি। মনে হয় আজকাল প্রায়ই যে গুরুর তাঁবেদার হ'লে আমার চলাফেরার স্বাধীনতা ক'মে যাবে এতে এত ভয় কিসের? এ-স্বাধীনতা পেয়ে কী এমন চতুর্বর্গ লাভ হয়েছে শুনি? সেণ্ট অগাস্টিনের "কন্‌ফেশন্" পড়েছিলাম। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "হা ভগবান, আমি স্বাধীন এই বড়াই করি কেন তুমি দেখিয়ে দিয়েছ: আমি স্বাধীন হ'তে চাই শুধু অবাধ ভোগ করতে, নীতি সংযম সভ্যতা কিছুরই মানা না মেনে। ভাবতেও ঘৃণা হয়। আমি যে এত হীন কই মনেও তো হয় নি কোনদিন? কেমন ক'রে ছিলাম এতদিন এ-মোহের মায়ায় ভুলে যে, আমি আসলে কী!"

আমার মনে পড়ে তোমারই একটা কথা: "স্বাধীন হ'তে চেয়ো না অসিত! ঠাকুরের দয়া অপার ব'লেই এ মায়ার রাজ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে পদে পদেই পরাধীনতার বেড়ী পড়তে হয়। না হ'লে কী হ'ত ভাবো তো? শুধু জোর যার মুল্লুক তার এর রাজ্য গড়ত এক কৃতান্ত শয়তান—যার সত্যিকার নাম নরককুণ্ড। মানুষের ইচ্ছা একটুখানি ছাড়া পেয়েছে তাইতেই আজ দুনিয়ার কী অবস্থা হয়েছে দেখো। মানুষ যতদিন আপ্তগরজী, কামুক, দাম্ভিক ও লোভী থাকবে ততদিন সে থাকবে অজ্ঞানরাজ্যেরই প্রজা—যাদের যত কম স্বাধীনতা দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। সত্যিকার স্বাধীনতা সে-ই চাইতে পারে যে অধিকারী—অর্থাৎ যে তার মন ও ইন্দ্রিয়দের স্ববশে রাখতে শিখেছে

নিত্যবৃন্দাবনের প্রেমের মন্ত্র পেয়ে।" (তোমার একথাগুলি আমার এত ভালো লেগেছিল যে আমার ডায়রিতে টুকে রেখেছিলাম।)

সেন্ট অগাস্টিন্‌ও প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন—অনুবাদ আমার :

আমাদের তুমি গড়েছ তোমারি তরে হে নির্মলিন,
তাই আমাদের প্রাণ মন অস্থির
পারে না লভিতে অচপল সুখবিশ্রাম—যতদিন
তোমারি মাঝে না পায় সে শান্তিনীড।*

ভর্তৃহরিও এই কথাই বলেছেন আরো জোর দিয়ে যে জীবন ক্ষয়িষ্ণু হ'লে কী হবে—তৃষ্ণা যে অক্ষয় (তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণা)।

কেবল সময়ে সময়ে আবার সংশয়ী প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে: এইই কি জ্ঞানের চরমবাণী যে, এ-উৎসাহ-উচ্ছল, প্রাণসঙ্কুল, অশ্রান্ত গতিময় জগতে বিধাতা আমাদের পাঠিয়েছেন শুধু জড় সমাধিতে জ'মে কাঠ হ'য়ে বসে কৃতকৃত্য হ'তে। ভোগের অফুরন্ত উপকরণ সামনে ধ'রে তিনি বলতে চাইছেন কি যে, ভোগ মানেই দুর্ভোগ, কর্ম মানেই কর্মভোগ? স্বাধীনতার বেলায়ও কি এই কথাই শেষ সত্য যে, গুরুর পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে সব কর্মের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে হাল্কা হওয়ার নামই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—to want to travel light, first and last?

ভালো বুঝতে পারি না ভাই। ধাঁধা লাগে, তবে হয়ত গুরু, শান্তি বা স্বাধীনতার তর্কও আসলে অবান্তর। কারণ যতই ভাবি ততই একটি সত্যকে যেন না মেনেই পারি না যে, আমাদের কাছেও ভগবান্ কিছু চান, নইলে আমাদের দিশা দিতে তিনি যুগে যুগে সাধু সন্ত গুরু অবতার হ'য়ে আসবেন কেন? যদি এ-পৃথিবী সত্যিই মায়া কি vale of tears হ'ত, আর মানুষ হ'ত অভিশপ্ত জীব—যাকে খৃষ্টানরা বলে "পাপমুখে জন্ম—born in sin—" তাহলে কি ঠাকুর আঠারো অধ্যায় ধ'রে অর্জুনকে তুতিয়ে পাতিয়ে ডাক দিতেন এই অশান্তির কুরুক্ষেত্রেই অভ্রান্তির ধর্মক্ষেত্রের পত্তন করতে?

* Thou hast created us for Thyself and our hearts cannot be quieted till they find repose in Thee.

CONFESSIONS……ST. AUGUSTINE (1,1)

তোমার আরো একটা কথা আমার মনে লেগেছে: জীবনের সমস্যার সমাধান খুজতে হবে যাঁরা দিব্যচক্ষে এ-সমাধান দেখেছেন তাঁদের দৃষ্টিকেই প্রামাণ্য ধ'রে—যাঁরা দেখেন নি তাঁদের এজাহার মঞ্জুর করার নাম ছেলেমানুষি। এই মেনে নেওয়াকেই তুমি "দীক্ষা" নাম দিয়ে বলতে চাইছ: "এ-দীক্ষা বিনা সিদ্ধির আশা দুরাশা। কারণ ভগবান্ তাঁর দৃষ্টিবর যাঁদের দিয়েছেন, যাঁদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছেন প্রেমের আলো তাঁদের অধিকার দিয়েছেন তীর্থ লক্ষ্যের দিশা দেবার। পাস্কালের কথা ভুল নয়—"পাগলেরা অন্ধদের নেতা হ'লে লক্ষ্য সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব।" সাধু, সাধু! তাই আমি অপেক্ষা করব সদ্‌গুরুর কেবল with reservation—মানে সদ্‌গুরু এলেও তাঁর কথা নির্বিচারে মেনে নিতে পারব না—যদি আমার হৃদয়ের সব তারই না তাঁর কথায় যুগপৎ বেজে ওঠে।

তোমাদের সবাইকে আমার ভালো লেগেছে আরো এই জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে একটি সরস ও সুন্দর প্রেমের সত্য সহজ ছন্দে ফুটে উঠেছে ফুলের ম'ত (Mixed metaphor-এর জন্যে ক্ষমা!) আমি স্বভাবে রসের ভক্ত। তাই যে-সাধনা, যে-জীবনযাত্রা শুষ্ক, একঘেয়ে—যে নিরন্তর গতির, গানের, হাসির প্রাণের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলে তাকে আমি দূর থেকেই দণ্ডবৎ করি। তুমি কাশীতে একবার হাসির স্বপক্ষে এত চমৎকার ওকালতি করেছিলে যে আমি আমার ডায়রিতে টুকে রেখেছিলাম। (না, মাভৈঃ, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমার বৃন্দাবনের বা কাশীর ডায়রি ছাপাব না) তুমি বলেছিলে:

"অনেক ধার্মিক তাঁদের হাসির উৎসকে শুকিয়ে ফেলেন এই কথাটি ভুলে গিয়ে যে, হাসির কাজ আমাদের নানা রোগশোকতাপ থেকে নিরাময় করা। যখন মানুষ হাসা ছেড়ে দেয় তখন বুঝতে হ'বে শিরে সংক্রান্তি। কারণ হাসি হ'ল দেবতার দান। পশুরা হাসে না কেন না তাদের জীবন চলে সংস্কারের খাতে। তাদের সামঞ্জস্যও যে ঐ প'ড়ে-পাওয়া ইন্‌স্টিংটের (instinct) রাজ্যে। তাই তাদের হাসার দরকারও হয় না। কিন্তু অহংবুদ্ধি ঢের বেশি জোরালো, বিকশিত ব'লে সে মানুষকে পদে পদে ফেলে বিপাকে, চায় চেপে মারতে, দ-য়ে মজাতে। এই সব দুর্যোগ থেকে মুক্তি দিতেই দেবতারা মানুষকে দিয়েছেন হাসির বর। তাই দেখতে পাবে বারবারই যে, হাসি আমাদের নানা সংকটের গোলকধাঁধায় এসে বাঁচায় দুঃসহ উৎকণ্ঠার চাপ

থেকে। যে-লোক হাসতে ভুলে গেছে তার অবস্থা কাহিল জেনো—গম্ভীর ঢেউরা গ'র্জে এসে তাকে ডুবোলো ব'লে!"

গুরু বলতে মনে পড়ল—তোমাকে বোধ হয় বলেছিলাম নাসিকে এক নির্ভেজাল সদ্‌গুরুর দেখা পেয়েছি—নাম মোহন মহারাজ। তাঁর এক শিষ্যা এখানে আছেন। তারও দীর্ঘ কাহিনী। শুনে চম্‌কে গেছি সত্যি। মনে হচ্ছে গুরুশক্তি সম্বন্ধে যে-সব রচনা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তাদের মধ্যেও হয়ত কিছু সত্য আছে—ঠিক বলতে পারি না। তবে এই শিষ্যাটি গুরুর কাছ থেকে কিছু সত্য পাথেয় যে পেয়েছে একথা অস্বীকার করি কী ক'রে যখন বিধবা হ'য়ে আত্মহত্যা করার পথে সে ঠাকুরের নূপুর শুনে গভীর ও স্থায়ী শান্তি পেয়েছে? তার কথা আমি লিখে রেখেছি। যদি ললিতা চায় তো পাঠাতে পারি—তার চিঠির প্রতিদানে।

মরুক গে। এবার কাজের কথায় আসি। তোমরা সবাই মিলে আমাকে তোমাদের আশ্রমে ডাকছ এ তোমাদেরই কৃপা। কারণ এ-স্বভাব-সংশয়ী অভক্ত অসাধককে গুরুবিমুখ জানা সত্ত্বেও তোমরা যে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় ক'রে দাও নি এ-বদান্যতাকে আর কোনো নাম দেওয়া চলে না। কিন্তু তোমাদের আমাকে এত ক'রে ডাকার দরকার নেই। আমি তোমাদের ওখানে যেতে চাইব তো নিজের গরজেই ভাই! কেবল আমার মুস্কিল হয়েছে এই যে, পাটনায় এক সঙ্গীত সভায় আমাকে পৌরোহিত্য করতে যেতেই হবে এখান থেকে। কথা দিয়েছি, উপায় নেই। ওরা তারের পর তার ক'রে আমাকে রাজী ক'রে ফেলে আমার নাম ছাপিয়ে দিয়েছে। আরো, সেখানে চন্দন চৌবে ধ্রুপদ গাইবেন ও আব্দুল করিম খেয়াল গাইবেন। তাই এ-সভায় আমি পৌরোহিত্য করব ভাবতে পুলকিত হচ্ছি বৈ কি। (আতঙ্কে শিউরে ওঠো ভাই, কাকে তোমরা বরণমালা দিয়েছ!)

সেখানে কনফারেন্স চলবে তিন দিন। শেষ দিন পূর্ণিমা রাতে আমাকে ভজন গাইতে হবে। তারপর যদি ওখানে ফের নানা নিমন্ত্রণের জালে জড়িয়ে না পড়ি তবে পাড়ি দেবো পাটনা থেকে উড়ে দিল্লি, দিল্লি থেকে মোটরে সোজা আলমোরা। কিন্তু কথা দিচ্ছি না। কেবল আন্তরিক চেষ্টা করব—এ-ভরসা দিতে পারি। হয়েছে কি, আমার সত্যই সময়ে সময়ে বিষম ক্লান্তি আসে আজকাল—অবসাদ একেবারে ছেয়ে ধরে! কিন্তু হায় রে, তারপরেই ফের

গানের ডাকে মেতে উঠি। এ-দোটানার বিড়ম্বনা কাটবে কবে মা-কে জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে জানাবে ভাই? আমি সত্যিই জানতে চাই।

এ চিঠির উত্তর দিও আমার পাটনার ঠিকানায়। একটি খামে আমি ঠিকানা লিখে পাঠালাম। তোমরা জানাতে ভুলো না—আমি যদি জন্মাষ্টমীর দুচারদিন আগে আলমোরা পৌছতে পারি তবে সেখান থেকে ষোল মাইল ডাণ্ডিতে চ'ড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তুমি করতে পারবে কি না। কারণ যদি না পারো তবে আলমোরায় গিয়ে আমি ফাঁপরে পড়ব। তোমাদের মতন পদব্রজে বিশ মাইল পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, আর ললিতাকে বোলো যে, তাকে আমি দুএকদিনের মধ্যেই চিঠি লিখব। আজ এখানেই ইতি করি, নৈলে তোমরা এ চিঠির জবাব দিলেও হয়ত আমি সময়ে পাব না পাটনায়। বলা রইল, একটা তারও কোরো।

মা-কে আমার প্রণাম দিও। আমার প্রতি তাঁর করুণার কথা ভাবতে সময়ে সময়ে প্রায় সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়ি—সত্যি বলছি।

প্রণবের খবর দাও না কেন?

সে কি আমাকে ভুলে গেল? কিন্তু সে ভুললেও তার কাছে যে দুটি অঘটনের কথা শুনেছি আমি ভুলি নি। ডায়রিতে লিখে রেখেছি। মন খারাপ হ'লে এধরণের কথা প'ড়ে যে বারবারই আমার বিপদ কেটে যায় এ একেবারে নির্জলা সত্য।. ইতি।

তোমাদের স্নেহাশ্রিত অসিত

[পাঁচ দিন পরে]

ভাই অসিত

ঝটিতি লিখছি তোমাদের পাটনার ঠিকানায় যাতে আমাদের বাঁশির ডাকে তুমি পাটনার রংমহল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারো ঘরছাড়া হ'য়ে। "তুমি ফের ওখানে নানা নিমন্ত্রণের নেশায় না মেতে ওঠো এই প্রার্থনা আমরা সবাই মিলে করব লিখে দাও দাদাকে"—ললিতা উবাচ। প্রণব উবাচ: "লিখে দাও সে আমাকে তার করলে আমি নিজে ষোল মাইল এগিয়ে গিয়ে তাকে বঁধুবরণ ক'রে ডাণ্ডিতে চাপিয়ে, মাথায় টোপোর পরিয়ে, উলুধ্বনি ক'রে এখানে এনে তুলব—যাতে ক'রে মন্দিরে ঠাকুরের সঙ্গে সত্যিকার শুভদৃষ্টি হয়।"

তোমার মন খারাপ হয় কেন তুমি নিশ্চয় জানো—আমি বললে ললিতা ফের ধমকাবে: "কেন কেবল দাদাকে শাসাও? সে কি জানেনা? তাকে এমন কথা বলো যাতে সে উৎসাহ পায়, দমিয়ে দিওনা গুরুবাদ অধিকারবাদ আরো হাজারোবাদ সম্বন্ধে যত সব গুরুগম্ভীর কথা ব'লে।"

তাই তোমাকে বলব আজ শুধু অনবদ্য কথা। কিন্তু তার আগে একটি কথা না লিখলেই নয়। তুমি লিখেছ তোমার মন মিইয়ে গেলে ডায়রিতে-টুকে রাখা প্রেমলানন্দের কথামৃত পান ক'রে সে ফের চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। আমার এতে খুশী হবারই কথা, কেবল ভয় পাচ্ছি পাছে তুমি এ-কথামৃত যত্র তত্র বিলোতে স্বরু করো রেডিও-রঙ্গরাজ বা পত্রিকা-পঙ্গপালের হরির লুটে। এ-ভয়ের কারণ আছে কারণ ললিতা বলল তোমার কলকাতার এক বন্ধু তাঁকে লেখা তোমার একটি দীর্ঘ লিপিকা এক সাপ্তাহিকে ছাপিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার কথা তো আছেই, ললিতার কথাও আছে। ললিতা এতে খুশী বৈ অখুশী হয় নি, কিন্তু আমি বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়েছি। সাধকের পক্ষে সাধনার সময়ে সব আগে চাই নির্জলা নির্জনতা—মানে সংসারের আবহাওয়া থেকে বিছিন্ন হয়ে অজ্ঞাতবাস—বিশেষ ক'রে সেই সব সাধকের যারা বৈরাগী হ'য়ে কোমর বেঁধে লোকালয় ছেড়ে তপোবনে প্রয়াণ করেছে—যেমন ১০৮ শ্রীপ্রণবানন্দ ২১৬ শ্রী প্রেমলানন্দ, ৪৩২ শ্রী ললিতাদেবী এণ্ড কোং। তুমি কথায় কথায় হাঁক দাও—তুমি কবি শিল্পী গুণী সাহিত্যিক—শুধু ধর্মার্থীই নও। মানি, কিন্তু আমরা তোমাকে বরণ করেছি ধর্মার্থী জিজ্ঞাসু ব'লে। অর্থাৎ তোমার কবি গুণী শিল্পী রূপ আমাদের কাছে গৌণ, তুমি আগে যোগী সাধক, পরে আর সব কিছু। তাই যখন দেখি—তুমি আমাদের মতন নিরীহ মানুষের raw material নিয়ে সাহিত্যের finished product এর বেসাতি স্বরু করেছে তখন একটু ত্রস্ত না হ'য়ে পারি কই? অথ তোমাকে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তোমার সাহিত্যে বা রেডিও-ভাষণে আর যার কথা নিয়েই ঢাক পেটাও না কেন, আমাদের কথা প্রচার করো না, লক্ষ্মীটি ভাই! ললিতা টুকছে—"এও ধমকের নামান্তর। কিন্তু আমি বলব: না, এ হ'ল আত্মরক্ষার—self-preservation-এর—কাকুতি মিনতি: আমাদের বেঁচে বর্তে থাকতে দাও। অন্ততঃ আমাদের অনুভূতি উপলব্ধির কথা কাউকে বোলো না ঘুণাক্ষরেও।

ঠাট্টা নয় শোনো—কেন এ কথা বলছি এত ক'রে।

আমি এ দশবছরে অনেক কিছু দেখেছি। শুধু ভগবানের লীলাখেলাই নয়, তাঁর ভক্তদের কীর্তিকলাপও। তিব্বতের পথে যেতে অনেক সাধুই এখানে আসেন। তাঁদের মধ্যে সত্যিকার মহাত্মা দেখেছি বৈ কি—যাঁদের তপস্যায়ই এদেশ পুণ্যভূমি হয়েছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে কুচো সাধু (lesser fry) অনেক দেখেছি যাঁরা কিছুদিন যোগ ক'রে দুএকটা যোগ বিভূতি পেতে না পেতে প্রচার স্থরু ক'রে দেন—আশ্রমে প্রেস বসিয়ে, রেডিওতে ভাষণ দিয়ে, শিষ্যদের এখানে ওখানে বক্তৃতা দিতে পাঠিয়ে। এই চারণের দল সর্বত্র গিয়ে গুরুর বিভূতির কথা রটিয়ে রকমারি চেলা জোটান—রীতিমত "রিক্রুট" করেন—টাকাও আসে প্রচুর—কেবল ঠাকুরের যে-পর্দানশীনা কৃপাদেবী তাঁর ঘোমটা খুলে চাউনিতে সবে কৃপার্থীর মন মজাতে স্থরু করেছিলেন তিনি ঢাকঢোলের শব্দে লজ্জা পেয়ে ফের ঘোমটা দিয়ে বিদ্যুতের মতনই ঝলকে উঠেই মেঘে মিলিয়ে যান। কিন্তু এতে সে-ভক্তেরা দমেন না—সমানে ঢাক পিটিয়েই ঘোষণা ক'রে চলেন কৃপাদেবীর হাতছানি কটাক্ষাদি প্রসাদ বিতরণের কাহিনী—অর্থাৎ "অতীত" ইতিহাস। আমরা চাই না এঁদের মত প্রতিধ্বনিজগতে বিখ্যাত হ'য়ে গণমনের মান পেয়ে বৃন্দাবনের গান থেকে বঞ্চিত হ'তে।

কিন্তু, আমাদের কথা মনে ক'রে যে তোমার বিষাদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছ এ-সংবাদে আমরা সবাই পুলকিত। এইই তো হওয়া উচিত ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণকে বলেছিলেন: "তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্" তথা "শ্রবণমঙ্গলম্" কিনা, "তোমার কথায় আমরা জীবনের হাজারো দুঃখে তাপে নবজীবনের বাণী পাই, এমন মঙ্গলময় বাণী আর কে বিলাতে পারে!" ভাই, মানুষ শুধু দুঃখী নয় দুর্ভাগাও বটে। পাস্কাল বলেছিলেন একটি চমৎকার কথা: "মানুষ যাতে দুঃখ পায়—বর্ষা রোগ শোক তাপ—তা দেখে আমার তেমন মন খারাপ হয় না যেমন হয় দেখলে কি সব মিথ্যে হৈ হৈ নিয়ে সে সুখ পায়।" কথাটা চমৎকার নয়? য়ুরোপে যত চিন্তাশীল দার্শনিকের লেখা পড়েছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মনে হয় আমার এই পাস্কালকে কারণ তিনি মস্ত বৈজ্ঞানিক গাণিতিক হ'য়েও আত্মিক জ্ঞানের পরম অলো-কে আলো ব'লে চিনেছিলেন মায়াকে অলীক অন্ধকার ব'লে সনাক্ত ক'রে।

কিন্তু চিঠি শনৈঃ শনৈঃ বড় হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রার্থনা—তুমি

যেন এই মায়া অন্ধকারকে ছায়া ব'লে চিনে জন্মাষ্টমীর জ্যোতিকে কায়া ব'লে বরণ করতে পারো। বম্বে বরোদা গোয়ালিয়র পাটনায় তো গণ্যমাণ্য রাজন্যদের ঢের হাততালি কুড়োলে—ভবিষ্যতেও কুড়োবে আরও কতশত মহামানবের সাগরতীরে। আমরা চাই—মাঝে মধ্যে আমাদের মতন নগণ্যদেরও স্মরণ করো—তাদেরও কিছু পরিবেষণ করো—তোমার খেয়াল ঠুংরির বহুবন্দিত বন্দেশ নয়, ঠাকুরের নামনন্দিত সন্দেশ। এ-চিঠির উত্তরে টেলিগ্রামে যেন শুনতে পাই তোমার আগমনীর টঙ্কার, এবং পত্রে তার প্রতিধ্বনির ঝঙ্কার। ইতি।

তোমার স্নেহাধীন প্রেমল

পুনশ্চ। ললিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার প্রণব তোমাকে কিছু লিখবে পুনশ্চ ভঙ্গিমায়। তবে মা ভৈঃ, সে চেষ্টা করলেও বেশি লিখতে পারবে না। ও বলতে পটু হ'লেও লেখায় অপটুই বলব। তবে জানি না, তোমার ছোঁয়াচের জাদু যে ভাই মৌনং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্। ফলেন পরিচীয়তে।

ভাই অসিত,

প্রেমল পুনশ্চ পাঠ দিয়ে ফেলেছে, তাই আমি সোজাসুজিই লিখি সরল চিঠি। অর্থাৎ পুনশ্চ নয়।

আমি সত্যিই লিখতে বসলে কেমন যেন ভেবেই পাই না কী লিখব—নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কিছুই ফলিয়ে রসিয়ে লিখতে পারি না।

তবু তোমাকে একটি কথা না লিখলেই নয়: কথাটি এই যে, প্রেমলের সঙ্গে আমি একমত নই যে, তুমি আগে যোগী তারপরে কবি শিল্পী গুণী। আমার মনে হয় মানুষকে এভাবে ভাগাভাগি ক'রে দেখলে তার প্রতি সুবিচার হয় না। আমি সব জড়িয়ে দেখতে চাই সমস্ত মানুষটাকে। তাই আমি বলতে চাই তুমি যোগী+কবি+গুণী+শিল্পী+সাহিত্যিক+সমাজতন্ত্র+ঐতিহাসিক+দরদী বন্ধু……আরো কত কী আমি জানি না কিন্তু তোমার নানা বন্ধু জানেন নিশ্চয়ই যাঁরা সেসব দিকের খবর পেয়েছেন। একথা বলছি এইজন্যে যে, তোমার ব্যক্তিত্বকে আমার নিজের কাছে বেশ একটু জটিল—complex মনে হয়েছে ব'লে আমি বিশ্লেষণ ক'রে হদিশ পাচ্ছি না তোমার

সমগ্র বিকাশের। কিন্তু সে যা হোক, তোমাকে তোমার এই সমৃদ্ধির জন্যে আমার নিজের বিশেষ ভালো লেগেছে একথা জানালে তুমি খুশী হবে ভেবেই কোমর বেঁধে এ-চিঠি লিখতে বসেছি—আরো এই জন্যে যে, প্রেমল তোমাকে বিষম ধম্‌কেছে। ও ভালোবাসে তাই ধমকায় জানি, এ ও জানি যে তুমি ওর তর্জনকে ওর স্নেহের প্রসাদ ব'লেই নেবে। তবু ধমক কিছু তারিফ নয়; তাই মন একটু-না একটু ঘা খায়ই। আশা করি আমার এই তারিফের ওজন ওর ধমকের উল্টো দিকে বাটখারা হ'য়ে ঝুলে ওর তিরস্কারের গুরুভারের ক্ষতিপূরণ মতন হবে—অন্ততঃ কিছুটা।

তবে সেই সঙ্গে আমি এ-ও বলবই বলব—আশা করি একথার মধ্যে তুমি কিছু অসঙ্গতি দেখবে না—যে, আমার মনে হয় না তুমি কবি শিল্পী গুণীদের সাহচর্যে বেশিদিন সুখ পাবে, কি দোবে-চোবে খাঁ-খানানদের ওস্তাদি মল্ল যুদ্ধের ঢেউয়ের বেশি দিন গা ভাসিয়ে চলতে পারবে। প্রেমলের একটা কথায় আমার মন পুরোপুরিই সাড়া দেয়ঃ

"All that is born in Time must vanish in Time: therefore, let us be betrothed to the Unvanishing: the Timeless Krishna." দেখ দেখ—Lo and behold!—কী কাণ্ড করলাম!—লিখব না লিখব না ব'লে লাজুকতার ভঙ্গি ক'রে কী প্রকাণ্ড চিঠি লিখে ফেললাম। তবে তোমার সঙ্গ পেয়েছি তো কিছুদিন। একটুও ছোঁয়াচ লাগবে না একি হয়?……ইতি স্নেহানুগত প্রণব।

পুনঃ—হ্যাঁ, মা বলছেন—লিখে দাও ওকেঃ "চন্দন চোবে আবদুল করিমের গান শোনে শুনুক, কিন্তু গায় যেন ঠাকুরের জন্যে—ওস্তাদেরা গেয়ে চলে চলুক কদরদান সমাজদারদের জন্যে। "আরো"—বলছেন মা—"গোয়ালিয়রে বরোদায় পাটনায় সমজদারদের হাততালি কুড়িয়ে যখন মন ভরবে না, তখন দেখবে মন কেমন ক'রে উঠবেই উঠবে—নৈমিষারণ্যে ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে গাইতে। আর, যখন এখানে এসে সত্যিই গাইবে ঠাকুরের কাছে, তখন দেখতে পাবেই পাবে—এ-পরিবেশে যে-সুর বেজে ওঠে তার সঙ্গে ওখানকার-পরিবেশে-বেজে-ওঠার সুরের তুলনাই হয় না। ওকে এত ক'রে আসতে বলছি ওর নিজের জন্যেই, এ একটুও বাড়ানো কথা নয় নয় নয়"—বলছেন মা লিখে দিতে তিন সত্যি ক'রে। ভালোই হ'ল,

কারণ তাঁর জবানীতে লেখা মানে তো তাঁরই লেখা। কাজেই এই সূত্রে তুমি মার চিঠিও পেয়ে গেলে, না চাইতে। এহেন ভাগ্যবান্ মন খারাপ করবে কী দুঃখে?

[দশ দিন পরে]

ভাই প্রেমল,

তোমার চিঠি পাটনায় এসে না পেয়ে মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। এত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম যে গান-যে-গান তাতেও আর যেন রস পাচ্ছিলাম না। এমন সময়ে—হঠাৎ আজ সকালে—তোমার ও প্রণবের চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছে যেন আকাশে বাতাসে বীণা বেজে উঠল ফের।

একটু বাড়াবাড়ি গোছের কবিত্ব হ'য়ে গেল বুঝি! ভয় হয়। কবি শিল্পীদের প্রতি তুমি তো তেমন প্রসন্ন নও। আমার ভাগ্য ভালো যে প্রণব আমাকে আশ্বাস দিয়েছে যে, আমার কবি শিল্পীর রূপেরও কিছুটা সার্থকতা আছে, আমার স্বরূপকে ওজন করতে হ'লে সবটাই ধরতে হবে। ওর এ-কথায় আমার দৃষ্টিভঙ্গির সায় আছে বলাই বাহুল্য।

তবে তোমার একথা ঠিক যে, ঠাকুরের লীলার সবপ্রকাশেরই দর এক হ'তে পারে না। মুদীর রূপের চেয়ে মণিকারের রূপের জৌলুষ বেশি, মণিকারের রূপের চেয়ে মনীষীর, মনীষীর চেয়ে প্রতিভাধরের, প্রতিভাধরের চেয়ে মুনি ঋষির······ইত্যাদি। তাই আমার মধ্যে যে-সাধক বা ধর্মার্থীর রূপ তোমাদের কাছে স্নেহের প্রশ্রয় পেয়েছে তাকে আমিও বেশি মূল্য না দিয়ে পারি না আরো এই জন্যে যে, তার প্রসাদেই আমি তোমাদের প্রীতি ও মা'র আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। বিশেষ করে তোমার স্নেহ পাওয়া যে আমার জীবনের কত বড় লাভ বলতে গেলে তুমি কবির উচ্ছ্বাস ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে ব'লে—কবির ভাষায় "হাল্কা তুমি করো পাছে হাল্কা করি তাই আপন ব্যাথাটাই।"

না, এ ঠাট্টা নয়, ভাই। সত্যি, তোমার নাম শুনেছিলাম মোহন মহারাজের কাছে—যাঁর নাম আগে করেছি। কিন্তু তোমার শুধু দর্শন নয়, স্নেহস্পর্শ পাওয়া—না, ফের উচ্ছ্বাসের রাশ কষি নৈলে আবার ধমক খাব—এসব born in time ব'লে। কিন্তু বেশি বকলে সইব না, ব'লে রাখছি।

বলব যদি কালাধীন সব কিছুই এত অসার অপলকা হবে তবে কালাতীত স্বয়ং তার সভায় অবতীর্ণ হ'তে চাইলেন কেন এক আধবার নয়, বার বার, যুগে যুগে, নাছোড়বান্দা হ'য়ে ?

মোহন মহারাজ তান্ত্রিক। তাঁর একটি উদ্ধৃতি আমার মনে ভারি লেগেছে—তন্ত্রের আশ্বাস :

ভোগো যোগায়তে সম্যক্ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি !

তিনি এর ভাষ্য করেন এই ব'লে যে ভোগ দুর্ভোগ হ'য়ে ওঠে না যদি ভোগের ঠিক ভঙ্গিটি আয়ত্ত করা যায়। যে তাল শিখেছে তার যেমন বেতালে পা পড়ে না তেমনি যে তন্ত্রধর্মে সত্যিকার দীক্ষা পেয়েছে তার সংসারযাত্রা হ'য়ে ওঠে মোক্ষের তীর্থযাত্রা।

অবিশ্যি এভঙ্গিটি আয়ত্ত করা সুকঠিন—কে না মানবে। কিন্তু যে কোনো মহৎ বিকাশই কি দুরায়ত্ত নয় ? তাই প্রাণলীলার কাব্য শিল্প বিজ্ঞান—এমন কি সম্পদবৃদ্ধির সাধনাকেও মোক্ষের পথে বাধা ব'লে মনে করতে বাধে। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় সত্যিই যে, সবচেয়ে বড় সুষমা—হার্মনি—মায়াবাদী বৈদান্তিকেরা ওরফে বিরক্ত বৈরাগীরা তেমন নিটোলভাবে পান না যেমন পান মহৎ তান্ত্রিকেরা বা লীলাবাদী বৈষ্ণবেরা। অথচ সখেদে মানতেই হচ্ছে আমাকে যে, বৈরাগ্যের দিকে আমার একটি প্রবল ঝোঁক আছে—কেন কেমন ক'রে এ-ঝোঁক আমাকে পেয়ে বসল জানি না। হয়ত কোনোদিন গুরুমুখে এ-সমস্যার সমাধান পাব—যদি অবশ্য সদ্‌গুরু লাভ আমার ভাগ্যে থাকে—তোমার মতন।

কিন্তু সে যাক। আমি আজ কেবল একটি আপত্তি করবই করব সঘনে—তাতে তুমি যত রাগই করো না কেন।

আমি কিছুতেই তোমার এ কথা মেনে নিতে পারছি না যে, তোমার মতন বিরল জ্যোতির্ময় একান্তী সাধকের কথা যত্রতত্র প্রচার করা আমার পক্ষে অসমীচীন কি অন্যায়। তুমি নিজে এ-প্রচার করতে চাওনা বুঝি। কিন্তু আমি তোমাকে জেনে চিনে তোমার স্নেহসঙ্গে সাহচর্যে দিব্য প্রেরণা পাওয়ার পরে কেমন করে মুখে চাবি দিয়ে থাকব বলো তো ? এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আগেও তর্ক হয়েছে, পরেও হয়ত হবে বার বার। কিন্তু যতবারই তুমি

হুঙ্কার ক'রে বলবে—আমার পক্ষে তোমার কথা লেখা বা বলা অন্যায়, আমি ততবারই ঝঙ্কার দিয়ে বলব যে, তোমার কথা না বলাই আমার পক্ষে অনুচিত হবে। ভাই জগতে মেকি সাধু এত বেশি যে, দুচারটি বিরল সাধুর দেখা পেলে তাদের কথা না ব'লে মৌনী হ'য়ে থাকাই অন্যায় ব'লে আমার মনে হয়। সর্বত্রই দেখি কবির ভাষায়—

সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশি, ধর্মের চাইতে তন্ত্র,
ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশি, পূজার চাইতে মন্ত্র।

এই·ই যখন অবস্থা তখন যে ভাগ্যবানের ভাগ্যে সত্যাশ্রয়ীর, ধার্মিকের, ভক্তের, পূজারীর দেখা মিলেছে তার অপরকে না জানালেই তো অপরাধ হবে যে মণি মেলে অমুক অমুক জায়গায়।

তাছাড়া ভাই তুচ্ছ কথার বেসাতি ক'রে ক'রে আমরা যে মিইয়ে গেলাম! আর্টের জন্যে আর্ট বুলি কপ্‌চে কপ্‌চে যে হ'য়ে দাঁড়ালাম সৌখীন মিথ্যাবিলাসী, সস্তা চেকনাইয়ের সওদাগর! কত সন্ধানীই খেদ করেন: খাঁটি সাধুর দেখা তো চাই মনে প্রাণেই কিন্তু কোন্ হাটে তাঁরা বিকান বলতে পারেন মশায়?"

এদের আমি বলবই বলব—কারণ এঁরাই আমার মক্কেল—যে, "আমি বিস্তর খুঁজে দুচারটি পরশমণির দেখা পেয়েছি—শ্যামঠাকুর, মোহন মহারাজ, প্রেমল বৈরাগী, শান্তিমা……তোমরা যাও যাও এক্ষণি—আর দেরি কোরো না—make hay while the sun shines—কারণ এঁদের কাছে গেলে পথের পাথেয় তথা পারের পারানি পাবেই পাবে কিছুটা।" এই ঘোষণা করাকে আমি আমার স্বধর্ম বলে চিনেছি—জহুরীর স্বধর্ম জহরের খবর রাখা ও ক'ষে বলা কোনটা খাঁটি জহর আর কোন্‌টা মেকি। অতএব লক্ষ্মীটি ভাই, আমি আমার স্বধর্ম মেনে চললে তোমরা রাগারাগি করো না, বলা রইল। তোমাদের গোপনিকতা, hush-hush, কথায় কথায় গুরু গুরু ক'রে তাঁর পরে ভয় ক'রে চলা—এসব তোমাদের কাছে স্বধর্ম হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে পরধর্মই বটে। কাজেই আমি তোমাকে কিছুতেই কথা দেব না যে, তোমার কথা আমি কাউকে বলব না। কেন দেব—যখন আমি মনে করি-এ-কথা চাওয়ার তোমার কোনো অধিকারই নেই!

একটি প্রাচীন কথিকা মনে পড়ছে। যেমন প্রাণেই প্রাণ জাগে তেমনি ধমকেও ধমক জাগবে তো! তাই শোনো এবার আমার ধমক:

১

রাজরাজেন্দ্র মন্দিরে তাঁর গাহিলেন প্রেমবন্দনায় :
নমি বার বার; কে নাথ, তোমার মহিমার পার পায় ধরায় ?
তুমি চিরদিন সাধো অমলিন ছন্দে কত না এ-ধূলিধামে
তৃণে ফুলে ফলে অমরাবতীর কৃপামঞ্জীর পূণ্য নামে !
যেথায় যাহারই অন্তরে জাগে অচিন্ত্য প্রভা অন্ধকারে
তোমারি হে প্রিয়, অনিন্দনীয় ঝরাও করুণা আলো-আসারে।
আমায় কেবল দাও নির্মল বর : শুনি যেন বীণার তারে
সান্দ্র তোমার মধুঝঙ্কার—ঢালো তুমি যারে সুর-বিহারে।
সুরে মিলে দিশা, কাটে অমানিশা, মিটে চিরতৃষা জানি হৃদয়ে :
করি প্রার্থনা সে-সুরসাধনামন্ত্রদীক্ষা আজ প্রণয়ে।

২

পরদিন রাজা মন্দিরে তাঁর বসিতে আসনে গভীর ধ্যানে
দেবতা-বীণার সুরঝঙ্কার উঠিল উছলি' অধীর তানে :
দেছেন নয়ন মেলি' বেদীমূলে অলক্ষ্য দেব গেছ রাখিয়া
দীপ্ত দৈবী বীণা—সম্রাট কহেন পুলকে উচ্ছ্বসিয়া :
"প্রতি পদে পাই, তবু ভুলে যাই—ঝরায়েছ কৃপা তুমি কত না !
যা কিছু চেয়েছি বন্ধু, পেয়েছি। দেখেছি—প্রসাদ নয় ছলনা।
শুধাই কেবল—কার সে-অমল করে বীণা তব উঠিবে রণি' ?"
কহে গূঢ় স্বর : "ধরায় রাজন্, আছে অগণন মোহন গুণী,
করো আহ্বান সবারে, কেবল একটি গুণীর পরশে বীণা
উঠিবে কাঁপিয়া প্রেমমূর্ছনে—আরাধনা যার নির্মলিনা।

৩

করিল রাজার চারণ ঘোষণা : "রাজমন্দিরে এসো সকলে,
যে যেখানে আছ সুরেলা, বাজাতে স্বর্গের বীণা ভূতলে।
সে-বীণা উঠিবে যার হাতে বাজি'—দিবেন প্রভু শ্রীকণ্ঠে তার
আপনার গাঁথা বৈজয়ন্তী মালা বাসন্তী, চমৎকার !"

৪

শুনি' দলে দলে আসে ছুটি' মহানন্দে নিপুণ শিল্পী কত !
শুধু বাজিল না বীণা—বুঝি কেহ নয় দেবতার মনের ম'ত ?
দৃপ্ত বাদক সুরের সাধক—শত শত শ্রোতা উল্লসিয়া
উঠিত যাদের আলাপে—তাদের হাতে ওঠে না তো বীণা বাজিয়া।
কেন বা ? জানি না—একি মায়াবীণা ? গুণীর পরশে বাজে না কেন
সুরের ঐন্দ্রজালিক যাহারা—হার মানে কেন তারাও হেন।

৫

অবশেষে এক দিব্য কান্ত তরুণ শান্ত মুনিতনয়
আসিয়া কহিল হাসিয়া : "প্রভু এ দৈবী বীণা, সামান্য নয়।
শুধু তার হাতে উঠিবে সে বাজি' পেয়েছে যে হৃদে তাঁর প্রসাদ :
ধ্যানে আমি তাঁর পেয়েছি করুণা দেখ চেয়ে তাই হে নরনাথ,
কেমনে রণিয়া ওঠে বীণা"—বলি' নিল তারে কোলে তুলিয়া তার
অঙ্গুলিঘায় গুণীর নিমেষে উঠিল তন্ত্রী কাঁপি' বীণার।

৬

সুরে সুরে ছেয়ে যায় সভাতল—চেয়ে থাকে সবে সবিস্ময়ে
তার পানে—জাগে পরশে যাহার আবেশ অপার প্রতি হৃদয়ে !
সম্রাট রাখি' অচিন গুণীর নয়নে মুগ্ধ নয়ন তাঁর
পুছিলেন : "এ কী ! জাগরণে দেখি এ-কোন স্বপন চমৎকার
কত মহাগুণী মানিল হার যে-বীণারে জাগাতে ঝংকারিয়া,
কেমনে তরুণ তোমার পরশে উঠিল হরষে সে উছসিয়া ?
বৈজয়ন্তী মালা বাসন্তী দিই শ্রীকণ্ঠে তোমার ভাই !
হেন অঘটন ঘটালে মোহন, কেমনে বলো না, শুনিতে চাই।"

৭

মুনিনন্দন কহিল : "রাজন ! নিরভিমানে যে করেছি আমি
সুরের সাধনা—সুরের চরণে যা আছে আমার দিয়ে প্রণামী।

ভুলিতে যে পারে প্রেমে আপনারে—তন্ময় হ'য়ে তাহার ধ্যানে
যারে আবাহন করিতে সে চায়, ধরে রূপ প্রেমী তাহারি প্রাণে।
পায় না উষার দিশা—মতি যার নিশীথ-বিহারে মানে না লাজ,
নাম এ-নিশার—'স্বেচ্ছা-আঁধার-বরণ-কামনা' হে মহারাজ।
সুরসাধনায় সুরেশের পায় যা আছে প্রাণের দিয়ে প্রণামী
আপনারে তাঁর করি উপচার, দিয়েছেন বর তাই তো স্বামী।
আপনারে পারে ভুলিতে যে ধ্যানে, তন্ময় হ'য়ে তাঁহার প্রেমে
যাঁরে সে করিতে চায় আবাহন, ভাবে তার তিনি আসেন নেমে
ওরা বারে বারে চেয়েছে বীণারে বাজিতে তাদের আপন সুরে,
তাই বেদরদী পরশে তাদের ওঠেনি বেজে সে এ-রাজপুরে।
আমি শুধু বলেছিলাম বীণাকে বাজিতে আপন গমকে তার:
তাই তো তন্ত্রী তাহার মন্দ্রি' উঠিল ঝংকৃ' হাতে আমার।"

যত দিন যায় ভাই, ততই আমার মনে হয় যে, আমাদের বুকের বীণা কিছুতেই প্রেমের শিহরণে ঝংকার দিয়ে ওঠে না আমরা প্রেমের সাধনাকেই আরাধনা ক'রে নিজেকে ভুলতে পারি না ব'লে। সিদ্ধির কথা থাক, সে অনেক দূরে। কিন্তু সাধনার কথা কিছু তো জানি, নৈলে পথচলা স্রুরু করব কেমন করে? আমার মনে হয় আজকাল যে প্রতি সাধনারই মর্মবাণী নিজেকে ভোলা, "আমি আমি" ছেড়ে "তুমি তুমি"-র ঝংকার সাধা।

জানি অবশ্য তুমি কী বলবে এর উত্তরে: যে এ হ'ল কবির কবিত্ব, ধোপে টিকবে না—মানে, যোগ-সাধনায়। কিন্তু আমাদের দেশে স্বয়ং ভগবানের নানা উপাধির মধ্যে একটি উপাধি কবি: কেমন তিনি? না, "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ ইত্যাদি ("অব্রণ, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ" তো বটেই)।

তাই আমি মানব না যে, কবির অন্তরে ঠাকুর আসেন না স্বজ্ঞা হ'য়ে। বলতে কি, আমার তো মনে হয় সত্য তখনই আনন্দ ঝংকারের শিখরে পৌঁছয় যখন সে মন্ত্রমান হয়ে ওঠে সুন্দর হয়ে। তাই তোমার আদর্শ নিত্যসুন্দরকে পুরোপুরি পেতে হ'লে তোমাকেও শুধু জ্ঞানী হ'লেই চলবে না, হ'তে হবে কবিও সেই সঙ্গে।

আমার কবিসত্তা তোমার মধ্যে সেই সুন্দরের আদর্শকে দেখতে পেয়েছে

ব'লেই তোমায় আমি ভালোবেসেছি। তুমি নীরস মৌনীবাবা হয়ে নাকটিপে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পৌঁছিয়ে যদি শুধু বুঁদ হয়ে ব'সে থাকতে তাহ'লে তুমি হাজার স্থিতপ্রজ্ঞ অদ্বৈতানন্দী হ'লেও আমি তোমার ছায়াও মাড়াতাম না— তোমার কীর্তিকলাপ পাঁচজনকে ব'লে বেড়ানো তো দূরের কথা।

কিন্তু লক্ষীটি ভাই, আমাকে তুমি নিজের সুরে বাজাতে চেয়ে পাকে ফেলো না। আমি জানি—আমার অগুণ অগুন্তি। কেবল দুটি গুণে আমি বঞ্চিত নই ব'লে আমার মনে হয় আমি ত'রে যেতেও পারি হয়ত। প্রথমটি এই যে, আমি সবাইকে শ্রদ্ধা করতে আগ্রহী হ'লেও পরম শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষের কথাও বুঝতে না পারলে বলি না—বুঝেছি। দ্বিতীয় গুণটি এই যে, আমি পরের মুখে ঝাল খাই না। তাই তুমি গুরুপদাশ্রয়ী হয়ে কৃতকৃত্য হয়েছ একথা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করলেও গুরু কী বস্তু না জেনে না চেখে তোমার দেখাদেখি তাঁর পায়ে দাসখৎ লিখে দিতে আমি রাজী নই। গুরুর কাছেও যদি আমার আত্মসমর্পণ করতে বাধে তবে তোমার গুরুগীতার বা মন্ত্র-গুপ্তির গুণকীর্তনে দোয়ার দিই কেমন ক'রে বলো তো? তোমাকে সত্যি বলছি ভাই, আমি কী যে ভয় করি গোঁড়ামিকে কী বলব! তুমি যদি গোঁড়া হ'তে, তবে আমি বৃন্দাবনে তোমাকে যমুনাস্নানে যেতে দেখলে ফিরে এসে বরং কূয়োর জলে স্নান করতাম তবু তোমার ছায়া মাড়াতাম না।

কিন্তু এবার আমার স্বেচ্ছাচারের সাফাই গাওয়া রেখে কাজের কথায় আসি। আমার এ-ফুঁশে ওঠা চিঠি পেয়ে যদি টেলিগ্রাফ ক'রে আমাকে নিরস্ত না করো, তাহ'লে জেনো আমি খুব সম্ভব জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন আগেই তোমাদের আশ্রমে অভ্যুদিত হ'ব like a bad penny—আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে কেমন ক'রে যখন একবার আমাকে আস্কারা দিয়েছ ঝোঁকের মাথায়?

কিন্তু ঠাট্টা থাক ভাই। কী যে আনন্দ হচ্ছে ভাবতে যে, পুণ্য জন্মাষ্টমীর উৎসবে আমি তোমাদের মতন ভক্তের ধন্য সঙ্গ পাব, মা-র মতন মহীয়সীর মিষ্টি কথা শুনব, প্রণবের সমর্থন পাব (জয় হোক তার সে এ ব্যাপারে আমার দিকে হয়েছে ব'লে!) আর last though not least, ললিতার সঙ্গে ফের দুর্দান্ত খুনসুড়ি করার সুযোগ পাব। আমি এবার রামপুরের ওস্তাদ উজীর খাঁর বীণা শুনতে যাব সব ঠিকঠাক ক'রেও সমস্ত নাকচ করলাম। এতেও কি

তোমার মন পাব না, যদি মন্ত্র-গুপ্তির ব্যাপারে তোমার মনের মতনটি হ'তে না-ও পারি?

শেষ কথা, প্রণবকে মনে করিয়ে দিও তার অঙ্গীকার। আমি কালই রওনা হ'য়ে একদিন দিল্লীতে কাটিয়ে জন্মাষ্টমীর দিন কয়েক আগে পৌছুব আলমোরা। ঠিক কোন্ তারিখে হাজির হ'ব দু'একদিন আগে টেলিগ্রামে জানিয়ে দেব। আলমোরায় যেন প্রণব একটা ডাণ্ডির ব্যবস্থা রাখে—কারণ ষোল মাইল পার্বত্য পথে পরিব্রাজক আমি হ'তে পারব না পারব না পারব না। তাই আলমোরায় প্রণবের দেখা না পেলে প'ড়ব অথই জলে, মনে রেখো। মাকে প্রণাম। তোমাদের কথা আর কী বলব।

ইতি স্নেহধন্য অসিত

চতুর্থ পর্ব

[পাটনার পরেই]

এক

অসিত চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রণবকে তার করেছিল যে সম্ভবতঃ ৮ই ভাদ্র আলমোরায় অভ্যুদিত হবে। পরদিনই প্রেমলের তার পেল: "প্রণবের জ্বর, তুমি সোজা আমাদের বৈজ্ঞানিক বন্ধু শ্রীসুরথ গুপ্তর ওখানে গিয়ে হানা দেবে। তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, কোনো ভাবনা নেই। নিশ্চয় এসো। আমরা সবাই দিন গুণছি।"

কাঠগুদাম থেকে বাসে আলমোরা উঠতে সাড়ে চার ঘণ্টা লাগল। এতক্ষণ ঘোরানো রাস্তায় উঠে অসিত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বৈ কি। শ্রীসুরথ গুপ্তর নাম শুনেছিল—আলমোরার বিখ্যাত বাসিন্দা—বৈজ্ঞানিক, রসিক, ভক্ত একাধারে। তাঁর উপর প্রেমলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাশীতে প্রেমল তাঁর নানা গুণের কথা ফলিয়েই বলেছিল। ললিতা তার উপর জুড়ে দিয়েছিল: "কিন্তু সুরথদার সবচেয়ে বড় গুণ—রসিক। রসে ভরা, একেবারে টস টস করছেন।" প্রেমল বলেছিল: "সুরথদা আমাদের যে কত বড় আশ্রয়, দরদী—হাঁ করবার আগে বুঝে নেন কী বলতে যাচ্ছি। চাইবার আগেই পাওয়া। এহেন বন্ধু বিধাতার দানই বলব। আমরা এখান থেকে কাঠগুদাম নামার পথে প্রায়ই ওঁর ওখানে দুচারদিন কাটিয়ে যাই। রস ও রসদ দুয়েরই সংস্থান হয়। তাছাড়া আলমোরায় ওঁর চমৎকার আরামনিলয়ে আমরা থাকি রাজার হালে—অকিঞ্চনের পক্ষে এ একটা কম লাভ নয় তো"······ইত্যাদি।

কাঠগুদামে সরকারী বাস যেখানে থামে সেখানে নামতেই এক প্রৌঢ় দীর্ঘকায় সুদর্শন বাঙালী দৌড়ে এসে ওকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, প্রথম সম্ভাষণ: "প্রণবের মুখ চেয়ে থাকবেন কী দুঃখে মশাই, আলমোরার বনেদী বাসিন্দা শ্রীলশ্রীযুক্ত সুরথ গুপ্ত থাকতে? চলুন। তবে আজ বিকেলে রওনা হ'লে চলবে না। ডাণ্ডিতে অন্ততঃ ছ ঘণ্টা লাগবে। কাল সকালে সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আজ রাতে, মানে অধীনের ওখানেই পায়ের ধুলো।"

অসিত (ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে): এ কী বলছেন? শুনেছি আপনি প্রেমলের অন্তরঙ্গ বন্ধু—

সুরথ (হেসে): ও একটা কথার কথা মশাই—সাদা বাংলায় যাকে বলে

cliché, flapdoodle. figure of speech—এও বুঝলেন না? প্রেমলের বন্ধু হওয়া কি চাট্টিখানি কথা মশাই। তবে ও ভালোবাসে সবাইকেই, তাই কাউকেই তার নিজের নামে ডেকে কাবু করে না—কাছে টেনে পাশে বসিয়ে বাবু বানিয়ে দেয়। যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে তার বন্ধু হ'তে পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা অনেক কিছুই ছেড়েছেন কিম্বা ছাড়ব ছাড়ব করছেন। সংসারের মাটি কামড়ে যারা প'ড়ে থাকে তারা ওর মতন ত্যাগীর হ'তে পারে বড় জোর বাহন, সেবায়েৎ বা হুকুমবরদার—যাই বলুন। হ্যাঁ, ব'লে রাখি—আমার ওখানে একটু ভজন করতে হবে কিন্তু। অনেককে শাসিয়ে রেখেছি—আসতেই হবে। সবাই উৎসুক—এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনের দু একজন সাধুও আসবেন।

অসিত (উৎফুল্ল): এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের?

সুরথ (একগাল হেসে): নয়ত কি মাডাগাস্কারের, মশাই? নিন, চলুন এবার—আপনার বিছানা বাক্স সবই উঠেছে আমার মোটরে। কেবল আপনি উঠলেই ষোলোকলা সম্পূর্ণ হয়।

অসিত (সরল হৃদ্যতায় মুগ্ধ হ'য়ে): এখন বুঝেছি কেন প্রেমল আপনাকে তার "মস্ত আশ্রয়" উপাধি দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছে। আপনি প্রেমিক পুরুষ, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' তো! তাই 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'—বলে না?

সুরথ (মোটরে উঠে ব'সে জিভ কেটে): অমন কথা বলতে নেই। তার যোগ্য আমি—বলেন কি? এ যে স্রেফ ব্লাস্‌ফেমি মশাই, গ্লেয়ারিং ব্লাসফেমি! তবে ওকে আমি একটুও যে চিনতে পেরেছি এতে আমি সত্যিই খুশী। কারণ বেশি লোক চিনতে পারে নি আজও—ভাবে ও আর পাঁচটার মতন একটি 'গোলে হরিবোলা' সাধু। (থেমে মুচকে হেসে) কিন্তু ও যে ক্ষণজন্মা মশাই! সাহেব পুরাণে বলে না—"Only a Christ can spot a Christ?" সেই নজিরে আমিও বলতে পারি—নেটিভ ভাষায় এর তর্জমা ক'রে—যে, মাদৃশ বহুজন্মাও তাদৃশ ক্ষণজন্মাকে চিনতে পেরে রাতারাতি হ'য়ে দাঁড়ালো ক্ষণজন্মা। 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি'—হা হা হা!

অসিত (হেসে): আপনি যে ক্ষণজন্মা তা কি আর বলতে হবে দাদা, মার্কিন বিদুষীর গলায় মালা দিয়ে—

সুরথ: শুধু যে বিদূষক বনেছি তাই নয়, এই বিদুষীকেই ক্ষণজন্মার

তেল নুন লকড়ির ব্যবস্থা করতে বাধ্য করেছি—এই না? হ্যাঁ দাদা, আমার বিদুষী সত্যিই আমাদের বেহিসেবি সংসার-শকট সমানে হিসেব ক'রে চালাচ্ছে আজ বিশ বৎসর। প্রেমল ওকে যে কী খাতির করে জানেন না। (গম্ভীর) কিন্তু আর প্রগল্ভতা নয়, সত্যই প্রেমলের মতন আত্মজ্যোতি পুরুষকে চিনতে পারা যে-কোনো দিশাহারার পক্ষেই একটা মস্ত সৌভাগ্য। তাই তো আপনাকেও ভাগ্যবান্ ব'লে সনাক্ত ক'রে এত পেয়ার করছি মশাই, যে, আপনিই ওকে চিনে নিয়েছেন এক আঁচড়ে।

অসিত: কিন্তু চিনেই যে ফ্যাসাদে পড়েছি দাদা!—আপনাকে দাদা ডাকলে রাগ করবেন না তো?

সুরথ (অসিতের কাঁধে চাপড় মেরে): রাগ? আমিও তো এইই চাই ভাই। মশাই টশাই বলতে আমার কেমন যেন জিভ উল্টে জড়সমাধি হবার জো হয়। প্রেমলের সঙ্গে বনেও তো এই জন্যেই। ও-ও আমাকে দাদা বলে, ওঁকে বৌদি। তুমিও ওঁকে বৌদি বোলো, কেমন? উনি খুব খুশী হবেন।

অসিত: আপনি যখন দাদা তখন দাদার জায়া যে বৌদি হবেন এ তো দুই আর দুইয়ে চার-এর হিসেব দাদা। আর আপনি যখন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক, তখন আপনার কাছে এসে পাটীগণিতে ভুল করলে চলবে কেন?

সুরথ: বেশ বেশ ভাই—তোফা! এখন বুঝেছি কেন প্রেমল তোমাকে বরণমালা দিয়েছে।

অসিত (সাগ্রহে): দিয়েছে, সত্যি?

সুরথ: সন্দেহের হেতু কী শুনতে পাই?

অসিত: সে দুঃখের কথা আর কী বলব দাদা? ও চায় মন্ত্রগুপ্তি, আমি চাই মন্ত্রপ্রকাশ। অর্থাৎ ও চায় আমি ওর কথা কাকপক্ষীকেও না বলি। কিন্তু বলুন তো দাদা, এ-ও কি একটা কথা হ'ল? এমন একটা সাধুর মতন সাধু—এ-গিল্‌টির রাজ্যে এমন গিনি সোনা—এমন রোমাঞ্চকর সংবাদ জেনেও কাউকে জানাব না? আমার অকালমৃত্যু হবে যে পেট ফুলে! আমার মনে পড়ে আরব দেশের এক কথিকা। শুনবেন?

সুরথ: শুনব না? বাঃ! বলো বলো। আমি সেই ল্যাটিন মনীষীকে সাধু সাধু ব'লে এসেছি তোমার জন্মাবারও আগে ভাই—যিনি বলেছিলেন:

Homo sum ; humani nil a me alienum puto.

এ-ও প্রেমলের কাছে শুনে মুখস্থ ক'রে রেখেছি আওড়ে জনগণমনকে ভড়কে দিয়ে তাদের অধিনায়ক হ'তে। তুমি নানা ভাষাবিদ্, লাতিন জানো নিশ্চয়ই।

অসিত: এবার আমাকে লজ্জা দিলেন দাদা, লাতিন শেখার আমার সুযোগ হয়নি। তাই বলুন ওর মানে আগে—তারপর বলব আপনাকে আরবী প্যারাব্‌ল্।

সুরথ: ওর মানে ভাই এই যে, আমি মানুষ ব'লেই অমানুষিক হ'তে নারাজ—চাই মানুষ যা কিছু করেছে ভেবেছে জিতেছে হেরেছে সব জেনে সবজান্তা হ'তে। না দাদা, অঙ্গীকারটি ঠাট্টার নয়। কারণ আমরা যতই বলি না কেন, মানুষ হ'য়ে মানুষের কীর্তিকলাপের খবর না রাখলে লোকে যে গায়ে থুথু দেবে বলবে, দ্বিজু রায়ের ছড়ায়: "তুই কি একটা মানুষ, তুই তো পশু পক্ষী মৎস্য লাটিম কিম্বা ফানুষ!"—হা হা হা। কিন্তু এবার বলো তোমার আরবী মানুষের পেটফোলার কাহিনী। কী করেছিল সে? বেশি খেজুর খেয়েছিল বুঝি?

অসিত: না দাদা। হয়েছিল কি, প্রেমল ওর কথা একটি পত্রপ্রবন্ধে লিখে কোনো পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে বিষম ধমকেছে আমায়। তাই ওকে তুড়ে শুনিয়ে দেব ব'লে পাটনায় কথিকাটি লিখেছি এক প্রগল্‌ভ ছড়ায়। শুনুন (পকেট ডায়রি বের ক'রে পড়ে)

বব্বন বলে: "চব্বন দাদা, চুপি চুপি তোকে বলি—
(বড় গোপনীয় কিন্তু, কাউকে বলিসনি, সাবধান!
মন্ত্রগুপ্তি বিনা তো সিদ্ধি নেই জানে ভগবান্):
পাছে জল যায় বেরিয়ে রে—তাই কষেছিনু অঞ্জলি,
বজ্রমুঠিতে—তবু কেন হায় সব জল গেল গলি'—
কোন্ ফাঁক দিয়ে পালালো বন্দী, কী ফন্দিতে কে জানে?
ধাঁধাঁ লাগে দাদা, ভাবতেও! তুই জানিস্ কি এর মানে?
তোরও ধাঁধাঁ লাগে? নিরুপায়! শুধু জপিস রে মনে মনে:
'এ-কথাটি অতি গোপন, রাখব চেপে আমি প্রাণপণে।"

চব্বন ভায়া পড়ল ফাঁপরে! কেন যে সে দিল কথা!

কিন্তু দিয়েছে কথা সে যখন—সাজে কি খেলাপ করা ?
মরদকি বাত যে হাতীর দাঁত ! মনে মনে সর্বদা
জপ করে : 'না না, এ-গোপন কথা কাউকে বলব না।"

"কী হে চব্বন ? কী জপ করছ দিনরাত উন্মনা ?"
"না না, বব্বন—ঐ দেখ"—ছুটে পালায় চমকে ত্বরা।
কাছে এসে তার স্বজন বন্ধু—শুধায় তাকে, সে রেগে
ক্ষেপে ছুটে হয় উধাও—দন্তে ঠোঁট চেপে বায়ুবেগে।

ফকির হাকিম ওঝা দলে দলে এসে হার মানে সবে।
একদা নিশীথে চব্বন ছুটে গিয়ে সাহারার মাঝে
মস্ত গর্ত খুঁড়ে নেমে হেঁটমুণ্ডে হাঁকল তবে :
"হে মিতা পাতাল ! শোনো—যে কথাটা বলিনি কাউকে ভবে ;
বব্বন ভাই দিলো যে দিব্যি, তাই তো বলতে বাজে :
মুঠো থেকে তার কোন ফাঁকে জল পালালো—সে জানে না যে !"

সুরথ (হো হো ক'রে হেসে) : প্রেমলকে খুব এক হাত নিয়েছ ভাই ! তাকে শোনাবে তো ?

অসিত (দোমনা) : শোনাব ? যদি সে কিছু মনে করে ?

সুরথ : ক্ষেপেছ ? তাকে নিয়ে হাসলে সে-ই করে সবচেয়ে তেজী অট্টহাস্য—he will outlaugh us all, I tell you : বিশ্বাস না হয় তোমার বৌদিকে জিজ্ঞাসা কোরো। (মোটর গেটে ঢুকতেই) এই যে সামনেই পতিপরায়ণা সতী সারথির পথ চেয়ে—যেহেতু এখানে পতি = সারথি, এও বুঝলে না ?—হা হা হা।

দুই

অসিত স্নান সেরে ধ্যানে ব'সে হাজার চেষ্টা ক'রেও মন বসাতে পারল না কৃষ্ণমূর্তিতে। কেবলই মনে হয় সুরথদার কথা। তার বিচিত্র জীবনে রকমারি চরিত্র দেখেছে সে, কিন্তু সুরথদা যেন একমেবাদ্বিতীয়ম্! ছড়া কাটা চলে: "যেমন পটু হাসতে, তেমনি ভালোবাসতে!" এক মুহূর্তে পরকে আপন করে নেন কেমন ক'রে—শুধু নিজেকে পরিবেষণ ক'রে নয়, ঐ সঙ্গে বিদেশিনী "বৌদি-কেও হাতছানি দিয়ে অপরিচিতকে "ভাই" ব'লে ডাকার দীক্ষা দিতে। অসিত সুরথদা'র আতিথেয়তার নামডাক শুনেছিল অনেকদিন থেকেই, কিন্তু এমন রসাল আতিথেয়তার পাঠ পেলেন তিনি কোন্ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে? অপিচ, ফ্লোরা বৌদিও কি চমৎকার গৃহিণী! যেমন বিদুষী, তেমনি সরলা! তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা NEW LIGHT সে আগেই পড়েছিল। তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধও ভালো লেগেছিল। কিন্তু এমন বিদুষী যে স্নেহময়ীও হ'তে পারেন—তা আবার এক বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এমার্সনের পৌত্রী হ'য়ে—এ কি ভাবা যায় সত্যি? ললিতা ও প্রেমলের কাছে শুনেছিল: "সুরথদা আনন্দময় পুরুষ।" কিন্তু কখনো মনে হয় নি—তাঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টিতেই এমন ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যাবে। তবে এও হয়েছে প্রেমলের ঘটকালিতেই তো। "সে-ই হ'ল catalytic agent"—বলেছিলেন সুরথদা হেসে। অর্থাৎ, যে শুধু উপস্থিতির জাদুতে অঘটন ঘটায়—এর সঙ্গে ওকে মিলনের সূত্রে বেঁধে। প্রেমল বলেছিল—কতরকম লোকই যে তাঁদের কাছে আসে ও এসেই প'ড়ে যায় তাঁদের প্রীতির জালে—আর বেরুতে পারে না। "আমি যে আমি অসিত—স্বভাববৈরাগী"—বলেছিল সে—"সেই আমাকেও কি না আটকে রেখে দেন তাঁদের স্নেহনিলয়ে পাঁচ সাত দশ দিন ধ'রে! আলমোরায় আমাদের বিজন আশ্রম থেকে যখনই বেরোই—সুরথদা'র আনন্দনিলয় হয় আমাদের last link with the world, half-way house—সংসার ও অরণ্যের মধ্যে। আর তার কারণ কী জানো? উনি বাইরে বৈজ্ঞানিক হ'লেও অন্তরে খাঁটি ভক্ত পূজারী। ওঁর ঠাকুরঘরে পরমহংসদেব, স্বামীজি, রাজা মহারাজ, গিরিশ ঘোষ, আরও কত সাধুসন্ত পরম ভাগবতের ছবি! আলমোরার রামকৃষ্ণ

মিশনের উনি একজন প্রধান পাণ্ডা—তারাও ওঁকে আপনার লোক মনে করে। ওঁকে 'অজাতশত্রু' নাম দিয়েছি আমি। সত্যি, বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এমন সহজ বিশ্বাসী খাঁটি ভক্ত বোধহয় আর দুটি নেই।......"

এ কথার প্রমাণ মিলল একেবারে হাতে হাতে—কয়েক ঘণ্টা বাদে বৈকালিক চা-পর্বের পরেই। কত জাতের লোকই যে এল অসিতের ভজন শুনতে! রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুও দু'জন। তাছাড়া, আলমোরার অধিবাসী, আমেরিকান, বাঙালী, জর্মন, কাশ্মীরী এমন কি একজন তিব্বতীও ছিলেন। "না লামা টামা নন" বলেছিলেন সুরথদা হেসে অসিতের কাছে তাঁকে পেশ ক'রে। "জানো বিদেশে আমি যেখানেই যেতাম সবাই ভাবত বেদ-বেদান্ত আমার নখদর্পণে—নাক টিপে কুম্ভক ক'রে নিশ্চয়ই আমি রামঠাকুরের মত নিশুত রাতে 'চোরাগোপ্তা' মশারির মধ্যে শূন্যে উঠে সমাধিতে বুঁদ হ'য়ে থাকি—হা হা হা! কিন্তু ওদের একথা বোঝাতে গিয়ে একেবারে চোখের জলে নাকের জলে—যে, ভারতীয় মাত্রেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা মধুসূদন সরস্বতী নয়। যেমন তিব্বতী মাত্রই রিমপোশে বা মিলারেপা নয়। হা হা হা!"

"হয়েছে, এবার ওঁকে গাইতে দাও"—বললেন ফ্লোরা বৌদী।

স্বামী প্রবীরানন্দ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, অসিতবাবু! এবার সুরু করুন। বৃষ্টি থেমেছে বটে, কিন্তু কখন যে ফের নামবেন তিনি—বলা যায় না তো—ভাদ্রের আকাশ তার উপর পাহাড়ে মেঘ, জানেনেই তো—

সুরথদা: মা ভৈঃ, স্বামীজি! আপনাকে হেঁটে ঘরে ফিরতে হবে না, বিজ্ঞানীর রথ জ্ঞানীর পায়ের ধুলো পেয়ে ধন্য হবে।

তিব্বতী: এক গানা সুনাইয়ে—সংস্কৃত গানা জী!

অসিত (সুরথকে): সংস্কৃত? এখানে ক'জন বুঝবেন?

সুরথদা: এক কাজ করো—নামকীর্তন ধরো—দেবভাষাও হবে—সর্ববোধ্যও হবে। (তিব্বতীকে) উনি একটি ঠাকুরের নাম শোনাবেন। গাও ভাই!

অসিত (খুশী): বাঁচালেন সুরথদা! (বলেই ধ'রে দেয়)।

হরি গাও......হরি গাও।
জয় রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি ধ্যাও!
জো রাম নাম সব সংকট কাটে,
সখি, রাম স্রো কোঁ্যা বিসরাও?

জয় দশরথনন্দন দুখভঞ্জন রঘুরাঈ !
জয় সীতাবল্লভ ভবভয়হারণ রাম সদা সুখদায়ী !
জয় রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি রাম সিয়াপতি ধ্যাও !
জয় রাম রাম সিরি রাম রাম সিরি রাম রাম নিত গাও !
হরি গাও……হরি গাও !
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও !

জয় মাধব মুকুন্দ মোহন মুরলীধারী !
জয় গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী রাধানাথ মুরারি !
জয় রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ গাও !
জয় রাধে রাধে রাধে রাধে রাধে শ্যাম ধিয়াও।
হরি গাও……হরি গাও !
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও !

জয় মহাদেব শিব শম্ভু ত্রিশূলধারী !
জয় উমামনোহর জয় যোগেশ্বর গঙ্গাধর ত্রিপুরারি !
জয় হর হর হর হর জয় শিবশঙ্কর জয় জগদীশ্বর ধ্যাও !
জয় হর হর ভোলা হর হর ভোলা হর হর ভোলা গাও !
হরি গাও……হরি গাও…
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও !

জয় জয় দুখহারিণি দুর্গা গৌরী মৈয়া।
জয় জয় ভবতারিণি কালী মাতা জয় জয় গঙ্গা দৈয়া।
জয় সদ্‌গুরু গোবিন্দ এক সখী রী, জয় গুরু জয় গুরু গাও !
সখি সদ্‌গুরু বিন গতি নহী জগতমে, সদগুরু নাম ধিয়াও !
হরি গাও……হরি গাও !
হরি নাম মধুর হরিনাম মধুর হরি ধ্যাও !

গানের শেষে অসিতের চোখের সামনে কেবলই ভেসে ওঠে মা-র ভাবোজ্জ্বল মুখ, ললিতার জলভরা চোখ আর প্রেমলের ঋজু দেহ, স্থিরদৃষ্টি—যেন উত্তান নয়নে সে কী দেখছে! কতবার ও জিজ্ঞাসা করেছে—প্রেমল কিছু দেখেছে কি না, কিন্তু মৃদু হেসে সে পাশ কাটিয়ে গেছে।...

গানের শেষে সবাই একে একে বিদায় নেওয়ার পরে স্থরথদা ওকে নিয়ে গেলেন নিরালায় তাঁর ঠাকুর ঘরে—যার কথা প্রেমল বলেছিল।

স্থরথদা ব'লে চললেন সোচ্ছ্বাসে: "আহা, কী নামগানই গাইলে ভাই! প্রেমল ও ললিতা দু'জনেই আমাকে বলেছিল তোমার নামগানের কথা। আর সেই সঙ্গে" (চোখ মিট মিট ক'রে) "ও একটা কথা বলেছিল—কিন্তু কাউকে বলতে পই পই ক'রে মানা ক'রে—"

অসিত (বাধা দিয়ে): জানি দাদা, কিন্তু আপনি কি এবিষয়ে খানিকটা আমারই সমানধর্মী নন? অর্থাৎ মানা যারা মানে তাদের জাতই আলাদা নয় কি?

স্থরথ (এক গাল হেসে): যা বলেছ ভাই! তবে he has a case, you must admit! ওকে কী যে বিরক্ত করে শুধু ওর গুরুভাইরাই তো নয়—ওর নানা ভক্ত—fan-এর দল—(ফের হেসে) তবে ও যতই চেষ্টা করুক না কেন ভাই, আলো দেখলে পতঙ্গের দল ছুটে আসবেই। তাই তো ও চায় সে-আলোকে একটু আড়ালে আবডালে রাখতে, এই আর কি।

অসিত: কিন্তু দাদা, পতঙ্গ—মানে, the moths, too, have a case: দিনের পর দিন তারা অন্ধকারেই ঘুরে মরেছে। কে বলতে পারে আলোর ডাকে আগুনের চিতায় পুড়ে মুক্তিই তাদের ভবিতব্য নয়? দাদা, যুগে যুগে সাধু মহাত্মাদের সবাইকেই অশান্তদের জ্বালায় "পালাই পালাই" ডাক ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবার পরে তাঁরা কি ফের ফিরে আসেন নি তাদেরই কাছে? চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলেছিলেন: "সংসারী জীবের কোনো গতি নাই।" কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছিল এই পাপী তাপী সংসারীদের নিয়েই নয় কি? অতদূরে যাবারই বা দরকার কি, আপনি তো শুনি রাজা মহারাজের মানসপুত্র। তিনি অতবড় বৈরাগী হ'য়েও রাতদিন গৃহী শিষ্যদেরই বল ভরসা দিতেন না কি তাঁর কথায়, লেখায়, ভাষণে, আশীর্বাদে?

স্বরথ: তোমার এ কথা কাটবে কে ভাই? তবে কি জানো? পতঙ্গরা যখন বড় বেশি ভন ভন করে—না, তারপর কুটুস কাটুস ক'রে কামড়াতেও ছাড়ে না—যার ফলে জ্বলে খুবই—তখন মহাত্মাদেরও কান্নাকাটি ক'রে বলতে হয়: "মায়াময়মিদম্ অখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা"—কাজ নেই এত ঝঞ্ঝাটে—বনে জঙ্গলে চম্পট দিয়ে মায়া ছেড়ে মায়েশের মধ্যে ডুব দেওয়াই পন্থা। বুদ্ধ যে বুদ্ধ তিনি করুণার প্রতিমূর্তি হ'য়েও দুশ্চর তপস্যা ক'রে অন্তিমে "তন্‌হা"—তৃষ্ণাকে—জয় করার ব্যবস্থা দেন নি কি?—বলেন নি কি—জন্ম মানেই দুঃখ, কাজেই দুঃখনিবৃত্তির একটি মাত্র উপায় আছে—দুর্দান্ত ঘুরন্ত জন্মচক্র থেকে tangent-এর মতন ছিটকে বেরিয়ে পড়া—যদিও বেরিয়ে যে ঠাঁই পাব কোথায়—তার কোনো হদিসই দেন নি তিনি। কিন্তু যেতে দাও ভাই এসব বৈরিগিদের কথা। ঠাকুরের জয় হোক, তোমাকে আমাকে অন্ততঃ তিনি বৈরিগির রক্তমাংস দিয়ে গড়েন নি।

অসিত: কিন্তু প্রেমলের মতন প্রেমিক পুরুষকে?

স্বরথ: আমার কি মনে হয় জানো দাদা? ও য়ুরোপের সভ্যতার নানা হীনতা ও নিষ্ঠুরতায় বড় ঘা খেয়েছে। আমার আরো কয়েকটি ইংরেজ, জর্মন ও ফরাসী বন্ধু আছে, তাদেরও প্রায় এই একই অবস্থা। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউই ওর মতন মস্ত আধার নয়। কিন্তু তারা সকলেই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে ওদেশের বস্তুতান্ত্রিকতার শূন্যতায় ও বুদ্ধিবাদের বিড়ম্বনায়। কিন্তু এর নাম 'রিয়্যাক্‌শন'—মানে ধাক্কা খেয়ে মুখ ফেরানো, শোধ তোলা। আসলে তুমি ঠিকই ধরেছ—ও প্রেমিক পুরুষই বটে—প্রেমল নাম ওর সার্থক। তাই —দেখো তুমি, মিলিয়ে নিও পরে—ও দিনে দিনে যত পাকবে ততই নরম হ'য়ে ঝুঁকবে না-র দিক থেকে ফিরে হাঁ-র দিকে—যাকে দার্শনিক শ্বাইৎজার (Schweitzer) বলেন ওয়র্লড্‌অ্যাফার্মেশন। একথা আমার আরো মনে হয় পরমহংসদেবের উত্তর-জীবনের পরিণতি দেখে। প্রথম দিকে কি তিনি সব ছেড়ে বৈরাগ্যের দিকেই ঝোঁকেন নি? কিন্তু পরে কী হ'ল বলো তো? মা কালীর আদেশ পাবার পরে কি আমাদের মত 'অখাদ্য'-দের সঙ্গেই দহরম মহরম ক'রে কাটান নি? আর কী দারুণ অখাদ্য ভাবো তো—যার জন্যে তাঁকে মা-র কাছে কেঁদেকেটে নালিশ করতে হয়েছিল: "মা, এ কাদের পাঠাস আমার কাছে? এক সের দুধে চার সের জল—কত জ্বাল দেব মা—শুধু

উনুনের ধোঁয়ায় চোখ গেল—এ আমি পারব নি।" পড়েছ তো কথামৃতে—বলতেন তিনি ঘড়ি ঘড়ি: "আমি নিত্যে পৌঁছে লীলায় ফিরে আসি?"

অসিত (খুশী): আপনার কথায় বড় ভরসা পেলাম দাদা। এ-যুগের ঋষি শ্রীঅরবিন্দও তাঁর সাবিত্রী-তে ঠিক এই কথাই বলেছেন—নির্জনবাসের পরে:

* Earth is the chosen place of the mightest souls,
Earth is the heroic spirits' battle-field

সুরথ (উদ্দেশে নমস্কার ক'রে): তাঁর লেখা যতটুকু পড়েছি তাতেই মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করেছি ভাই। তাঁর সাবিত্রী-তে আমিও একটি শ্লোক পড়েছিলাম—যখনই আমার মন খারাপ হয়, শ্লোকটি আওড়াই—

** God must be born on earth and be as man
That man, being human, may grow even as God.

মহাজন মহানুভব মহাত্মা মহর্ষি—এঁদের কাছে তো এই বাণীই চাইব—পাপীতাপীদের জন্যে। তাঁরা ভগবানকে চাইবেন কি শুধু নিজে সমাধিতে বুঁদ হ'য়ে ব'সে থাকতে? কখনই না। দেখ না শ্রীচৈতন্যদেবকে—সর্বদা থাকতেন দীনহীনের সঙ্গেই নয় কি? স্বামীজি নিজে? দরিদ্রের জন্যেই তাঁর প্রাণ কাঁদত না কি অষ্টপ্রহর? বলতেন না কি উঠতে বসতে: "কী হবে মুক্তি ফুক্তি নিয়ে? তুত্তোর তোর মোক্ষ কৈবল্য!

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

অসিত: একথা খুবই ঠিক। কিন্তু সেইজন্যেই তো সাধুসন্তদের মধ্যেও বেশি আচারিপনা দেখলে মন খারাপ হয়।

সুরথ: আমি বুঝেছি তুমি কী বলতে চাইছ ভাই। কিন্তু সাধুদের মধ্যে যাঁরা সত্যি বড় সাধু এ-আচারিপনা তাঁরা কাটিয়ে ওঠেনই ওঠেন—কারণ যেটা আমরাও দেখতে পাচ্ছি চর্মচক্ষে, তাঁরা দিব্যচক্ষেও দেখতে পান

* মহান্ আধার যাঁরা পৃথিবীরে করেন বরণ,
মহাবীর যাঁরা—বসুন্ধরা তাঁহাদের রণাঙ্গন।

** শিবেরে জন্মিতে হবে এ-ধরায় জীবরূপে—যাঁর
ঐশ্বরিক আকর্ষণে সালোক্য লভিবে জীব তাঁর।

না এ কি কখনো হ'তে পারে? তবে কি জানো ভাই? আমার মনে হয়—আচারিপনার মধ্যে কিছু কিঞ্চিৎ গতানুগতিকতার আমেজ থাকলেও একটা বড় দিকও আছে। ধরো, প্রেমলের মুখেই শুনেছি যে, আচার-বিচার মেনে চললে—বিশেষ ক'রে গুরুর কথায়—আমাদের মনকে বাগ মানানো একটু সহজ হ'য়ে আসে—যার ফলে স্বেচ্ছাবিহারকে ছাড়তে আর তত বাজে না। আমরা উঠতে বসতে সাধনায় আত্মাভিমানকে জয় করার কথা বলি। কিন্তু বললেই তো সে পোষ মানে না। আচার মেনে চললে তাকে বলা যায়—চোপরাও! যা ইচ্ছে তা চাইতে পারবি না, গুরুর কথা মেনে চলতেই হবে তোকে। এককথায় সংযমের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হ'ল আচার মেনে চলা।

অসিত: কিন্তু দাদা, এর ফল কী হয় দেখতে পাই না কি প্রায়ই? যাঁরা আচার মেনে চলেন তাঁরা কি সত্যিই রাতারাতি মহানুভব হ'য়ে ওঠেন? বরং অনেক সময়ে খুঁতখুঁতে শুচিবেয়ে হ'য়ে আরো ছোট হ'য়েই যান না কি?

সুরথ: কি জানো ভাই, এসব যুক্তি হ'ল শাঁকের করাত—দুদিকেই কাটে। কারণ একদিকে যেমন আচার মানতে মানতে মানুষ অসহিষ্ণু শুচিবেয়ে হ'য়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি দেখবে—সব আচার-বিচারকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে শেষে হ'য়ে ওঠে নিহিলিষ্ট, কালাপাহাড়। তাছাড়া রুখে উঠে ক্রমাগত নিজের মতিগতিকেই গুরুবরণ করার ফলে অনেক সময়েই কি অনাচারীরা মনে ক'রে বসেন না যে, দুরাচার হওয়াটাই হ'ল বাহাদুরি—স্বাধীনচিন্তা? আমি আথাল পাথাল ভেবে কুলকিনারা না পেয়ে শেষটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভাই যে, সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্—কোনো কিছুরই বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না—যাকে বুদ্ধদেব বলতেন the golden middle path—সাবাস! আরো একটা কথা: যাঁরা সত্যিই মহাজন তাঁরা সাধনার একটা স্টেজে আচারী হ'লেও দেখবে—যতই ওঠেন ততই মুক্তি পান আচারিপনার কবল থেকে। ঐ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনই দেখ না কেন, প্রথম দিকে কী আচারীই ছিলেন তিনি। বলতেন কেঁদে: "মা! শেষে কিনা কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি!" কিন্তু পরে কী হ'ল?—সকলের ওখানেই তো খেতেন। আমার সত্যি কী মনে হয় জানো ভাই? মনে হয়—তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস একটু সমঝে দেখতে চাইলে শুধু আচারিপনাই নয়, এ-দিনদুনিয়ার অনেক দুরাচারিপনার গাঢ় সমস্যাও ফর্সা হ'য়ে যায়। তাই তো আমার মন

যৌবনেই সাধুসন্তদের পায়ে বিকিয়ে দিয়েছি ভাই! আমি যে দেখতে পেয়েছি—সাধুসন্তরাই হ'লেন salt of the earth! শিখদের এক গুরুবাণীতে আছে: "সন্ত্‌ জো না হোতে জগমে তো জল জাতে সংসার"—অর্থাৎ সাধুসন্তরা এ-জগতে জন্মান ব'লেই আজো জগৎ টি'কে আছে, নৈলে কবে জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে যেত—যেমন আজ ফের যেতে বসেছে সাধুকে ছেড়ে আমরা পলিটিশিয়ানকে গুরুবরণ করেছি ব'লে। ডিক্টেটর, প্রেসিডেণ্ট, পলিটিশান গুরু-দিশারি! হা অদৃষ্ট! দেখছ না তাঁরা কী উঠে প'ড়ে লেগেছেন অ্যাটম্‌ বোমার পাহাড় তুলতে—এর ফল কি ছাই ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে দাদা?

অসিত (হেসে): কিন্তু আপনি বৈজ্ঞানিক হ'য়েও সাধুসন্তদের পায়ে মন বিকিয়ে দিলেন কেমন ক'রে?

সুরথ: বাঃ! বৈজ্ঞানিক ব'লে সাধুসন্তকে দণ্ডবৎ করব না? সেই সাঁওতালদের গল্প জানো তো? তাদের পটিয়ে খৃষ্টান করলেন তো পাদ্রিপুঙ্গবেরা। ভাবলেন কী সেবাই না করলেন খৃষ্টদেবের। ওমা, একদিন তাদের ডেরায় গিয়ে দেখেন কি—সাঁওতাল খৃষ্টানরা মহা ধুমধাম ক'রে মা কালীর মূর্তির পায়ে ফুল দিচ্ছে। তাদের হুঙ্কার দিয়ে ধমকাতে তারা জবাব দিল হুহুঙ্কারে: "সায়েব বলিস কী তুই? খৃষ্টান হয়েছি ব'লে ধম্ম ছাড়ব?" হা হা হা। (গম্ভীর হ'য়ে) কিন্তু এ সত্যি হাসির কথা নয় ভাই। তাই বলি—বিজ্ঞানের চর্চা করলে সাধুসন্তের মহিমায় বিশ্বাস উঠে যাবে কী দুঃখে?

অসিত: কারণ এ হ'ল অন্ধ বিশ্বাস—বলেন নাকি বুদ্ধিবাদীরা উঠতে বসতে?

সুরথ: শোনো ভাই, আমি প্রেমলের কাছে একটি ভারি চমৎকার কথা শিখেছি: faith আর belief-এর তফাৎ। সে বলে—বিশ্বাস আমাদের মনকে শক্তি জোগায় যার ভিৎ-এ আমরা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারি—অর্থাৎ কি না, সে আমাদের জোর দেয় লড়তে। আর belief—ধারণা—নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, তাকে খাড়া ক'রে রাখতে হয় আমাদের মনের রোখ বা প্রাণের ঝোঁক দিয়ে। ওর এক একটা কথা এমনি মন্ত্রবাণীর সুরেই বেজে ওঠে যেন: My faith supports me, whereas my beliefs have to be suppor.ed by me" কেমন aphorism, বলো তো? "সাবাস" বলতে ইচ্ছে হয় না?

অসিত (সায় দিয়ে): একশোবার। এ aphorismটি ও আমাকে

কাশীতে বলেছিল একদিন। আমার এত ভালো লেগেছিল যে, আমি আমার ডায়রিতে টুকে নিয়েছিলাম।

সুরথ: খুব ভালো করেছিলে। ওর অনেক কথা আমিও আমার পকেটবুকে টুকে নিয়েছি ওকে না জানিয়ে। আর তাই তো আমি বেশি ভাবি না ওর আচারিপনার জন্যে। মহাভারতে বলেছে: "সর্বং বলবতাং পথ্যম্"— বলিষ্ঠ মহাপুরুষ সব রকম পথ্য থেকেই বল পেতে পারেন। আমি তাই বলি— ও করে করুক না দুদিন এই ছোঁওয়া-ছুঁয়ি নিয়ে ছেলেখেলা। মনে আছে কি তোমার পরমহংসদেব গিরিশ ঘোষ মদ খায় শুনে কী বলেছিলেন? "থাক না, থাক না—কদিন খাবে?" আমিও তাঁর দোয়ায় দিই এই ব'লে: "প্রেমল আচার বিচার নিয়ে যদি একটু বাড়াবাড়িও করে করুক না—কদিন করবে? ভালোবাসতে যে শিখেছে তার ভয় কী? Everything can be grist to love's mill—আর কারণ কী বলব?—কারণ, প্রেম তো শুধু রক্ষাকবচই নয় ভাই—সে যে আকাশগঙ্গার ঢল, এ ধুলোবালির জীবনে যখন নামে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—শাস্ত্র-শাস্ত্রী মন্ত্র-তন্ত্র আচার-বিচার—সব।

অসিত: আপনি এমন চমৎকার কথা বলতে শিখলেন কোত্থেকে দাদা?

সুরথ: ঐ একই আকাশগঙ্গার জলতরং থেকে ভাই—যার একটি নাম—কৃপা। তবে আমি এ কৃপার বর পেয়েছি ঠিক প্রেম থেকে নয়। পেয়েছি —সাধুসন্তদের অন্তরঙ্গ ছোঁয়াচ থেকে: শ্রীমা সারদামণি, রাজা মহারাজ, গিরিশবাবু—এঁদের আশীর্বাদই আলো ধরেছে আমার তীর্থপথে। তার পরে এল প্রেমল।

অসিত (খুশী হ'য়ে): ওর একটা কথা মনে পড়ছে। একদিন ও বৃন্দাবনে বলেছিল: "বুদ্ধি সব জেনেও কিছুই জানে না, কারণ ভগবৎকৃপাকে জানার মতন ক'রে না জানতে পারলে এ-জীবনযাত্রা হ'য়ে দাঁড়ায় একটা দৃষ্টিহীন শক্তির খামখেয়ালী বুদ্বুদবাজি: an arbitrary bubble-play of purblind energy." ও এক একটা কথা বলে সত্যি ভোলা যায় না দাদা—jewelled sayings, যাকে বলে।

সুরথ (হাত বাড়িয়ে): হাত মেলাও দাদা—একেবারে bull's eye! হয়েছে কি জানো? ও সবকিছুকেই তলিয়ে দেখে ওর আশ্চর্য মনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে—যাকে বেদে বলেছেন—"আবৃত্তচক্ষু"। নৈলে কি ওর মুখে এরকম

অবিস্মরণীয় কথার খই ফুটতে পারত? কৃপার কথা বলছিলাম না? একদিন ও কৃপার কী ডেফিনিশন দিল শুনবে? বলল এম্‌নিই ধাঁ ক'রে: "এ জগতে কেউ ভগবানের অগ্নিষজ্ঞে আত্মাহুতি দিলে তার ফলে যে-বিস্ফোরণ হয় তারই নাম কৃপা: "In this world whenever anybody immolates his self in the Fire of the Divine, there is an explosion which is Grace. ওকে তাতাতে চেয়ে আমি টুকলাম: "কিন্তু নিজের প্রিয়তম আমি-টিকে আহুতি দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা ভাই?"

ও জবাব দিল তক্ষনি: "করুণাই কি চাট্টিখানি কথা স্বরথদা যে চাইতে না চাইতে হাতে চাঁদ আসবে?"

আমি বললাম: "মানে তুমি বলছ তপস্যা শুধু তপস্যা—বুদ্ধের মতন! বৈষ্ণবেরা কিন্তু ঠিক তা বলে না?

ও বলল: "স্বরথদা, এমন একটি বৈষ্ণবও কি চাক্ষুষ করেছ যে সব ছাড়ার তপস্যা না ক'রেও কৃপা পেয়েছে? উপনিষদ কি অকারণ বলছে যে, এ-পথ সবচেয়ে কঠিন দূরত্যয়—যেন ক্ষুরের উপরে চলতে হয়—rope-dancer-এর মতন?

আমি বললাম: "কিন্তু ঠাকুর তো বলতেন আত্মসমর্পণ হ'লে কৃপা মিলবেই মিলবে?"

ও বলল: "তাতে কি ব্যাপারটা একটুও সহজ হ'য়ে এল না কি? আত্মসমর্পণ মানে কি দুটো ফুল ঠাকুরের পায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলা—'তবৈবাহম্—আমি তোমার' আর অমনি ঠাকুরও পিঠ পিঠ বলবেন একগাল হেসে—'মমৈব ত্বম্—তুমিও আমার।' আর যাই করো না কেন, করুণাকে মাড়োয়ারিদের সস্তা নামজপের মতন ছেলেখেলা দাঁড় করিয়ো না। আমি করুণা পেয়েছি স্বরথদা, তাই বলতে পারবে না আমি শোনা কথা বা পুঁথির বুলি আওড়াচ্ছি। কিন্তু পেয়েছি ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ব'লেই যে, প্রতিপদে স্বেচ্ছাবিহার ছেড়ে সাধনাকে গুরুমুখী করলে তবেই করুণাকে মিলতে পারে, নৈলে নয়। সব অভিমান, আত্মাদর, কামনাবাসনা, কাড়াকাড়ি, প্রিয়পরিজন, আসক্তি, মমতা, প্রত্যাশা সমস্ত জলাঞ্জলি না দিলে কি কৃপাদেবী আসেন? বড় জোর উঁকি দিয়ে "টু" বলেই ফের গাঢাকা হন। আর তখন কী হয় বলো তো? ভাগবতে নারদের কাহিনী স্মরণ করো: নারায়ণের কৃপা তাঁর হৃদয়ে

এসে কিছুক্ষণ থেকেই অদৃশ্য। নারদের মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল—যেমন হয় স্তনন্ধয় শিশুর তাকে মার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে।" আর তাই জন্যেই তো গুরুর দরকার। যখন কৃপা তার স্বাদ দিয়ে ক্ষুধা জাগিয়ে চম্পট দেয় তখন কেবল গুরুই আশ্বাস দিতে পারেন যে হারানিধি ফিরে পাবেই পাবে—তবে আপ্রাণ সাধনা করলে তবেই—নৈলে নয়। সে-শূন্য মুহূর্তে এ-সাধনার শক্তি দিতেও আর কে আছে গুরু ছাড়া? আত্মসমর্পণ বলছ, কিন্তু করবে কার কাছে? ভগবান্ যার কাছে কথার কথা—একটা গুজব মাত্র—সে কেমন ক'রে তাঁকে বলবে—'তবৈবাহম্'? তাই এলেন গুরু তাঁর প্রতিনিধি—double—হয়ে। বললেন যে গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্টঃ—গুরুর প্রসন্ন হওয়া মানেই ইষ্টের প্রসন্ন হওয়া। গুরু কৃষ্ণ যে অভিন্ন এ তো আর মুখের কথা নয়—এইই হ'ল সত্যস্য সত্যম্। তাই গুরু যদি বাঘের মুখেও পাঠান যেতে হবে নির্ভয়ে। কারণ জেনো—তিনি তোমাকে বাঘের মুখে পাঠাবেন কেবল তখনই যখন বাঘের মুখ থেকে তুমি হাসতে হাসতে ফিরে আসতে পারবে।"

অসিত: কিন্তু সুরথদা, এ কথায় সে মানুষ বল পাবে কী ক'রে যার গুরুকরণই হয় নি?

সুরথ: কেন? সাধুরা তাহ'লে আছেন কী করতে? না ভাই, আমারও এ কথার কথা নয়। প্রেমল যেমন পেয়েছে গুরুর কৃপা এ-শর্মা তেমনি পেল সাধুদের কৃপা। ওঁর মতন পাই নি অবশ্য। জালায় যতটা ধরে ঘটিতে ততটা ধরবে কেমন ক'রে বলো? কিন্তু তবু ঘটি টইটুম্বুর হ'লেই তো ঘটির তৃষ্ণা মিটল—কেল্লা ফতে! ঠাকুর বলতেন না কি—শুঁড়ীখানায় ক'হাজার বোতল মদ আছে সে-খবরে আমার কাজ কি? আমি এক বোতলেই মাতাল হই—তার বেশি হাতিয়ে নিয়ে করব কী? আমাকে যে মাতাল করেছেন সাধুরা তাঁদের কৃপার সোমরসে দাদা—আর একবার তো নয় যে নাস্তিকদের কথা মেনে নেব—মনের ভুল ব'লে? আরে! সাক্ষাৎ পেয়েছি দেখেছি চেখেছি তবু কান দেব ঐ দেউলে কানা কালাদের কথায়? অবসাদে মনঃকষ্টে চোখের আলো কালো হ'য়ে গেছে—রাখাল মহারাজের তামাক সাজতেই বা গিরিশবাবুর পা টিপতেই ও মা, কী ফুরতি! প্রত্যক্ষ ভাই প্রত্যক্ষ—একেবারে জলজ্যান্ত যাকে বলে। কী? হাসছ বুঝি—বৈজ্ঞানিকের মুখে কৃপার কীর্তন শুনে! (চুপি চুপি) হয়েছে কি জানো? ঠাকুরের লীলা বিচিত্র তো?

তাই আমাকে নিয়ে তিনি এক নয়া খেল খেললেন—যেন বলতে চেয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে: "দেখ রে বেটারা, একবার নয়ন ভ'রে দেখ, আর শ্রবণ ভ'রে শোন ভূতের মুখে রামনাম—বৈজ্ঞানিকের মুখে কৃপার জয়গান।" (সুর নামিয়ে) কিন্তু এই কৃপা পাওয়ার ফল হ'ল সাংঘাতিক ভাই!—বুকে জেগে উঠল প্রার্থনা—যেন আপনা আপনি—অঘটন যাকে বলে। ধ্যানে বসতেই—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ভাই, কে যেন প্রার্থনা করিয়ে নিল, বলিয়ে নিল যা বলবার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি দুদিন আগে।

অসিত: কী বলিয়ে নিল দাদা? বলুন না, লক্ষ্মীটি!

সুরথ: তুমি যে মুখ-হল্‌সা—

অসিত: তবু বলুন। যে কৃপা পেয়েছে তার কি কৃপাল না হ'লে চলে?

সুরথ: হা হা হা! কী কথাই বলেছ ভাই! তোমারও দেখছি খাসা কথার বাঁধুনি আছে। নৈলে কি প্রেমল-যে-প্রেমল তোমাকে hate করতে চেয়েও না পেরে হার মানে? অতএব ব'লেই ফেলি দুর্গা ব'লে—যা থাকে কপালে। কী প্রার্থনা সে করিয়ে নিল জানো? "দেখ ঠাকুর, তুমি যখন অন্তর্যামী তখন জানোই জানো আমি কী চীজ। আর তুমিই বলেছ গীতায় যে, যার যেমন স্বভাব সে তেমনি ছন্দে চলবেই চলবে। কাজেই আমি—হাজারো কামনা বাসনার হাতের পুতুল—তোমার কাছে চাইবই তো এ ও তা সাত সতেরো। তাই শেষ কথা তোমাকে ব'লে রাখছি—once and for all ঠাকুর!—যে, আমি যা যা চাইব সবই যেন দিয়ে ফেলো না। তুমি জানো—কী কী আমার পক্ষে ভালো। আমি যদি জানতাম তবে তো জ্ঞানীই হতাম। কিন্তু আমি যে ছাপোষা অসহায় বৈজ্ঞানিক ঠাকুর! জ্ঞানের কী জানি বলো? তাই আমি তো চাইবই ভুল ক'রে কাঁটা, আগাছা, ধুলো কাদা, কত কী—এমন কি বিষও হয়ত চাইতে পারি অমৃত ভেবে। কিন্তু তুমি যেন তাই ব'লে এ-সব অবস্তু দিয়ে আমাকে দ-য়ে মজিও না! ঠাকুরও কল্পতরু তো—কথা শোনেন—আমার এ প্রার্থনা শুনবামাত্র বললেন: "বহুৎ আচ্ছা, তোকে দেব না রে যা চাইবি"...নৈলে আর কৃপা বলেছে কেন? হা হা হা!'

তিন

অসিতের সুরথদাকে কথা দিতেই হ'ল যে, ফিরবার পথে তাঁর ওখানে দুদিন থেকে তবে কাঠগুদামে নামবে। না দিলে প্রেমলের আশ্রমের জন্যে ডাণ্ডি পাওয়া সম্ভব নয়—বললেন তিনি সখেদে। একদিনের পরিচয়, কিন্তু অসিতের মনে হ'ল যেন কত দিনের চেনা! এ অভিজ্ঞতা ওর বিদেশেও হয়েছে প্রথম যৌবনে। কিন্তু সে ভোগজগতের লেনদেনে প্রাণশক্তির স্তরে। ওর বৈরাগী তৃষ্ণার খবর এমন এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছে কজন? মীরাবাইয়ের একটি গান ও গেয়েছিল সুরথদার ওখানে রওনা হবার আগে "ঘায়লকী গতি ঘায়ল জানে"। সুরথদা শুনে উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটি চরণ উদ্ধৃত করে :

পুষ্প দিয়ে মারো যারে জানে না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।

বলেছিলেন : "ভাই, ঠাকুরের বাঁশির ডাক শোনা বাণ খেয়ে পড়ার চেয়েও সাংঘাতিক, কেন না এ হ'ল যাকে বলে ধনেপ্রাণে মারা—সব থেকেও সব খোয়ানোর আনন্দ। তুমি যেন এই টানে দেউলে হওয়ার আনন্দের অধিকারী হ'তে পারো প্রেমলের মতন—এই প্রার্থনা করি।"

* * *

আলমোরার শৈলমালা কেমন যেন রিক্ত, শুষ্ক—ইংরাজীতে যাকে বলে gaunt; কিন্তু অসিত ডাণ্ডি চ'ড়ে গহন অরণ্যের মর্মভেদ করতে চলেছে—যেখানে লতা পাতা নানারঙা বন্য ফুলের আগুন লেগেছে। সঙ্কীর্ণ হাঁটা পথের রাস্তাকে প্রশস্ত করার কথা হচ্ছে। হ'লে যাত্রীর সুবিধা হবে—বাসও চলবে—অবধারিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মনোরম নির্জনতার অঙ্গহানিও হবেই হবে। সুরথদা বলেছিলেন : "সভ্যতার প্রসাদে আমরা অনেক কিছু লাভ করেছি মানতেই হবে ভাই, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক কিছুই হারিয়েছি বৈকি, বিশেষ ক'রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রেমলদের আশ্রমে তুমি পাবে অনাহত তপোবনের শান্তি সুষমা, কিন্তু বাস ট্রাক মোটর ভ্যান শারাবাঙ্ক এদের অভ্যাগম হ'তে না হ'তে সে গভীর নিস্তব্ধতার ভার্জিন রূপশ্রীও জখম হবেই হবে।

প্রেমলের আশ্রমের কাছে বনস্থলীর সৌন্দর্য আরো মঞ্জুল হ'য়ে উঠল। অদূরে হিমালয়ের তুষারাবৃত শৈলমালা অসিতের নয়নমনকে মুগ্ধ ক'রে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কানে বেজে ওঠে এ-নৈঃশব্দের গাঢ় শঙ্খ—ডাণ্ডি দাঁড় করিয়ে পকেট ডায়রিতে উদ্বেল চিত্তে গান বাঁধে :

উদার গম্ভীর তুষারমন্দির-শঙ্খে মুক্তিমৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে কে জাগে নৃত্যবিভঙ্গে।
গভীর ওম্-আনন্দে
উছলি' স্বপ্ন-অনন্তে
দাও চিরাশ্রয় হে শিব বরাভয়, তোমার আলোকিত অঙ্কে।
তোমার দুন্দুভি-তূর্য-
স্বননে ব্যোমে জ্বলে সূর্য
তোমার ইঙ্গিতে অপার সঙ্গীতে কুসুম বিকশিল পঙ্কে।
এসো চিরোজ্জ্বল কান্তি !
বিছায়ে তুঙ্গ প্রশান্তি
বাজাও শঙ্কর, তাল দীপঙ্কর অভয়-ডম্বরু-ডঙ্কে ॥

চার

অসিত ডাণ্ডি থেকে নামবার আগেই কানে এল ললিতার উল্লসিত অভ্যর্থনা :

"জয় গুরু জয়! বাপী! দেখ সে! সোনার টোপর মাথায় দিয়ে কে এলো! উলু উলু উলু!"

ওরা সবাই ছুটে এল মন্দির থেকে। প্রেমল অসিতকে আলিঙ্গন ক'রে বলল : "কাল এলে না কেন ?"

"সুরথদাকে কি জানো না ?"

"তা বটে, মনে ছিল না। গানের আসর হয়েছিল নিশ্চয়ই ?"

"শুধু গানের না, প্রাণেরও। কত কী-ই যে বললেন সুরথদা! কথা শুনে মনেই হয় না তিনি নামজাদা বৈজ্ঞানিক।"

ললিতা টুপ ক'রে বলল: কথা শুনে কি মনে হয় দাদা, যে তুমি জাত-বৈরাগী।

প্রণব বলল: কথা কাটাকাটি পরে হবে। ঐ ফের বৃষ্টি নামল ব'লে। চলো, ঘরে চলো। মা পথ চেয়ে আছেন।

অসিত: তাঁর শরীর এখন কেমন?

প্রেমল: সম্প্রতি পায়ের ব্যথাটা বেড়েছিল। তুমি আসবে খবর পাওয়ার পর থেকে কমেছে অনেকখানি।

ললিতা (হেসে): মা বললেন: "তোমার সঙ্গে এক ঝলক ধন্বন্তরি আলো নামার ফলেই ঘটেছে এ-অঘটন।"

প্রণব বললে: বেশি উচ্ছ্বাস ভালো নয়। তবে অসিতই বিপদে পড়বে। শুধু পায়ের ব্যথা কমলে কী হবে?

অসিত: কী হয়েছে তাঁর?

প্রণব: সে হাজারো উপসর্গ। মা পই পই ক'রে মানা করেছেন তোমাকে সে-সবের ফিরিস্তি দিতে।

পাঁচ

মন্দিরটির ডান পাশেই মা-র ঘর। শুধু একটি খাট ও কয়েকটি দেয়াল-কুলঙ্গি। একটি দোর দিয়ে বেরুলেই মন্দিরের সামনের আধঢাকা বারান্দা। বারান্দার সামনেই ঠাকুরঘর। অন্দরে কৃষ্ণরাধার বিগ্রহ। সদরে একটি বুদ্ধ মূর্তি। ব্যস। আর কিছুই নেই—ঘটা, সাজ কি চালচিত্র।

ওদিকে আর একটি দোর খুলে বেরুলে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দা—কাঁচের সার্সিওয়ালা জানলায় সুরক্ষিত। বারান্দা বেয়ে পরিক্রমা ক'রে ফিরে আসা যায় মন্দিরের বারান্দার অন্য দিকে—একটি অর্ধবৃত্ত শেষ হয়েছে বারান্দার চওড়া ব্যাসরেখার দুই প্রান্তে। এ বারান্দাটি আরো দুটি ছোট ঘরের প্রবেশপথ। একটি প্রেমলের শোবার ঘর, অন্যটি—বসার। মাটিতে কম্বলাসন, সামনে একটি একহাত উঁচু, দেড়গজ লম্বা কাঠের চৌকি। মাটিতে আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে এই চৌকিতেই সে লেখে বা পড়ে। অসিত রইল প্রেমলের শোবার ঘরে। প্রেমল রাতে শোয় মা-র ঘরে মাটিতে এক খড়ের তোষকের উপর কম্বল

পেতে। প্রণবের কুটির অদূরে, ললিতার কুটিরের পাশেই। সবচেয়ে আরাম ললিতার ডেরায়। অন্য কোনো ঘরেই কার্পেট নেই। তাই ললিতা চেয়েছিল অসিতের জন্যে নিজের ঘরটা ছেড়ে দিতে। কিন্তু প্রেমল রাজী হয় নি, বলেছিল: 'না, ও দুদিনের জন্যে এসেছে, যতটা পারে মা-র কাছাকাছি থাকুক। আসবাবের বিলাস ও ঢের ভোগ করেছে, করবেও পরে। এখানে ও একটু ভোগ ক'রে যাক যা আর কোথাও পাবে না—দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে শান্তিপ্রসাদের জলযোগ।'

বলা হয় নি, কিন্তু বলাই চাই যে, মা-র ঘরে আর একটি বাসিন্দা এক কুকুর। শুধু বাসিন্দা নয় মা-র বিছানায়ই শোয় মার কোলের কাছে।

ছয়

অসিত এর আগে তিন চারটি আশ্রমে গিয়ে পাঁচ সাত দশদিন ক'রে কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথাও এত আরাম পায় নি। বাইরের দিকে অবশ্য আরাম বলতে যা বোঝায় তার উপকরণ কিছুই ছিল না—না আসবাব পত্রের জৌলুষ, না ভোজনবিলাস। কেবল একটিমাত্র আসর বসত খাওয়ার সঙ্গতে—সকালবেলা কফির সঙ্গে ব্রাউন ব্রেড ও মাখনযোগে নানা আলোচনা। সকালে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে হত এই কথালাপ প্রাতরাশের পরিবেশে। তারপর প্রণব যেত তার ঘরে পাহাড়ীদের ওষুধ দিতে, আর ললিতা রাঁধত রান্নাঘরে। প্রেমলকে আশ্রমের অনেককিছুরই দেখাশুনা করতে হ'ত। দুপুরবেলা আহারের পর অসিতের একটি ব্যসন ছিল—ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা। ভাদ্রমাসে সাড়ে সাত হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ে কনকনে শীত—হাড়ে কাঁপুনি ধরে। দুপুরবেলাও অসিত দিব্যি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিত। ভাগ্যে অসিত নিজের নরম কম্বল ও বালাপোষ এনেছিল। প্রেমল প্রণব এমনকি ললিতাও পাহাড়ীদের রুক্ষ কম্বলই গায়ে দিত। কেবল মা-র জন্য ছিল লেপের ব্যবস্থা। ভারতের সনাতন আদর্শ ওরা সবাই পুরোপুরিই মেনে নিয়েছিল—বিলাসবর্জন, মিতাহার তথা কৃচ্ছ্রসাধনা। কৃচ্ছ্রের জন্যেই কৃচ্ছ্র নয় অবশ্য—বিলাসের উপকরণ কমানোই ছিল লক্ষ্য। প্রেমল প্রায়ই মহাকবি গেটের নানা উক্তি উদ্ধৃত করতে ভালোবাসত। থেকে থেকে ঘোষণা করত তাঁর একটি অনুজ্ঞা: "You must do without—you

must do without." সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বলত—বিলাসে ওর আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, বিলাসীদের ইচ্ছাশক্তি—will-power প্রায়ই দুর্বল হ'য়ে পড়ে। বলত অসিতকে ঘড়ি ঘড়ি: "অনেক ইদানীন্তনই আমাদের শাস্ত্রের নানা নিষেধকে বাড়াবাড়ি বলেন সৌখিন 'সহজিয়া' হ'তে চেয়ে। ভাবটা এই যে, যেহেতু বাইরের সব কিছুই বাহ্য, সেহেতু বিলাসে ভয় কি? যথেচ্ছ ভোজনে দোষ কি? নরম বিছানায় শুলে ক্ষতি কি?...ইত্যাদি। যারা সংসারী তাদের পক্ষে ক্ষতি নেই, মানি। কিন্তু যারা সাধক তাদের পক্ষে উদার হ'য়ে দেহের সব আরামকেই বিধাতার দান ব'লে প্রচার করার বিপদ আছে। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। নিজের অন্তরের তল পর্যন্ত খুঁজে দেখতে হবে—কোথাও সুখের আসক্তি ঘুপটি মেরে ব'সে আছে কি না। সাধনার ফলে যে আত্মপ্রসাদ জ'মে ওঠে তার স্নিগ্ধতা ও সৌম্যতা—serenity—বজায় রাখা যায় না যদি আসক্তির মোহ সাধকের মনকে পেয়ে বসে।" এ-ধরনের স্কুলমাষ্টারি কথা অসিতের ভালোই লাগত—যদিও সে "কঠোর" করতে অভ্যস্ত ছিল না ব'লে মাঝে মাঝে গৃহসুখের অভাব বোধ করত বৈকি। কিন্তু যখন দেখত বিলাসিনী ললিতাও হাসিমুখে "কঠোর" করছে—ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, কাপড় কাচছে, দুবেলা রাঁধছে—তখন লজ্জা পেত ভাবতে যে, আরাম বিনা তার এখনো বেশ একটু কষ্ট হয়।

কিন্তু "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"বলত প্রেমল প্রায়ই সুরথদার প্রতিধ্বনি ক'রে। অসিত দেখল—কথাটা সত্য—অক্ষরে অক্ষরে। তাই কয়েকদিন আশ্রমের রুক্ষতা—austerity—তার বেশ গা-সওয়া মতন হ'য়ে এল। এমনকি শক্ত বিছানায় শুয়েও আর মনেই হ'ত না কলকাতার মোটা নরম ডান্‌লপ্‌ তোষকের কথা। কেবল খুব ভোরে উঠতে হ'ত এই যা। কিন্তু না উঠেই বা করে কি! ভোরবেলার পূজায় যোগ না দিলে মান থাকে না যে।

কিন্তু ওর সব ক্ষতিপূরণ করেছিল প্রেমল ও ললিতার সঙ্গ। দিনের পর দিন হু হু ক'রে কেটে যেত ওদের সাহচর্যে। মা-র সঙ্গও ওকে প্রেরণা দিত বৈকি। কিন্তু তাঁর শরীর সে সময়ে খুব দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল ব'লে সন্ধ্যাবেলায় ভজনের সময়ে ছাড়াও তাঁর স্নেহস্পর্শ পেত না।

আর এক চিরসরস—"তাজা-ব-তাজা"—আনন্দ ছিল—বিকেলবেলা ঘণ্টাখানেক প্রেমল প্রণব ও ললিতার সঙ্গে নানা আলোচনা। তারপরই

যেত সবাই মিলে মা-র ঘরে। মা কখনো বলতেন নিজের সাধনার এক আধটা উপলব্ধির কথা। কিন্তু বেশি কথা বলার মতন তাঁর অবস্থা ছিল না সে সময়ে। তাই কাশীর মতন তাঁর সঙ্গে হাসিগল্প জ'মে উঠত না।

আলমোরার প্রাকৃতিক পরিবেশ ওর তেমন মন টানে নি। সমুদ্র বা পাহাড় ওকে সময় সময়ে মুগ্ধ করলেও ও আশৈশব ভালোবেসে এসেছে নদীকে—আর নদীর নদী হ'ল গঙ্গা। গঙ্গাকে সাথী পেলে ওর মন যেমন ভ'রে উঠত হিমালয় ওকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারত না।

কিন্তু এটুকু বুঝতে ওকে বেগ পেতে হয় নি যে, আলমোরাই প্রেমলের আপন পীঠস্থান—শুধু গুরুস্থান ব'লেই নয়, হিমালয়ের স্তব্ধ মহিমা তার মনকে শান্তিতে ভ'রে দিত। অসিতের হিমালয় সম্বন্ধে ধ্রুপদ ধামারটি রোজই একবার ক'রে শুনতে চাইত সকালে উঠেই :

উদার গম্ভীর তুষার-মঞ্জীর-শঙ্খে মুক্তিমৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে কে জাগে নৃত্যবিভঙ্গে !

ওদের সাধনার আবহ ঘন হ'য়ে উঠত প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে। মা পাশের ঘরে বিছানা থেকে শুনতেন ওদের আরতি ও স্তব। স্তব করত সকলেই। অসিতও যোগ দিত। আরতি করত একা প্রেমল। প্রণব—শুধু ধ্যান।

অসিতকে প্রতি সন্ধ্যায় আরতির পরে হয় নামগান না হয় ভজন কীর্তন করতে হ'ত। প্রেমল শুধু কীর্তন করত : বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। চণ্ডীদাসের 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব' গানটি গাইতে গাইতে তার গোরা মুখ লাল হয়ে উঠত আবেগে। সে সুগায়ক ছিল না, কিন্তু তার ভাব ও আন্তরিকতায় সবাই মুগ্ধ হ'ত। অসিতের কয়েকটি গান ছিল তার বিশেষ প্রিয় : "মেরে দিলমে দিলকা প্যারা হৈ মগর মিলতা নহী," "গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী।" "দীন দয়াল গোপাল হরি" 'চাকর রাখোজী"...ইত্যাদি। কিন্তু ওর সবচেয়ে ভালো লাগত অসিতের রচিত বৃন্দাবনের লীলাকীর্তন। এ-গানটি শুনতে শুনতে ওর মুখচোখের ভাবই বদলে যেত। বলত ওকে প্রায়ই যে, ভারতবর্ষে এসে অবধি এমন গান আর শোনেনি কোনোদিন।

সাত

মা সচরাচর বিছানায় ব'সেই জপ করতেন। জন্মাষ্টমীর আগের দিন তিনি একটু সুস্থ বোধ করতে ললিতাকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন—অসিতের সঙ্গে প্রেমলের আলোচনা তর্কাতর্কি শুনতে তাঁর সাধ হয়েছে। অসিত খুশী হ'য়ে সটাং গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলল: "খুব ভালো লাগল মা শুনে"—ব'লেই প্রেমলকে: "কেবল সাবধান প্রেমল! মা শ্রোতা হ'লে I have got to rise to the occasion!"

প্রণব (হেসে): অমন কথা বোলো না। ও তোমাকে আস্ত রাখবে না তাহ'লে।

ললিতা: ঈ-স্! দাদা আমার কি সোজা তার্কিক না কি—গোল্‌ডস্মিথ বলেছিলেন না সেই বিখ্যাত পাদ্রীর কথা: For even though vanquished he could argue still:

প্রণব (পিঠ পিঠ): তাহ'লে আমরা হব পাড়াগাঁয়ে বেচারীদের দল—yokel rustics—যারা সে পাদ্রী সাহেবকে দেখে থ হ'য়ে যেত। আহা, তার পরের শ্লোকটা কী—সেই And still they gazed—

প্রেমল (পাদপূরণ করে):

> And still they gazed and still the wonder grew:
>
> That one small head could carry all he knew.

ললিতা: আস্পর্ধা! আমি rustic—পাড়াগেঁয়ে? যে ফ্রেঞ্চের ফুলঝুরি কেটে চলতে পারে—বলতে পারে: De l'audace, et encore de l'audace, et toujours de l'audace:*

মা: গুরুর সামনে এমন যা মুখে আসে তাই বলে?

প্রেমল (হেসে): একটু ফ্রেঞ্চ প'ড়েই ধরাকে সরা! কিন্তু হে গরবিণী! ফ্রেঞ্চের দিন গত জেনো। এ হ'ল রাশিয়ার যুগ। যদি রাশিয়ানে বুকনি ঝাড়তে পারতে তাহ'লেও বা বুঝতাম।

---

* চাই চোখ-ধাঁধানো বীর্য—বীর্য—বীর্য—বীর্য।

—(ফরাসী বিপ্লবে Danton-এর দম্ভোক্তি)

মা : না। সংস্কৃত সংস্কৃত। দেবভাষাই শিখলি না রে মেয়ে, দেবভূমিতে জ'ন্মে। আর দেখ্ তো হুলালকে, মার মার কাট কাট দেশ থেকে এসে কেমন রপ্ত করল বাঁশির ভাষা—'মুরলীরস তরলীকৃত'—তারপর কী যেন ?

প্রেমল : মুরলীরস-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনম্।
মম খেলতু মদ-চেতসি মধুরাধরমমৃতম্॥

ললিতা (রাগতঃ) : তা গুরু যদি না শেখায় শিষ্যা কী করবে শুনি, মুখ বুঁজে থাকা ছাড়া !

প্রণব (অসিতকে) : দেখছ তো মুখ বুঁজে থাকার নমুনা ?

মা : হয়েছে হয়েছে, এবার ভালো কথা হোক। (ললিতাকে) তোর গুরুকে কফি দিবি কখন ?

ললিতা : আগে অতিথিকে দিয়ে তবে তো ? দেবভাষা দেবভাষা করছ—জানো না মুনি ঋষিরা বলতেন অতিথি সাক্ষাৎ দেবতা—যেখানে গুরু মাত্র দেবদূত।

প্রেমল : ধন্যবাদ মিষ্টভাষিনী যে অপদেবতা বলো নি।

ললিতা : ছি ছি ! ঠাট্টা ক'রেও এমন কথা বলে ! তুমি যে কী বাপী ! (ব'লেই ছুটে এসে ওর পায়ে মাথা রাখে)

প্রেমল (হেসে) : বা রে বা ! উনি ঠাট্টা করতে পারেন—শুধু গুরু বেচারীই—ও কী ! কান্না ! এবার "ছি ছি" বলার পালা কার শুনি ? (ললিতার মাথা বুকে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে) পাগলামি করে না। ওঠো (মাথায় গাল রেখে গাঢ় কণ্ঠে) : ওঠো মা, তোমার কথায় কি আমি কিছু মনে করতে পারি ?

ললিতা (চোখ মুছে উঠে ব'সে জোর করে মুখে হাসি টেনে অসিতের দিকে চেয়ে) : কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি ভাই ! তোমারই একটা গজল আছে না—ঐসা হো হি জাতা হৈ ? (প্রসঙ্গান্তর আনতে) বলো এখন ঐ 'মুরলীরসে-'র মানেটা কী।

অসিত : "কৃষ্ণকর্ণামৃতের"ও শ্লোকটি আমি প্রায়ই গাই বাংলায়ও (সুর ক'রে)

মুনিরও মানসকমল কোমলি' দল মেলে যার মুরলী-স্বনে,
তার সুমধুর অধরামৃত করুক লীলা এ-মুগ্ধ মনে।

* * *

অসিত: জানো প্রেমল, কাল রাতে আমি কী পড়ছিলাম? স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন—সুরথদা বইটি আমাকে দিয়েছেন উপহার।

মা: কোন্ ব্রহ্মানন্দ? রাখাল মহারাজ?

অসিত: হ্যাঁ মা। তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে একটি শ্লোক আওড়ে মন্তব্য করেছেন: ঠিক কথা, এই-ই তো চাই—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবঃ বাহ্যপূজাঽধমাধমা॥

ললিতা: মানে কী বলো দাদা, নৈলে আমি আজ থেকে রান্না বান্না রেখে শুধুই সংস্কৃত পড়ব—তখন বুঝবে ঠেলা ক্ষিদের চোটে।

অসিত (হেসে): এর মানে হ'ল—সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সর্বত্র ব্রহ্মকে দেখা, তারপরে মধ্যম ধ্যান ধারণা, তারপরে জপ বা স্তব—অধম। সবশেষে বাহ্যপূজা—অধমাধম।

ললিতা: কী বলবে এবার বাপী? এ তো আর শিষ্যা নয় যে দাবড়ে দেবে! সাক্ষাৎ মহানির্বাণ তন্ত্র—শিব আওড়েছেন পার্বতীর কাছে, তাই না?

প্রেমল (ভ্রূকুটি ক'রে): ব্রহ্মানন্দজী এ-শ্লোকটির নজির না দিলেও পারতেন। (অসিতের দিকে তাকিয়ে) তোমাকে বোধহয় কাশীতে একবার বলেছিলাম—আমরা নানা সনাতন নজির দিয়ে প্রায়ই ভুল করি—ভুল বুঝে।

অসিত: ভুল বুঝে?

প্রেমল: তাছাড়া কী? কোনো প্রাচীন বিধিবিধানের ঠিক বিচার করতে হ'লে দেশকাল পাত্রের কথা ভাবতে হবে—অর্থাৎ কোথায় বলা হয়েছিল (দেশে), কখন বলা হয়েছিল (কাল) আর কাকে বলা হয়েছিল কোন্ ক্ষেত্রে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যুদ্ধ করতে, উদ্ধবকে বললেন অকিঞ্চন হ'তে। শঙ্করাচার্য একবার বললেন—ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং—(ললিতাকে) অর্থাৎ গুরু শিষ্য মিত্রবন্ধু কেউ নেই শুধু আছি আমি সোহং সাক্ষাৎ শিব যিনি আনন্দকে জেনে আনন্দী হয়েছেন। তারপরই "গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং"—তুমি কাশীতে গেয়েছিলে মনে আছে? কী? না সব থেকেও তার কিছুই নেই যার মন গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়ে না। বেশি দূরে যাবার দরকার কি? পরমহংসদেব নানা পণ্ডিত ও প্রচারককে বলেছিলেন সাধনা না ক'রে লেকচার দেওয়া বৃথা। তাঁর নানা শিষ্যকেও বলেছিলেন যো সো ক'রে

আগে কালীদর্শন করা চাই—তারপর ভিখিরি-বিদায়ের পালা। কিন্তু বিবেকানন্দকে কী বলেছিলেন মনে আছে কি: "সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে থাকতে চাস কি রে? এ তো হীনবুদ্ধির কথা। আমি চাই তুই মস্ত অশ্বত্থ গাছের মতন বহু ত্রিতাপে তাপিত জীবকে আশ্রয় দিবি অভয় দিবি, তোর ছায়ায় এসে তারা জুড়োবে।"

মা: ঠিক কথা। কিন্তু অসিত এসবই জানে। তুমি ওর আসল প্রশ্নের উত্তর দিলে কই? ওকে বলো না কেন বাহ্যপূজায় কত কি তুমি পেয়েছ—ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণের কথা।

প্রেমল (সভয়ে): চুপ চুপ, মা! অসিতকে কি তুমি চেন না? ও রেডিয়ো মারফত হাটে বাজারে ছড়িয়ে দেবে এ-খবর হরির লুটের মতন।

মা (হেসে): না না। ও বলবে না। ওকে তুমি বলতে পারো, কারণ ও এখন বুঝবে—তোমায় বলছি আমি।

প্রেমল (অসিতের মুখের দিকে তাকিয়েই ললিতার দিকে ফিরে): তুমি বলো।

ললিতা (খিলখিল ক'রে হেসে): বাপী! তুমি যে কী fuss করো ঘড়ি ঘড়ি! ঠাকুরের লীলা কি তাঁর ভক্তকেও বলতে মানা? দাদাও তো তোমার আমার মতনই ঠাকুরের কৃপা চায়। আচ্ছা, শোনো ভাই, আমিই বলছি। আমরা মন্দিরে ঠাকুরকে ভোগ দিই তো? হালুয়া ভোগ? একবার হ'ল কি রোজকার মতন ভোগ ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে রেখে আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ধ্যানে বসেছি এমন সময়ে বাপী বলল: "চলো তো দেখি—ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করেছেন কি না।" মা কিছু বললেন না। শুধু মুচকে হাসলেন ওঁর বিছানায় ব'সেই। আমরা গিয়ে দেখি—(চোখ বড় বড় ক'রে) বলব কি ভাই, দেখি কি—থালায় সাজানো গোল হালুয়াভোগের এক ধার থেকে এক থাবল হালুয়া স্রেফ উঠে গেছে। শুধু তাই নয় বাকি হালুয়ার গায়ে স্পষ্ট ছোট্ট আঙুলের ছাপ! যেন বালগোপাল—

প্রেমল: হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না।

অসিতের গায়ের মধ্যে শির শির ক'রে ওঠে! ও পড়েছিল নানা বইয়েই ঠাকুরের এ-ভাবে প্রসাদ গ্রহণ করার কথা। গিরিশ ঘোষকে এক বৈষ্ণব বলেছিলেন গিরিশবাবু বিশ্বাস করেন নি যে, এও তাঁর নরলীলার একটি ছন্দ হ'তে পারে। এমন আরো কত ছন্দের কথা পড়েছে ও কত সাধুর জীবনীতেই,

কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে নি, ভেবে এসেছে এ-সব হয় গল্প, কল্পনা—কিম্বা তিনি তিল পরিমাণ সত্যকে তাল ক'রে বাড়িয়ে রটানো। হঠাৎ খুশী হ'য়ে উঠে প্রেমলের পিঠে চাপড় মেরে বলে: "তবু তুমি কেবলই—বুদ্ধের মতন—ঠাকুরের কৃপাকে অবিশ্বাস করবে!"

প্রেমল: আমি কৃপাকে অবিশ্বাস করেছি কবে? আমি কি তোমাকে বৃন্দাবনে বার বারই বলি নি—আমি কী ভাবে বার বারই গুরুর প্রসাদে ঠাকুরের করুণার স্বাদ পেয়েছি? অবিশ্বাসী আসলে তুমিই ভাই যে কিছুতেই গুরুর মধ্যেকার দেবতাকে মান দিতে চাও না।

অসিত: আমাকে তুমি কেন ক্রমাগতই ভুল বুঝে বেঁকে বসো—বলতে পারো? আমিও কি তোমাকে বলি নি বারবারই যে, আমি শুধু যে সাধুর আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের করুণার স্বাদ পেয়েছি তাই নয়, শিশুর সংস্পর্শে, সমুদ্রের দৃশ্যে, রামধনুর রঙে, কবির কাব্যে, গুণীর গানে আরো কত কিছুর মাধ্যমে পেয়েছি ভাগবতী কৃপার আভাষ। শুধু, গুরুর নানা মানবিক খুঁৎ আমার চোখে পড়ে এই অপরাধে তুমি আমার সম্বন্ধে রায় দিলে যে, আমি প্রকৃতিতে অবিশ্বাসী—বলবে: গুরুবাদকে পুরোপুরি মানতে না পারলে ভগবানের কৃপাকে অমান্য করা হ'ল?

প্রণব: এখানে আমি তোমার সঙ্গে একমত অসিত! কারণ তোমার আমার মতন ভক্তিমার্গীর নামে এ অপবাদ রটানো খুবই অন্যায় যে, আমরা কৃপাকে আদৌ মানতেই চাই না।

অসিত: ধন্যবাদ প্রণব। কারণ আমার বহু চ্যুতি ত্রুটি সত্ত্বেও আমি নিজেকে ভক্তিমার্গী ব'লেই সনাক্ত করি। ভাই বুদ্ধের দীপ্ত ব্যক্তিরূপ আমার মন টানলেও আমি বহু চেষ্টা ক'রেও তাঁকে ভালোবাসতে পারি নি—যেমন ধরো পেরেছি খ্রীষ্টদেবকে। বলতে কি, যে-বুদ্ধ গুরু ও করুণাকে কবিকল্পনা বলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁকে প্রেমল যে কেমন ক'রে এমন বিষম ভক্তি করতে পারল—আমি ঠিক বুঝতে পারি না—ধাঁধাঁ লাগে।

প্রেমল: অসিত, বুদ্ধ একবার বলেছিলেন যে, বনে অগুন্তি গাছে যত পাতা আছে তাদের সংখ্যা আর কারুর হাতে কয়েকটি গাছের পাতার সংখ্যার মধ্যে যে-অনুপাত তাঁর অনুক্ত প্রজ্ঞা ও উক্ত জ্ঞানবানীর মধ্যেও সেই অনুপাত ধরা যেতে পারে।

অসিত: তুমি আমাকে সত্যি অবাক করলে এবার। আমি বুদ্ধের অনুক্ত প্রজ্ঞার সম্বন্ধে কোনো রায়ই দিতে চাই নি। যে গুপ্ত জ্ঞানের তহবিল সম্বন্ধে কিছুই জানি না তার মহিমাকে নাকচ করব কোন স্পর্ধায় বলো? আমার আপত্তি শুধু তাঁর এই জজিয়তি রায়-এ যে, বাইরের কোনো agency—ভাগবতী শক্তি, গুরুশক্তি বা কৃপাশক্তি—মানুষকে তার তন্‌হা বা বাসনার উর্ধ্বে ওঠার বল জোগাতে পারে না। আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলব কি?—আমি বলতে চাইছি যে, বুদ্ধের 'তপস্যাকেই মুক্তির একমাত্র পথ' বলাটা আমার কাছে গাজোয়ারি—dogmatic—মনে হয়, কেন না করুণাও যে আমাদের মুক্তির দিকে এগিয়ে দিতে পারে এ-সত্যকে অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া যে সব অবতারকল্প মহাপুরুষ ভাগবতী করুণা আছে এ-অঙ্গীকার করেছেন তাঁরা কেউই বুদ্ধের চেয়ে কম জ্ঞানী তপস্বী নন।

প্রেমল: কিন্তু এইমাত্র তোমাকে কী বললাম—স্রেফ ভুলে গেলে? বুদ্ধ করুণাবাদ বা গুরুবাদকে নামঞ্জুর করেছেন কবে কার কাছে ও কোথায়—দেখতে হবে না? আমার মনে হয় যে, তাঁর সময়ে শাস্ত্রের নানা বুলি আওড়ে চলতি লোকাচারকে মানতে মানতে মানুষ তামসিক হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই তিনি তাদের ধম্‌কে ফেরাতে চেয়েছিলেন ক্লৈব্য ছেড়ে বীর্য উদ্যমের দিকে। কিন্তু বুদ্ধের কথা ঠিক হোক বা ভুল হোক তার সঙ্গে কৃপা সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কী সম্বন্ধ শুনি? মানে, যে-সব উপলব্ধি আমার বার বার হয়েছে গুরুর প্রসাদে তারা আর কারুর সমর্থন বা অস্বীকারের তোয়াক্কা রাখবে কেন? আমি কি তোমাকে বলি নি যে, আমি গুরুসেবার মধ্যে দিয়ে বার বারই ইষ্টের কৃপা পেয়েছি?

প্রণব: কৃপা বলতে তুমি ঠিক কী বোঝো বলবে একটু খুলে?

প্রেমল: সুরথদাও একবার আমাকে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন। তাতে আমি বলেছিলাম যে, আমাদের 'আমি'কে ভগবানের অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দিলে যে বিস্ফোরণ হয় তারই নাম কৃপা।

প্রণব: উপমাটি শুনতে চমৎকার, মানি। কেবল জিজ্ঞাসা করি—আমরা এই আগুনে নিজেদের আহুতি দিতে যাব কেন? জগতের কী লাভ হবে যদি, ধরো, ভগবানের অগ্নিযজ্ঞে তুমি আমি বা অসিত আহুতি দিয়ে পুড়ে স্রেফ ছাই হ'য়ে যাই?

প্রেমল: উত্তরে আমি বলব—প্রতি গ্রহ সূর্যের অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে আহুতি দেবার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের তাপসমৃদ্ধি বাড়তে বাধ্য। কোনো যথার্থ আত্মাহুতিই ব্যর্থ হ'তে পারে না।

ললিতা (আহ্লাদে হাততালি দিয়ে): তুমি চমৎকার কথা বলো বাপী—দুর্দান্ত বাগ্মী! সাধে কি দাদা বেচারি ফি বার তর্কে হেরে যায়?

প্রেমল: আর তুমিও কিছু কম দুষ্টু নও বৎসে! একঢিলে দুপাখী মারায় তোমার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু আমি অসিতের কাছে বেশি বাগ্মী হ'লে কি আর রক্ষে আছে? ধরো যদি কোথাও আমার কোনো ভুলচুক হয় ও আমার সেই কথাটাকে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে নাকি? (অসিতকে) দোহাই তোমার অসিত, আমার কথাবার্তা তোমার ডেঞ্জেরাস ডায়রিতে টুকে নিও না খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতে। আমাদের আশ্রমে আমরা কোনো খবরের কাগজ আসতে দিই না লক্ষ্য ক'রে থাকবে হয়ত?

অসিত: করেছি। কিন্তু কেন দাও না?

মা: কারণ খবরের কাগজে মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়—বিশেষ ক'রে সাধকদের।

অসিত: মানি মা। কিন্তু—মানে—জগতে কোথায় কী ঘটছে সাধকেরা জানবেই না আদৌ?

প্রেমল (হেসে): ভাই, এ-জানা না জানার 'পরে কি বেশি কিছু নির্ভর করে—তোমার আমার মতন নিরীহ বেচারী মানুষের ক্ষেত্রে? যাঁরা দিকপাল, মঞ্চে মঞ্চে বক্তৃতা ক'রে ও মীটিং কনফারেন্স ডেকে জগতের চেহারাই বদলে দিচ্ছেন তাঁদের হয়ত বিশ্বের খবর জানার দরকার—বলতে পারি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি অকুতোভয়েই যে, এ-বিশ্বজ্ঞতারও সাড়ে পনেরো আনা না হোক—অন্ততঃ বারো আনা স্রেফ মায়া—make-believe. তুমি কালই তারি একটি গান গাইছিলে না?—

এম্‌নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কী কুহক ক'রে—
গতায়াতের পথ আছে—তবু মীন পালাতে নারে!

(হেসে) আর মহামায়ার এ-কুহকের রূপ রাগ সুর তাল অগুন্তি। তাঁর একটি প্রধান কারসাজি হ'ল নিত্যবস্তুকে আবছা রেখে অনিত্য বস্তুকে নিত্যের মান দেওয়া—তাই সারা জগতেই দেখতে পাবে মানুষ এই ঠিকে ভুল করছে—হাল্কাকে ভাবছে ভারি, ভারিকে হাল্কা।

মা: ঠিক বলেছ দুলাল। তাই তো তুচ্ছকে নিয়ে মাতামাতি ক'রে ক্রমাগত আমাদের মনের এত "বাজে খরচ" হয়—পরমহংসদেবের ভাষায়। ফল যা হবার: আমরা যতই সভ্যভব্য হই ততই বাড়তে থাকে মনের প্রাণের এই বাজে খরচ। (অসিতকে) পরিণামে কী হয় দেখতেই তো পাচ্ছ—দেউলে অবস্থা: বাইরে যত enlightened হই অন্তরে ততই আঁধার ছেয়ে আসে। নয় কি বাবা? বলো তো, বুকে হাত দিয়ে।

প্রণব: একেবারে bull's eye মা! অক্ষরে অক্ষরে। একটি মস্ত প্রমাণ—খবরের কাগজের দুর্দান্ত প্রতিপত্তি শুধু অনিত্য বস্তু ফেরি ক'রে। আর এই trash ফেরি করতে কাগজওয়ালারা কী প্রাণান্ত পরিশ্রম করেন ভাবো একবার! এ-অনিত্যবস্তু আজকাল ক্রমশ রূপ নিচ্ছে নেশার দিকে—চমকের, উত্তেজনার, বিভীষিকার। তাই হাবিজাবি খবরের চেয়েও বেশি আদর আজকাল sensational খবরের যাতে মন শিউরে ওঠে। কাজেই মনও গ'ড়ে উঠছে এই সবেরই গ্রাহক হ'য়ে—নিত্যবস্তুকে ভুলে অনিত্যকে ফাঁপিয়ে। ফল কী হয় দেখতেই তো পাচ্ছ—যে-জ্ঞানে আত্মার মুক্তি, প্রাণের শান্তি, মনের শুদ্ধি—যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োঽন্যজ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে—যা জানলে কৃতকৃত্য হয়—সেই জ্ঞানই থেকে যায় অজ্ঞাত, অখ্যাত অবজ্ঞাত। (থেমে) প্রত্যহ আমরা কত সময় নষ্ট করি খবরের কাগজ পড়তে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই, শোনো। গত যুদ্ধে, ১৯১৭ সালে, একবার আমি কুরুক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে স্বদেশে ফিরে আসি। এর ঠিক আগে পনেরো দিন কুরুক্ষেত্রে একটিও খবরের কাগজ হাতে আসে নি। লণ্ডনে ফিরে দেখি—আমার মা আমার জন্যে গোছা গোছা Times সাজিয়ে রেখেছেন পনেরো দিনের—ফিরে আমি পর পর পড়ব ব'লে। কিন্তু লণ্ডনে ফিরে পুরোনো সংখ্যাগুলির একটিও পড়ি নি আমি। ঠিক যেমন মানুষ মৃতদেহ ছুঁতে চায় না তেমনি আমার মন চায় নি এ-শবদেহের মত বাসি মাল ছুঁতে। কিন্তু ভেবে দেখ—এ-পনেরো দিন লণ্ডনে থাকলেও অন্ততঃ পনেরো ঘণ্টা ধ'রে পড়তামই তো এসব খবর যা দুদিনেই ম'রে ভূত হ'য়ে যায়? এরই নাম আমি দিতে চাই—অনিত্যের ভাঁওতা—যা আমাদের কোনো কাজেই আসে না, অথচ—হায় হায়!—আমরা ভাবি—বিষম জরুরি—না জানলেই নয়! এর নাম মায়া নয় তো কী—বলবে আমাকে? যদি খবরের কাগজওয়ালারা সত্যিকার খবর পরিবেশণ করত—অর্থাৎ নিত্যবস্তুর—তাহ'লে

কি সেসব পুষ্টিকর পথ্য পাতে পড়তে না পড়তে বাসি হ'য়ে যেত এভাবে?

(মৃদু হেসে) কিন্তু তারা কোত্থেকে সত্যিকার খবর দেবে বলো—যাদের মেলে না হাটে বাজারে, মীটিং কনফারেন্সে, হুল্লোড়ের রঙ্গমঞ্চে? সে-সংবাদ পেতে হলে কেবল নিজের মধ্যে ডুব দিতে হবে: তুমিই কাল গাইছিলে না কি—"ডুব দে রে মন, কালী বলে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে?"

(থেমে) কিন্তু এই যে নিরন্তর অনিত্যবস্তুর খবরাখবর নিয়ে মাতামাতি, এর শোচনীয়তার একটু আভাষ পাই আমরা—যখন বাজে কাজ ছেড়ে কাজের কাজী হ'য়ে সাধনা করতে বসি। কারণ তখন দেখতে পাই—যে, এই সব অজস্র খবরের হাজারো হিজিবিজিই আমাদের "হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে" কিলবিল করতে থাকে—মাইক্রোবের ঝাড়ের মতন। আর আমরা ডুকরে কেঁদে উঠি: "ধ্যান করতে বসি, ধ্যান হয় না; জপে মন বসে না; প্রার্থনায় হৃদয় সাড়া দেয় না, ফলে সাধনা হ'য়ে যায় খান খান!" না হ'য়ে পারে? সকালবেলা খবরের কাগজ আসতে একটু দেরি হয়েছে তো মন উচাটন!—কী হ'ল, কাগজ আসতে কেন এত দেরি হচ্ছে!! তারপর যেই কাগজ আসা অমনি লাফিয়ে উঠে ডুবে যাওয়া—কে কোথায় কাকে খুন করেছে, কে কাকে ঠকিয়েছে, কোথায় কত বোমা পড়েছে, কতগুলি মেয়ে গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে···এই নিত্যবস্তুকে হেনস্থা ক'রে অনিত্য বস্তুকে নিয়ে মেতে ওঠার পাগলামি আজকের মানুষের প্রায় স্বধর্ম হ'য়ে দাঁড়ায় নি কি? কালই রাতে ললিতাকে পড়াচ্ছিলাম পাস্কালের একটি ভারি চমৎকার কথা: "Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou par un autre tour de folie, de n'être pas fou."

ললিতা (ছেলেমানুষি বিজ্ঞ ভঙ্গিতে): সত্যিই ভারি চমৎকার মা! তুমি দেবভাষা জানলেও এ-ভাষার তো খবর রাখো না তাই শোনো বলি: এর মানে—আমরা এম্নিই জন্ম-পাগল যে কেউ যদি পাগল না হয় তাকে আরো পাগল ভাবি। কোথায় এক গল্প পড়েছিলাম—এক অন্ধদের দেশে এক চক্ষুষ্মান্ মানুষ এসে কী বিপদেই পড়েছিলেন!—তিনি জগৎ সম্বন্ধে যাই বলেন না কেন, কানারা হেসে উড়িয়ে দেয় প্রলাপ ব'লে।

প্রণব (হেসে): বার্নার্ড শ-র সম্বন্ধে এক গল্প আছে। তিনি গিয়েছিলেন এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তাঁর চোখ পরীক্ষা ক'রে বলে—চোখ

normal নির্দোষ। শ তো রেগেই আগুন: "কী! আমি অসামান্য শ!—চোখ কি না নর্মাল?" ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "রাগ করবেন না স্যর! নর্মাল চোখের মতন abnormal অঘটন ঘটে কালে ভদ্রে—লাখে না মিলয় এক।" তখন শ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন—"বাঁচা গেল" ব'লে।

(সকলের কলহাস্য)

প্রেমল (হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে): কিন্তু আসলে এ হাসির কথা নয় অসিত, কান্নারই কথা—বিশেষ ক'রে তোমার আমার মতন সত্যসাধকের পক্ষে। কারণ অনিত্যের চাপে নিত্য বস্তুর যে শ্বাসকষ্ট সুরু হয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ চোখের সামনে। ধর্ম—যা ধারণ করে—হয়ে দাঁড়াল আজ abnormal, চোরাবালি! ফলে মানুষ দল বেঁধে ছুটেছে শক্তিমদে মাতাল হ'য়ে—কোথায়, কেউ জানে না। তার জপমন্ত্র আজ কী? না, "গতি গতি গতিই সার—লক্ষ্য না-ই বা থাকল কী যায় আসে?" আর এই সব বুলিবাজদেরই নামডাক রটছে—জ্ঞানী। জ্ঞানীই বটে, যাঁরা রটাচ্ছেন যে, জীবন হচ্ছে একটা "tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing!"

অসিত: তোমার খেদ আমি বুঝি প্রেমল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এই সব জ্ঞানীরা প্রশ্ন করতে পারেন: "এ জীবনের যে কোনো একটা লক্ষ্য বা purpose আছে তা আগে থাকতে a priori ধ'রে নেব কেন?"

প্রেমল: খতিয়ে ফের সেই প্রাচীন তর্ক তুলছ—অন্ধকারে দিশারি কে?—আত্মার আস্তিক বিশ্বাস, না মনের পোষ্যপুত্র বুদ্ধি যার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ?

অসিত: রোসো রোসো। বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য হ'ল এই অন্ধকার আছে—মানি, কারণ প্রত্যক্ষ। বুদ্ধিও সসীম, বটেই তো—সে হাৎড়াচ্ছেও বটে। কিন্তু তবু সে আছে, আমাদের কাজেও লাগে প্রতিপদেই। কিন্তু এই আত্মাটি কে? কোথায় থাকেন তিনি? তাঁকে মেনে নেবই বা কেমন ক'রে? শুধু অন্ধ বিশ্বাসের এজাহারে?

প্রেমল: এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে: না মানতে চাও কে তোমাকে সাধছে মানতে? ঘুরে মরো না সাধ মিটিয়ে অন্ধকারে ঠোকর খেয়ে কান্নাকাটি ক'রে। কেবল একটা কথা মনে রেখো: যাঁরা বিশ্বাসের এজাহারে আত্মা বা ভগবানকে প্রথমদিকে মেনে নেন তাঁরা মানবার সময় অন্ধ মতন থাকলেও দেখতে দেখতে যে-দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন—মনের বস্তুবিচারী চক্ষুষ্মান্ বুদ্ধি তার পাত্তাই

পায় না, বিচার করবে কি ? তাই বিশ্বাসীরা প্রথমটা না জেনে মেনে নিলেও—শেষে অন্ধ বিশ্বাসের পথেই পৌঁছল পরা প্রজ্ঞায় ওরফে পরা ভক্তিতে। শুধু এই প্রজ্ঞা ও ভক্তির প্রসাদেই মানুষ অমৃত হ'য়ে উঠতে পারে উপনিষদের মৈত্রেয়ী যার দিশা চেয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে : যে এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অর্থাৎ তাঁকে জানলে চিনলে তবেই অমৃত হওয়া যায়।

অসিত : কিন্তু তাঁকে জানবার চিনবার পথটা ঠিক কী ? জীবন ও বিধাতা দুই-ই রহস্যময়। নানা মুনির নানা মত—উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়তে হয় যে !

প্রেমল : উদ্‌ভ্রান্ত হবে কেন ? সব তত্ত্বজিজ্ঞাসুকেই এক পথে চালাতে চাও কেন ? সত্যার্থীরা কেন চলবেন একই ধারায়—গড্ডালিকা-প্রবাহে ? প্রতি মুনির পথেই চলুন না সে মুনির সমান ধর্মীরা। এমন তো নয় যে যদু মুনির পথে চললে মধু মুনি তোমাকে শাপ দিয়ে ভস্ম ক'রে দেবেন ?

প্রণব : কিন্তু প্রেমল, য়ুরোপে ঠিক এই শাস্তিই দেন কি চার্চের মুনিরা—ইনকুইমিশনের পুড়িয়ে মারা—বেত্রাঘাত—

প্রেমল (হাত তুলে) : জানি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকেই বা আদর্শ ধরতে বাধা কি ? ভারতে কি কোনো দিনও বিরুদ্ধ মতের পথিককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ? তাছাড়া ধর্মবিশ্বাস এখন সাবালক হয়েছে সারা জগতেই—যে যে পথে ইচ্ছে চলতে পারে না কি আজ ? এই-ই তো চাই : ভক্তিসাধনার পথে চলুক ভক্তিপন্থীরা, জ্ঞানের পথে জ্ঞানমার্গীরা, কর্মের পথে কর্মযোগীরা। জীবনে যে বৈচিত্র্যের শেষ নেই—সবাই মানে। এ-ও তো আনন্দেরই কথা।—জীবন রহস্যময় ? মানি কিন্তু সব জলের মতন সাফ হ'লে মন রূপ Othello-র occupation is gone বলতে হ'ত না কি ? আমরা চাই কী ? সন্ধানী হ'য়ে আনন্দ শান্তি সার্থকতার নিটোল তৃপ্তি—যেখানে সব সংশয় সংঘর্ষ দ্বন্দ্বের অবসান—এই না ? হাজারো পথে হাজারো ছন্দে হাজারো লক্ষ্যের পানে অন্তহীন আনন্দমণি কুড়োতে কুড়োতে চলুক না প্রত্যেকেই—এতে কার আপত্তি শুনি ?

অসিত (সদীর্ঘশ্বাসে) : কিন্তু এ-হাজারো পথে মণি কই ভাই ? মরুপথে শুধুই যে ধুলো বালি কাঁকর।

প্রেমল (অসিতের কাঁধে চাপড় দিয়ে) : এ ভাই তোমার রাগের কথা। অন্ততঃ তোমার অভিজ্ঞতার এজাহার এ নয়—যাকে মা উপাধি দিয়েছেন

'আনন্দময় শিশু', ললিতা—হাসিখুসির ফুলঝুরি। কিন্তু শুধু তোমার আমার মতন কয়েকটি ভাগ্যবান্ ছাড়া আর সবাই যে মনমরা হ'য়ে মরুপথে চলে এমন কথাও বলা চলে না। আমি বলতে চাই—এ-দিন দুনিয়ায় অগুন্তি মানুষ অঢেল দুঃখকষ্ট পেলেও দিনে দিনে সুখ আনন্দও কিছু কম কুড়োয় না। আমাদের দেহ মন প্রাণ এমনি ধাতুতে গড়া যে জগৎজোড়া দারিদ্র্য বা অবিচারের পেষণ সত্ত্বেও অন্ততঃ শৈশবে কৈশোরে ও যৌবনে আমরা প্রায় সবকিছু থেকেই কমবেশি আনন্দ কুড়োতে কুড়োতে পথ চলি—দুচারজন জন্ম-রুগ্ন বা পঙ্গু ভিক্ষুক ছাড়া। অন্তরে যে-আলোর দিশা পাই তার ডাকে সাড়া না দিয়ে অনেক সময়েই হয়ত নানা প্রলোভনে মজি—ঢালুপথে গড়িয়ে পৌছই অন্ধকারের রসাতলে, কিন্তু তবু এই গড়ানোর মধ্যে দিয়েও কিছু না কিছু রস পাইই পাই—ওঠাপড়ার রস, দুঃখকষ্টের রস, দ্বন্দ্বসংঘর্ষের রস—এমন কি হাহুতাশের মঞ্চে গ'ড়ে তুলি ড্রামার আনন্দ-উত্তেজনা। জ্ঞানীরা বলেন শুধু সেই পথে চলতে—যে-পথে মরু পার হওয়ার সময়েও মেলে ভগবানের কিঞ্চিৎ কৃপার ছোঁওয়া যার প্রসাদে ধুলোবালি কাঁকরের মধ্যেও মুক্তামণি ঝিকমিকিয়ে ওঠে তাঁর রূপের ঝিলিকে। এ-বস্তুবিশ্বে আমাদের তিনি পাঠিয়েছেন এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে—যেখানে ধু ধু শূন্যতার হাহাকার—সেখানেও পূর্ণতার আভাস পেয়ে ধন্য হ'য়ে ঘোষণা করতে: 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—আমি দেখেছি দেখেছি সেই সূর্যপ্রভ দেবদেবকে যিনি আমাদের অজ্ঞানের যবনিকার ওপারে থেকে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন। হ্যাঁ—লুকোচুরি ছাড়া আর কী—তাঁর এই ডেকে সরে গিয়ে শেষে ধরা দেওয়া—যাতে ক'রে পদে পদে তাঁকে পেতে পেতে ফস্কে গিয়ে হারিয়ে ফিরে পাওয়ার আনন্দ দশগুণ হ'য়ে ওঠে। এরই তো নাম লীলা। তুমিই সেদিন গাইছিলে একটি চমৎকার গান—মনে নেই?—রবীন্দ্রনাথের—

তোমায় নতুন ক'রে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন—
ও মোর ভালোবাসার ধন!

ললিতা: তুমি যে বাক্যবিশারদ—কে না মানবে বাপী? কেবল কথা মানুষকে পেয়ে বসলে এক বিপদ হয় প্রায়ই: কথার ঢেউয়ে খেই হারিয়ে যায়। তাই সবই হ'ল, কেবল হায় হায়, দাদার আমার আসল প্রশ্নটারই উত্তর মিলল না?

প্রেমল: You are impossible! আমি তাহ'লে এতক্ষণ কী বললাম শুনি?

ললিতা: বললে তো এক গঙ্গা কথা, কেবল বাহ্যপূজা কেন অধমাধম নয়—বুঝিয়ে বললে কই?

প্রেমল: বাঃ! বললাম না—নানা পথের মধ্যে বাহ্যপূজাও একটা পথ—অর্থাৎ তাদের কাছে—এপথে চলা যাদের স্বধর্ম?

ললিতা: উঁহুঃ। Not convincing।

প্রেমল: তাহ'লে শোনো বলি—to carry conviction এই বস্তুজগতে ঠাকুর আমাদের পাঠিয়েছেন এক নতুন খেলা খেলতে। এ জগত ছাড়া আরো কত সূক্ষ্ম বিচিত্র জগত আছে যেখানে তাঁর হাজারো রূপ রস ভাবকে বরণ ক'রে কৃতকৃত্য হওয়া যায়। মনে রেখো—সর্বত্র তিনি ব্যাপ্ত হ'লেও—(তেন সর্বমিদং ততম্)—প্রতি পথের বাঁকেই তিনি উঁকি দেন এক এক নতুন রূপে। এখন, আমাদের বস্তুবিশ্বে—material world-এ—তিনিই চাইলেন যেন আরো এক অসম্ভবকে সম্ভব করতে: অর্থাৎ যেখানে মনে হয় চেতনার চিহ্নলেশও নেই, সবই অনড় অচল জড়—সেখানেও তিনি আমাদের ডাক দিলেন সেই স্থাণুর বাইরের স্থূল আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর দেখা-পাওয়ার সাধনা করতে—যেন তাঁকে বলা চ্যালেঞ্জ ক'রে: "খুব পর্দার পর পর্দা বুনেছিলে ঠাকুর! এমন মোক্ষম লুকিয়েছিলে যে, ভেবেছিলে তোমার হদিশ পাব না, না? কিন্তু স্বভাবে আমি যে নাছোড়বান্দা ঠাকুর—তাই মরুভূমিতেও খুঁড়তে খুঁড়তে দেখা পেয়েছি অমৃতহ্রদের। কারণ এর আগেও বারবারই ঠেকে শিখেছি তো যে, তুমি ক্রমাগত লুকিয়ে থেকে আমাদের দুয়ো দিতে চাও। আমিও তাই শাসাচ্ছি তোমায়: "বহুৎ আচ্ছা, দেখি কেমন ক'রে তুমি লুকিয়ে থাকো।" অসিত ভাই, গাও তো ফের তোমার সেই কৃপার গানটি: ঐ গানটিকে তুমি তো নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়েছ, প্রেমের অভিমানের পথেই যেন কেমন ক'রে পেয়ে গেছ প্রেমময়ীর দেখা—যদিও হয়ত আধা-অজান্তে।

অসিত গান ধরে:

(মাগো) কৃপা তোমার আছে জানা
চাইলে পরেই যত "না না"!
(তোমার) চাঁদের পানে হাত বাড়ালেই মেঘ-আড়ালের কতই মানা!

(তোমার) ছলনা আর সইব না তো, রইব না আর ধৈর্য ধ'রে :
(এবার) ডাকব তোমায় সাঁঝ সকালে, জাগরণে, ঘুমের ঘোরে।
(মাগো) যতই আমি তোমায় ডাকি,
বলবে তুমি : "কাছেই থাকি",
(শুধু) ছুঁতে গেলেই যাও পালিয়ে, ধরতে গেলেই নেই নিশানা!

(তুমি) কাছেই আছ—মানবো না আর, কাছে থেকেও রইলে দূরে,
(আমি) শুনব না আর তোমার কথা, সাধব তোমায় সকল সুরে।
(দেখি) লুকিয়ে থাকো কেমন ক রে
দেশে থেকেও দেশান্তরে,
(এবার) জ্বালবো আলো চাওয়ার দীপে চিনতে তোমার ঠিক ঠিকানা।

গাইতে গাইতে ঘরের হাওয়াও যেন বদ্‌লে যায়। মা ভাবসমাধিতে স্থির হ'য়ে ব'সে। মুখে দিব্য হাসি। দু চোখের কোণ থেকে শুধু দুটি সরু ধারা গাল বেয়ে নামছে। একটু বাদে মা বললেন ভাবমুখে : "তুমি পারলে কই লুকিয়ে থাকতে ঠাকুর? পারবে কেমন ক'রে বলো যদি আমরা…সব ছেড়ে বলি—চাই না এসব হাবি জাবি—চাই শুধু তোমাকেই?…তখন… তখন কী হয়?…না, এই হাবি-জাবিকে আর হাবিজাবি মনে হয় না—মনে হয় চিন্ময়। আমি যে দেখেছি ঠাকুর তুমি—তুমি সবই তুমি—যেদিকে চাই তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। আহা, চোখের ঠুলি ওদের খুলে দাও না ঠাকুর ওদের দেখিয়ে দাও একবারটি। ওরা দেখতে পায় না ব'লেই এত তর্ক করে। হাসি পায় ঠাকুর, ওদের পণ্ডিতি যুক্তি শুনে। যে-তুমি প্রতি অণুর বুকে জ্বলছ সেই তোমাকে কি না ওরা বলে—নেই নেই নেই! হায় হায় হায়! বিজ্ঞের জাহাজেরা এর নাম দেয় বিজ্ঞে! ঠাকুর ঠাকুর!"

বলতে বলতে তাঁর চোখ থেকে ধারাসারে বর্ষা নামল। তার পরেই পূর্ণ সমাধি…

ওরা সবাই উঠে সন্তর্পণে তাঁর খাটের কিনারায় মাথা রেখে প্রণাম করে।

আট

একটু পরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হলেন। তারপরে অসিতের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন: "বাবা, এসব কথা মুনি ঋষিরা গোপন রাখেন, তার একটা কারণ সত্যকে বিশ্বাস না করার প্রত্যবায় আছে।"

অসিত প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাকালো।

মা: একটু খুলে বলি তোমাকে আজ, কারণ লগ্ন এসে গেছে। ব্যাপার কি জানো বাবা? সত্যকে অবিশ্বাস করলে তাতে ক'রে সত্যের মান হানি হয় না, অবিশ্বাসীদের ঠাট্টা তামাশায় সত্যদর্শীরও কোনো ক্ষতিই হয় না। ক্ষতি হয় কেবল অবিশ্বাসীদেরই। সত্যদর্শীরা যে বলতে চান না তাদের ভগবদ্দর্শনের কথা তার একটা কারণ এইই। কিন্তু তোমাকে আজ বলতে পারি কারণ তুমি আসলে অবিশ্বাসী নও এ আমি দেখতে পেয়েছি। আর কখন জানো? যখন তুমি গাইছিলে শেষের অন্তরাটি যে তুমি "সাধবে মা-কে সকল সুরে।" সেই সময়ে ঐ যে দেয়ালে মা ভবানীর ছবি ঝুলছে না?—তাঁর হৃদয় থেকে একটি স্নিগ্ধ ক্ষীণ আলো এসে তোমার কপালে ঠেকল। তারপরে কি আর না মেনে পারি যে, তুমি অধিকারী হয়েছ ডাকার ব্যাকুলতার গুণে? তাই শোনো। সব কথা বলার সময় হবে না, পারবও না আমি গুছিয়ে সব বলতে। তবে সংক্ষেপে যা বলব তাতেই হয়ত কাজ হবে।

তোমাদের তর্ক উঠেছিল বাহ্যপূজা নিয়ে। পূজা কার? না, ঠাকুরের বিগ্রহের। এ-বিগ্রহ কেমন ক'রে এল? না, ঠাকুর নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো না কোনো সময়ে। কেন দিয়েছিলেন? না, নরলীলা তিনি ভালোবাসেন ব'লে। নৈলে কি গীতায় গান বেজে উঠত যে, যুগে যুগে তিনি জন্ম নেন? গীতায় অবশ্য তিনি এ-লীলার রহস্য বেশি খুলে বলেননি। শুধু এইটুকু ব'লেই থেমে গিয়েছিলেন যে, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন আর ধর্মের নতুন ক'রে পত্তন করতেই তিনি বার বার অবতীর্ণ হন। একথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে যে "মানুষী তনু"-তে তিনি আমাদের কাছে

আসতে চান সে-কাঠামোকে পূজো করব না কেন? সাধনার অর্থ—তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে নিজের স্বেচ্ছাচারী অভিমানকে জয় করা তো? তাঁর নরলীলাকে মেনে নিলে এ-অভিমান জয় করা কিছুটা সহজ হ'য়ে আসে। কারণ সবচেয়ে বড় সাধনা হ'ল প্রেমের সাধনা, আর মানুষ সবচেয়ে সহজে ভালোবাসতে পারে মানুষকে। তাই অর্জুন বলেছিলেন ঠাকুরকে তাঁর মানব-মূর্তিতেই দর্শন দিতে—বিশ্বরূপ দেখিয়ে বিহ্বল না করতে। (থেমে) গৃহবিগ্রহ পূজো করা প্রবৃত্তি পদ্ধতি প্রাণহীন লোকাচার নয়—ভালোবেসে বিগ্রহের মধ্যে তাঁকে ডাকলে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এ কথার কথা নয় বাবা, বহু সাধক প্রত্যক্ষ দেখেছেন—প্রেমের ডাকে বিগ্রহের মধ্যে ঠাকুর নামেন—যেমন মীরার বিগ্রহে নামতেন। নামেন কেন? না, ভক্তের সঙ্গে তিনি মানুষ মানুষ খেলা খেলতে ভালোবাসেন ব'লে। (থেমে) তবে মূর্তিপূজাও সকলের জন্যে নয় বাবা। গীতায় একটি লাখ কথার এক কথা বলেছেন ঠাকুর—নম্র হ'য়ে মেনে নিলে আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল ঢের ক মে যেত। কথাটা হ'ল—প্রত্যেকের প্রথমে খুঁজে পেতে হবে তার স্বধর্ম—তারপরে চলতে হবে সেই পথে। প্রচারকেরা "সবাইকে এক গোয়ালে মাথা মুড়োতে হবে" হেঁকেই এত মুস্কিল হয়েছে। কারণ ঠাকুর আমার নানা সুরেই তাঁর বাঁশি বাজান—যে যে-সুরে সাড়া দেয় সে সেই সুরেই নিজের প্রাণের তার মিলিয়ে নেয়। এতে আপত্তি কেন? ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈচিত্র্যে এ-ও কি মানতে নারাজ তুমি? (নমস্কার ক'রে) তিনি কী কাণ্ড ক'রে চলেছেন যুগ যুগ ধ'রে—একবার ভাবো তো! শুধু কোটি কোটি বিশাল সূর্য চন্দ্র তারা নীহারিকাই তো নয়—অণুর মধ্যে নেমেও কী কীর্তি করছেন বলো তো—যে-অণুদের তাল পাকিয়ে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড গ ড়ে উঠেছে! একটু ভাবতে না ভাবতে তাক লেগে যায় শুধু মহতো মহীয়ানের কথা ভেবেই নয়, অণোর অণীয়ান্‌ও কি কম আশ্চর্য? প্রণবের কাছে শুনেছি—সিকি ইঞ্চি জায়গায়ও নাকি লক্ষ লক্ষ জীবাণু জন্মাচ্ছে, হৈ চৈ করছে, মরছে, আবার জন্মাচ্ছে কোটি কোটি বৎসর ধ'রে। অথচ প্রতি জীবাণুরই একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। তাহ'লে ঠাকুরের কত মূর্তি দাঁড়ালো গোনাগুন্তিতে ভাবো তো—কারণ প্রতি জীবাণু তো তাঁরি এক একটি রূপ। তাঁর বিশ্বরূপে তিনি যখন অর্জুনকে তাঁর এই মহারূপের একটুখানি দেখিয়েছিলেন, তখন অতবড় বীর হ'য়েও সে ভয়ে কম্পমান

হয় নি কি? তবু আমরা তাঁর দুচারটে লীলাখেলা দেখে লীলাকে মেনে লীলাময়কেই বাতিল ক'রে দিয়ে বাহাদুর বনতে চাই বাবা। এরই নাম পণ্ডিতমূর্খ। নয় কি?.

অসিত: কিন্তু এত রূপের ঘটা কেন মা?

মা (হেসে): তাঁর ভালো লাগছে ব'লে। মর্জি। লীলা। কত নাম দেওয়া যায়। কিন্তু নাম লেবেলের কি সত্যি দরকার আছে বাবা? তার চেয়ে ঢের ভালো নয় কি—তিনি যে-রূপেই আসেন সে-রূপেই তাঁকে অভ্যর্থনা করা 'এসো" ব'লে? এরই তো নাম অর্চনা। এতে দোষের কী থাকতে পারে। যাকে ভালোবেসেছি বা বাসতে চাই তাকে ডেকে আদর করা, পূজো করাই কি প্রেমের ধর্ম নয় বাবা? একঘেয়ে জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা এই সাদা কথাটি বুঝতে চান না ব'লেই মূর্তিকে গাল দেন—বলেন মূর্তি পূজা করলে তাঁকে ছোট করা হয়।

শোনো কথা। আমি ছেলেবেলায় এক সময় কয়েকটি ব্রাহ্ম সখীর পাল্লায় প'ড়ে তাদের মতন বিজ্ঞ স্বরে বলা স্বরু করেছিলাম—মাটির বিগ্রহ নিষ্প্রাণ, স্বতরাং ভগবান্ হ'তেই পারে না। এই সময় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর প্রেমবিহ্বল উদ্দণ্ড নৃত্য দেখে অভিভূত হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রতিমা পূজার কথা। তিনি হেসে বলেছিলেন যে তিনিও একসময়ে ব্রাহ্মদের প্রভাবে প'ড়ে ভাবতেন প্রতিমা বিগ্রহ মূর্তি সব কুসংস্কার। একদিন হ'ল কি, শান্তিপুরে তাঁদের গৃহবিগ্রহ শ্যামস্বন্দর তাঁকে বললেন: "ওরে একবার আয় না, দেখ্ আমি কেমন সেজেছি।" তাতে তিনি বললেন: "ধেৎ! তোমাকে যে আমি বিশ্বাসই করি না!" তাতে ঠাকুর বলেন: "নাই বা বিশ্বাস করলি রে, দেখতে ক্ষতি কি?" শুনে দেখতে গিয়ে প্রভুপাদের আর চোখের জল থামে না।

বাবা! ভক্তি যারা চায় তারা সবচেয়ে সহজে ভক্তির সাধনা করতে পারে কোনো না কোনো মূর্তির মধ্যে দিয়েই। এ-মূর্তিকে বাইরে রেখে তার 'পরে দেবত্বের আরোপ করলে প্রেমের ডাকে সে-মূর্তি জীবন্ত হ'য়ে ওঠে এ একটি অকাট্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশেই ঘটেছে এ-অঘটন—বুদ্ধিমন্তদের গাজোয়ারি অস্বীকার একে কী ক'রে কাটবে? সত্যকে কি গায়ের জোরে "তুমি নেই" বললেই সে হার মেনে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় বাবা?

দুলাল আমাকে কঠোপনিষদ প'ড়ে শোনাচ্ছিল সেদিন। তাতে এক-জায়গায় আছে—যা এখানে তাই সেখানে যা সেখানে তাই এখানে। মূর্তিকে তিনি সেখানে মঞ্জুর করেছেন ব'লেই এখানে আমরা তাঁর মানপত্র পেয়ে মূর্তির চালচিত্র গড়তে পেরেছি। গীতা কী শুধুই ফাঁকা আওয়াজ করেছে—যখন ঠাকুর অর্জুনকে বললেন—তাঁকে যে যে ভাবেই ডাকুক না কেন তাকে তিনি ঠিক সেই ভাবে, সেই রূপেই দর্শন দেন, তার অর্থ—পাতা ফুল ফল সবই গ্রহণ করেন? আর গ্রহণ করা মানেই তো বাহ্য পূজার পাঠ দেওয়া। গীতার শেষ অধ্যায়েও তিনি এই কথাই বলেন নি কি যে আমাকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে হবে জ্ঞানীর মতন, প্রাণ দিয়ে বরণ করতে হবে ভক্তের মতন, দেহ দিয়ে বরণ করতে হবে যাজ্ঞিক বা পূজারীর মতন? দুলাল প্রায়ই বলে—the proof of the pudding lies in the eating: বিগ্রহকে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে ফুলচন্দন সাজিয়ে পূজো করলে যদি ঠাকুর তার মধ্যে জেগে উঠে দর্শন দেন তবে তার পরে আর কী বলবার থাকতে পারে বলো তো?

ললিতা (উৎফুল্ল হ'য়ে): ও মা! তুমি তো সামান্যি মেয়ে নও! চোরা-গোপ্তা বাপীর কাছে লেকচার দেওয়ার দীক্ষা নিলে কবে?

প্রেমল: কী বাজে বকছ? চুপ করো।

ললিতা: চুপ করব কেন? (অসিতকে) দেখ তো দাদা, তুমি তো কত পেল্লায় সাধু সাধ্বী গুরু গুর্বীর সঙ্গে মিশেছ। কত অঘটনই না দেখেছ স্বচক্ষে। কিন্তু এমন জুড়ি আর দেখেছ কি যে, হিন্দু মা হ'ল সাহেব ছেলের গুরু—মৌনব্রতের, আর সাহেব ছেলে হ'ল হিন্দু মার গুরু—কথা ব'লে ফাটিয়ে দেওয়ার ব্রতে? সত্যি মা তুমি যে বোলচালে আজ বাক্যবিশারদ বাপীকেও হারিয়ে দিলে এজন্যে তোমাকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম! (গিয়ে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে) ওর বড় অহঙ্কার হয়েছিল—ওর মতন কথা বলতে কেউ পারে না—gift of the gab-এ ওর জুড়ি নেই।

(প্রণবকে): তোমাকে বলিনি সেদিন—অতিদর্পে হতা লঙ্কা? (হাততালি দিয়ে) কী বাপী? বলিনি সেদিন—আমাকে ঘড়ি ঘড়ি ধমকে দমিয়ে দিলে সাজা পাবেই পাবে? তাই মা সরলা অবলা হ'য়েও দাদাকে বুঝিয়ে দিলেন দুকথায় যা তুমি দুশো কথায়ও বোঝাতে পারো নি।

মা (ধমকে): তুই থামবি? আমি কথায় দুলালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

পারি কখনো? না জানি বেদ বেদান্ত, না তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ উপনিষদ দর্শন ব্রহ্মসূক্ত। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—আমার দৌড় ঐ গীতা ভাগবত অবধি। তাই তো তুলাল আমাকে বেদ বেদান্ত পড়াচ্ছে—গুরু মুখ্যু হ'লে মান থাকবে না ব'লে।

প্রেমল (উঠে প্রণাম ক'রে): শেম মা! শেম! ঠাট্টা ক'রেও এমন বাণ হানতে নেই। আমি তোমাকে পড়াচ্ছি? ছি ছি! কাল থেকে সব পড়ানো বন্ধ।

মা (সস্নেহে): সত্যি, তোর কাছে আমি কি কম শিখেছি রে! তোর নিষ্ঠা, ভক্তি, বিদ্যা বুদ্ধি, সবার ওপর এমন নির্মল চরিত্র—বাল-ব্রহ্মচারী—

প্রেমল: মা আমি চ'লে যাব কিন্তু সুরথদার কাছে। থাকবে তুমি তোমার আশ্রম নিয়ে!

মা: না রে না! ঠাট্টা বুঝিস না?

প্রেমল: না মা, গুরুকে নিয়ে ঠাট্টা—অন্ততঃ আমি পারি না। মনু কি বলেন নি "নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ"—শিষ্যের আসন সর্বদাই গুরুর আসনের নিচে পাততে হবে?

প্রণব (বাধা দিয়ে): ভাই, এখন এ-তর্ক ধামা চাপা দাও—গুরু বড় না শিষ্য বড়। মন্দিরে ঠাকুর অপেক্ষা করছেন, আরতির সময় হ'ল।

মা: ঠিক ঠিক! যা—আজ পঞ্চপ্রদীপে আরতি করিস।

ললিতা: কেন মা জন্মাষ্টমী তো কাল!

মা: হোক। ঠাকুর চাইলেন আজ পঞ্চ প্রদীপের আরতি।

অসিত (চম্‌কে): কখন চাইলেন মা?

মা (একটু চুপ ক'রে থেকে): তোমার গান শেষ হবার একটু পরেই। আর বললেন কোত্থেকে জানো বাবা? বিগ্রহ থেকেই। তাই তো আমি বলি বাবা যে, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'লে তার মধ্য দিয়ে ঠাকুর যখন লীলা করেন সে-লীলা কোনো নিরাকার লীলার চেয়েই কম যায় না। (প্রেমলকে) তুই বল্ না ওকে শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে কী দেখেছিলি; না—বল্ তুই। আমি বলছি—বলার দরকার আছে। ও বুঝবে এখন।

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে): যাক অগত্যা। শোনো।

গত বৎসর আমি গিয়েছিলাম দক্ষিণে কয়েকটি মন্দিরে ধ্যান করতে—মা-ই

বললেন যেতে। হ্যাঁ আর গিয়েছিলাম তিরুভন্নামালাইয়ে রমণ আশ্রমে।

অসিত: রমণ মহর্ষিকে তুমি দেখেছ? আহা, আমার তাঁকে যে কী ভালো লেগেছিল!

ললিতা: তুমিও দেখেছ? ঐ দেখ মা, (কাঁদুনী সুরে) কেবল আমিই দেখতে পেলাম না।

মা: পাবি রে পাবি—সময় হ'লেই। কিন্তু দেরি হ'য়ে যাচ্ছে দুলাল, বলো শ্রীরঙ্গমের কথা।

প্রেমল (অসিতকে): সে কী বলব ভাই? ভাষায় তার বর্ণনা হয় না, হ'তে পারে না। তবু বলি যতটা পারি—মা যখন বলতে বলছেন!

মন্দিরে শ্রীনাথকে প্রণাম করতে গিয়ে মন্দিরে ঢুকেই কেমন যেন ভাব লেগে গেল। ঠিক এরকম অনুভূতি আমার আগে কখনো হয়নি কোনো মন্দিরে বা তীর্থে। তারপর বিহ্বল হ'য়ে বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গ হ'তেই ঘোর মতন এল। দেখলাম···সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য···(গাঢ়কণ্ঠে) সে সে এক বিশাল সমুদ্র···কিন্তু জলের তো নয়—শুধু আলো আর আলোর ঢেউ। অথচ তরল আলো, ঠিক জল নয়। ভাগবতে আছে না নারায়ণ জলে শয়ান ছিলেন যোগনিদ্রায়। সেই জলই হয়ত···কে জানে? জল থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। "আপো নারায়ণঃ" বলেছেন মুনিরা। যাক।

তারপর···তারপর···কালের প্রবাহ যেন থেমে গেল। সে কী নিশ্চুপ—কী বলব ভাই? আমার মধ্যেও সব স্থির···শুধু শান্তি আর শান্তি। বাইরের সমুদ্র আর ভিতরের সমুদ্র একাকার হ'য়ে গেছে শান্তিরসে। এমন সময়ে হঠাৎ সে-আলো নীল রঙে রঙিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে প্রতি নীল ঢেউয়ের চূড়ায় এক একটি শ্বেত পদ্ম ফুটে উঠল···যেদিকে চাই সেদিকেই শ্বেত পদ্ম। আর প্রতিটি পদ্মে অভ্যুদয় হ'ল কৃষ্ণ রাধার যুগল মূর্তি—রাধা হাসছেন হাসি কৃষ্ণ বাজাচ্ছেন বাঁশি। অসিত! অসিত! কী বলব সে কেমন হাসি, কেমন বাঁশি!···আকাশে বাতাসে কাঁপছে শুধু ঠাকুরের বাঁশির ঝঙ্কার···আর তার সঙ্গে দুলছে ঠাকুরানীর হাসির আলো···আর···আর··· বাঁশির প্রতি রেশে আনন্দ, হাসির প্রতি দোলে স্বপ্নের মিড়—কিসের স্বপ্ন কে বলবে?···সে···সে···" কথার রেশ ওর আপনা আপনিই মিলিয়ে যায়···

* * * *

সকলে উঠে একে একে প্রণাম করে মাকে। তারপর মন্দিরে গিয়ে বসল ওরা চারজন। মা ব'সে রইলেন তাঁর খাটে একা···ভাবস্থ।···

নয়

অসিত মন্দিরে বসল প্রেমল ও ললিতার মাঝখানে। প্রণব বসল ওদের পিছনে।

প্রথমে ললিতা ও প্রেমল গাইল :

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী কিশোরী গলার হার।
কিশোরী-ভজন কিশোরী-পূজন কিশোরী চরণ সার।
মন মাঝে রাধা বনে রাজে রাধা রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা রাধাময় হ'ল আঁখি।
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধানাথ নাম পেয়েছি অনেক আশে।
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার,
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার।
কহিতে কহিতে রসিক নাগর তিতল নয়নজলে
চণ্ডিদাস কহে নবীন কিশোরী বন্ধুরে করিল কোলে।

গান শুনতে শুনতে অসিতের বুকে একটু একটু ক'রে ভক্তি জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে মন্দিরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব। কিছু দেখতে পায় না তবু কী এক অনির্ণেয় শক্তিতে ওর মন ছেয়ে যায়। মনে হয় প্রথম যে মন্দিরের সার্থকতা আছে। প্রেমলের একটি কথা মনে প'ড়ে যায়—বলত ও প্রায়ই বৃন্দাবনে—যে, যে মন্দিরের বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে সে মন্দিরে ঠাকুরের করুণা উচ্ছল হ'য়ে ওঠেই ওঠে—যারাই শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে আসে তারাই কিছু না কিছু পাথেয় পায় সে-করুণা থেকে। প্রেমল উপমা দিয়েছিল বৈদ্যুতিক ডাইনামোর—করুণার এই উৎসযন্ত্র থেকে যেন আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে—কেবল যারা অবিশ্বাসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে

(insulated) থাকে তারা পায় না এ বিদ্যুতের স্পর্শ। "এইজন্যই"—বলেছিল প্রেমল—"বুদ্ধির হাজার দীপ্তি থাকলেও সরল বিশ্বাসের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করতে পারে না ধর্মের ক্ষেত্রে।" অসিত বলেছিল: "কিন্তু যা যা বিশ্বাস করা অনুচিত তা বিশ্বাস করলে তো ক্ষতিও হয়?" উত্তরে প্রেমল বলেছিল: "ভাই, যা বিশ্বাস করা অনুচিত তাকে বিশ্বাস করলে যত ক্ষতি হয় তার দশগুণ ক্ষতি হয় যা বিশ্বাস করা উচিত তাকে অবিশ্বাস করলে।" "উক্তিটি উদ্ধৃত করার মতন। ললিতা মিথ্যা বলে নি: প্রেমল শুধু ভক্তিসাধনায়ই নয় ভাষার সাধনায়ও সিদ্ধ হয়েছে। নইলে ওর কথায় অবিশ্বাসীদের হৃদয়ও দুলে উঠত না। "অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেও, ভাই বিশ্বাসী হ'য়ে দাঁড়য় ওর কাছে আসতে না আসতে—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি—"বলেছিল প্রণব। এম্নি কত কথাই ওর মনে আসে ভিড় ক'রে! অসিত কেমন যেন শিউরে ওঠে ভাবতে যে, সে এমন পরম ভাগবতের স্নেহ পেয়েছে! প্রেমলের ভক্তিকোমল দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে ওর মনে আবেগ জেগে ওঠে। মনে মনে ও তাকে প্রণাম করে।

তারপর ললিতা বলল: "এবার তোমার গানের পালা দাদা! মন দিয়ে গেও কিন্তু—পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েছি যখন।"

অসিত: কী গাইব?

প্রেমল: একটি মীরাভজন—নৃত্যসঙ্গীত। কাল জন্মাষ্টমী তার সূচনা হোক আজকে।

ললিতা: বাংলা, হিন্দি আমি ভাল বুঝি না—তুমি মীরার সেই নাচের গানটির বাংলা অনুবাদ গাও না ভাই!

প্রণব (হেসে): চমৎকার নির্দেশ বটে। কোন্‌টি?

ললিতা: দাদা জানে। সেই "নেচে গেয়ে আজ"—যেটি বৃন্দাবনে আমাকে শিখিয়েছিলে।

অসিত: আচ্ছা (ধরে):

নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে।
চাই না সে বিনা আর কারে—জানি প্রিয়তম শুধু তারে॥

কলঙ্ক হ'ল সিঁথির সিঁদুর, মাথার মণি শোভার।
মোহশৃঙ্খলও হ'ল কিঙ্কিণি—পায়ে পায়ে ঝঙ্কার!

তার তরে সয় সকলি—হারায়ে সকলি জিনিব তারে।
নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে ॥

এ-ভবার্ণবে জীবন তরণী, প্রণয় কর্ণধার।
বঁধুয়ার বিরহিণী চাহিবে না কারো পানে ফিরে আর।
তুফানেরো সাথে খেলিব, উধাও ঢেউ সাথে গাহিয়া রে!
নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে ॥

বিঁধিলে কাঁটা সে-রক্তে আঁকিব চিহ্ন পথে আমার,
দেখি' যারে পরে প্রতি বিরহিণী দিশা পাবে পথে তার।
ভালবেসে তারে আনিব টানিয়া, আড়াল মানিব না রে!
নেচে গেয়ে আজ মোহনের ঘরে যাব সখী, অভিসারে ॥

চোখ বুঁজে গাইতে গাইতে আবেগ জেগে ওঠে অসিতের বুকে। হঠাৎ মনে হয় যেন ঘরের ডান কোনে অতি মধুর নূপুরের ধ্বনি বাজছে গানের সঙ্গতে। চোখ চেয়ে দেখে···কই কোথাও কিছু নেই! ফের গান ধরে—

'মোহশৃঙ্খলও হ'ল কিঙ্কিণি—পায়ে পায়ে ঝঙ্কার'···ঐ আবার সেই নূপুর বেজে ওঠে! আবার তাকাতেই বাঁ পাশে ললিতার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। দেখে ললিতাও তাকাচ্ছে সেই কোনে, প্রেমলও। কী ব্যাপার! ওর মনে কৌতূহল গাঢ় হ'য়ে ওঠে।

গান শেষ হ'তে বলে প্রেমলকে: "ভাই, একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে আজ।"

প্রেমল (হেসে): ঐ কোনে?

অসিত (আশ্চর্য): তুমিও শুনেছ?

ললিতা: বাপী বলবে ভেবেছ? না-ই বলুক। শুধু কি ও-ই শুনতে পারে না কি? (সগর্বে) আমিও শুনেছি। আর আমি বলবই বলব। হ্যাঁ দাদা, শুনেছি শুনেছি শুনেছি ঐ কোনে ঠাকুরের নূপুর বেজে উঠল। আর সেই সঙ্গে নীল আলো—ঐ একই কোনে।

অসিত (প্রেমলকে): তুমিও শুনেছ?

প্রেমল : না। তবে দেখেছি।

অসিত : কী ?

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে) : ললিতা যা বলল…নীল আলো।

ললিতা : তুমি দেখনি দাদা ?

অসিত : না, আমি শুধু শুনলাম যেন নূপুর বাজছে। মনে হ'ল ভুল শুনছি হয়ত…

প্রেমল : অসিত, অসিত, অসিত! এখনো সংশয়! আদালতেও যে corroborative evidence-কে জজ জুরি উকীল সাক্ষী সবাই মানে। কেবল তুমিই…(ললিতাকে) : যে জেগে ঘুময় তাকে জাগাবে কে ?

দশ

শেষে আরতি হ'ল যথাবিধি। সবাই দাড়িয়ে উঠে স্তব করল :

কৃষ্ণ গেহে স্থিতা রাধা রাধা গেহে স্থিতো হরিঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥
কৃষ্ণচিত্তাস্থিতা রাধা রাধাচিত্তাস্থিতো হরিঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥
নীলাম্বরধরা রাধা পীতাম্বরধরো হরিঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণো বৃন্দাবনেশ্বরঃ।
জীবনে মরণে নিত্যং রাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম ॥

আরতির শেষে সকলে ফিরে এসে একে একে মা-কে প্রণাম ক'রে বসল মাটিতে। মা অসিতের দিকে চেয়ে হেসে বললেন : "বলি নি বাবা, যে, তুমি এখন বুঝবে ?"

প্রেমল : কিন্তু ও বুঝছে কই মা ? নিজের কানে শুনে তবু যে মাথা নাড়ে—শুনেছি, না কানের ভুল…

মা : আহা, সংশয় এম্‌নি ক'রেই কাটে রে! এক একটা ঢেউ আসে আর সংশয়ের বাঁধকে ঘা দিয়ে জখম ক'রে যায়। দেখ নি—নদীতে কী হয় যখন বর্ষায় জল বাড়ে ? তীরে এসে লাগে ঢেউ বার বার মনে হয় তীর সমানে

দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে জখম হ'তে থাকে, শেষটা একদিন প্রকাণ্ড এক চাঙড়া মাটি ভেঙে ধ্ব'সে পড়ে—অম্‌নি যেখানে জমি ছিল হ'য়ে যায় নদীর সঙ্গে একাকার।

অসিত: কিন্তু…ঠাকুর কি সত্যিই এ যুগেও আসেন সাধকদের গানের সঙ্গে নূপুরে তাল দিতে? কিছু মনে করবেন না মা, এসব গল্পকথা শুনেছি অনেক, পড়েছিও বিস্তর, কিন্তু চোখে দেখা যায় কি না—

মা: কেন যাবে না বাবা? নরলীলা মানে কী তাহ'লে? শুধু একটা কথা? বলছিলাম না—তিনি নানারূপে আসেন নানা লীলা পোষ্টাই করতে? শোনো, আমারই একটা চোখে দেখা ব্যাপার। আমি সে সময়ে বিশ্বাস করতাম না যে গণেশ ঠাকুরও জীবন্ত হ'য়ে দেখা দেন। একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার সুড়সুড়িতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কি—ওমা! শিশু গণেশ—কী যে সুন্দর! আহা, আলোঘন তনু বাবা, সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে, অমন উদ্ভট মূর্তি এত সুন্দর হয়…মনে হয় যেন সুষমার নির্যাসে গড়া…এহেন গণেশ ঠাকুর খেলা করছেন আমার ঘাড়ে তাঁর শুঁড় বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে! এর পরেই আমি গণেশ ঠাকুরের ঐ মাটির মূর্তিটি আনিয়ে ঐ কুলুঙ্গিতে রেখেছি। রোজ তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করি বাবা। তিনি এসেছিলেন আমার এক সংকটের দুর্লগ্নে—সংকট কাটাতে। সংকট মানে সাধনার বিঘ্ন। তাঁর এক নাম বিঘ্নহন্তা, আর এক নাম সিদ্ধিদাতা, জানো তো? ঠাকুর এই রূপেও যখন আসেন ভক্তের ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতে, তখন কৃষ্ণ হ'য়ে নূপুর বাজিয়ে আসবেন না কেন? (থেমে) বাবা, এ সবই জীবন্ত প্রত্যক্ষ সত্য—বহু সাধক দেখে এসেছেন আবহমানকাল। কিন্তু তাঁরা তো নাম সই রেখে যান নি সে-ইতিহাসে—আর রেখে গেলেও কি ছাই তোমরা বিশ্বাস করতে—যখন স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করতে এত বেগ পাচ্ছ?

অসিত: কিন্তু মানুষের যে চোখের ভুল হয় এও তো সত্যি মা? কল্পনাও তো করেন অনেকে; মানে, subjective—

মা: মানি। কিন্তু প্রেমল ঠিকই বলে—অনেক বাজে ওষুধে অসুখ সারে না ব'লে তো বলা যায় না ভালো ওষুধ নেই যাতে বহু রুগীর সংকট অসুখও সেরেছে বার বার; তাছাড়া বাইরের প্রমাণও মেলে—তোমাদের বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যার নাম দেন—objective proof; শোনো আর একটা দৃষ্টান্ত

দেই—আমারই, স্বচক্ষে দেখা, তাই চোখের ভুল বলারও পথ নেই। ঐ যে দেখছ কুলঙ্গিতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন মাটির বালগোপাল না? ওঁকে আমি এম্‌নিই ওখানে রেখেছিলাম, কিন্তু রোজ ফুল দিতাম না। মানে রীতিম'ত পূজো করতাম না। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওঁর কান্নায়। জেগে উঠে শুনি—ঠাকুর বলছেন: "তুমি দিব্যি লেপ মুড়ি দিয়ে আরাম ক'রে ঘুমচ্ছ। কিন্তু আমি ঘুমই কেমন ক'রে বলো তো? আমার সারা গায়ে পিঁপড়ে উঠ্‌ছে যে!" ঘুম ভেঙে আমি ধড়মড় ক'রে উঠে কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে দেখি কি—ওমা! সত্যিই তো! হয়েছিল কি, পাশে একটা মধুর বোতলের ছিপি আঁটা হয় নি ভালো ক'রে। ফলে পিল পিল ক'রে পিঁপড়ের সার উঠছে—আর ঠাকুরের সর্বাঙ্গে অবিশ্রান্ত ওঠা-নামা করছে! আমি তখন কেঁদে হাতজোড় ক'রে ঠাকুরকে বললাম: "আর কখনো এমন হবে না ঠাকুর, এইবারটি আমাকে মাপ করো।" ব'লে ঠাকুরকে ভালো ক রে ধুয়ে মুছে আমার বিছানায় শুইয়ে দিই। তবে ঠাকুর ঘুমন। এরকম আরো কত নরলীলার কাণ্ড দেখেছেন কত শত ভাগ্যবান্ ভক্ত। আমি বৃন্দাবনের দুটি বৈষ্ণব সাধকের কথা জানি—কিন্তু সে থাক। তোমাকে আজ শুধু এইটুকু বলতে চাই বাবা—যে তুমি আসলে সাধকই বটে—তোমার গুরু এলেই তোমাকে ডেকে নেবেন। তখন কোথায় থাকবে তোমার খাঁ চোবে মিশ্র আলি হোমরাও চোমরাও ওস্তাদেরা কে জানে? কেবল এইটুকু জানি আমি যে, তখনও তুমি গাইবে বটে, কিন্তু ওস্তাদি গান নয়—শুধু ভজন আর সমজদারদের শোনাতে নয়—ঠাকুরকে শোনাতে আর সে-শুভদিনে বহু সাধক-সাধিকা সে গানের প্রসাদ পাবেন তোমার কণ্ঠ থেকে—একথা মিলিয়ে নিও পরে যখন আমি আর এ-জগতে থাকব না—কিন্তু হয়ত ওপার থেকে শুনব কান খাড়া ক'রে—কে বলতে পারে? এমনও তো ঘটে কখনও কখনো।

ললিতা (ঝংকার দিয়ে): তোমার কী যে সব অলুক্ষুণে কথা মা!—'চ'লে যাব চ'লে যাব—আমার ডাক এসেছে।" এর মধ্যেই যাবে কি মা? তুমি হ'লে আশ্রমের মাথা—মাথা না থাকলে সে যে কবন্ধ হ'য়ে শুধু হাঁপাবে—মনে হয় না কি একবারও?

মা (হেসে): কিচ্ছু হবে না রে! দুলাল হ'য়ে দাঁড়াবে অন্ততঃ তিনটে মাথা একটার জায়গায়।

প্রেমল : আরো গাল দাও না কেন মা দশানন ব'লে ?

মা : ছি ছি, তোকে কি গাল দিতে পারি বাবা ! তুই না এলে কি আমি এ-আশ্রম গড়তে সাহস পেতাম ? (অসিতকে) আমার এ-ছেলেমেয়েরা সব বড় মায়াবী, বাবা ! কিন্তু বৈরাগী হ'য়ে মায়ামমতা—এ কোন্ দিশি কথা শুনি ? আমি কে বল্ দেখি ? কিছুই না। একটা সময়ে দেশলাইয়ের কাঠির মতন একটুখানি আগুনের ফুলকি জ্বেলেছিলাম। কিন্তু আগুন গনগনে হ'য়ে ওঠার পরে আর দেশলাইয়ের কাঠিকে কে পোঁছে ! তুমি দেখো অসিত, ও যে কেমন আধার—সবাই বুঝবে আমি চ'লে গেলে তবে—মিলিয়ে নিও।

প্রেমল : ফের যদি অমন করো মা—

মা (অসিতকে হেসে) : কী আবদার দেখতো ছেলের ! মা কি কারুর চিরকাল থাকে না কি রে—না, বেশিদিন পঙ্গু হ'য়ে বাঁচা ভালো ? আমার কাজ শেষ হয়েছে—আমি জানি। কিন্তু যাক সে কথা—যা বলছিলাম। (অসিতকে) তুমি নিজেকে যা ভাবছ বাবা, তুমি তা নও নও নও—এও পরে তুমি মিলিয়ে নিও—আমি চ'লে গেলে। আর একটা কথা তোমাকে আমি আজ বলতে চাই—যদিও তুমি হয়ত এখন ঠিক বুঝতে পারবে না, ভাববে—আমি ফের হেঁয়ালির সুর ধরেছি। কথাটা এই যে, তোমাকে ঠাকুরই পাঠিয়েছেন এখানে। (থেমে) সংসারে সব কিছুই ঘটে বাবা, তাঁর হাতের ঠেলায়—যদিও আমরা এমনই বেয়াড়া যে,শুধু তাঁর ঠেলাটারই খবর পাই—হাতের ছোঁওয়াটা ফ'স্কে যায়। তবু তুমি একদিন দেখতে পাবেই পাবে যে, তোমার মধ্যে সত্যিকার বৈরাগ্যের ব্যাকুলতা জেগেছিল ব'লেই আমাদের 'পরে তিনি ভার দিয়েছিলেন তোমাকে রওনা ক'রে দিতে—খেইটি ধরিয়ে দিয়ে—কোন্ পথে ঠাকুরকে পেয়ে তাঁর প্রেমের আলোয় নিজেকে চেনা যায়। হয়েছিল কি জানো বাবা ? তুমি মগজী বুদ্ধির হাঁক-ডাকে বড় বেশি হকচকিয়ে গিয়েছিলে হাল আমলের বুদ্ধিমন্তদের মতন, তাই তোমাকে শোনানোর দরকার ছিল একটুখানি বাঁশির সুর—যাতে ক'রে তুমি টের পাও—সে-সুরের পাশাপাশি বুদ্ধির দুরন্ত গলাবাজি কী রকম বেসুরো বাজে। বাবা, ঠাকুর যদি এসে দাঁড়ান আজ তোমার ঠিক সামনে—তাহ'লে তোমার বুদ্ধির পর্দায় বড় জোর তাঁর একটা আবছা ছায়া মতন পড়তে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। তাঁকে দেখা, চেনা, জানা, চাখা—এ পারে

কেবল আমাদের অন্তরাত্মা। দুলাল আমাকে উপনিষদ পড়াচ্ছিল তাতেও ঐ কথাই আছে যে আমাদের হৃদয়ই শ্রদ্ধার ভিৎ, সত্যের বনেদ—বুদ্ধি, যুক্তি বিচার নয়। তুমি ওদেশ থেকে তালিম নিয়ে এসেছ মগজের —কিন্তু মগজের কর্ম নয় তাঁকে চিনতে কি অভ্যর্থনা করতে পারা। তিনি এসে বসতে চান যে অন্তরের অন্দর মহলে—মগজ হ'ল সদরের দারোয়ান, অন্দরে ঢুঁ মারবে কেমন ক'রে? দেখ না কেন এই যে আজ তুমি ঠাকুরের নূপুর শুনলে—কেন শুনলে এমন হঠাৎ—আথাল পাথাল ভেবেও কি কোনো কুল কিনারা পাচ্ছ? না—পেতেই পারো না। কারণ মগজী বুদ্ধি দিয়ে কেউ কস্মিনকালেও ভগবানের লীলার তল পায় নি। পাবে না। তোমাকে আরো একটা দৃষ্টান্ত দিই শোনো—এ-ও আমার স্বচক্ষে দেখা। পওহারি বাবার নাম শুনে থাকবে হয়ত?

অসিত: স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে গুরু করতে চেয়েছিলেন?

মা: হ্যাঁ। তিনি গাজিপুরে একটি গুহায় থাকতেন। মাঝে মাঝে উঠে এসে সাধুদের ভাণ্ডারা দিতেন। আমার তখন বয়স হবে চৌদ্দ পনেরো। শুনলাম একদিন সকালে উঠেই যে, আজ পওহারি বাবা ভাণ্ডারা দেবেন। মানে, সাধুদের খাবার ও কাপড়। আমি ঝোঁকালো মেয়ে—তার উপর রোখালো তো? হঠাৎ ঠিক করলাম—পওহারি বাবা কোত্থেকে এই ভাণ্ডারার রসদ জোগান তার তল পেতেই হবে। কাউকে না ব'লে পুরুষ সেজেই শুড়ুৎ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সাধুদের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। পাঁচ সাতশো সাধু ভিখিরি। এক এক ক'রে পৌঁছাচ্ছে পওহারি বাবার গুহায় আর আমি দেখছি দূর থেকে তাঁর দুটি হাত—একটি হাতে ভাঁড় ঝুলছে যার মধ্যে খাবার, অন্য হাতে ধুতি। পাঁচ সাতশো ভাঁড়, তার উপর পাঁচ সাতশো কাপড় তো সোজা জায়গা নেয় না! আমি শুনেছিলাম—তিনি থাকেন এক ছোট্ট গুহায়। এ কী ব্যাপার! মনে মনে মৎলব আঁটলাম। একটু একটু ক'রে এগিয়েই যেই পৌঁছেছি গুহার সামনে, দেখলাম পওহারি বাবার দুটি হাত গুহা থেকে বেরিয়ে ভাঁর ও কাপড় দোলাচ্ছে—আমাকে ডাকতে। আমি চক্ষের নিমেষে গুহায় ঢুকে পড়লাম। বাইরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু শুনছে কে?

অসিত: তারপর মা?

মা: তারপর আর কি?—চক্ষুস্থির! ছোট্ট গুহা—কোথাও কোনো মুখ

নেই—শুধু এই একটি মাত্র মুখ ছাড়া। কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম বাবা—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—যে গুহায় কোথাও কিছুই নেই, না ভাঁড় না কাপড়!

অসিত: বলেন কি মা!

মা: তোমাকে বলছি। কিন্তু তুমি যদি একথা কখনো কাউকে বলো কি কাগজে লেখো লোকে কি তোমাকে বিশ্বাস করবে ভেবেছ? বলবে—হয় তুমি মিথ্যুক, নয় আমি। বলবেই বলবে—কেননা মগজী বুদ্ধি দিয়ে কেউ এ-অঘটনের তল পেতেই পারে না। সাধুদের এমন আরো কত বিভূতি, কত কীর্তিই দেখেছি আমি। কিন্তু এসবই গৌণ অঘটন বাবা। সবচেয়ে বড় অঘটন হ'ল—সাধুদের আশীর্বাদে মানুষের স্বভাব বদ্‌লে যাওয়া। ঠাকুরের কৃপায় তাদের মধ্যে দিয়ে এসে ঘটায় এ-অঘটন, যার ফলে কৃপণ হয় দাতা, লম্পট—ব্রহ্মচারী, অবিশ্বাসী—ভক্তিমান্, অবোধ—জ্ঞানী। এইই হ'ল সবচেয়ে বড় অঘটন। শুধু সাধনা ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হয় না বাবা—যদিও আপ্রাণ সাধনাও চাই-ই চাই। কিন্তু সে সাধনাও করিয়ে নেন তিনিই—সাধু বা গুরুর মধ্যে থেকে হুকুম দিয়ে বল জুগিয়ে ডাক শুনিয়ে। এরই নাম কৃপা। এ-কৃপাকে বুদ্ধদেব নাকচ করেছিলেন কিনা জানি না। প্রেমল তাঁর খবর রাখে—অগুন্তি কেতাব পড়েছে তাঁর সম্বন্ধে—পালিতে সংস্কৃতে ইংরেজিতে ফ্রেঞ্চে, কাজেই বলতে পারে সঠিক। কিন্তু যদি দুশো বুদ্ধও এসে এজাহার দেন যে, ঠাকুরের কৃপা ব'লে কিছুই নেই তাহ'লেও আমি হেসে কুটি কুটি হব বাবা! কারণ এ হ'ল অকাট্য সত্য যে, হাজার হাজার সাধক ঠাকুরের কৃপার পরশমণির ছোঁওয়ায় সোনা হ'য়ে মহাজন ব'নে গেছেন। কিন্তু এসব তর্কাতর্কি করে মানুষ কখন? না, যখন সে ঠাকুরকে দেখেনি জানেনি চেনেনি—এক কথায়, ভালোবাসেনি। যখন একবার এই ভালোবাসা আসে বাবা, তখন দিন দুনিয়ার চেহারাই বদলে যায়। তখন কে কী বলছে তা নিয়ে আর মাথা বকাতে ইচ্ছেও হয় না, দরকারও থাকে না। তখন শুধু শান্তি আর আনন্দ আর······আর বিহ্বল হ'য়ে বলা: ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর······আমি······আ···

তাঁর কথা শেষ হ'ল ভাবসমাধিতে। ওরা সবাই তাঁকে প্রণাম করে একে একে।···

বাইরে এসে অসিত বলল প্রেমলকে "একটু কথা আছে ভাই, তোমার সময় হবে কি?"

প্রেমল (হেসে): আমি এখানে কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি শুনি ? (ললিতাকে): ঠাকুরের প্রসাদ এনো ঘণ্টাখানেক পরে। আমারও ওর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

এই সময়ে প্রণবের ডাক পড়ল : এক পাহাড়ী কৃষাণ হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে ঘা খেয়েছে। সে ললিতাকে নিয়ে গেল তার ডিস্পেন্সারিতে। অসিত প্রেমলকে নিয়ে গিয়ে বসালো তার শোবার ঘরে। বিছানার উপরে পাশাপাশি ব'সে অসিত একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল : "আমার ভাই মনটা একটু খারাপ হ'য়ে গেছে মার-কথা শুনে।"

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে গলা সাফ ক'রে নিয়ে): জানি। কিন্তু উপায় কী বলো ? আমাদের জীবন মরণ তো আমাদের হাতে নয় ভাই।

অসিত : মা-র ঠিক কী অসুখ ?

প্রেমল : অসুখ তো অগুন্তি। কিন্তু তা নিয়ে কথা নয়। মা ইচ্ছে করলে আরো কয়েকবছর থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কেবলই বলেন— তাঁর কাজ শেষ হয়েছে—ডাক পড়েছে। তাছাড়া (গাঢ়কণ্ঠে) মা বলেন : তাঁর সাহায্য যতদিন দরকার ছিল ততদিন ঠাকুর তাঁর হাজার অসুখেও তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এখন—মা বলেন আমাদের কাছে ঠাকুর চান যে, আমরা শুধু তিনি ছাড়া আর কারুর 'পরেই নির্ভর না করি। তাছাড়া প্রণব একটা কথা বলে—কিন্তু থাক এ-প্রসঙ্গ।

অসিত : না থাকবে না। বলতেই হবে তোমাকে। মা একটা কথা ব'লে আমাকে আরো চমকে দিয়েছেন যে, আমাকে ঠাকুরই তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন খেই ধরিয়ে দিতে।

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে): হ্যাঁ ভাই, সত্যি কথা। আর তাই তো মা আমাদের বলেছিলেন তোমাকে এখানে ডাকতে—এখানে তোমার— চোখের ঠুলি খ'সে পড়বে ব'লে। তাই তুমি ঠাকুরের নূপুর শুনতে পেলে। তাঁর আলোও চর্মচক্ষে দেখতে পেতে—যদি না সংশয়কে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে।—না, শোনো। আমি তোমাকে ধম্‌কাতে চেয়ে একথা বলি নি। ব্যাসদেব বলেছেন, একটি লাখ কথার এক কথা—তোমাকে এর আগেও বলেছি—যে, পর্যায়যোগাৎ লভতে মনুষ্যঃ—উষার লগ্ন না এলে কখনো রাত পোহায় না। তুমি নানা সাধু সন্তর কাছে ধর্ণা দিয়ে একটু আধটু আলোর আভাষ পেলেও

সংশয়ের রাত তোমার পোহায় নি, কারণ তাঁদের তুমি শ্রদ্ধা করলেও ভালবাসো নি—মানে যেমন ভালোবেসেছ আমাদের। ভাই, সংসারে শুধু প্রেম বিনা যে শুধু নন্দলালার দেখা মেলে না তাই নয়, কোনো লালারই দেখা পাওয়া যায় না। তুমি আমাদের দেখবামাত্র ভালোবেসে ফেলেছিলে ঠাকুর উস্কে দিয়েছিলেন ব'লেই। আমরাও তোমাকে ভালোবেসেছি ঠিক ঐ একটি কারণে। কিন্তু মা আরো একটু বলেছেন—যা এখন তোমাকে বলতে মানা করেছেন আমাদের পই পই ক'রে। মা বলেন—ঠাকুর অনেক কিছু আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন—যতদিন না আলোর তৃষ্ণায় আমাদের প্রাণ ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

অসিত : কিন্তু—না, আমি জানতে চাইছি না কী সে গোপন কথা—কেবল এইটুকু জানতে চাই যে, তাহ'লে ঠাকুর কি সবই আগে থাকতে ছক কেটে রেখেছেন—বলবে? কারণ তা যদি বলো—অর্থাৎ যদি সব কিছুই তাঁর অলংঘ্য বিধান বা নিয়তি-নির্দিষ্ট হয়, তাহ'লে সাধনার জন্যে সাধকদের উঠে প'ড়ে লাগতে বলার কি কোনে মানে হয়? জীবনটা হ'য়ে দাঁড়ায় না কি এক অদৃশ্য শক্তির খামখেয়ালি পুতুল খেলা?

প্রেমল : ঐ দেখ, তুমি সেই একই ভুল করছ—যা মগজী বুদ্ধির নাগালের বাইরে তাকে সেই বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে চাইছ। তবে কথাটা যখন উঠলই তখন বলি—মা-র কাছে এসে'আমি যা শিখেছি। (একটু থেমে)

আমি এক সময়ে ভাবতাম যে, আমি শক্তিমান্ বুদ্ধিমান দেবব্রত জিজ্ঞাসু—কাজেই মন দিয়ে সাধনা করলে আমার সিদ্ধি ঠেকায় কে? তোমারই গানের ভাষায় বলি: "এবার জ্বালব আলো চাওয়ার দীপে চিনতে তোমার ঠিক ঠিকানা।" কিন্তু শেষে বুঝলাম—তোমারই আর একটি গানে আছে এ-প্রশ্ন :—

"জ্বলে কি আলোর আলো—তুমি মা যদি না জ্বালো?"
পারি কি বাসিতে ভালো—তুমি না বাসালে ভালো?"

তোমাকে আমি চিনেছি ভাই তোমার গানের মধ্যে দিয়েই—যদিও (হেসে) মজা এই যে, তুমি নিজে নিজেকে চিনতে পারো নি। এও তাঁরই আর এক লীলা ভাই, আর লীলা বলে তাকেই মন যার তল পায় না। যেমন ধরো, তোমাদেরই এক ঘরোয়া উপমা আছে যে, সাপের মাথায় মণি আছে

কিন্তু সে নিজে শুধু তার বিষেরই খবর রাখে। আমারও সে-সময়ে ঠিক সেই অবস্থা ছিল। ধ্যান লাগালাম—কী বিপর্যয় ধ্যান! উপবাস, আসন, মৌনব্রত, মাধুকরী, স্বপাকে খাওয়া—কী নয়? মা দু একবার একটু আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন। বেশি বললেন না। কিন্তু হায়রে, সবই যেন ভেস্তে গেল। ক্রমশঃ এমন অবস্থা হ'ল যে, আমি যত সাধনা করি ততই সাধনার অহঙ্কার আমাকে পেয়ে বসে। সবই আমি করব—আমার সাধনা, আমার সংকল্প, আবার বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা, রায়, মাটিতে পা ফেলা, জলে সাঁতার কাটা, আকাশে ওড়া সবই আমার মর্জি—initiativo। কাজেই তিনি—ঠাকুর—আস্তে আস্তে কল্কে না পেয়ে স'রে গেলেন। শেষটায় যখন মনে হ'ল আর সইতে পারছি না, ভেঙে পড়ব—যাকে বলে tou h and go—তখন হঠাৎ দেখলাম স্বর্গে উঠতে চেয়ে নিজে হাতে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে এসে পড়েছি কোন্ রসাতলে! তখন কেঁদেকেটে শরণ নিলাম মার চরণে। অমনি সব কান্না হ'য়ে উঠল আনন্দ—ঠিক যেন বাজিকরের হাতে অগণ্য গ্রন্থি খুলে যাওয়া রশিটা ধ'রে নাড়তেই। তখন আর হাঁক দিলাম না: "সাঁতার কেটে পাথার পেরুব"—বললাম মা-কে চোখের জলে: "আমার সাধনার ভার তুমিই নাও মা।" মা এই ডাকটুকুরই অপেক্ষা করছিলেন: "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা হি মাতঃ"। মিলল দিশা, কিন্তু এমন পথে যার কোনো হদিশই দিতে পারেনি আমার স্বাবলম্বী শক্তি, বহুপাঠী বিদ্যা বা মগজী বুদ্ধি। কিন্তু এও এক হেঁয়ালি—বটেই তো। সাধনাও চাই অথচ কৃপার কাছেও ধর্ণা দিতে হবে! নিজের পায়ে দাঁড়াতেও হবে অথচ অসহায় হ'য়ে! রাধাকৃষ্ণের মিলনে শ্রীরাধার কণ্ঠে একটি সূক্ষ্ম হার ছিল—একদা সেও হয়ে উঠল বাধা! গোপীদের শেষ পাশ—কুলবালার লজ্জা—তাকেও ঠাকুর অম্লানবাদনে কাটলেন বস্ত্রহরণ পর্বে! সংসারের কর্তব্য পালন না করা মহাপাপ—অথচ তাকে মেনে চললেও মিলবে না তাঁকে যাঁর বিধানে কর্তব্যকে লংঘন করা পাপ হ'য়ে দাঁড়ালো! তোমার প্রশ্নও তাই এই হেঁয়ালির থাকেই পড়ে: দৈব না পুরুষকার? হাল ধরা, না হাল ছেড়ে দেওয়া? আমি কর্ম কর্তা, না স্বভাব আমাকে চোখবাঁধা বলদের মতন চালাচ্ছে নাকে দড়ি দিয়ে? জানো নিশ্চয়ই, আমাদের ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে: "You can catch a swallow if you can put salt on its tail." পাগলামির প্রলাপ বৈ কি, কারণ পাখীকে না

ধরলে তার লেজে নুন দেব কেমন ক'রে? অথচ লেজে নুন না দিলে তাকে ধরাও যাবে না! কিন্তু আসলে এ প্রলাপ নয় নয় নয়—এইখানেই ঘটে অঘটন, আর ঘটান যিনি তাঁরই নাম দৈবী কৃপা। তাঁর শরণ নিলে পাখী হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে তার লেজে তুমি নুন দিয়ে ব'সে আছ। এর অন্য নাম প্যারাডক্স। আত্মিক জগতে সবচেয়ে গভীর তত্ত্বকথার আভাস দিয়েছেন ঋষিরা এই প্যারাডক্সেরই ভাষায়: তিনি চলেন অথচ চলেন না; কাছে অথচ দূরে; অণোরণীয়ান তথা মহতো মহীয়ান্; সর্বধর্মের স্রষ্টা অথচ সর্বধর্ম পরিত্যাগ বিনা তাঁর শরণ নেওয়া যায় না। মগজী বুদ্ধি এর নাম দেয়—হেঁয়ালি। দেবে না? যার গোটা দৃষ্টিটাই উপরভাসা সে অতলের খবর পাবে কেমন ক'রে? তাই সে দেখতে পায় না এই গভীর সত্যটি যে, যে-সাধক গুরুচরণে সত্যি শরণ নিয়েছে সে শরণাগতি বলতে বোঝে না তামসিক নিরুদ্যম, বোঝে আমি কর্ম করলেও কর্মকর্তা নই—এইমাত্র। তাই অর্জুন যখন কৃষ্ণকে বললেন "আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, আমাকে তুমি বুঝিয়ে দাও আমার কী কর্তব্য।" তখন ঠাকুর তাকে "মামেকং শরণং ব্রজ" বলার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন: "আমাকে স্মরণ ক'রে আমার প্রতিনিধি হ'য়ে যুদ্ধ করো হৃদয়দৌর্বল্য রুখে উঠে ত্যাগ ক'রে।" এ-উল্টোপাল্টামির চাবিকাঠি মগজী বুদ্ধি কেমন ক'রে পাবে বলো? তাই শুধু তোমার আমার নয় ভাই, প্রতি সাধককেই আত্মনিবেদনের এই পরম দীক্ষাটি পেতে হবে: সাধনার আশ্রয় নিয়ে কর্মব্রতী হ'তে হবে শরাগতির মন্ত্রসিদ্ধিকে আয়ত্ত করতে। এ যে পারে তারই হাতে চাঁদ এসে ধরা দেয়। যে চাঁদকে টিপ ক'রে লাফিয়ে ওঠে সে শুধু মুখ থুবড়ে পড়ে।"

ললিতা ডাক দিল: "এবার খেতে এসো বাপী। লেকচার জুড়িয়ে যাবে না। কিন্তু খাবার যাবে।"

বারো

অসিতের মন কী যে অশান্ত হ'য়ে উঠে! এ কী হল? এমন শান্তিময় আশ্রমে এসে কেন তার মনে এত অস্বস্তি জ'মে উঠল? যার আশীর্বাদে সব চিন্তাই যেন থিতিয়ে গিয়েছিল। এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যে তার মন প্রাণ যেন টইটুম্বর হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে সেই

থিতিয়ে যাওয়া চিন্তাবুদ্বুদেরা ফের বিজবিজ ক'রে উঠে ওর মনকে উতলা ক'রে তুলল। এমন কিছু যে ঘটছে যা ঘটবার ম'ত এটুকু বুঝতে ওর বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু অসহায় হ'য়ে শরণাগতি চাওয়ার ছবি চমৎকার হলেও কী উপায়ে অসহায় হওয়া যায় কে ব'লে দেবে? সাধনাও চাই অথচ অসহায়ও হতে হবে! জানাও চাই অথচ সংশয়ের হাজারো প্রশ্নকে আমল দিলে চলবে না! এক পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের কথা মনে পড়ল "জগতের সব চেয়ে প্রাচীন লড়াই হচ্ছে বুদ্ধি বনাম বিশ্বাসের। কখনো এ জেতে কখনো ও।" কিন্তু দুই-ই মরিয়া না মরে রাম ধনুর্ধর। বিজ্ঞানের ভিত্তি হ'ল সংশয়—বলেন কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক। একথা যদি সত্যি হয় তবে সংশয়কে কিছু নয় ব'লে নস্যাৎ করা চলে কী? অথচ ধর্মের পথে সংশয় হ'ল নিবেদিতার ভাষায় a lion in the path। মানুষের জীবনে এ দুই পথের পথিকের ছন্দ একেবারে উল্টো কেন? যাঁরা মহাপ্রতিভাধর তাঁরা বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে জগতের চেহারাই বদলে দিয়েছেন একথা অস্বীকার করার নাম পাগলামি। কিন্তু তাঁরা যখন বলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো পথে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান মিলতেই পারে না তখন সেও কি সমান পাগলামি নয়? মা-র মতন শান্তিময়ী সে কি এর আগে দেখেছে, না, শরণাগতির পথে সংশয়কে জয় ক'রে এমন আশ্চর্য তেজস্বিনী হওয়া সম্ভব একথা কোনদিন কল্পনা করেছে? কথায় যাঁর এতটুকু আত্মাভিমানের আমেজ নেই অথচ প্রতি কথার জোর কত! মনে পড়ে ইহুদীদের খৃষ্টকে দেখে বলাবলি করা: He speaks with authority! এই পাঞ্জা আছে ব'লেই না মা-ও যাই বলেন মনকে আবিষ্ট করে। না করলে প্রেমলের মতন বলিষ্ঠ প্রতিভাধরও কি ওঁর পায়ের কাছে বসে থাকে পোষা বেড়ালছানাটির মতন? শুধু প্রেমলই তো নয়—প্রণবও তীক্ষ্ণধী, স্বভাবে তামসিকও নয়, অন্ধবিশ্বাসী নয় সেও তো মার কাছে হার মেনেছে! আর ললিতা? সেও কি মারই আদেশে প্রেমলের কাছে তার বিদ্রোহী মাথা নোয়ায় নি? এমন একটি আশ্চর্য পরিবার গ'ড়ে উঠেছে কেমন ক'রে এ হেন অকল্পনীয় পরিবেশে? এ কি পওহারিবাবার ভাণ্ডারার চেয়েও অভাবনীয় অঘটন নয়? একদিকে ওর মনে সম্ভ্রম জাগে এ-কয়টি স্নেহময় সত্যাশ্রয়ী তত্ত্বজিজ্ঞাসুর' পরে। অন্যদিকে আসে ভয়: সেও কি এদেরই মতন সর্বহারা হ'য়ে বিশ্বাস মন্ত্র জপ করতে বাধ্য হবে ভগবানকে

পেতে ? তাঁকে পাওয়া মানে কি সব ছাড়া—বহুদিনের ধারণা, বাঞ্ছিত প্রতীতি, বুদ্ধির পরে আস্থা—সব বিসর্জন দেওয়া ? হঠাৎ মনে পড়ে টমসনের বিখ্যাত Hound of Heaven কবিতাটি : প্রেমল মাঝে মাঝে কাশীতে ওর কাছে আবৃত্তি করত। বলেছিল একদিন খুব জোর দিয়েই যে, ইংরেজ কবিদের মধ্যে ব্লেক ছাড়া আর কেউই এত চমৎকার খাঁটি আধ্যাত্মিক কবিতা লেখেন নি। পড়তে পড়তে প্রেমলের গৌর মুখ লাল হ'য়ে উঠত :

I fled Him, down the nights and down the days ;
I fled Him, down the arches of the years
I fled Him, down the labyrinthine ways ;
Of my own mind ; and in the mist of tears
I hid from Him, and under running laughter······
From those strong feet that followed, followed after...

সত্যিই তো ভগবান মানুষের পিছু নিলে সে ভয় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে ছুটে পালায় নিজের মনের আঁকা বাঁকা অলিগলি দিয়ে—বৎসরের পর বৎসর কান্নার কুয়াশার আড়ালে নিজেকে গোপন করতে চেয়ে। কেন ? না,

Lest, having Him, I must have naught beside—পাছে তাঁকে পেতে হ'লে আর সব কিছুকেই বিদায় দিতে হয়।

"হা অদৃষ্ট"—বলেছিল প্রেমল ব্যঙ্গ হেসে—"ভাবো কামনা বাসনার মায়ামোহে মানুষ আজ কোথায় পৌঁছেছে—কী হসনীয় আশঙ্কায় ! যে-ভগবানের অগুন্তি দানের প্রসাদে আমরা বেঁচে আছি, যাঁর নিশ্বাসে আমরা প্রতি মুহূর্ত নিশ্বাস নিচ্ছি, যাঁর কৃপায় আকাশে আজো চন্দ্র সূর্য উঠছে ; মা সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করছে ; পরের জন্যে স্বার্থপর মানুষও আত্মত্যাগ করছে ; যাঁর আলোয় তীর্থযাত্রী পথ চলছে তাঁর বাঁশির ডাকে নির্দিশায় দিশা পেয়ে ; যিনি বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে ঝিকৃমিক ঝিকমিক করছেন ব'লেই এ ব্রহ্মাণ্ড অশ্রান্ত সৌন্দর্যের নির্ঝর ঝরিয়ে চলেছে আবহমানকাল—তাঁকে পেলে কে জানে যদি সব হারাতে হয়—এ-ভয়, এ-অর্বাচীন সংশয়ের কী নাম দেওয়া যায় বলো তো ?"

কত সত্যি কথা ! ভাবতে ভাবতে ওর বিষাদ কেটে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে গভীর শান্তিতে শেষ রাতে। এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখে :

চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে—অচিন বন। হঠাৎ দেখে সামনে এক

মণিমহল। ভিতরে ঢুকে যে-ঘরেই যায় দেখে রত্নমণি অঢেল বিছিয়ে আছে—শুধু নেবার অপেক্ষা। কার এ-সম্পত্তি? উপরতলায় উঠে দেখে আরো বিচিত্র মণি! অবাক্ হ'য়ে ভাবছে গৃহকর্তা কোথায়, এমন সময়ে স্বর শোনে: "তুমিই গৃহকর্তা, এসবই তোমার।" স্বর আসছে আরো উপরতলা থেকে। দেবতাই হবে। সাধ জাগে তাঁর দেখা পেতে—যিনি না চাইতে ওকে এত ধনসম্পদ দিলেন। কিন্তু উঠতে যেতেই ভয় আসে। যদি ধরো, উপর তলায় কিছুই না থাকে, আর দেবতা বলেন এসব ছেড়ে ছুড়ে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে? নেমে আসে: কাজ কি? অধ্রুবের সন্ধানে যদি ধ্রুব প্রাপ্তি হাতছাড়া হয়! অম্নি শোনে আবার সে স্বর, যেন দেবতা হেসে বলছেন: "তুষ্টে চ তত্র কিম্ অলভ্যম্ অনন্ত আদ্যে!" * লজ্জায় ও মুখ ঢাকে··· সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়।······দিগন্তে শুকতারা যেন হেসে বলে: "এত দেখে শুনে তবু ভয়?"

তেরো

পরদিন অবিস্মরণীয় জন্মাষ্টমী! বিকেল বেলা। মা-র ঘরে ওরা গিয়ে বসেছে। ললিতা এক এক পেয়ালা ক'রে কফি ঢেলে দিল ওদের—তিনজনকে। মাকে শুধু কমলালেবুর রস।

চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রেমল মাকে বলল অসিতের স্বপ্নের কথা।

মা (খুশী): খুব ভালো লক্ষণ বাবা! বলিনি?

অসিত (হেসে): ঠাকুর ধম্কালেন ব'লে?

প্রেমল: অবিশ্যি। ভাগবতে কি কালিয়ের নাগরাণীরা ঠাকুরকে বলেনি: 'ক্রোধোঽহিতেঽনুগ্রহ এব সম্মত":

ললিতা: মানে? ঐ দেখ, আমি সংস্কৃত জানি না ব'লে আমাকে এত হেনস্থা—

অসিত: বাপ্‌রে! তোমাকে হেনস্থা করবে কার ঘাড়ে এমন দুটো মাথা আছে দিদি? ওর মানে হচ্ছে ঠাকুরের ক্রোধও তাঁর কৃপাই বটে।

* অনন্ত বৈভব বিভু তুষ্ট হন যদি কারও প'রে,
অলভ্য কিছু কি তার থাকে আর বিশ্বচরাচরে? (ভাগবত)

প্রণব (অসিতকে) : আমার এই কালিয়দমন গল্পটি কী চমৎকারই যে লাগে, অসিত ! তোমাদের পুরাণের কত গল্পই যে—কী বলব—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে এমন রসিয়ে উঠেছে : এ বলে আমায় দেখ, ও বলে

প্রেমল : কিন্তু কেন ঘটেছে এ রাজযোটক বলো তো ?

প্রণব : কেন ? তাঁদের কল্পনার প্রসার ছিল ব'লে। আর কি ?

প্রেমল : না, আরো আছে। তাঁদের মনে বিশ্বাস এত সহজে ঠাঁই পেত ব'লে। তাই তো ভারতকে স্বামীজি "পুণ্যভূমি" উপাধি দিয়েছিলেন তাঁর কলম্বোর ভাষণে। কী অসিত, ফের মন খারাপ ? না সংশয় ;

অসিত (হেসে) : দুইই। সত্যিই আমার কেমন যেন ধাঁ ধাঁ লাগে ভাই। কারণ শুধু স্বামীজিই তো নন, শ্রীরামকৃষ্ণও হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম নাম দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—আর সব ধর্ম আসবে যাবে কেবল হিন্দুধর্ম থাকবে ; তারপরে মহাত্মা সন্তদাস বাবাজিও বলেছিলেন—ভারত হ'ল ধর্মভূমি ; সবশেষে মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দও বললেন—ভারত অদূর ভবিষ্যতে জগতের অধিনায়ক হবে তার আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাবলে। অথচ স্বামীজি উঠতে বসতে দুঃখ প্রকাশ করতেন যে, আমাদের দেশের লোক ঘোর তামসিক, তাই "লোকাচারই" হ'য়ে উঠেছে আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা—ফলে "ধর্ম আমাদের গিয়ে ঠেকেছে ভাতের হাঁড়িতে।" এ-দুই মত কি পরস্পর বিরোধী নয় ?

প্রণব (প্রেমলকে) : নাও, ঠেলা সামলাও এবার।

প্রেমল (মৃদু বিদ্রূপে) : এ-ঠেলা তুমি একাই সামলাতে পারবে। আমি আজ একটু জিরুই।

মা : না, দুলাল ! তুমিই এর জবাব দাও।

প্রেমল : প্রণবকে বারণ করছ কেন মা ?

মা : কারণ অসিত যে প্রশ্নটি করেছে সেটি শুনতে সহজ হ'লেও তার উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। তাছাড়া অসিত তোমাকে সত্যই ভালোবেসেছে। তাই তুমিই বলো। আমি আজ চুপ ক'রে শুধু শুনতে চাই। ঢের বকেছি কাল।

প্রেমল : কিন্তু জন্মাষ্টমীর দিন এত তর্কাতর্কি—

মা : এ-তর্কাতর্কি নয়। তুমি কি ভুলে গেলে অসিতকে কাল ঠাকুর কী স্বপ্ন দিয়েছেন ?

অসিত : স্বপ্ন দিয়েছেন ? ঠাকুর ?

মা : নৈলে কি যাকে সাহেবরা বলে change ? বাবা, বিশেষ ক'রে সাধনার পথে, প্রথম দিকে ঠাকুর কথা কন নানা স্বপ্নের ভাষা-ই। তুমি যে মণিমহল দেখলে তারই নাম ভারতবর্ষ—যেখানে সব মণিরত্নই অঢেল। কিন্তু তবু এ সব রত্নই "তোমার" হ'লেও তুমি প'ড়ে পেয়েছ ব'লে তোমার হ'য়েও হয়ে দাঁড়ালো মায়া—সোনার হরিণ। এসবের কোঠা পেরিয়ে মায়েশ-এর দরবারে পৌঁছলে তবেই পাবে প'ড়ে পাওয়া রাজ্যপাটের দখল-নামা। কিন্তু এম্‌নিই মায়ার খেলা, বাবা, যে মণি পেতে না পেতে মানুষ মণিকারকে ভুলে গিয়ে হ'তে চায় আত্মপ্রসন্ন দখলদার। তিনি বারবারই ডাকেন আমাদের দিশা দিতে—কেমন ক'রে তাকে পেলে তবেই এ ধন-রত্ন ভোগ করা যায়—আমরা সে ছন্দটি শিখতে চাই না ব'লেই পদে পদে পাকে পড়ি !—কিন্তু তবু ভয় পাই পাছে "Lest having Him I must have naught beside"—কিন্তু যে-ই তাঁকে একবার চিনবে সেই দেখতে পাবে—এ পুণ্য-ভূমিতে তিনি বারবার অবতীর্ণ হয়েছেন কেন—কিন্তু ঐ দেখ, নিজেই ফের ব'কে চলেছি।

অসিত : না, বলুন মা। বড় ভালো লাগছে।

মা : না বাবা, এখন (প্রেমলের দিকে হেসে) you have the floor—তোমারি প্রিয় কঠ-উপনিষদের ভাষায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" দুলাল ! ওঠো—সুপ্ত সিংহ, জাগো !

প্রেমল (মা-র চোখের দিকে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে অসিতের দিকে ফিরে) : মা আবদার ধরলে আর রক্ষে নেই অসিত, তাই তাঁর সামনেও বলতে হবে "জানি" এই ভঙ্গি ক'রে—যেমন শরশয্যায় ভীষ্ম করেছিলেন কৃষ্ণের সাম্‌নে। কেবল তফাৎ এই যে, ভীষ্ম জানতেন—কৃষ্ণই তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছেন, যেখানে আমি বক্তৃতা সুরু করতে না করতে ভুলে যাই যে, আমি বক্তা নই। মরুক গে। বলি শোনো আমার এ সম্পর্কে যা মনে হয়।

য়ুরোপ-আমেরিকার কাপালিক চণ্ডবৃত্তি দেখে যখন আমি মানুষে

প্রায় বিশ্বাস হারাতে বসি সেই সময়ে আমার হাতে আসে বুদ্ধের বাণী : যে, অক্রোধ দিয়েই ক্রোধ জয় করতে হবে, আর সবাইকে ভালোবাসতে হবে যেমন মা ভালোবাসেন তাঁর একমাত্র সন্তানকে। মনে হয় আমার যে, এছাড়া আর পথ নেই—যে বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ভোগবাদ আমাদের পেয়ে বসেছে তার সমাপ্তি সর্বনাশে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ত্যাগের আদর্শ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল : বুদ্ধ—যে রাজার ছেলে, যার সবই ছিল, সে কিসের ডাকে ভোগ ছেড়ে যোগকে বরণ করল প্রাণকে পর্যন্ত বাজি রেখে? এত বড় দুর্ধর্ষ ত্যাগ—"l'audace"—আর কোন দেশের ভোগীর মধ্যে ঝলকে উঠেছে বলো তো? ভাবো তো, কী অদ্ভুত বৈরাগ্য এ—যার মূলে ছিল না কোনোই আধি ব্যাধি কি নিরাশা! মানুষকে ভালোবেসেছিলেন ব'লেই না তাঁর মন মানুষের দুঃখে ব্যথিয়ে উঠেছিল! তাই তো যোগাসনে বসার সময়ে তিনি শপথ করেছিলেন :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতি।

(ললিতাকে) অর্থাৎ আমার ত্বক্ অস্থি মেদ সমস্তই যদি শুকিয়ে মাটিতে মিশে যায় তবু জ্ঞানের জ্ঞান না পেয়ে আমি এ যোগাসন থেকে উঠছি না।

পেলেন তিনি দুঃখ নিবৃত্তির চাবি—বাসনাজয়—সব তৃষ্ণাকে অস্বীকার করলে তবে মিলবে পরমা শান্তি। এরপরে উপনিষদ গীতাতেও পেলাম এই কথাই আরো গভীর ছন্দে—ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং, ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্ ইত্যাদি। ধাপে ধাপে বুদ্ধের দিশা মেনেই নির্বাণ শান্তি থেকে উঠে এলাম ব্রহ্মাত্মবাদে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানলেই ব্রহ্ম হওয়া যায় আর না জানতে পারলে সর্বনাশ, "মহতী বিনষ্টিঃ"। কিন্তু তারপরে শুনলাম মা-র প্রসাদে ঠাকুরের প্রেমের বাঁশি—দেখলাম তাঁর রাঙা চরণ—যার ছোঁওয়ায় এ ভারত পুণ্যভূমি হ'য়ে উঠেছে—যাঁর অপরূপ রূপ অনুপম প্রেমের আলোয় পথ দেখিয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় আনন্দের নিত্য-বৃন্দাবনে। এ-বাণী এমন সুরে আর কোন্ দেশে বেজে উঠেছে বলতে পারো আমাকে? বলি না—অন্য দেশের মানুষও ঠাকুরকে চায় নি। কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে, অকুণ্ঠিত ছন্দে, অগাধ রসের সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে শেষে বিশ্বরূপ দর্শনের মহানাট্যমঞ্চে আর কোথাও মানুষ তাঁকে রসানাং রসতমঃ, সত্যস্য

সত্যং অমৃতস্য অমৃতং ব'লে বরণ করে নি—ধর্মের মধ্যে দিয়েই সব ধর্মকে উত্তীর্ণ হ'য়ে শরণাগতির মন্ত্রে। প্রতি ধর্মেই তাঁর সত্যের একটি-দুটি-তিনটি ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণই এসেছেন নিটোল নর-লীলার পূর্ণ বাণীবাহ হ'য়ে—যে-বাণীর প্রতিধ্বনি জেগে উঠেছে অগণ্য পুরাণে তন্ত্রে মন্ত্রে পূজায় সাধনায় কাব্যে গানে কীর্তনে। বলব না এহেন দেশকে পুণ্যভূমি —যার ধুলাও পবিত্র রজঃ, পর্বতও দেবতাত্মা, নদীও পতিতপাবনী? এ কবিত্বের অপলকা উচ্ছ্বাস নয় অসিত, যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।" এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর কি তুলনা আছে ভাই—যিনি নররূপী নারায়ণ—সর্বভূতের অন্তরবাসী সর্বঋষির অন্তর্নেত্র, সর্বযজ্ঞের পরম পুরোহিত? রমণ মহর্ষি আমাকে বলেছিলেন—গীতার এই শ্লোকটি তাঁর মনে নিরন্তর বাজে গভীর ঝঙ্কারে:

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয় স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।*

রমণ মহর্ষির মতন জন্মসিদ্ধ কি আর কোনো দেশে জন্মাতে পারত—বিশেষ ক'রে এ যুগে?

অসিত: রমণ মহর্ষিকে কেমন লেগেছিল তোমার?

প্রেমল: আমি তাঁকে দেখে শুধু যে মুগ্ধ হয়েছি তাই নয় ধন্য হয়েছি তাঁর আশীর্বাদে। যে-দেশে তাঁর মতন লোকোত্তর মহাজন জন্ম নিয়েছেন সে দেশকে ধন্য বলব না? বলব না তার মাটিও চিন্ময়?

মা: অসিতকে বলো না দুলাল, মহর্ষি তোমাকে কী ভাবে তাঁর নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপটি দেখিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, ঠিক সময়েই প্রসঙ্গটা এসে গেছে। প্রথমে একজনেরই চোখের ঠুলি খোলে. তারপরে তার দৃষ্টির ছোঁয়াচে আরো পাঁচজনের চোখে জ্বলে ওঠে দৃষ্টিপ্রদীপ, হয় দিব্যদর্শন।

ললিতা: হ্যাঁ বলো না বাপী! আমার কী যে ভালো লাগে তাঁর কথা শুনতে!

* নিখিল জীবের অন্তরবাসী আমি:
আদি মধ্য ও অন্ত—জীবন-স্বামী।

প্রেমল (একটু চুপ ক'রে থেকে): শোনো তবে বলি অসিত। কিন্তু ব'লে বোঝাতে পারব কি সে অপূর্ব দর্শন?

(হেসে) মহর্ষিকে আমি ভক্তি করেছি প্রথম থেকেই তাঁর একটি ছবি দেখবামাত্র। তারপর পড়ি তাঁর নিজের লেখা ও পল ব্রাণ্টনের বিবৃতি। বুঝতে দেরি হয় নি আমার যে, তিনি জীবন্মুক্ত নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—যাঁর সম্বন্ধে বলা যায় ভাগবতের ভাষায়।

মুক্তানামপিসিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!

(ললিতাকে) অর্থাৎ জীবন্মুক্ত সিদ্ধদের মধ্যেও এমন পরম ভাগবত মেলে কালে ভদ্রে।

মা: আগে বলো তাঁর সম্বন্ধে তুমি ধ্যানে কী দেখেছিলে।

প্রেমল: তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না মা! তোমার কাছেই শুনেছি—এসব ধ্যানদর্শনের কথা গুরুর কাছে ছাড়া বলতে নেই—

মা: কিন্তু গুরু হুকুম দিলে বলা যায় এমন কথাও শোনো নি কি গুরুর কাছে? না, আমি বলতে বলছি কারণ আছে ব'লেই। অসিত সত্যিই সংশয়ী নয় তো—ও জানতে চায়, কেবল আষাঢ়ে গল্পও তো রটে, তাই বলতে বলছি তোমাকেই—যার কথা মেনে নিতে ওর বাধবে না?

প্রণব (চুপ ক'রে): কিন্তু ধরুন, যদি বাধে?

ললিতা: ঈ—শ্! মা যাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তার মন কি কুটিল হ'তে পারে?

অসিত (মা-কে): শুনুন, আমি সহজে মেনে নিতে পারি না একথা সত্যি মা, কিন্তু যাকে সত্যসাধক ব'লে চিনেছি তাকে বিশ্বাস করতে আমার বাধেনা। তবে (ললিতাকে) মন আমার কুটিল না হ'লেও বেশ একটু জটিল দিদি। তাই তুমি তোমার সার্টিফিকেট ফিরিয়ে নিতে পারো।

ললিতা (কাঁদো কাঁদো সুরে): তুমি ভা—রি, দুষ্টু দাদা! আমি দুরন্ত মেয়ে হ'তে পারি, কিন্তু তোমাকে সার্টিফিকেট দিতে যাব এত বড় মুখ্যু না কি আমি?

মা (হেসে): তা ওর অপরাধ কী বল্? ও স্বচক্ষেই দেখেনি কি—তুই সাক্ষাৎ গুরুর সঙ্গেও কী ঝুটোপুটি ঝগড়া করিস উঠতে বসতে? দেখেশুনে আমিই ভয় পাই, তা ও ছেলেমানুষ!

প্রণব : কিন্তু এবার তোমার কথাটা শেষ করো প্রেমল। আরতির সময় হ'ল ব'লে।

মা : হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি বলো দুলাল—রমণ মহর্ষির সম্বন্ধে ধ্যানে কী দেখেছিলে।

প্রেমল (অসিতকে) : সে সময়ে আমি খুব ধ্যান করতাম—আরো রমণ মহর্ষির কথা প'ড়ে। ভাবতাম আমি কে আমি কে আমি কে আমি কে? রমণ মহর্ষির নির্দেশ মেনে দেখতে চাইছিলাম কোথাও পৌঁছতে পারি কি না। হঠাৎ একদিন ওঁর ছবির সামনে ধ্যান করছি (দেয়ালে দেখিয়ে) এই হেলান দেওয়া ছবি বৃদ্ধ বয়সের—এমন সময়ে হঠাৎ দেখি ছবিটি গ'লে মিলিয়ে গেল আর অমনি সামনে এক পাহাড়! সেই পাহাড় বেয়ে এক পনেরো ষোলো বছরের ছেলে চলেছে। মাকে বলতে মা বললেন : রমণ মহর্ষি ঐ কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ ক'রে অরুণাচল পাহাড়ে উঠে অরুণাচল শিবের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন।

অসিত : তিনিই যে রমণ মহর্ষি—কেমন ক'রে জানলে?

প্রেমল : রমণাশ্রমে আমার এক বন্ধু আছেন তাঁকে লিখেছিলাম। তিনি মহর্ষির বালক বয়সের একটি ছবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার ধ্যান দর্শনের পরে। অবিকল সেই মূর্তিই আমার ধ্যানে ফুটে উঠেছিল।

ললিতা (শাসিয়ে) : কী দাদা, এবার?—স্কেপটিক!

মা : ফে—র! বলি নি তোকে—ছেলে আমার মোটেই স্কেপটিক নয়? যার শ্রদ্ধা করার এমন সহজ শক্তি সে কখনো স্কেপটিক হ'তে পারে রে মেয়ে?

ললিতা : মা, তুমি ভারি একচোখো। তোমার ছেলের সাতখুন মাফ—কিন্তু মেয়ের পান থেকে চুণটি খসেছে কি সুরু হয়েছে তোমার তর্জন গর্জন।

মা (হেসে) : আর মেয়ে আমার কী লজ্জাবতী লতা রে। সাত চড় মারলেও কথা কন না। (প্রেমলকে) কিন্তু বাজে কথা থাক্ দুলাল বলো তারপর কী হ'ল।

প্রেমল : ছবি পাবার পরেই আমি যাই রমণাশ্রমে। মহর্ষির ঘরে গিয়ে প্রথম দিনই তাঁকে প্রণাম ক'রে বসলাম তো তাঁর পায়ের কাছে।

তিনি তাঁর লম্বা বেদীটিতে হেলান দিয়ে জানলার দিকে সমানে একদৃষ্টে চেয়ে—যেমন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছবিতে আছে। দেখেই গভীর ভক্তিতে মন ছেয়ে গেল। আহা, চোখ নয় তো, যেন নির্মল শুকতারা!—কী দীপ্তি, অথচ নরম করুণা, গভীর শান্তি! যাক।

তাঁর পায়ের কাছে ব'সে ভাবলাম—এই নিটোল শান্তি নামল ব'লে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক উল্টো কাণ্ড: কোথাও কিছু নেই একটি স্বর আমার মনেরদোরে যেন টোকা মেরে প্রশ্ন ক'রে চলল: "কে তুমি? কেতুমি? কে তুমি?"

আমি প্রথমে হলাম আশ্চর্য, তারপরে—বিব্রত, শেষে—বিরক্ত। চেষ্টা করলাম কান না দিতে। কিন্তু স্বর থামতে চায় না যে—আর এ তো বাইরের কান নয় যে কানে তুলো দেবো!···অগত্যা ভেবেচিন্তে একটা উত্তর খাড়া করতেই হল—অবশ্য মনে মনেই। বললাম: "আমি কৃষ্ণদাস"। অমনি—কি আশ্চর্য—প্রশ্নটা বদলে গেল: "কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ কে?" আমি তখন নানা উত্তর খাড়া করলাম: অন্তর্যামী, ভক্তবৎসল নিয়ন্তা, আদিগুরু···কিন্তু প্রশ্ন থামে না কিছুতেই। বুঝলাম—পরীক্ষায় পাশ হই নি। শেষে অশান্ত চিত্তে ঘরে ফিরে এসে ব'সে ধ্যান লাগালাম ক'ষে। কিন্তু ধ্যান করব কী? প্রশ্ন চলে সমানেই: "কে কৃষ্ণ? কে কৃষ্ণ? কে কৃষ্ণ?"

শেষে হতাশ হ'য়ে রাধারাণীকে আর্জি জানালাম। তিনি ধ্যানে এসে জানতে চাইলেন—আমি কী উত্তর দিয়েছি। তখন বুঝলাম—ব্যাপারটা সঙিন, প্রশ্নটা আদৌই কল্পনা নয়—করেছিলেন মহর্ষি স্বয়ং। আমি রাধারাণীকে বললাম একে একে যা যা আমার মনে হয়েছিল। রাধারাণী মৃদু হেসে বললেন: "হ'ল না।"

"হ'ল না? তবে? মান বাঁচাও, বলো।"

তখন রাধারাণী বললেন আমার কানে কানে—অতি মৃদু সুরে···অথচ কী ঝংকার! আহা!

অসিত (রুদ্ধশ্বাসে): তারপর?

প্রেমল: তারপর আর কী? নিশ্চিন্ত। সঙ্গে সঙ্গে—সে কী ক'রে বোঝাব ভাই কী হ'ল? তাই শুধু বলি—হঠাৎ সব ধ্বনি থেমে গেল···সঙ্গে সঙ্গে নিটোল শান্তি এল ফিরে।

পরদিন সকালে ফের মহর্ষির ঘরে গিয়ে বসেছি যথাবিধি—তাঁর পায়ের কাছে। ধ্যান সুরু করতে না করতে মনে গভীর নিটোল শান্তি বিছিয়ে গেল। সে যে কী অপূর্ব শান্তি—ভাষায় কি তার আভাষ দেব ভাই? তাই থাক সে অপচেষ্টা, বলি তারপর কী হ'ল।

হঠাৎ আমার মাথায় কী খেয়াল চাপল চোখ বুঁজে মনে মনে মহর্ষিকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম: 'কে আপনি, কে আপনি, কে আপনি?'

অমনি হঠাৎ চোখ খুলে দেখি—দুসেকেণ্ড আগে যে বেদীতে মহর্ষি হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন সে বেদী খালি!

অসিত: খালি? মানে—?

প্রেমল: মহর্ষি উবে গেছেন—melted into thin air যাকে বলে। আশ্চর্য হ'য়ে আবার চোখ বুঁজেই তক্ষনি ফের চোখ খুললাম। দেখি মহর্ষি সেই একই ভাবে আসীন তাঁর বেদিতে—শান্তিসিন্ধু সদাশিব! হঠাৎ তিনি ফিরে তাকালেন—ঠোঁটের উপান্তে ঈষৎ হাসির ফিনকি—কী প্রসন্ন হাসি! তারপরেই ফের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না। তাঁরও না। আমার প্রশ্নের তিনি উত্তর দিলেন—যে ভাবে কেবল তিনিই দিতে পারতেন—আর কারুর সাধ্য ছিল না।

মা (অসিতকে): বুঝতে পারলে কি বাবা? না, ধাঁধা লাগছে?

অসিত (ঈষৎ অনিশ্চিত সুরে): বোধ হয় আঁচ পেয়েছি মা, বলতে পারি না। তিনি জানিয়ে দিলেন তো যে, রক্তমাংসের দেহটা তাঁর—মানে রমণ মহর্ষির—তাঁর আসল স্বরূপ নামরূপের অতীত? তাই না?

মা (খুশী): ধরেছ বাবা! (ললিতাকে) দেখলি রে মেয়ে আমার ছেলের কেমন সুবুদ্ধি? তুই তো ধরতে পারিসনি!

ললিতা: পারি নি বৈ কি! শুধু বলি নি। বাপী দশটা প্রশ্ন করলে তবে একটার জবাব দেয়—আমি সস্তা হব কী দুঃখে? তাই সাফ জবাব দিয়েছিলাম—"বলব কেন?"

মা (হেসে): খুব বাহাদুর! এমন না হ'লে চেলী!

প্রণব: কিন্তু আসল প্রশ্নটা ধামাচাপা প'ড়ে মারা গেল মা: যে, ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলা সাজে কি না?

মা: না না। বলছে ও। বলো দুলাল।

প্রেমল (অসিতকে): আমি যখন প্রথম লক্ষ্ণৌয়ে আসি, তখন আমারও মনে বিষম সংশয় ঘনিয়ে এসেছিল—ভারতবর্ষ কি সত্যিই পুণ্যভূমি? তা সংশয়ের অপরাধ কী বলো? ভাবো—কাদের সঙ্গে আমাকে মিশতে হ'ত দিনের পর দিন!—অধ্যাপক আর ছাত্র, উকীল আর ডাক্তার, রইস আর দেশধ্বজ যাদের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনার মুখেই খই ফুটত বিলিতি বোলচালের cliche-র। তাছাড়া ভড়ঙেরও সে জেল্লা কত—দেখানেপনা!—আমি কত কেতাব পড়েছি। ছাত্রেরা কপচাত নানা পাখীপড়া বুলি আর অধ্যাপকেরা আওড়াতেন নানা ধুমধড়াক্কা বিলিতি মতামত—এর ওর তার—যেসব বুলি আমাদের দেশে সেকেলে ব'লে বাসি হ'য়ে গেছে, শুধু হাসিরই খোরাক জোগায়। অথচ মজা এই যে, ভারতীয় হ'য়েও তাঁরা কেউ ভুলেও ভারতের বেদবেদান্ত গীতা ভাগবতের নাম মুখে আনতেন না, শুধু শুনতাম—সনাতন সব আপ্তবাক্যই হয় কুসংস্কার নয় আষাঢ়ে গল্প। শুনতাম উঠতে বসতে যে, হিউম্যানিটি (with a capital H) আর সায়েন্সই হলেন এ যুগের শিবশক্তি, জীবনের উদ্দেশ্য শুধু চাল বাড়ানো—to raise the standard of living। কালচার্ড হওয়া, সাহেবদের বাহবা পেয়ে নাম করা। সকলের মুখেই ঐ এক রা: pillars of society—যাঁরা আসতেন মা-র সালঁ-তে—সবাই এ বিষয়ে একমত যে, ধর্ম হ'ল মিডীভাল আর সায়েন্স হ'ল 'মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা। তাদের সঙ্গে মেশা ছিল এক যন্ত্রণা।

আমি নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতাম যদি শুধু মা-র বাইরের রূপই আমার চোখে পড়ত। কিন্তু তাঁকে ভালোবাসার জন্যই আমি দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর আসল স্বরূপ যা তিনি লুকিয়ে রাখতেন। কেমন ক'রে তাঁর এ-সত্য স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ হ'ল সে ইতিহাস বলব না—তার দরকারও নেই। কেবল এইটুকু বলি তাঁর মধ্যেই দেখতে পেলাম আমার গুরুকে। তারপর ঘটল আর এক অঘটন: তাঁর আশীর্বাদ পেতে না পেতে আমার এমন কয়েকটি আশ্চর্য অনুভূতি হ'ল যার ফলে আমার আর সন্দেহ রইল না যে আমি যা খুঁজতে ভারতবর্ষে এসেছিলাম তার চাবিকাঠি আছে মা-র কাছেই। তাঁকে বললাম সেকথা, চাইলাম দীক্ষা। মা বললেন: "আমি দীক্ষা দিতে পারি কেবল এই সর্তে যে, এর পরে যদি তোমার আর একটিও আত্মিক উপলব্ধি—Spiritual experience—না হয় তাহ'লেও তুমি সাধনা ছেড়ে দেবে

না।" অর্থাৎ কিনা, দীক্ষার ফলে যে-নবজন্ম হবে তার নির্দেশেই চলবে সমানে, মরুর পরে মরু পার হ'য়ে, যুক্তি, সংশয় সুবিধা এ সবের মায়া কাটিয়ে। আমি রাজী হ'লাম, কারণ বিলিতি সভ্যতায় আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম এই নব জন্মের ফলেই।

মা-র দীক্ষা পেতে না পেতে আমার চোখের ঠুলি খ'সে পড়ল—তাঁর মন্ত্রবলেই বলব। সঙ্গে সঙ্গে আমার এই নবলব্ধ দৃষ্টির সামনে ফুঠে উঠল ভারতের সত্য রূপ যা চর্মচক্ষে দেখা যায় না। আমার বুকে ভক্তির বন্যা ডেকে গেল, মনে হ'ল—ধন্য আমি যে, এ পুণ্যভূমিতে এসে ঠাঁই পেয়েছি এমন দেবী গুরুর চরণে। মার আদেশে বাংলা ও সংস্কৃত শিখলাম—পড়লাম উপনিষদ, ভাগবত, গীতা, তন্ত্র, চৈতন্যচরিতামৃত। এখানে ওখানে মিশবার সুযোগ পেলাম কয়েকজন সাধুর সঙ্গে বিশেষ ক'রে গুপ্তযোগী মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে। মার কাছে শুনেছিলাম তিনিই ছিলেন মা-র প্রথম গুরু। মহেন্দ্রবাবুও আমাকে সাধনার পথে কম আলো দেন নি। পড়ালেন বেদ, সাংখ্য, গীতা বিশেষ ক'রে তন্ত্র।...তারপর অনেক কিছুই উপলব্ধি হ'ল—গুরুর কৃপায়ই বলব—যার ফলে দেখতে পেলাম যে, ভারতের আত্মা—ধর্মই বটে, মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের অন্তিম বাণী মন বরণ ক'রে নিল :

নিত্যো ধর্মঃ সুখেদুঃখেত্বনিত্যে
জীবো নিত্যঃ হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ

(ললিতাকে) অর্থাৎ কেবল ধর্মই চিরন্তন, সুখদুঃখ আলোছায়া—আসে যায়, আত্মা অটল, কিন্তু তার বাহ্য বনেদ—basis—টলমলে।

অসিত : তারপর ? থামলে কেন ?

প্রেমল (উদ্দীপ্ত সুরে) : তারপর আর কি! মন আমার গান গেয়ে উঠল বিল্বমঙ্গলের দোয়ার দিয়ে :

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ
ত্বয়ি অপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ।

—(ললিতাকে) অর্থাৎ, ঠাকুর, তুমি প্রসন্ন হ'লে আর সবাই মুখ ফেরালেই বা কী, আর তুমিই যদি প্রসন্ন না হও তবে আর সবাই আমাকে রাজা করতে চাইলেই বা কী ? যেই গাওয়া, অমনি শুনলাম গুরুর কণ্ঠ ইষ্টের স্বর আর সঙ্গে সঙ্গে যেন এক দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলাম—আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের পাশ

কাটিয়ে—যে, ধর্মই এ দেশকে ধারণ ক'রে আছে আর সাধুরাই সে ধর্মের ধারক, প্রতিভূ। উপলব্ধি করলাম ভাগবতে নারায়ণের সাধুস্তুতিঃ "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্"—অর্থাৎ সাধুরাই আমার হৃদয় আর আমিই সাধুদের হৃদয়।

তারপর ঘটল আর এক কাণ্ড! দেখলাম স্বচক্ষে কুম্ভমেলা। আর দেখে অভিভূত হ'য়ে—সে যে কী হ'ল অসিত, কী বলব?—আর কোন্ দেশে ধর্ম আজো এমন জীবন্ত কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে? যে দেশে মাত্র গঙ্গা-স্নানে পাপী তাপী নির্মল হয়; যে দেশে সাধুকে দেখবামাত্র প্রণাম করতে ছুটে আসে ভক্ত অভক্ত সমান আগ্রহে; যেদেশে ঠাকুর আজো অফুরন্ত রাগমালায় তাঁর বাঁশি বাজান নিত্যবৃন্দাবনের লীলার অঙ্গীকারে; যে-দেশে মা বলতে আজো অগুন্তি বুকে জেগে ওঠে জগন্মাতার জগদ্ধাত্রী মূর্তি—সেদেশে দু চার লাখ অন্ধ বুদ্ধিমন্ত বিজ্ঞানের ক্ষীণ তীরন্দাজি দিয়ে কী ক'রে ভগবানের হিমালয় প্রতিষ্ঠার নড়চড় করবে শুনি? সত্যি বলছি তোমায় ভাই, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ভারত বেঁচে আছে আজো ধর্মের ঐতিহ্যকে লালন করছে ব'লেই। (থেমে) কিন্তু কুম্ভমেলার কথাই বা আলাদা ক'রে বলছি কেন? তোমাদের হাজারো ব্রতপার্বণে আজ কার নাম আঁকা? দেবতার। দৈনন্দিন জীবনে এদেশের লোক সকাল সন্ধ্যা কাকে স্মরণ করে? ভগবান্‌কে। এমন কি বাহ্য সমাজেরও আইন কানুন প্রণয়ন করেন কাঁরা? রাজনৈতিকেরা নয়—সাধু মহাত্মারা। এমন কি, তোমাদের বর্ণাশ্রম ধর্মেরও নিয়ন্তা বা সমর্থক ঐহিক রাজরাজড়া পুলিশ কোতোয়াল নয়, গীতা ভাগবত স্মৃতি সংহিতাই বটে। সেকুলার? না, ভারতের আত্মা কোনো দিন বিশ্বাস করে নি আজও করেনা যে, ভগবানকে বরখাস্ত ক'রে সমাজের কোনো স্থায়ী সংস্কার হ'তে পারে। তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দেই।

একবার আমি কাঠগুদাম থেকে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি ট্রেনে। তৃতীয় শ্রেণীতে ঢুকবামাত্র যাত্রীরা সবাই উজিয়ে উঠল। দারুণ ভিড়, কিন্তু দরিদ্র যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন নিজেরা নোংরা মাটিতে ব'সে আমার জন্যে বিছানা পেতে দিল। সাধুজির যেন কষ্ট না হয়। কেউ পাখা করে, কেউ সরবৎ এনে ধরে। কেউ ফল। কেউ চা। দেখ সত্যি বলছি ভাই, আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে উঠল। কার জন্যে এদের এত প্রীতি শ্রদ্ধা দরদ; এক

অচিন গেরুয়াধারী সাধু। আমাদের বুদ্ধি বিজ্ঞানের দেশে অসিত, কে পায় বিপুল সম্বর্ধনা? হয় রাজারাণী, না হয় নটনটী, না হয় সিনেমা তারকা, না হয় এক আধটা আইনষ্টাইন বা বার্নার্ড শ—যাঁদের প্রতিষ্ঠার মূলে—খবরের কাগজের কান ফাটানো জয়ধ্বনি। কিন্তু ভারতে রাজারাণীও মাথা নোয়ান সাধুদেরই পায়ে—কৌপীনবস্ত গান্ধিজি পান সার্বজনীন সম্মান।

ললিতা হাততালি দিয়ে: তুমি চমৎকার কথা বলো বাপী—একথা মানতেই হবে তোমার অতিবড় শত্রুকেও।

প্রণব: কথা তো ও চমৎকার বলেই। কিন্তু (প্রেমলকে) একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না কি? রাজারাজড়া এ দেশেও যে-কোনো ছাই মাথা সাধুর পায়ে মাথা নোয়ান না—গান্ধিজির মতন চৌখস প্রতিভাধরকে রাজনীতির আকাশে উল্কার মতন সর্বসাধারণের চোখ ধাঁধিয়ে ঝলকে উঠতে হয় তাদের অভিভূত করতে। আর কেন তারা অভিভূত হয় তাও তুমি বেশ ভালো ক'রেই জানো। অভিভূত হয়, কারণ গান্ধিজি সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার—phenomenon! তাছাড়া তাঁকে নিয়েও খবরের কাগজওয়ালারা কিছু কম ধুমধাম করে নি।

ললিতা: ঠিক বলেছ প্রণবদা। আমি এদিক দিয়ে ভেবে দেখি নি। বাপী এখানে একটু বেশি ব'লে ফেলেছে। গান্ধিজি সত্যিই এক অদ্ভুত মনিষ্যি। আমি বিলেতে শুনতাম এক ভারি চমৎকার রটনা আমেরিকান টুরিস্টদের সম্বন্ধে—যাঁরা এদেশে আসেন তিনটি জিনিষ দেখতে: তাজমহল, মহাত্মা গান্ধি আর রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

সবাই হেসে ওঠে, প্রেমলও যোগ দেয় সে হাসিতে একটু পরে হাসির রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পরে প্রেমল প্রণবকে বলে: "তোমার একথা সত্যি। কিন্তু তুমি আমার মূল বক্তব্যটি ঠিক ধরতে পারো নি—কিসের উপর আমি জোর দিতে চেয়েছিলাম। আমার বলবার উদ্দেশ্য—গান্ধিজির অভ্যুদয় এদেশে সবাইকে দেখতে দেখতে এমন অভিভূত করতে পারত না যদি না তাঁর কৌপীনবস্ত মূর্তি সন্ন্যাসীর ত্যাগের প্রতীক রূপে মান পেত। যতই বলো না কেন, য়ুরোপে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ধুমধাম করা হয় ধনী শিল্পী জননেতা বা বৈজ্ঞানিককে নিয়েই। ভারতে মান পায়—সাধু সন্ত ত্যাগী মহাত্মা।

প্রণব: কিন্তু ভাই, ধর্মভাবকে মাপা যায় না তো এইসব ধুমধাম দিয়ে।

তলিয়ে দেখলে কি দেখা যায় না—য়ুরোপ আমেরিকার গড়পড়তারা এখনো ধর্ম বিমুখ নয় ?

প্রেমল : আমি একথা মানি প্রণব যে গড়পড়তারা সবদেশেই মোটামুটি একই খাতে চলে, কেন না তাদের মূল চাহিদা ঝোঁক রোখ দাবিদাওয়ার স্থর তাল ছন্দ সর্বত্রই এক। কিন্তু তবু বলব ভারতের মাটির মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাকে অস্বীকার করা কঠিন। (অসিতকে) তুমি কালই আমাকে বলছিলে না লোয়েস ডিকিনসনের একটি ভ্রমণকাহিনীর কথা ? বলো তো প্রণবকে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ললিতা : রোসো রোসো। ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো, কেন আচমকা এ সাহেবের ডাক পড়ল। কে ইনি ?

প্রণব : নামজাদা লেখক, বার্টারাণ্ড রাসেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু, লীগ অফ নেশনের খশড়া প্রথম এঁরই মগজে গজিয়েছিল। ভেবেছিলেন ইনি হয়ত আজও ভাবেন কে জানে ?—যে সভাসমিতি ডেকে সবাইকে দিয়ে দলিল সই করিয়ে জগতের সব আপৎশান্তি হ'ল ব'লে !

অসিত : (প্রেমলকে) কিন্তু হঠাৎ তাঁর কথা তুললে কেন ?

প্রেমল : বলছি। তুমি বল তো আগে।

অসিত (প্রণবকে) : সাহেব এক ব্রিলিয়াণ্ট কাহিনী লিখেছেন সারা জগৎ চক্রদিয়ে। তাতে শেষে লিখছেন যে কিপলিং যে বলছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরকে কোনদিনই বুঝতে পারবে না—একথায় তার পুরো সায় আছে যদি "প্রাচ্য" কে বদলে "ভারত" বসানো হয়। কারণ বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে তাঁর মনে হয়েছে যে, য়ুরোপ চীন জাপানের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে পারে, কেবল একটি দেশকে কোনদিনই বুঝতে পারেনি ও পারবে না— ভারতবর্ষের মতিগতি ও ভাবধারা।

প্রণব : ডিকিন্সনের রায়-এ কি তুমি সায় দাও প্রেমল ?

প্রেমল : দিই, কেবল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমার মনে হয় যাঁরা য়ুরোপের বুদ্ধিবাদী কালচারকে ভারতের অধ্যাত্মবাদের চেয়ে বড় মনে করেন তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের মতিগতি ভাবধারা ডিকিন্সনের মতনই অবোধ্য মনে না হ'য়েই পারে না। যেমন ধরো রোমাঁ রোলাঁ। কিছু মনে কোরো না অসিত, যদি রোলাঁ সম্বন্ধে তোমার উচ্চধারণায় আমি নাম সই

করতে না পারি। কী করব বলো? ভারতবর্ষকে ভালোবাসবার পর থেকে আমার দৃষ্টিই বদলে গেছে যে। আমার এখন মনে হয় যে রোলাঁ জাঁকালো ইনটারন্যাশনাল জগৎগুরু হ'য়ে সবাইকে পথ দেখাতে গিয়ে নিজে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি ভেবেছেন—বিবেকানন্দী জীবসেবা—খৃষ্টান স্পিরিট অফ সার্ভিস—হ'ল ভারতের আত্মারও মূল বাণী। "হতেই হবে"—হাঁকলেন রোঁলা —"যেহেতু হিউম্যানিটি এক, বিশ্বদেব is equal to বিশ্বসেবক।" আমার আপত্তি এইখানেই—একেবারে গোড়াতে। আমি বলি—ভারতের বাণীকে ভালো ব'লে সার্টিফিকেট দিতে না চাও দিও না, যদি ভারতের ধর্মবাদকে অনৈহিক বা সেকেলে ব'লে নাকচ করতে চাও তবে সে অধিকারও তোমার মঞ্জুর। কিন্তু যে-বাণী ভারতের আত্মার বাণী নয় সেই উন্নাসিক পরোপকারবাদ —doing good to others, ভারতেরও মর্মবাণী এমন কথা ঘোষণা করতে পারো না, বলতে পারো না তারস্বরে উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবাদী রেডিয়োতে: "এসো ভাই সব! আমরা সবাই এক পথের পথিক। ভগবান থাকেন থাকুন তাঁর আকাশ বৈকুণ্ঠে, আমাদের—কিনা হিউম্যানিটির একমাত্র লক্ষ্য হ'ল সার্ভিস টু হিউম্যানিটি'।" ভারত আবহমানকাল সব আগে বসিয়েছে ভগবানকে, তারপর সংসার্ বা সংসারীকে। ভারতের মন্ত্র হল শিবজ্ঞানে জীবসেবা—আহাবাদী দয়ালুতা কি noblesse oblige humanitarianism নয় নয় নয়। রোলাঁ হিন্দুধর্মের এই বাদী স্বরটিই ধরতে পারেন নি, তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে নমো নমঃ ক'রে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বিবেকানন্দকে নিয়েই ধুমধাম করেছেন তাঁকে ভারতের আত্মার চরম প্রতিভূ হ'লে বরণ করে। এর নাম যদি দৃষ্টিবিভ্রম না হয়—

প্রণব: রোসো রোসো, স্বামী বিবেকান্দ জীবসেবার বাণী প্রচার করেছেন ব'লে কি বলবে—তিনি ভারতের আর্যবাণীর—ধ্যান তপস্যার—মর্মজ্ঞ ছিলেন না?

প্রেমল: না, তা বলি না। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মহাপুরুষ—সেণ্ট পলের মতনই মহাশক্তিধর, সংস্কারক, প্রচারক। কিন্তু যেমন কেবল সেণ্ট পলের প্রতিভার গজকাঠি দিয়ে খৃষ্টের মহিমার তল পাওয়া যায় না, তেমনি কেবল বিবেকানন্দের কীর্তির ভাষ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মজ্ঞ হওয়া যায় না। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে যে বুঝতে পারেনি—বা চায়নি—তার কাছে হিন্দুধর্মের মর্মবাণীটিই অজ্ঞাত থেকে গেছে জানবে। না, এ আমার গাজোয়ারি কথা নয় প্রণব, যে, এ-যুগে ভারতের আত্মার তুঙ্গতম আলোকস্তম্ভ—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ নন।

আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু। স্বামীজিকে আমি সুরথদার মতনই শুধু শ্রদ্ধা নয়, ভক্তি করি মন-প্রাণে। এ যুগে তাঁর মতন মহাবীর সংস্কারকের খুবই প্রয়োজন ছিল হিন্দু সমাজের হাজারো তামসিকতার আগাছা সাফ করতে। আমি ঠিক কী বলতে চাচ্ছি হয়ত তোমাকে দুকথায় বোঝাতে পারব না, কিন্তু অসিত বুঝবেই বুঝবে। কারণ সে শ্রীরামকৃষ্ণকে আশৈশব ভালোবেসে এসেছে ব'লেই আমার এই রায়-এ সায় না দিয়ে পারবে না যে, মা কালীর এই চিরশিশুটির মা-মা-ঝঙ্কারেই বেজে উঠেছে ভারতের অন্তরাত্মার একটি গভীরতম স্বরঝঙ্কার—যে-স্বর তার একান্ত নিজস্ব, অর্থাৎ যে-স্বরে আর কোনো ধর্মই দোয়ার দিতে পারে নি—অন্ততঃ আজ পর্যন্ত। তাই আমি বলবই বলব যে, স্বামীজির বীর্য-ত্যাগ-জ্ঞানের হাজার গুণগান করলেও রোলাঁর কর্ম নয় শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমার মূল্যায়ন করা। কিম্বা ধরো, শ্রীচৈতন্যদেব—যিনি যেখানেই গিয়েছেন তাঁর হরিনামের মৃতসঞ্জীবনী রসে ঘুমন্ত ও মরন্তদের বাঁচিয়ে জাগিয়ে মাতিয়ে তুলেছেন—লক্ষ লক্ষ প্রাণের মরা গাঙে ভক্তির বান ডাকিয়ে, আত্মঘাতী কামনাবাসনার কাঁটাবনে আগুন লাগিয়ে, কাঙালদের মধ্যেও শ্রীক্ষেত্রের পাত পেড়ে। মনে করো কি, আজ যদি তিনি আবার হঠাৎ ভারতে অভ্যুদিত হন নামের হরির লুট ঝরাতে, তাহ'লে রোঁলা-বর্গীয় মিশনরিরা কি তাঁর জয়ধ্বনি করবেন? না অসিত, তাঁরা বৈজ্ঞানিক অজ্ঞদের স্বরে স্বর মিলিয়ে তাঁর প্রেমোন্মাদকে হিস্টিরিয়া নাম দিয়ে পাগলাগার-দের ব্যবস্থা করবেন ডাক্তারের সার্টিফিকেটে। কিন্তু ভারতবর্ষে কন্যাকুমারী থেকে মানস সরোবর পর্যন্ত কোটি কোটি হিন্দু তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে চোখের জলের প্রণামে।''

ঘরের মধ্যে সবাই নিশ্চুপ। একটা থমথমে ভাব জেগে ওঠে। মা আঁচলে চোখ মোছেন, ললিতা মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করে। অসিতের বুকের তার বেজে ওঠে। প্রণব একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে প্রেমলের আবেগ-উচ্ছল রাঙা মুখের পানে। প্রেমল একটু থেমে গাঢ়কণ্ঠে ব'লে চলে:

"আমি বলছি তোমাকে অসিত, তোমরা যদি য়ুরোপের মন্ত্রশিষ্য হ'য়ে ধর্মে তোমাদের সহজ শ্রদ্ধা হারিয়ে বিশ্বাসের কোঠায় দেউলে হ'য়ে পড়ো, তাহ'লে ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ'—ভগবানকে ধর্মকে হারিয়ে সব হারাবে—কারণ ভারতের প্রাণপুরুষ আর কোথাও নেই আছেন তার ধর্ম ধ্যান ভক্তির মর্মকোষে। তোমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে আজ ক্রমশঃ ফেঁপে উঠছে বুদ্ধি রোখালো, দম্ভ

জাঁকালো, ব্যঙ্গ ঝাঁঝালো অশ্রদ্ধা—যার চেয়ে সর্বনেশে বিষ আর নেই। গীতার কথা ভুলো না যে, "সংশয়াত্মা প্রণশ্যতি"—নাস্তিক অশ্রদ্ধাকে বরণ করার অন্য নাম—মরণবাড় বাড়া। মনে রেখো যে, বার বার বিদেশীদের হানা দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের আত্মাকে রক্ষা করেছেন ঠাকুর এই শ্রদ্ধার বর্মে পথ দেখিয়েছেন পরা প্রজ্ঞার আলোয়, বাঁচিয়ে তুলেছেন ভক্তির সুরধুনীতে। তাই তোমরা দেশ হারালেও ধর্মকে আঁকড়ে ধ'রে ছিলে ব'লে ধর্ম বারবারই তোমাদের রক্ষা করেছে। যুধিষ্ঠির একটি লাখ কথার এক কথা বলেছিলেন যক্ষকে যে, 'ধর্ম এব হতো হন্তি, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'—'ধর্মকে মারলে ধর্ম তোমাদের মারবে, রাখলে—রাখবে।

অসিত: তোমার একথায় আমার মনেরও পুরো সায় আছে ভাই, বিশ্বাস কোরো। কেবল, কিছু মনে কোরো না—তুমি কি রোলাঁর 'পরে একটু অবিচার করছ না? রোলাঁ—

প্রেমল (হাত তুলে): না অসিত, রোঁলা, রাসেল ডিকিন্সন—এঁদের ওকালতি কোরো না fair-minded হ'তে চেয়ে। অধর্ম সিঁধ কাটে এই সব ওকালতির ছিদ্র পেয়েই। রোঁলা, রাসেল, ডিকিন্সন, ওয়েল্‌স্ এঁরা কেউ মন্দ নন। মনে মনে এঁরা সত্যিই চান মানুষের মঙ্গল। কেবল জানেন না এক—সেরা মঙ্গল কী, দুই—কী ক'রে মানুষকে আত্মঘাতের অমঙ্গল থেকে বাঁচানো যায়। এঁদের হয়েছে কি বলব? মগজী বুদ্ধির তাঁবেদারি করতে করতে—এঁরা প্রত্যেকেই আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি অনুভব খুইয়ে বসেছেন। তাই তো জগতকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে চান সভা সমিতি, দলিলদস্তাবেজ আন্তর্জাতিক সলাকলায়। আত্মিক দৃষ্টি উপলব্ধি থাকলে এঁরা কখনই এমন অশ্রদ্ধেয় কথা বলতেন না যে, ভারতের ধর্মনিষ্ঠা কুসংস্কার, ভক্তিবাদ শোচনীয়, গুরুবাদ সেকেলিয়ানা। এ-পুণ্যভূমিতে তাঁরা রাতারাতি নাস্তিক্যের আবাদ ক'রে সৌভ্রাত্র্যের সোনা ফলাতে চান—যে দেশের প্রাতঃস্মরণীয় সাধুসন্তেরা স্তবগান করেছেন—শিবপীঠ বারাণসীর, দেবতাত্মা হিমালয়ের, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার—যার জড় মৃৎশিলার মধ্যেও তাঁরা ভগবানের দেখা পেয়ে ধন্য হয়েছেন, জীবজন্তুর মধ্যেও দিব্য-লোকের প্রতীক খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে জ্ঞানী ভক্তেরা যুগযুগান্ত ধ'রে দীক্ষা পেয়ে এসেছেন জগৎপ্রণামের।

ললিতা (ফের চোখ মুছে): কেবল একটা কথা বাপী—জগৎপ্রণাম

ব্যাপারটা কী? কথাটা আগেও তোমার মুখে শুনেছি—কিন্তু মানেটা বলেছিলে কিনা মনে পড়ছে না।

প্রেমল (ললিতাকে) তোমার মনে নেই? বাঃ! এই সেদিনই যে মার সাম্নে পরে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম? শ্লোকটি বিখ্যাত। শোনো তবে, আবার বলি:

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্।

অর্থাৎ, আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয় প্রতি বৃত্তিকেই ঈশ্বরমুখী করতে হবে: বাণী হোক তোমার গুণগানে রত, কান শুনুক কেবল তোমার কথা, হাতে করুক তোমার পূজা, মন থাকুক তোমার চরণলগ্ন, চোখ করুক শুধু সাধুদর্শন আর মাথা প্রণামে নত হোক এই জগতের উদ্দেশ্যে যেখানে তোমার নিবাস। (অসিতকে) জগৎপ্রণাম কথাটি কী সুন্দর, বলো তো? এ-অপরূপ ভাবধারা আর কোন্ দেশে ফুটে উঠেছে এমন শ্রদ্ধার বাগানে ভক্তির ফুলটি হ'য়ে?

মা (দু হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে): শোনো অসিত, আজ বলব তোমাকে লগ্ন এসে গেছে—বলিনি একটু আগে?

তুমি আমাকে দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করেছ—আমি কুকুরটিকে কেন আমার বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়াই রোজ। এতদিন আমি বলি নি। কারণ (পুলকে শিউরে) আহা!······আমি কুকুরকে সইতে পারতাম না বাবা! মনে করতাম অপবিত্র। একদিন আমার ঠাকুরের ভোগ রেঁধে বিগ্রহের সামনে তাঁকে নিবেদন ক'রে প্রার্থনা করছি তাঁকে ভোগ গ্রহণ করতে—এমন সময়ে এই কুকুরটি—রাস্তার কুকুর—পিছন থেকে এসে সে-ভোগে মুখ দিয়েছে। চম্‌কে উঠে আমি পাশের লাঠি তুলে ওকে মারলাম। ও কেঁদে উঠল। অমনি আমি দেখলাম··· আমার···আমার ঠাকুর···বালগোপাল তার মধ্যে শুয়ে! আর···আর তিনিও কাঁদছেন।

(গাঢ় কণ্ঠে) সেই থেকে এ-কুকুর হয়েছে আমার নিত্যসাথী। (উদ্দেশ্যে প্রণাম)

প্রণব (চোখ মুছে): আরতির সময় হয়েছে মা!

চোদ্দ

রোজকার মতন ওরা মন্দিরে বসল। ললিতা বসল মা-র ঘরের চৌকাঠ পেরিয়েই। তার ডানদিকে অসিত, তারপরে প্রেমল ও প্রণব।

জন্মাষ্টমী। পুণ্য দিন। পাহাড়ীরা অনেক বনফুল এনেছিল। স্বরথদা ও ফ্লোরা বৌদি পাঠিয়েছিলেন নানা মিষ্টান্ন ধূপ ও ফল।

ললিতা ঠাকুরের জন্যে বিশেষ পরমান্ন-ভোগ রেঁধেছিল।

প্রথমে ললিতা গাইল গোবিন্দ দাসের বিখ্যাত গান: "সুন্দরি রাধে! আওয়ে বনি!" তারপর আরতি হ'ল। সব শেষে প্রেমল অসিতকে গাইতে বলল তার সবচেয়ে প্রিয় গান: বৃন্দাবনের লীলা। গাইতে না গাইতে অসিতের বুকের রক্ত উছল হ'য়ে ওঠে:

নিত্য বৃন্দাবন

সেই বৃন্দাবনের লীলা পড়ে আজ মনে—
সেই নন্দগোপাল কান্ত কিশোর
দীপ্তি দুলাল মরি মনচোর
নাচিত যে রাসে প্রণয়ের মধুবনে:
আজ মনে পড়ে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে॥

প্রাণ- তুফানে জ্বলিত তারাদীপে যে গগনে,
সেই কালো নিরাশায় আলোনন্দন,
ধূসর ধরায় রঙিন স্বপন,
রজনী-বেদনা পোহাত যার বরণে:
আজ পড়ে মনে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে॥

মরু- ক্ষুধায় ঝরিত যে সুধা-নির্ঝরণে,
যত ম্লান অনিত্য বাঁধন মায়ার
কাটিত স্নিগ্ধ চাহনিতে যার,
উছসিত প্রাণ যার প্রেম-পরশনে:
আজ পড়ে মনে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে॥

যত ক্ষয় ক্ষতি আনে অবসাদ এ জীবনে,
যত চিন্তা ভাবনা জয় পরাজয়,
সুখের সাধনা লোকলাজ ভয়,
ভুলিতাম যার "আয় আয়" বাঁশি-স্বনে :
আজ পড়ে মনে তায়—পড়ে ফিরে ফিরে মনে ॥

ভালো- বাসা যে বিলাতে এসেছিল জনে জনে,
দিতে ঠাঁই না-চাহিতে তার রাঙা পায়,
বিধুর নিশীথে মধুর উষায়,
ডাকে আজো সখী, সে হৃদি-বৃন্দাবনে :
তার ঘরছাড়া নীল মুরলীর মূরছনে।
চল বরিতে লো তার চরণ-চিরন্তনে ॥

ওরা হাসে বলে : "ওরে পাগল, রাখিস মনে
হায়, অমৃত-স্বপন ফলে না রে জাগরণে,
চিররঙিনের ছবি শুধু কবি-কল্পনা,
ছায়া-ইন্দ্রধনুর মায়া জলজল্পনা,
চিরজীবন কোথায় মরণধরায় বল্ ?
চিরসুখ-আশা শুধু সোনার হরিণ-ছল,
শুধু বেদনার ধু ধু মরু ছায় এ জীবনে।'

ওরা হাসে, কলভাষে, ওরা জানে না তাই হাসে ;
ওরা জানে না, তাই মানে না, আমি জানি তাই মানি ;
আমি শুনেছি তোমার বাঁশি অন্তরে তাই বঁধু, আমি জানি ;
ডাকে যে তোমায়—তায় লও রাঙা পায় টানি' ;
তুমি এসেছিলে ভালোবেসেছিলে আমি জানি ;
সুধাধারে ক্ষুধাবুকে ঝরেছিলে আমি জানি ;—

শুধু এসেছিলে নয়—আসো, তুমি ডাকিলেই কাছে আসো,

আজো বাঁশি-সুরে ভালোবাসো ;
ডাকি আঁখিজলে যেই "কোথা তুমি?" সেই করুণায় নেমে আসো,
তুমি নয়ন মুছাতে আসো ;—

তুমি করো বুকে বুকে যুগে যুগে গান বঁধু,
তাই বরে তব ঝরে সুখে দুখে আজো মধু ;
তাই আনন্দে পাই যারে
পাই বেদনায়ও ফিরে তারে।

দুখ- বাদলে তোমায় জানি সুখ-কিরণে তোমায় জানি
বঁধু, বিরহে তোমায় জানি মধু-মিলনে তোমায় জানি
আমি জীবনে তোমায় জানি স্বামী, মরণে তোমায় জানি ॥

গানের শেষে আঁখর দিতে দিতে অসিতের মনের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস জেগে উঠল। আঁখরের পর আঁখর জোগাতে লাগল কে যে! এত আঁখর সে কখনো দেয়নি। চোখের জলও বাধা মানে না আর। বুকের মধ্যে যেন ভক্তির দুকূল ভাঙা বান ডেকে যায়!…

গান শেষ হ'তে মন্দিরের মধ্যে এক নিটোল নৈঃশব্দ্য ছেয়ে যায়। অসিত চেয়ে দেখে—ললিতা দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু ক'রে। প্রেমল একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে চেয়ে, চোখে অশ্রুআভাষ।

হঠাৎ প্রণব মৃদু স্বরে প্রেমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল: "জানো, মা বাইরের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে গান শুনছিলেন।"

প্রেমলের চমক ভাঙল। সে চকিতে প্রণবের দিকে ফিরে বলল: "সে কি? মা? খোলা বারান্দায়?"

ললিতা (শিউরে উঠে): মা-র বুকে সর্দি বসেছে যে!

প্রণব (ঘাড় নেড়ে): বটেই তো। মা খুব অন্যায় করেছেন। এই ঠাণ্ডায়—

প্রেমল (লাফিয়ে উঠে): তাহলে মা নিশ্চয়ই ওদিক দিয়ে ঘুরে এসেছিলেন—গান শুনতে। কারণ এদিকে চৌকাঠের কাছে ললিতা ব'সে ছিল তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তো আসতে পারতেন না।

প্রণব : তাই তো ভাবছি—

প্রেমল : চলো চলো।

ওরা চৌকাঠ পেরিয়েই ফিরে এল মা-র শোবার ঘরে।

দেখল মা স্থির হ'য়ে তাঁর খাটটিতে ব'সে দেয়ালের দিকে চেয়ে। হাত দুটি কোলের উপরে।

প্রেমল বলল : "মা! তুমি কি ব'লে—"

ললিতা হাত তুলে বলল : "শ্—শ্! দেখছ না মা সমাধিতে।"

ওরা দাঁড়িয়ে রইল হাতজোড় ক'রে।

* * *

মিনিট দশেক পরে সাড় ফিরে আসতেই মা অসিতের দিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন। সে এগিয়ে আসতেই ধরা গলায় বললেন : "বোসো বাবা—না, মাটিতে নয়—আমার খাটেই বোসো—আরো কাছে, আমার কাছে স'রে এসো—আরো।"

অসিত ঈষৎ কুণ্ঠিত হ'য়ে বসল! মা-র খাটে সে এর আগে কোনোদিন বসে নি তো—প্রেমল প্রণব ও ললিতা রোজকার মতন মাটিতেই বসল সতরঞ্চের উপরে।

মা গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মৃদু স্বরে বললেন : "কিছু দেখতে পেলে না বাবা?"

অসিত (চমকে) : দেখতে? কী মা?

মা : ঠা······ঠাকুর।

অসিত (শিউরে উঠে) : ঠাকুর? মানে কৃষ্ণ?

মা : আমার ঠাকুর আর কে বাবা? (ফের অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে জোর ক'রে) তুমি যখন······শেষের দিকে······মানে আঁখর দিচ্ছিলে না?···ঠিক সেই সময়ে—

অসিত শুধু প্রশ্নোৎসুক কণ্ঠে মার চোখের দিকে চেয়ে থাকে···

মা : ঠাকুর এসেছিলেন।······হ্যাঁ বাবা, প্রথমে এসেছিলেন আমার ঘরে। তারপর······ঐ চৌকাঠ পেরিয়ে······গেলেন মন্দিরে।······আমি তো এদিক দিয়ে ঢুকতে পারতাম না······ললিতার জন্যে। তাই···আমাকে ···ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হ'ল······ঠাকুর যে বাবা! ছুটে না গিয়ে কি পারি?

তিনি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঠায় চুপ ক'রে শুনছিলেন। হ্যাঁ বাবা··· দেখেছি আমি খোলা চোখেই···কিন্তু তুমি দেখতে পাও নি!

অসিত (বিহ্বল): না মা···তবে···মানে···

মা (একটানা—থেমে থেমে): হ্যাঁ···ঠাকুর। ঠাকুর!···নিজে এসেছিলেন ···শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তোমার দিকে চেয়ে···ঠোঁটের কোণে অপরূপ···হা··· হাসি। ও ঠাকুর ঠাকুর! (চোখ দিয়ে জল ঝ'রে পড়ে···ললিতা উঠে এসে চোখ মুছিয়ে দেয়, মা ভাব মুখে ব'লে চলেন শুধু) ঠাকুর ঠাকুর···ঠা···

অসিত নত হ'য়ে মা-র পায়ে মাথা রাখে। চোখের জল তারও বাধা মানে না।

* * *

মা-র মুখ খুলে গেল। একের পর এক ব'লে চললেন তাঁর নানা দর্শন শ্রবণ অনুভূতির কথা···নানা দেবদেবীর আবির্ভাবের কথা···প্রসাদের কথা আরো কত কী। অসিত ঠিক ক'রে রেখেছিল সব তার ডায়রিতে টুকে রাখবে যেমন রোজই রাতে রাখছিল।···

মার বলা শেষ হ'লে অসিত গাঢ় কণ্ঠে শুধালো: "আপনি কি ঠাকুরকে সর্বদাই দেখতে পান মা?"

মা: নিজের হৃদয়ে সর্বদাই দেখি বাবা,···তবে বাইরে আর দেখতে পাই না—যেমন যেমন···আজ ঠাকুর দেখা দিলেন। আগে আগে বাইরেও দেখতে পেতাম—প্রায়ই।

অসিত: তাহলে আজকাল আর পান না কেন মা?

মা (একটু চুপ ক'রে থেকে): ঠাকুর বললেন—যদি বাইরে আমি তাকে বেশি দেখি তাহ'লে আমার দেহ থাকবে না।

অসিতের বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে উ ল। মনে পড়ল মা-র কথা: "আমার কাজ শেষ হয়েছে বাবা। এখন শুধু পথ চেয়ে বসে থাকার পালা—কখন ডাক আসে।"

সকলে একে একে মা-র পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয়। শুধু প্রেমল থাকে।

অসিত ঘর থেকে বেরুবার সময়ে মা তাকে ডাকলেন। সে ফিরে আসতেই বললেন: "বোসো বাবা, এক মিনিট। একটি কথা বলার আছে।"

অসিত : কী মা ?

মা : ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন···তোমাকে ধ্যান ট্যান বেশি করতে হবে না। তুমি তাঁকে ঐ···গানের মধ্যে দিয়েই পাবে।···বেঁচে থাকো বাবা—যার গান শুনতে ঠাকুর নিজে আসেন নিত্যবৃন্দাবন থেকে।···

(প্রথমার্ধ সমাপ্ত)

শেষার্ধ

পঞ্চম পর্ব

(তিন বৎসর পরে)

উদ্বোধন

TENNYSON

Read my little fable
He that runs may read
Most can raise the flowers now
For all have got the seed

কথিকা আমার করিও পাঠ
উধাও চলিবে যবে :
সকলেই ফুল ফোটাতে পারে,
বীজ নাই কার ভবে ?

* * *

Speak to Him thou for he hears,
and Spirit with Spirit can meet—
Closer is He than breathing,
and nearer than hands and feet.

তার সাথে করো আলাপ, শোনে সে প্রাণের কথা সবার
প্রাণের শ্রবণে তার—দিতে প্রেমসঙ্গ :
বুকের শ্বাসেরো চেয়ে রাজে কাছে দিবানিশি সে অপার,
প্রতি অঙ্গের চেয়ে অন্তরঙ্গ ।

* * *

If thou shouldst never see my face again,
Pray for my soul. More things are wrought by prayer
Than this world dreams of. Wherefore, let thy voice
Rise like a fountain for me night and day.

যদি আমাদের এ জীবনে দেখা না হয় কখনো বন্ধু, আর—
প্রার্থনা কোরো আত্মার তরে তুমি আমার ।
প্রার্থনায় যে কত অঘটন ঘটে—স্বপনেও জগত যারে
পারে না ভাবিতে—জানি আমি, কহি অঙ্গীকার ।
তাই এ মিনতি কণ্ঠ তোমার উছলি উঠুক আমার তরে
রজনীবিহান—ঝর্ণা যেমন নিয়ত ঝরে ।

উৎসর্গ

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা-১৬

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

স্নেহভাজনেষু,

তোমাকে "ছায়াপথের পথিক"-এর শেষার্ধ উৎসর্গ করলাম এতে হয়ত তুমি আশ্চর্য হবে একটু। তবে তোমাকে লিখেছি তোমার রবীন্দ্র-তর্পণ প'ড়ে আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে, মহাজনের প্রতি শ্রদ্ধা তোমার আন্তরিক। এ যুগে মহানুভব মহাপ্রাণদের প্রতি শ্রদ্ধাকে অনেক সময়েই ইদানীন্তনেরা সেকেলে ব'লে উপেক্ষা ক'রে থাকেন। মহাভারতে অকারণ বলেনি "অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপ প্রমোচনী" অর্থাৎ অশ্রদ্ধা মহাপাপ, শ্রদ্ধাই পাপমোচন করে, কারণ মহাত্মারাই আমাদের অন্তরাত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাই খৃষ্ট তাঁদের উপাধি দিয়েছিলেন salt of the earth—যে তামসিকতার বিষক্ষয় ক'রে মানুষকে সাত্ত্বিক করে।

'ছায়াপথের-পথিক'—এ এই শুদ্ধিদাতা বর্গীয় কয়েকটি মহাজনের কথা লিখেছি যাঁদের স্বচক্ষে দেখেছি ব'লেই মন আমার দেশের এ দুর্লগ্নেও হতাশ হয় নি। শঙ্করাচার্য তাঁর 'বিবেক চূড়ামণি'-তে লিখেছেন "বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধ চক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যং"—অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে নিজের নিঃসংশয় বোধ-এর কষ্টিকালিতেই পেতে হবে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—direct experience এর মাধ্যমে। মহাত্মাদের সংস্পর্শেই এ অপরোক্ষ অনুভবের শক্তি জাগে। তুমি একথা মানো জেনেছি তাই তোমাকে দরদী ব'লে এ উপহার।

ইতি
তোমার নিত্যশুভার্থী
দিলীপদা

প্রেমল বৈরাগীর বাণী

"মনোবিশ্বের ঘোর গবেষণা বুদ্ধি সাধনা বরিয়া যারা
সিংহনিনাদে আত্মপ্রসাদে দৃপ্ত পুলকে আত্মহারা,
শোনে নি অধীর জীবনে গভীর দীক্ষামন্ত্র যারা ভূতলে,
হৃদয়-আবেগে তীর্থপথের মিলে না পাথেয়—তারাই বলে।

"যত দেয় মন তর্কযজ্ঞে যুক্তি আহুতি—মিলায় তত
শান্তিকিরণ, বেদনার ধূমে আবছায়া হয় বরণ-ব্রত।
কামনাবাসনামুগ্ধেরা তবু পাতে না তো কান গভীর সুরে,
শোনে না—যে চায় গোলকধাঁধায় পথ—দিশা পায় হৃদয়পুরে।

"রাজধানী তার নিত্যহৃদয়বৃন্দাবন—আনন্দে যেথা
বাঁশরীনূপুরে ডাকে ব্রজরাজ মিলনে ঘূচাতে বিরহব্যথা।
যে চায় সে-ডাকে দিয়ে সাড়া তার রাঙা পায়ে ঠাঁই সহজ প্রেমে,
নাই তার ভয়, হবে তার জয়, তার তরে হরি আসিবে নেমে।

"অকূলপাথারে ঘোর তুফানেও ডুবিবে না তার দুরাশাতরী,
জাগরণে তার ফলিবে স্বপন ভুবনমোহনে হৃদয়ে বরি'।
চ্যুতিও সোপান হবে তার, হবে বাধাও গতির সহায় তার
হবে অঘটনী করুণার বরে কালোও আলোক চমৎকার!

"শ্রদ্ধার বীজ হৃদয়ে বপন করে যে সুজন—ধন্য সে-ই,
প্রজ্ঞা ফলিবে সে-বীজে, লভিবে শক্তি সে নামকীর্তনেই।
তর্ক-বিচার পথে কে-পেয়েছে জীবন্মুক্তিবর অপার?
সরল প্রণামে জ্বলে ধূলিধামে তারকাকরুণা হিয়ারাধার।"

ভারতের এ-চিরন্তনী বাণী ঝঙ্কৃত হ'ল কণ্ঠে তব,
নিষ্ঠাতপসজ্ঞানভক্তির ভাষ্য বিরচি' নিত্যনব।
কৃষ্ণপ্রেমের ওগো একান্তী সাধক! এদেশে আসিলে তুমি
গাহিতে: "সেবক আমি শ্যামলের, ভারতই আমার জন্মভূমি।"

হরিদ্বার

ভাই প্রেমল,

কাল তোমার চিঠি পেলাম অনেকদিন পরে। প্রথমে খুবই আনন্দ হল—কতদিন পরে তোমার চিঠি এল—কিন্তু তার পরেই হরিষে বিষাদ: এত ছোট চিঠি! তবে উপায় কি? তোমাকে যে একলা কত দিক সামলাতে হয় দেখে এসেছি তো স্বচক্ষেই! ঠাকুরের ভোগ রান্না, ধান বোনা, চরকা কাটা, ছুতোরের কাজ করা, ফল ফুলের চাষ—সবার উপর নানা অতিথির দেখাশোনা ও গীতা উপনিষদের ভাষ্য লেখা।

দিনের পর দিন শুনছি—আবার এক বিশ্বযুদ্ধ বাধবে কে জানে? সেদিন হিটলারের "Moin Kampf" পড়ছিলাম। জর্মন জাতকে Herrenvolk ব'লে কী দম্ভ! এরূপ ক্ষেত্রে তোমাদের ঐ সুদূর অরণ্যে নিজের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানেরই কাজ বৈ কি। কেবল আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয় প্রায়ই: হিটলার তো দেখছি এক বিভীষণ প্রলাপী—বদ্ধ পাগল! বুদ্ধিমান জর্মন জাত তাকে Fuehrer ব'লে বরণ ক'রে নিল কেমন ক'রে? যাহোক নিয়েছে যখন তখন আর সবাইকেও তো তটস্থ হ'য়ে থাকতেই হবে—নাজিসমের উত্তরে আর কোনো একটা অনুরূপ হুহুঙ্কারী "ইসম্‌" খাড়া করতে। তুমি লিখেছ স্পিরিচুয়াল কম্যুনিসমের কথা। শুনতে কর্ণরোচক, কিন্তু "কম্যুনিসম্‌" শুনলেই কেমন যেন সভয় রোমাঞ্চ হয়। আমি সম্প্রতি রুষদের পুলিশ রাজ্য, চেকা, N. K U. D. ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি বই পড়ে বিষম ঘা খেয়েছি। যা পড়েছি তার সিকির সিকিও যদি সত্যি হয় তাহ'লে নির্ভরসা হ'য়ে বলতেই হয়, তোমাদের সুরে সুর মিলিয়ে, যে বনে গিয়ে বাস করাই ভালো ধানের চাষ ক'রে, চরকা কেটে শক্তি থাকলে Thoreau-র মতন নিজের হাতে নিজের কুটির গ'ড়ে। কেবল দুঃখ এই যে বনবাসেরও ফ্যাসাদ কিছু কম নয়। সেদিন ফের রামায়ণ পড়ছিলাম। সীতা যখন আবদার ধরলেন রামের সঙ্গে বনে যাবেনই যাবেন তখন রাম তাকে বোঝাচ্ছেন ভয় দেখিয়ে: "বনে থাকা দারুণ কষ্ট সতী! জানো না তো: শুধু হিংস্র বাঘ সিংহই নয় মাতা হাতীও আছে বড় ভয়ানক! কখনো দারুণ শীত তখনো অসহ্য গরম—"অত্যুষ্ণমতিশীতঞ্চ"—

খাবার মেলা ভার—তার উপর "সর্পাঃ সরীসৃপাশ্চান্যে বৃশ্চিকাশ্চ মহাবিধাঃ··· পতঙ্গ মক্ষিকাকীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।" ললিতা বলত ডাঁশ মশার কথা—ত্রেতাযুগের দেখা যাচ্ছে বনে সে ভয় ছিল ষোলোআনাই।

না, এ ঠাট্টা নয়। আমার ভাই, বনস্থলী ভালো লাগে, কিন্তু দুচারদিন। চিরজীবন যে শহরে মানুষ সে কি বনকে সত্যিই আত্মীয় মনে করতে পারে? বৈচিত্র্য হিসেবে অবশ্য বনস্থলী মরুভূমি পাহাড় পর্বত সবই চমৎকার লাগে। কিন্তু হয়েছে কি জানো? আমি হ'লাম জন্মনদীচর। আর নদীর রাণী—গঙ্গা। না, শুধু রাণী নয়—দেবীও বটে। আর কোন্ নদী আছে যার উপাধি ত্রৈলোক্যবাহিনী, ধর্মদ্রবী, পতিতোদ্ধারিণী? তাই তোমার আলমোরা প্রবাসকে আমি মনে প্রাণে অভিনন্দন করতে অক্ষম, ত্রুটি মার্জনীয়।

আমি এসেছি আজ ফিরে হরিদ্বারে। এখন আছি এক আশ্চর্য যোগীর আশ্রমে—শ্যামঠাকুরের গুরু মহাযোগী আনন্দগিরির শান্তিনিলয়ে। তাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম দু একবার তোমার মনে থাকতে পারে। আমার সঙ্গে আছে সতী—যার ইতিহাসও তুমি জানো। তুমি যেমন স্বভাব-বৈরাগী সেও তেমনি স্বভাব-বৈরাগিনী। অথচ নিজে স্নেহময়ী মা ও স্ত্রী—যেমন তুমি বন্ধুর বন্ধু, শিষ্যার গুরু, গুরুমার শিষ্য। সতীকে তোমার কথা বলি মাঝে মাঝে। কারণ আমার মনে হয় সে তোমাকে কতকটা বোঝে। আমাকে প্রায়ই উস্কে দেয় তোমার সংস্পর্শে এসে তোমার ছোঁয়াচে আমার দোমনা ভাবের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। মাঝে মাঝে খুবই উৎসাহ পাই ভাবতে যে, শ্যামঠাকুর, আনন্দগিরি, মা ও তোমার স্নেহ পেয়েছি। কিন্তু তারপরেই মনে হয় তোমারই একটি কথা: "সাধুদের স্নেহ সঙ্গ আশীর্বাদ শক্তি সবই শুভঙ্কর, কিন্তু ভাই, সব আগে চাই একান্তী হবার সাধনা, নৈলে এসব বিশেষ কিছুই কাজে আসবে না।"

কিন্তু এ-যুগের মানুষ—চিত্তবিক্ষেপের রাজধানীতেই যার বাস—একান্তী হবে কোত্থেকে বলো? তুমি কেমন ক'রে ক'রলে এ-অসাধ্য সাধন—মাঝে মাঝে ভাবি। আনন্দগিরি বলেন তোমার আছে "পশ্যন্তী বুদ্ধি।" অর্থাৎ সেই বুদ্ধি যার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী—তল পর্যন্ত না পৌঁছিয়ে যে ছাড়ে না। আমার তো নেই এমন কোনো সহজাত দৃষ্টি। আনন্দগিরি বলেন—আমার মধ্যে যে আড়টুকু আছে সেটুকু কাটবে গুরুর আবির্ভাবের পরে—আগে নয়। তবে যেই হবে

এ-আবির্ভাব—হবেই হবে আমার হাজারো অনর্থনিবৃত্তি, আমি দেখতে পাবই পাব যে, অঘটন এ-যুগেও ঘটে গুরুশক্তির জাদুতে। আলমোরায় মা-ও বলতেন একথা—মনে আছে? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—তাহ'লে আমি করব কী? অনাগত গুরুর পথ চেয়ে হাত পা ছেড়ে দিয়ে lotus-eater হ'য়ে ব'সে থাকব? আনন্দ গিরি বলেন: "না, ব্যাকুল হ'তে হবে, কিন্তু ব্যস্তবাগীশ নয়।" তিনি আমাকে ঘড়ি ঘড়ি বৈদিক ধমক দেন: "ন ত্বরমাণেন লভ্যঃ"—ব্যস্ত হ'য়ে হাঁক পাঁক করলে আরো দেরি হবে। কাল বলছিলেন পুরীতে তাঁর এক বন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ এক দুর্দান্ত স্রোতে ভেসে বহুদূরে চ'লে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর নুনিয়া রক্ষী। সে চেঁচিয়ে বলল: বাবু, হাঁক পাঁক করবেন না, শুধু জলে চিৎ হ'য়ে ভেসে থাকুন—যতক্ষণ না পাল্টা স্রোত এসে আপনাকে তীরের দিকে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁচতে গেলেই ডুববেন।" বন্ধু বাধ্য শিষ্যের মতন ভেসে রইলেন। নুনিয়া যা বলেছিল ফলল অক্ষরে অক্ষরে: খানিক বাদে তীরমুখী স্রোত এসে ফের ভাসিয়ে তাঁকে তীরে পৌঁছে দিল। এরকম অভিজ্ঞতা না কি আরো অনেকের হয়েছে—বললেন আনন্দ গিরি। সে নুনিয়া জানত তাই গুরু হ'য়ে এসে বাঁচালো ডুবুডুবুকে। "এরি তো নাম সত্যিকার গুরু।" বললেন তিনি, "মানে যাঁর কথা শুনতে ধাঁধাঁ লাগলেও মানলে প্রাণ বাঁচে।" তুমিও বলতে—মনে পড়ে—যে, বাধাকে সহায় দাঁড় করানোই হ'ল যোগ—"কর্মসু কৌশলম্"। ডায়রিতে লিখে রেখেছি: "প্রেমল বলল আজ: 'অহংবুদ্ধি ডিমের খোলা হ'লেও বাধা না হ'য়ে সহায়ই হয় যতক্ষণ না অহংশাবক সাবালক হ'য়ে খোলা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারে।" আনন্দগিরি ও তোমার জ্ঞানকে আমার কী যে হিংসে হয়!

তাই বলো আরো জ্ঞানের কথা—দাও এইরকম বিচিত্র উপমা। তুমি বলতে—এই যে ডায়রি—"প্রেমল বলল: 'সব সময়েই যে ঠেকে শিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। জ্ঞানের একটি মজা এই যে, তাকে বরণ করলে অনেক কিছু দেখে বা শুনেও শেখা যায়। একজন ধুনী জ্বালালে পাঁচজনের কাজে লাগবে না কেন?" খুব ভালো কথা: তাই তোমার উপদেশ আমি চাই আমার কাজে লাগাতে। বলো—কবে তুমি কী ক'রে ঝড়েও ধুনী জ্বাললে? কেমন ক'রে কুমীরের ঘাড়ে চ'ড়ে গঙ্গা পার হ'লে।

মা-র কথাও লিখো। তাঁর শরীর কেমন আছে? তাঁর স্নেহকেও আমি

দৈবী করুণা ব'লেই বরণ করেছি ভাই। মহানুভব যাঁরা তাঁদের স্নেহ তো সত্যিই *বিধাতার আশীর্বাদ।* এমনি আর একটি দৈবী আশিস পেয়েছি সম্প্রতি—তিন মাস আগে—রমণাশ্রমে। রমণ মহর্ষিও সত্যিই আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। রোজই আমার গান শুনতেন কী যে স্নেহে! তাঁকে দেখে আমারও মনে হ'ত —সদাশিবই বটে: শান্তিসিদ্ধ জন্মসিদ্ধ, যিনি ভগবানকে 'বেত্তি তত্ত্বতঃ'— অর্থাৎ জানার মতন ক'রে জেনেছেন, চেখেছেন, ডুবেছেন তাঁর মধ্যে। তবে মনে হ'ত—আনন্দগিরি, শ্যামঠাকুর, মোহনমহারাজ, মা, এঁদের দেখলে যেমন কাছের মানুষ মনে হয় (তোমার তো কথাই নেই) রমণ মহর্ষিকে দেখে তেমন ভরসা পাওয়া যায় না, যেতে পারে না। মনে হ'ত না—তাঁকে মনের কথা বলা যায়, বা বললে তিনি বুঝবেন অথচ কী শান্তিই পেয়েছিলাম তাঁর পায়ের কাছে ধ্যানে ব'সে! সে-সময়ে অশান্তিতে আমার মন ছিল এত ক্ষত-বিক্ষত যে, সত্যিই ভাবিনি—সে-বিক্ষিপ্ত চিত্তে কোনো নিটোল শান্তি নামতে পারে। ধ্যান তো হ'তই না, নাম করতে গেলেও আরো সংশয় ছেয়ে আসত কালো মেঘের মতন—সব আলোই যেত নিভে। কিন্তু রমণ মহর্ষির পায়ের কাছে বসতে না বসতে যেন যুগের অশান্তি গ'লে শান্তিতে রূপ নিল। যেন বাজিকরের বাজির মতই তিনি খেললেন ভানুমতীকা খেল।

একটা প্রশ্নের আমি জবাব পেলাম এই সূত্রে: যে, যাকে আমরা বলি নৈষ্কর্ম্য তার মধ্যে দিয়েও মহাযোগীরা সত্যিই কর্ম করতে পারেন—আর যে-সে কর্ম নয়—অশান্তকে শান্তি দেওয়া, নির্ভরসাকে ভরসা দেওয়া, সংশয়ীকে বিশ্বাস দেওয়া।

রমণ মহর্ষিও আমাকে কৃপা করেছেন ভাই। কীভাবে—চিঠিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, ফের যখন দেখা হবে বলব। কিন্তু সে কবে? মা কি বলেন কিছু?

প্রণব মহারাজ সমানে রুগ্নদের সেবা ক'রে চলেছেন তো! ধন্যি ডাক্তার! যোগাশ্রমে এসে যেন ও আরো ফুলের মতন ফুটে উঠল ডাক্তারি-বৃন্তে। ওর একটা কথা আমি ভুলব না কোনোদিন: "ঠাকুরের করুণা ডাক্তারি ওষুধের মাধ্যমেই কাজ করতে পারবে না কেন? পাদ্রে পিও-র জীবনী পড়ছিলাম। থাকেন ইতালিতে। প্রার্থনা ক'রে কত লোকেরই তো রোগ সারান। অথচ এক বিরাট হাসপাতালের পত্তন করেছেন তাঁর গ্রামে—গির্জার পাশেই। তিনি

অস্ত্রোপচারের মোটেই বিরোধী নন—বলেন প্রায়ই : সার্জনের ছুরির পিছনেও ঠাকুরের করুণার আবির্ভাব হ'তে পারে।" কিন্তু খতিয়ে এ যুক্তিরই কথা। তাই হয়ত মন সহজে একে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে পারে। অন্তরের বিশ্বাস ও মনের ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি এ-দুয়ের স্বধর্ম সম্বন্ধে পাস্কাল একটি বড় চমৎকার মন্তব্য করেছেন, কালই পড়ছিলাম :

"La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elee est au-dessus, et non pas contre"* আনন্দ গিরিকে একথা বলতে তিনি এর অনুবাদ চাইলেন, আমি বাহাদুরি ক'রে পদ্যে অনুবাদ করলাম—ভাষ্যই বলব :

বিশ্বাস করে বরণ সহজে তারে
দেখেনি শোনেনি ইন্দ্রিয় কভু যারে :
তা বলি' নয় সে বিরোধী ইন্দ্রিয়ের
করে না অস্বীকার
ইন্দ্রিয়বোধ দেয় যার সমাচার
বিশ্বাস রাজে উপরের স্তরে, ইন্দ্রিয়—জগতের,
স্বভাবে উভয়ে সন্ধানী সহযাত্রী এ-বসুধায়
সতীর্থদের বিবাদ বলো কোথায় ?

ললিতাকে এ-ভাষ্য দেখিয়ে বোলো একটু তারিফ করতে। বাঃ! গদ্য ফ্রেঞ্চের পদ্য বাংলা রূপ দিলাম এ হেন ওরিজিন্যাল কৃতিরও তারিফ করবে না—এও কি একটা কথা হ'ল ?—বিশেষ ক'রে যে পাস্কালের সে এত ভক্ত ?

কিন্তু না, ঐ সঙ্গে তাকে বোলো—তার কথা আমার কত যে মনে হয় কী বলব ? গুরু শিষ্যের গুরুগম্ভীর সম্বন্ধ দেখে দেখে আমার সত্যিই ভয় করত—তোমার সঙ্গে তার ঝুটোপুটি তর্কাতর্কি ও অবাধ ঠাট্টাতামাশা দেখে তবে সে-ভয় একটু কেটেছে। বলছিলাম কালই একথা আনন্দ গিরিকে। কিন্তু সতী শুনে চোখ বড় বড় ক'রে বলল : "সে কি মামাবাবু ? গুরুর সঙ্গে তর্কাতর্কি, হাসি ঠাট্টা ? বলো কি ? ললিতার ঘাড়ে কি একটি মাথা আছে, না গুটি পাঁচেক ?

*Faith, indeed, attests what the senses do not, but not the contrary of what they testify to. Faith is above the senses—not at odds with them.

কিন্তু আর প্রগল্‌ভতা নয়। এখুনি আনন্দগিরির ঘরে ধ্যানে বসতে হবে। হুঁ হুঁ! নিখুঁৎ অনবদ্য গম্ভীর ধ্যান। বোলো ললিতাকে। শুধ্‌ কাব্যি আর গানই নয়—সাক্ষাৎ ধ্যান। এবার?

ইতি। স্নেহাধীন

অসিত।

পুঃ।. মাকে আমার হ'য়ে দুটি কথা জিজ্ঞাসা কোরো: এক, কবে আমার গুরু দেখা দেবেন্‌ একটু আভাষ দিতে পারেন কি? দুই, গুরুই বা কিনি? সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন: তিনি সদ্‌গুরু তো? নইলে ধনে প্রাণে মারা যাব ভাই!

তিন মাস পরে

ভাই অসিত

তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দেব দেব ক'রে দেওয়া হয় নি নানা কারণে। প্রধান কারণ—মা-র অসুখ খুব বেড়েছিল। তোমার মনে আছে হয়ত মা বলেছিলেন তোমাকে যে ঠাকুর বাইরে তাঁকে বেশি দর্শন দিলে তাঁর দেহ থাকবে না? তোমার গানের দিন মা-র সেই দর্শনের পর থেকেই তাঁর শরীর খারাপ হয়। নানা উপসর্গ—একের পর এক। সে সব ব'লে কী হবে? শেষে কয়েকমাস আগে যখন তোমার চিঠি এল তখন সংকট অবস্থা। সুরথদা এসেছিলেন দিল্লীর এক হার্ট-স্পেশালিষ্টকে নিয়ে। তিনি কার্ডিওগ্রাম ছাপ পরীক্ষা ক'রে প্রণব যা বলেছিল তারই প্রতিধ্বনি করলেন। ইঞ্জেকশান্‌ দিতে চাইলেন, কিন্তু মা বললেন: "না, ঠাকুর ডাকছেন। আর দেরি করা নয়।" এই সব কারণে আমাদের মন ভালো ছিল না—বুঝতেই তো পারো। মা শুধু আমাদের জীবনের কেন্দ্রই তো নন—আমাদের এ-ক্ষুদ্র আশ্রমটির খুঁটিও তিনি, চূড়াও তিনি। মা কিন্তু একথা মানেন না, বলেন বার বার একই কথা: যে, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তুমি গাইতে যে গানটি—যেটি ললিতা তোমার কাছে শিখেছিল—সেটি তিনি তার মুখে প্রায়ই শুনতেন চান। সে গানটির শেষে আছে—

"কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চ'লে আয় আমার পাশে"

মা প্রায়ই গুন গুন ক'রে গান এই আভোগটি আর বলেন: "এই-ই ঠিক বাবা, এই ঠিক—এখন আমি বুঝেছি যে এখানে আমরা আসি শুধু তাঁরই একটি না একটি লীলা পোস্টাই করতে। সেটি সাঙ্গ হ'লেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ঘুম যাব সব একে একে তাঁর কোলে।"

কিন্তু ঠাকুর তাঁকে আরো দুদিন হয়ত এই "কারাগৃহে"ই রাখতে চান—ধন্যবাদ ঠাকুরকে!—তাই গত ক'দিন মা একটু ভাল আছেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়ে বসেন আমাদের আরতিতে, আর বলেন: "আহা! সে কী গানই গেয়ে গেছে রে! তাকে লিখে দিস—তার ভাবনা কী? সে গানের মধ্যে দিয়েই তাঁকে পাবে। যার গান শুনতে ঠাকুর নিজে নেমে আসেন তার আবার ভাবনা? ফের লিখে দে—তার সময় হ'লেই গুরু তাকে ডেকে নেবেন। নেবেনই নেবেন।"

আনন্দগিরিও তোমাকে এই কথাই বলেছেন শুনে খুশী হলাম। অতএব তুমি তোমার সংশয়কে বেশি আমল দিও না। অবিশ্বাস আসে আসুক না। মা প্রায়ই বলেন যে, এ যুগের মানুষ ঘড়ি ঘড়ি মনের চাবি দিয়ে প্রেমের তালা খুলতে চেষ্টা করে বলেই তালাও জখম হয়, চাবিও হয় অপদস্থ।

গ্রীক দার্শনিক প্লটিনাস বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা: "তর্ক থেকে আমরা পৌছই দৃষ্টির' কোঠায়।" আনন্দগিরিকে আমার প্রণাম দেবে। কিন্তু আমার "পশ্যন্তী বুদ্ধি" যদি থাকেও তবে সে এখন সবে মিট মিট ক'রে চোখ মেলতে সুরু করেছে। দেখে অনেক কিছুই, কিন্তু ধাঁধা লাগে। তবে আমি বলি—লাগুক না ধাঁধা। Jig-saw ধাঁধা খেলো নি? নানা ভাবে কাটা কাঠের কোনা, মনে হয় পাগলামি—কিন্তু সাজাতে ওমা! হঠাৎ দেখি একেবারে নিখুঁৎ নিটোল কাপে কাপে ব'সে গেছে এর সঙ্গে ও ওর সঙ্গে সে—আর এমন ভাবে যে, কখনো কল্পনাও করিনি। আমাদের আশ্রমে নানা সাধু আসেন তাঁদের মধ্যে দু-একজনকেও ঠিক এই কথাই বলতে শুনেছি যে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে প্রতি হেঁয়ালিকে ধাঁধা মনে হয় ততক্ষণই যতক্ষণ মন দিয়ে ধাঁধার উত্তর খুঁজি। শেষে যখন মন ওরফে মগজী বুদ্ধি নাজেহাল হ'য়ে হাল ছেড়ে দেয় তখনই ধাঁধার উত্তর মেলে—কিন্তু যে পথে চাই সে পথে নয়, সম্পূর্ণ অন্য পথে। "পশ্যন্তী বুদ্ধি" এই অকল্পনীয় পথের আভাষ পায় ব'লেই তার এত আদর। তবে আনন্দগিরিকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো যে, আমি তাঁর

আশীর্বাদ চাই—যেন এ-বুদ্ধি দিয়ে আরো সাফ দেখতে পাই যে, গুরুর পায়ে শরণাগতির দিশাই "সত্যস্য সত্যম্"। আমার জ্ঞান-কে দেখে তোমার "হিংসে" হয় লিখেছ। প'ড়ে হাসি এল। আমি বলতে চাই—to return the compliment—যে আমার হিংসে হয় তোমার গানকে তথা প্রাণকে। গানকে—যে ঠাকুরকে টেনে আনে তাঁর বৈকুণ্ঠ থেকে, আর প্রাণকে যে দিলদরিয়া—পরকে আপন ক'রে নিতে পারে এত সহজে। আমরা তোমাকে কাছে টেনেছি এ জন্যে তুমি আমাদের প্রেমের গুণগান করেছ। কিন্তু তোমার কাছে-আসার ক্ষমতা কিছু কম বন্দনীয় নয় জেনো। শুধু চুম্বকই লোহাকে টানে না ভাই, লোহাও চুম্বককে টানে। এ-উপমাটি আমার নয়—ললিতার। সে তোমার কথা প্রায়ই বলে—বলে যে, তুমি যেন আঁখর দিয়ে ফলিয়ে তোলো তোমার গানের সঙ্গে প্রাণের লীলাকে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, রমণ মহর্ষিও তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন তোমার এই সহজ শ্রদ্ধা ও সরল গ্রহিষ্ণুতার জন্যে। এ বুদ্ধির ঝাঁঝালো যুগে ভাই, এ-দুটি গুণ বড়ই বিরল—এই শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা আর বরণ করার সরল আগ্রহ। জীবনের সব কুয়াশার মধ্যে দিয়েই এরা বাতি ধরে। তাই তুমি নির্ভরসা হোয়ো না হোয়ো না হোয়ো না। তুমিই একটি গান গাইতে রবীন্দ্রনাথের, ললিতা তোমার কাছে শিখেছিল। মাঝে মাঝেই শোনায়—আমাদের তোমার উদাত্ত কণ্ঠকে মনে করিয়ে দিয়ে :

"নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে,
যদি পণ ক'রে থাকিস সে-পণ তোমার রবেই রবে।"

কিন্তু মুস্কিল কি জানো ভাই? এ-ধরণের ভরসা সত্যি দিতে পারেন কবিরা নয়, এমন কি বন্ধুরাও নয়—(যদিও সাধক বন্ধু তার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে কিছুটা পারে নিরাশায় আশা জাগাতে)—পারেন কেবল সদ্‌গুরু। তাই ভাগবতে বলেছে "গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষু"—কি না গুরুরূপ সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া উপনিষদের (কি না জ্ঞানের) চক্ষু লাভ করলে তবেই পরম দর্শন হয়।

তাই তো তোমাকে এত ক'রে বলি গীতার কথা—"নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ"। নিরুৎসাহ হোয়ো না, হোয়ো না। আনন্দ গিরি, মোহন মহারাজ, শ্যামঠাকুর, মা, রমণ মহর্ষি আরো কত সাধুসন্ত তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন ও করছেন তুমি হয়ত খবরও রাখো না। কিন্তু আমরা নানা সাধুর দূর থেকে আশীর্বাদ করার শক্তির কথা শুধু যে মানি তাই নয়, জানি—চাক্ষুষ করেছি ব'লে। তাই তো

আমি রমণ মহর্ষিকে দেখার বহু আগে ধ্যানে পেয়েছিলাম তাঁর সান্নিধ্য—যে কথা তোমাকে বলেছি। আরো বলতে পারতাম—কিন্তু বলব যেদিন তোমার গুরুলাভ হবে। উপনিষদের সেই শ্লোকটির কথা তোমাকে বলেছি—কিন্তু আবার বলি—(কারণ it bears repetition) :

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যার দেব ও গুরুতে ভক্তি আছে সেই মহাত্মার কাছেই গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ হয়।

এখানে আর একটি কথার 'পরে জোর দিতে চাই : যে উপনিষদে ঠিকই বলেছে যে যার গুরু ও ইষ্টে ভক্তি আছে সে মহাত্মা। এ-যুগে মহাত্মার অর্থটা একটু বদলে গেছে। সেদিন স্বরথদা লিখেছেন : য়ুরোপ আমেরিকায় সবচেয়ে বড় great man—মহাত্মাশ্রেষ্ঠ কিনি তার খবর নিতে ধুমধাম ক'রে লক্ষ লক্ষ জনগণমন-এর ভোট নেওয়া হয় সেক্যুলার-ডিমক্রেটিক ঢঙে। ফল বেরিয়েছে আমেরিকার এক কাগজে যার দৈনিক গ্রাহক চার লক্ষ সত্তর হাজার। সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন চার্লি চাপলিন। রুশ দেশে যদি ভোট নেওয়া হ'ত তাহ'লে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা দাঁড়াতেন নিশ্চয়ই স্টালিন। তবে মুস্কিল এই যে, এঁদের দেহান্ত হ'তে না হ'তে আরো কত রকমারি ধূমকেতু হু হু ক'রে উদয় হবেন ভোটারদের চিত্তাকাশে। শুনছি না কি জল্পনা কল্পনা চলছে—আর ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই রথে চড়ে চাঁদে গিয়ে ঢুঁ মেরে আসবেন আর এক পার্থিব ধূমকেতু। আসার সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের সব মহাত্মার দীপ্তি নিভে যাবে এ নবোদিত মহাত্মার জ্যোতির্ধ্বজের পাশে এবং তাঁর উপাধিতিলক হবে : কৃষ্ণবুদ্ধ খৃষ্টলাঞ্ছনী প্রতিভা। তবে ভরসা এই যে, সেদিন তুমি আমি অন্ততঃ থাকব না, কাজেই সে মহানবযুগজয়ধ্বনিতে যোগ দিতে তোমাকে আমাকে বাধ্য করা হবে না। এ-ও ঠাকুরের এক কম করুণা নয় ভাই, কি বলো?

মার আশীর্বাদ নিও। আমাদের ভালোবাসা তো তোমার হাতের পাঁচ।

ইতি। তোমার স্নেহ-ঋণী

প্রেমল

পুনশ্চ। এইমাত্র স্বরথদার চিঠি পেলাম জুমেল থেকে। পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে! উঃ!! মনে হচ্ছে Alexander Selkirk-এর আক্ষেপ :

"Oh ! had I the wings of a dove"—আমি উড়ে গিয়ে দেখে আসতামই আসতাম কাশ্মীরে গুরুগৃহে তোমার সন্তজাত শিশুরূপ। বলতে ভুলেছি—সুরথদাই খবর দিয়েছেন তোমার দীক্ষার। ললিতা সে চিঠিটি তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছে, কিন্তু ধরেছে—তার আগে সে তোমাকে "এক হাত নেবেই নেবে।" কী ভাবে নেবে সে-ই জানে। সে কখন যে কী ক'রে বসে "দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"!

* * *

দাদা! দাদা! দাদা!

কেমন? বলি নি তোমাকে যে তুমি যা নও তাই সাজতে ভালোবাসো!' তুমি স্কেপটিক? তাহ'লে লজ্জাবতী লতাও কাঁটাঘাস—প্রজাপতিও গঙ্গাফড়িং! বলতাম না তোমাকে যে, তুমি বাপীর মতই বৈরিগি—তাই সংসারে সব থেকেও সংসারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারো নি! তুমি স্বভাবে অবিশ্বাসী হ'লে কি এত সব সাধু সন্ত যোগী ঋষি—and last though not least, মা—তোমাকে এত ভালোবাসতেন? জানো, আমাদের আশ্রমে আমরা সহজে কাউকে বলি না "আস্তাজ্ঞে হোক।" আগে সুরথদার ছাঁকনি দিয়ে তাকে ছাঁকা হয়—তারপর সে কী দাঁড়ায় দেখে সুরথদা ছাড়পত্র দিলে তবে মা তাকে এখানে আসতে অনুমতি দেন। মা বলেন: বাজে হোমরাও-চোমরাও কি হুজুগেদের মন রাখতে গেলে ঠাকুরের মন পাওয়া যায় না। ভিড়ের হট্টমন্দিরে অট্টরবই ঝাঁকিয়ে ওঠে, বংশীরব শোনা যায় না। আমাদের এখানে তাই আমরা সহজে কৌতূহলীদের আসতে দিই না—খবরের কাগজকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না—রিপোর্টার তো কা কথা। বাপী বলে: পাবলিসিটির জয়শঙ্খ মানেই ডিভিনিটির লবডঙ্কা। এ হেন আশ্রমের মন্দিরে জাগ্রত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে যার বৃন্দাবনলীলা গানে······ঘটেছিল সে সাধকের উপাধি স্কেপটিক?? না, তবে যদি তখমার জন্যে বায়না ধরো, তবে বড়জোর হাম্বাগ উপাধি মঞ্জুর করতে পারি।

না, ঠাট্টা নয় আর। সত্যি দাদা! কী যে আনন্দ গৌরব হচ্ছে ভাবতে যে, তোমার সম্বন্ধে ভুল ভাবিনি, ঠিকই ধরেছিলাম "এ-রাম মনুষ্য নয়!"

উঃ! এককথায় সব ছেড়ে উধাও হ'লে গুরুচরণে—তাঁকে যা কিছু আছে সব নিবেদন ক'রে? একটা কথা বলব দাদা? কথায় কথায় একে ওকে তাকে

আমরা ত্যাগী নাম দিই তাদের কৌপীনবস্ত দেখবামাত্র। কিন্তু আসলে যার রেস্ত আছে কেবল সে-ই ত্যাগ করতে পারে। যে আজন্ম নিরন্ন সে ত্যাগী হবে কী ক'রে শুনি? বাপী আরো জুড়ে দেয়: "যে সত্যি ভোগ করেছে সেই পারে সত্যি ত্যাগী হ'তে। তাই যারাই নেংটি প'রে মৌনব্রতী বা উর্ধ্ববাহু হ'য়ে ছাই মেখে গাল বাজিয়ে বোম্ ভোলা ব'লে হুঙ্কার দেয় তাদের বলা চলে না খাঁটি ত্যাগী।" ঠিক যেমন, গিন্নির গর্জনে যে গঙ্গোত্রী রওনা হয় (অনুপ্রাসের শোভাযাত্রা লক্ষণীয়!) তাকে বৈরিগি বলা চলে না। তুমি প্রায়ই বাপীর মাধুকরী করা দেখে ভয় পেতে, বলতে এ আমি পারব না। বাপী বলে: "তুমি যা পারলে তা যারা মাধুকরী করে তারাও পারে না।" কাজেই quits—শোধ-বোধ। সত্যি, তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করে ভাই। যার এত অসুখ না হ'লে দিতাম পাড়ি। কিন্তু মা প্রায়ই "যাই যাই" ক'রে এত দমিয়ে দিচ্ছেন যে, নড়তে পারছি না এখান থেকে। তাই তুমিই এসো না কেন ভাই! এখন না পারো দুদিন পরে—তোমার গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে অবিশ্যি। এবার পড়ো স্বরথদার চিঠি। প্রণাম প্রণাম প্রণাম—হে প্রণম্য!

ইতি—

তোমার স্নেহগর্বিতা ললিতা।

ললিতা দিদি!

আমি দিন কুড়িক আগে দুমেলে এসেছি। ভেবেছিলাম এখান থেকে শ্রীনগর ও পাহালগাঁ ঘুরে অমরনাথ যাব। কিন্তু দুমেলে এসেই স্বামী স্বয়মানন্দকে দেখে ম'জে গেলাম। চমৎকার যোগী! একটু গম্ভীরাত্মা, কিন্তু বেরসিক নন মোটেই। অন্ততঃ আমি তো খুব হাসি গল্প করি তাঁর সঙ্গে। তিনি প্রেমলের মতন অট্টহাস্যে পাকা না হ'লেও হাসেন বেশ মন খুলেই—আর কী যে মিষ্টি হাসি! কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর ভাগবতের ব্যাখ্যা। রোজ সকালে শুনি। পণ্ডিত তো বটেই, কিন্তু সব আগে কবি। তাই ভাগবতের নানা বাণী এমন সরস ক'রে বলেন—অনেক শ্লোক আবার কবিতায় অনুবাদ ক'রে—যে, অসিতের কথা মনে করিয়ে দেন। মনে পড়ছিল অসিত তাঁর কথা বলেছিল। তাঁকে সে দেখেছিল একবার কয়েক বৎসর আগে—তোমাদের ওখান থেকে সোজা গিয়েছিল দুমেলে। কিন্তু আমাকে লিখেছিল একটি চিঠিতে যে, স্বামীজিকে খুব ভালো লাগলেও তাঁর

শিষ্যদের সঙ্গে মিশে সে বিশেষ তৃপ্তি পায় নি। বড় গম্ভীর ও নীরস। তাই ভয় খেয়েছিল।

তারপর আনন্দগিরির ওখান থেকে চিঠি লেখে আমাকে যে, দোটানায় বড় কষ্ট পাচ্ছে। লিখেছিল—"প্রেমলকে লিখতে ভরসা হয় না সুরথদা, সংশয়ের নাম শুনলেই সে কেমন যেন বিমুখ হ'য়ে ওঠে! আমার মনে হয় দাদা, যারা স্বভাবে বিশ্বাসী তারা স্বভাবে সন্দিগ্ধদের কিছুতেই নেকনজরে দেখতে পারে না…" ইত্যাদি।

তারপরই এখানে হঠাৎ স্বামীজির কাছে তার! আমি তখন সবে এসে জিরুচ্ছি—তোড়জোড় বাঁধছি অমরনাথ যাব ব'লে। কিন্তু ওর তার পেয়ে আর বেরুতে পারলাম না। কারণ স্বামীজি বললেন আমাকে যে, ও বরাবরের জন্যেই আসবার অনুমতি চেয়ে তার করেছে। শুনে তো আমি থ! এই দুদিন আগেই তো লিখেছিল সন্দেহের দোলায় হাঁপিয়ে উঠেছে, আর—তবে এমনিই তো হয় দিদি। ওকে আমি বলেছিলাম—মা-ও তো বলেছিলেন—যে, গুরুবরণ ওকে করতেই হবে এবং সে-গুরু নির্দিষ্ট আছে। আমি কিন্তু ভাবি নি ও স্বামী স্বয়মানন্দকে বরণমালা দেবে। আমি ভেবেছিলাম—হয় প্রেমলের টানে মার চরণে আশ্রয় নেবে, নৈলে আনন্দগিরির। তবে ও মহাপুরুষকেই বরণ করবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—যদিও দুমেল আশ্রমে ও স্বস্তি পাবে কি না ভরসা ক'রে বলতে পারি না। মরুক গে—আমাদের বাঁকা ঠাকুরটি কাকে যে কোন্ আঘাটায় নাস্তানাবুদ ক'রে হঠাৎ কোন ঘাটে তোলেন কেউ কি জানে দিদি? কেবল একটি কথা আমরা সবাই জানি যে, 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—অর্থাৎ যে তাঁকে সত্যি চাইবে তার গতি হবেই হবে। তাই আশাকরি অসিত নিশ্চয় এখানে এসে স্বামীজির কাছে যা দরকার শুষে নিয়ে আশ্রমের অবান্তর যা কিছু বর্জন করবে—হংসৈর্যথা ক্ষীরম্ ইবাম্বুমধ্যাৎ—হাঁস যেমন জল থেকে ক্ষীর টেনে নেয়। (হাঁস অবিশ্যি সত্যিই কিছু পারে না এ-অসাধ্যসাধন করতে—তবে কাব্যিক উপমায় পারে তো—আর অসিতও কবি—তাই ঠিক উপমাই এসে গেছে)।

যাহোক অসিত তার করার তিন দিন বাদে দিল্লী হ'য়ে সোজা এখানে এল সতীর মোটরে। তার কাছে সব শুনলাম। সে-দীর্ঘ কাহিনী ওর মুখেই শুনো তোমরা—কিংবা চিঠিতে—আমি শুধু সংক্ষেপে জানিয়ে দিই খবরটা

জানাবার মত ব'লে। দিদি, সংসারে দিনের পর দিন, কত কী-ই তো ঘটছে যার যোগফলে মানুষের মানুষে তথা ভগবানে বিশ্বাস টলমল ক'রে উঠছে—(যার যেমন স্বভাব তার বিশ্বাসও তো সেই ভাবেই তাকে দুলিয়ে তুলবে !)—কেবল এমন অঘটন কালে ভদ্রে ঘটে যার প্রসাদে ভাঁটিয়ে যাওয়া বিশ্বাসে আবার জোয়ার জেগে ওঠে। অসিতের বৈরিগি হওয়াকে খানিকটা এই জাতের অঘটন বলা চলে। আনন্দগিরিকে ও বলেছিল: স্বয়মানন্দ স্বামীকে দর্শনের পর তাঁর দিকে ঝুঁকলেও তাঁর কাছ থেকে কিছুই তো পায় নি—মানে হাতে আসে নি। শুধুই হারিয়েছে—মানে অনেক কিছুই যা আগে ভালো লাগত এখন মনে হচ্ছে বিস্বাদ। এরূপ ক্ষেত্রে—বলেছিল অসিত—কিছু না পেলে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় কেমন ক'রে ?

শুনে আনন্দগিরি শুধু বলেছিলেন "অসিত, এ হ'ল ভগবানের সঙ্গে দরদস্তুর করা—আগে কিছু দাও তবে ছাড়ব, নৈলে নয়। এপথে বৈরাগী হওয়া যায় না।"

তারপর—বলল ও আমাকে—সারারাত ঘুম হ'ল না চিত্তগ্লানিতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সকালে উঠেই মনস্থির হ'য়ে গেল এক মুহূর্তে—আর ভুলেও করবে না দরদস্তুর। সব ছাড়বে এক কথায়—যাকে বলে to burn one's boats. স্বামীজিকে তার ক'রে দিল আমাকে গ্রহণ করতেই হবে, গুরুদেব। আমি আমার যা কিছু আছে এবং আমি নিজে যা (all I have and am) সমস্তই বিনা সর্তে আপনার চরণে নিবেদন করছি। আপনি যে-বিধানই দিন না কেন মাথা পেতে নেব।"

স্বামীজি ওকে তার ক'রে দিতেই ও তুমেলে চ'লে এল, আর এল বরাবরের জন্যে সন্ন্যাসী হ'য়েই বলব। কারণ এ যদি সন্ন্যাস না হয় তবে সন্ন্যাস কার নাম ? দাড়ি গোঁফ চুল ত্যাগ করতে না-মরদ ফুলবাবুরাও পারে দিদি। কিন্তু এক কথায় স্বেচ্ছাবিহারের স্বাধীনতা ত্যাগ—এ না-মরদের কাজ নয়। আমি ওকে বুকে জড়িয়ে বললাম: "সাধু ভাই ! সাধু সাধু ! প্রেমলের ছোঁয়াচে কিছু পেয়েছ সত্যিই। প্রেমল খুশী হবে এবার।"

ও বলল কুণ্ঠিত হ'য়ে: "কিন্তু লজ্জায় প্রেমলকে আমি লিখতে পারিনি—মানে, এ দরদস্তুরের কথা।"

আমি বললাম: "ভাইরে ! বলি নি কি তোমায়—আমাদের বাঁকা

ঠাকুরটি সোজা লোক নন। তাই তাঁর কৃপা যে পায় সেও তাঁরই মতন বেঁকে যায়—অর্থাৎ তার লজ্জাও হ'য়ে ওঠে গৌরব। তিনি একেবারে যাকে বলে whole-hogger কি না, তাই এতটুকুও আব্রু বরদাস্ত করতে পারেন না। তাছাড়া ভুলো না—লজ্জা যেখানে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় সেখানেই তাকে ছাড়ায় গৌরব। গোপীদের বিবস্ত্রা হ'য়ে মানহানি হয়নি, মান বেড়েই গিয়েছিল। কিন্তু তাব'লে কি ওদেশে নাচঘরে থিয়েটারে কাবারে-তে মেম সাহেবদের বিবসনা হ'য়ে পদবৃদ্ধি হয়? হয় না কেন? যারা স্বভাবে নির্লজ্জা তাদের লজ্জা ত্যাগকে 'ত্যাগ' নাম দেওয়া যায় না ব'লেই নয় কি?"

তাই আমিই লিখে দিলাম তোমাদের জানাতে এই অঘটনটির ইতিহাস। কে বলে দিদি, অঘটন আর ঘটে না এ যুগে?

মাকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিও।

ইতি। তোমাদের সুরথদা

ভাই অসিত,

প্রেমল ললিতা ও সুরথদার চিঠির পরে আমার চিঠি হয়ত মনে হবে তোমার গঙ্গাজলের পর কুয়োর জল। হোক। সময়ে সময়ে কুয়োর জলও তো কাজে আসে—নৈলে কুয়ো মানুষ খুঁড়ত কি?

আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই একটি কথা: যে, মানুষ চিনতে মা-র কখনো ভুল হ'তে দেখিনি। তাই তোমাকে যখন তিনি বরণ করেছেন আমাদেরই একজনের মধ্যে (আমার আত্মস্তুতি কী চতুর, ভাবো একবার!) তুমি অকুণ্ঠে বিশ্বাস করতে পারো তোমার নিজের উচ্চাধিকারকে। প্রেমল সেদিন তোমার সম্বন্ধে একটি কথা বলেছিল সখেদেই বলব। ললিতা ওকে বলেছিল—কী প্রসঙ্গে মনে নেই—যে তুমি প্রেমলের জ্ঞান থেকে অনেক কিছু শুষে নিয়েছ গ্রীষ্মের পরে তপ্ত মাটি যেমন প্রথম বর্ষার জল শুষে নেয়। "তাই"—বলেছিল ললিতা—"আমার মনে হয় এবার দাদা শুধু ভক্তির নয় জ্ঞানের মুক্তিরও গান গাইবে।" উত্তরে প্রেমল বলেছিল: "কী পাগল! আমি তাকে পই পই ক'রে মানা করেছি মুক্তি নিয়ে মাথা বকাতে। ভক্তি যার প্রাণে ফসল ফলিয়েছে। সে জ্ঞান মোক্ষ মুক্তির চাষ করতে যাবে কী দুঃখে?" ব'লে আবৃত্তি করল—আমি টুকে নিলাম (তোমার ছোঁয়াচে কিছু তো শেখা চাই):

"দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্ জাতে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥"

মৃদু হেসে ও অনুবাদ করল এই ব'লে যে, দ্বৈত—কিনা—তুমি-আমিবাদকে—ভুল বুঝি আমরা কেবল বোধদয়ের আগে : বোধোদয়ের পরে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাই যে, ঠাকুর দ্বৈতের ব্যবস্থা করেছেন ভক্তির আনন্দলোকে পৌঁছে দিতেই—আর সেখানে পৌঁছবামাত্র আমরা দ্বৈতকে অদ্বৈতের চেয়েও সুন্দর ব'লে বরণ ক'রে নিই মনে প্রাণেই।

শুনে মা বলেছিলেন: "একথা সত্যি। কারণ খাঁটি ভক্তি মানেই আমি তুমি।—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর জগৎ মিথ্যা এ-দর্শনের জমিতে না আছে ভক্তির স্থান, না কর্মের সার্থকতা। তাছাড়া মুক্তি—মানে, এ-জগৎ চক্র থেকে নিষ্কৃতিই যদি লীলার শেষ লক্ষ্য হবে, তবে এ-জগতে আমাদের ঠাকুর পাঠালেন কেন ছাই? তাঁর মধ্যে ম'জে আমরা তো মুক্তি পেয়েই দিব্যি মশগুল হ'য়ে ছিলাম অগাধ নিরাকারে। কেন মরতে—সীমার দুর্ভোগ ভুগতে—এলাম এ-জগতে? তাই ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈতলীলা—বিরহমিলনের লুকোচুরি হাসিকান্নার আলোছায়া—যে শেষমেষ অদ্বৈতের একাকার নিশ্চুপলীলার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর সাধক ও ভক্তের এ কথায় আমারও পুরো সায় আছে। আর এ আমার বিচার ক'রে পাওয়া মনগড়া ধারণা নয়—আনন্দ থেকে পাওয়া অনুভূতি।"

কাজেই যে-ভাগ্যবান্ পুরুষ ভক্ত হ'য়ে জন্মেছে সে কী দুঃখে জীবন্মুক্ত জ্ঞানীকে হিংসে করতে যাবে শুনি? না ভাই, অন্ততঃ আমি যে তোমাকে হিংসে ক'রে জলে পুড়ে-মরি একথা তুমি অকুণ্ঠেই বিশ্বাস করতে পারো। ঠাট্টা নয়: তোমার গান থেকে শুধু যে ভক্তেরা ভক্তির পাথেয় পেয়েছেন তাই নয়। জ্ঞানীরাও অনেকে ভক্তির দিকে ঝুঁকেছেন—একথা মা প্রায়ই বলেন। আর মা-র রায় ভুল হয় না। কাজেই তুমি সময় পেলেই ফের চলে এসো এখানে—কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সরিক হ'তে নয়—আমাদের মনকে তোমার গানের প্রাণের ভক্তিরসে আরো রসিয়ে তুলতে।

ইতি। তোমার ভক্তি-উদ্বুদ্ধ বন্ধু

প্রণব

(দেড় বৎসর পরে)

ললিতা দিদিমণি,

তোমার চিঠির সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় নানা কারণে। তবে কয়েকটি কথা তোমাকে লিখতে পারি।

প্রথম কথা : আমি যে হরিদ্বারে সব ছেড়ে এক কথায় গুরুচরণে শরণ নিতে পেরেছি এর পিছনে ছিল তিনটি প্রেরণা।

এক, প্রেমলের গুরুভক্তি—যার আলোয় গুরুবাদ সম্বন্ধে আমার অনেক ভুল ধারণার কুয়াশা কেটে গিয়েছিল সেই সময়েই।

দুই, তোমার মতন বেপরোয়া নব্যাকে গুরুবরণ ক'রে ফুলের মতন ফুটে উঠতে দেখা। আমার কেমন যেন বরাবরই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধকে বড় গুরুগম্ভীর নীরস মনে হ'ত। তুমি প্রেমলকে ভক্তি ক'রেও দূরে রাখো নি আরো কাছেই টেনে এনেছ তোমার হাসি গল্প বাগ্বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে—এ ছবিটি দেখে আমি ভরসা পেয়েছিলাম কম নয়।

তিন, মার-স্নেহ ও আশ্বাস : যে, গুরুর অধীন হওয়া মানে স্বাধীনতা হারানো নয়। এখানে গুরুদেবকে যতই ভালোবাসতে শিখছি ততই হাসি পাচ্ছে কী সব ভুল ধারণাই না আমার ছিল এক সময়ে! আমি সত্যিই ভাবতাম—গুরু "ভাত দেবার ভাতার নন—কিল মারবার গোঁসাই।" কিন্তু গুরুদেবের উদারতায় যতই মুগ্ধ হচ্ছি ততই যেন চোখের ঠুলি খ'সে পড়ছে।

সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে কী বলব? শোনো বলি একটু ফলিয়েই।

ছেলেবেলায়ই মহাভারত পড়তে পড়তে কৃষ্ণকথায় আমার মন দুলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাঁকে সত্যি ভক্তি করতে পারলে মুক্তি পাবই সংসারের হাজারো দুরন্ত বাঁধন থেকে। কিন্তু ক্রমশঃ সংশয় আমাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলেছিল—ঠেকে শিখে যে, যাকে কস্মিন্‌কালেও দেখিনি তাকে শুধু শোনা কথার জোরে আপন মনে করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রচর্চায় কিছুই লাভ হয় না এমন কথা বলি না। কিন্তু পুঁথির দীক্ষায় ভক্তিপাঠে হাতে-খড়ি হওয়া অসম্ভব না হ'লেও ভক্তি কাব্যের রসলোকে প্রবেশ করা যায় না। সেজন্যে চাই এমন কোনো মানুষকে শুধু চোখে দেখা নয়—ভালোবাসা, যে তার প্রত্যক্ষ প্রেমের আলোয় পথ দেখাতে পারে। তাকে বরণ করলে তবেই সহজানন্দে কৃষ্ণকে বরণ করা সহজ হ'য়ে আসে। নৈলে যেমন হাজার হাজার ধর্মার্থীর বেলায় ঘটছে তাই হয়—শোনা

কথার নির্দেশে আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে সময় নষ্ট হয়, কোনো খুঁটিই মেলে না। অন্ততঃ গুরুদেবকে ভালোবাসার ফলে এটুকু আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমার ভক্তির জবুথবু ভাব—stagnancy—কেটে গেছে—আমি অনেক সময়ে নিঃস্রোতেও দীক্ষার প্রবাহে গুরুসেবার পাল তুলে এগিয়ে চলেছি।

এর একটি কারণ কী—খুলে বলি।

আমাদের আশ্রমে খরচ অনেক। এখানে দেড়শো সাধক সাধিকা গিশ গিশ করছে। অবিশ্যি গুরুদেবের কাছে নানা ভক্তেরাই প্রণামী পাঠান, যারা বরাবরের জন্য এখানে আসে তারা তাদের সর্বস্ব নিবেদন করেও বটে। তবু সব জড়িয়ে খরচ তো বাড়েই, তাই প্রত্যেকেই চেষ্টা করে সাধ্যমত আশ্রমের আয় কিছু বাড়াতে।

মানুষ সর্বত্রই তো উপায় করতে চায় আরো আরো আরো। ফলে সংসারযাত্রার নিশ্চয়ই সুবিধে হয়। কিন্তু পারমার্থিক পথে আয় বাড়ানোর ফলে প্রেমের প্রেরণা যে বাড়ে না এ বিষয়ে ধার্মিকদের মধ্যে মতভেদ নেই। এই জন্যেই আমি বিলেত থেকে ফিরে গানকে পেশা করা সত্ত্বেও গান গেয়ে উপায় করতে চাই নি। অর্থলোভ আমার কোনদিনই ছিল না একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না। কিন্তু যশস্বী হব, গানে সাহিত্যে কাব্যে উপন্যাসে নানা রসাল সৃষ্টি ক'রে কীর্তিমান হব এ উচ্চাশা ছিল দুর্দম। প্রেমল এজন্যে আমাকে উঠতে বসতে ধমকাত। কিন্তু আমার মন স্বীকার করতে চাইত না যে, কীর্তিমান হ'তে চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু থাকতে পারে।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখলাম কীর্তির দীপ্তির সঙ্গে অহঙ্কারের দৃপ্তিও বেড়ে ওঠেই ওঠে, আর অহঙ্কারের সঙ্গে যে ভক্তির অহিনকুল সম্বন্ধ কে না জানে?

গুরুদেবের কাছে এসে তবে এ সমস্যার সমাধান পেলাম। তিনি বললেন: "উচ্চাশা খুব ভালো—যদি আশা হয় অসীম। অর্থাৎ, ছোটখাটো কীর্তির স্পৃহা বন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায় বটে—কিন্তু সর্বোচ্চ কীর্তির দুরাশা মুক্তিদা, বলদা, ভক্তিদাত্রী জ্ঞানধাত্রী। কী এ-কীর্তি? না, আত্মাভিমানের লোভ বর্জন। কেমন ক'রে? না, ভালোবেসে। কাকে? না, ইষ্টকে। কিন্তু ইষ্টকে তো দেখতে পাচ্ছি না। বেশ, তাঁর প্রতিনিধিকে—অর্থাৎ গুরুকে ভালোবাসো, তাহ'লেই একটু একটু ক'রে ইষ্টকেও ভালোবাসতে শিখবে যার ফলে তাঁর দর্শন পাবে ভক্তির দিব্যনেত্রে। অথ, প্রশ্ন আসে: গুরুকে ভালোবাসার উপায় কি?

উত্তর গুরুর হুকুমবরদার হ'য়ে গুরুসেবাব্রতী হওয়া। অর্থাৎ, তিনি যা বলেন সবই যদি অকুণ্ঠে মেনে নিতে নাও পারি তাহ'লেও তাঁর কথায় আস্থা রেখে পরীক্ষা করতে চাওয়া—তিনি যে বীজ বুনতে বলছেন বুনলে তাতে ফসল ফলে কি না।

এ কথায় আমার সংশয়ী মন সায় দিল। গুরুদেব আমার গুরুসেবার অনুমোদন করলেন—হ'লাম আমি গুরুদাস: আশ্রমে নানা অতিথি আসেন তাঁদের দেখাশোনা, নানা জ্ঞানার্থীর কাছে গুরুবাণীর প্রচার—সবার উপর আশ্রমের আয় বাড়ানো যত্র তত্র গান গেয়ে। কিছুদিন আগে লাহোরে ও দিল্লীতে গান গেয়ে কয়েক হাজার টাকা আনি। ফলে কীর্তিও হল অর্থও এল কিন্তু ভক্তি মন্দা হ'য়ে পড়ল না—বরং প্রত্যক্ষ জোয়ারই জেগে উঠল ভাঁটিয়ে যাওয়া উৎসাহে। তাই আমি ঠিক করেছি প্রতি বৎসর দু তিন মাস বাইরে যাব ও গান গেয়ে যা পাই গুরুদেবকে প্রণামী দেব—গুরুসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে। আশা করি প্রেমল এতে আপত্তি করবে না। মা-কেও জিজ্ঞাসা কোরো। কারণ আমার মন এ বিষয়ে একেবারে নিঃসংশয় হ'তে পারছে না। এই জন্যে আমি হাততালি কুড়োতে যাচ্ছি না তো নানা সভায়? পরমহংসদেব বলতেন ভাবের ঘরে চুরি করলে বস্তু লাভ হয় না। তাই ভয় হয়। কারণ অহমিকা আসে নানা ছদ্মবেশে। প্রেমলের জ্ঞান তো আমার নেই যে মুখোষকে মুখোষ ব'লে সনাক্ত করতে পারব সব ক্ষেত্রে। কে জানে—হয় তো খুব সূক্ষ্ম মুখোষ হ'লে ধরতে পারব না। আর তখন ফের প'ড়ে যাব গর্তে। প্রেমলের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আস্থা আছে ব'লেই আরো এ প্রশ্ন করছি।

মা কেমন আছেন? তাঁকে বোলো আমাকে আশীর্বাদ করতে যেন ভাবের ঘরে চুরি না করি। ঠাকুরের নৈবেদ্য যেন অহং পুরুত চুরি করতে না পারে।

আজ আর সময় নেই ভাই। শ্রীনগরে গান গাইবার নিমন্ত্রণ এসেছে। মোটা দক্ষিণাও পাব মনে হয়।

কিন্তু এ দক্ষিণা পেতে যাচ্ছি শুধু গুরুসেবা করতেই তো? বাহবা কুড়োতে নয় তো? ভয় হয় বৈকি। তাই আরো দরবার করছি মা ও প্রেমলের কাছে।

ইতি। তোমার

স্নেহাধীন দাদা।

(দশদিন বাদে)

ভাই অসিত,

ললিতাকে যে-চিঠি লিখেছ পড়ে সত্যিই আমার মন খুশী হ'য়ে উঠেছে। মা-ও খুব প্রসন্ন হয়েছেন—তাঁর অসুখ একটু বেড়েছে ব'লে তোমাকে লিখতে পারলেন না নিজে হাতে, তবে বললেন লিখে দিতে যে, গুরুকে ভালোবাসলে ইষ্টকে ভালোবাসা সহজ হয় ব'লেই সদগুরু সে ভালোবাসার অর্ঘ গ্রহণ করেন। সত্যিকারের গুরু কখনই নিজের জন্যে কিছু চান না। তিনি তো নিজের ব'লে কিছুই আগলে রাখেন নি। তাই তাঁকে যা দেবে তিনি সোজা পাঠিয়ে দেবেন দেবেন ইষ্টকে—প্রণামী। গুরু আর ইষ্ট এক বলতে অনেকে এই বিকল্পবাদই বোঝেন। কিন্তু এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না—এ-"বাদ" মানে হল একটা cult; সব cultই সত্য সাধকের কাছে বর্জনীয়। তাই তোমাকে বলেছি বহুবারই যে, আমি গুরুবাদ অবতারবাদ বর্গীয় পরিভাষার বিরোধী তোমার মনে থাকতে পারে। আসল কথা তুমি ঠিকই ধরেছ—ভালোবাসা। যদি দেখ, গুরুর প্রতি ভালোবাসা বাড়ছে তবে আর কার পরোয়া? চলো পাল তুলে এ ভালোবাসায় —কোনো আবর্ত তুফান ঝড় ঝাপটাই তোমার নৌকাকে বানচাল করতে পারবে না পারবে না পারবে না।

তবে বাইরে গিয়ে গান গেয়ে গুরুসেবার্থে প্রণামী সংগ্রহ করার সম্বন্ধে আমি শুধু একটি কথা বলব—কিছু মনে করো না। (তুমি জিজ্ঞাসা করেছ বলেই বলছি—নৈলে বলতাম না।) আমার মনে হয় যে, তোমার মন ভুল বলে নি—এখানে একটু "কিন্তু" (snag) আছে। তবে আসলে এ সংশয়ের কথা নয়—আন্তরিকতার—sincerity-র—কথা। তুমি মনে প্রাণে আন্তরিক —সরল, তাই তোমার জন্যে আমার দুর্ভাবনা নেই। তবু সাধনার সময়ে বাইরে গিয়ে হৈ চৈ যত কম করা যায় ততই ভালো। তবে গুরুসেবার জন্যেই যদি তুমি যাও—(ষোলো আনা গুরুসেবা কিন্তু, মনে রেখো)—তাহ'লে ভয় নেই, থাকতে পারে না। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই ভাগবতে সন্দীপনি মুনির অভয়বাণী যে মনে প্রাণে যে-শিষ্য গুরুসেবা ("গুরুনিষ্কৃতম্") করবে তার ইষ্টলাভ হবেই হবে। কিন্তু যেহেতু তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন, সেহেতু এ নিয়ে আর বেশি বলা বাহুল্য হবে—বিশেষ যখন তোমার গুরুদেব রয়েছেন

স্বয়ং তোমাকে আগলাতে তথা রুখতে। যেই একটু বেচাল হবে তিনি লাগাম কষবেনই কষবেন।

এ নিয়ে আরো কিছু লিখতাম। কিন্তু মা-র স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হচ্ছে তাই আমাদের সবার আনন্দের আলোয় আশঙ্কার মেঘের ছায়া পড়েছে। জানি অবশ্য মা-র আপন বলতে কিছুই নেই আজ—সবই তিনি ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়ে জীবন্মুক্তের অবস্থা লাভ করেছেন। তবু তিনি থাকবেন না ভাবতেও —কিন্তু যাক এ-প্রসঙ্গ। আমরা প্রার্থনা করবই করব—তুমিও প্রার্থনা কোরো ভাই—যেন মা আরো কিছুদিন থাকেন তাঁর ভক্তির আলো ও প্রসাদ আমাদের সবাইকে বিতরণ করতে। এ জগতে নাস্তিক্যের অন্ধকার ঘনায়মান—চারদিকেই রণরোল উঠেছে চাপা বা অর্ধপ্রকট। অজ্ঞান দাম্ভিক মানুষ নানা ইস্‌মের নাম দিয়ে বরণ করতে চলেছে নানা আত্মঘাতী বৃত্তিকে। চাইছে বাইরের প্রতিষ্ঠানের ধুমধড়াক্কায় মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের পত্তন করতে। কিন্তু সে আশা দুরাশা। তোমাকে অনেকবার বলেছি, আবার বলি—ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবনে বা রাষ্ট্রে শান্তি ও সৌভ্রাত্র্যের রামরাজ্য আসতেই পারে না। "ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ" চিরদিন এই-ই হ'য়ে এসেছে, আজ হঠাৎ ধর্মকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র বা কোনো আধুনিক "ইস্‌ম্"-কে বহাল করলে সবই তছনছ হ'য়ে যাবে। হচ্ছেও তো—দেখতেই তো পাচ্ছ। প্রথম জীবনে যুদ্ধে আমি বোমা ফেলতাম শত্রুকে দুষমণ নাম দিয়ে। কিন্তু জগতে একটি মাত্র দৈত্যরাজ আছে যার চেয়ে বড় দুষমণ আর নেই। সে হল নাস্তিক দম্ভ—যে বলে গীতার ভাষায় "কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া"—আমার মতন এমন অপরূপ মহাত্মা আর কে আছে এ জগতে? এ অজ্ঞানান্ধ জগতে একমাত্র দিশারি সাধু সন্ত মুনি ঋষি গুরু মহাজনদের দৃষ্টিদীপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই মহাভারতের গল্প: দৈত্যপতি বৃত্র নিহত হওয়ার পরে কালকেয় দৈত্যরা জগৎকে উচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল এক এক ক'রে সমস্ত সাধু মহাত্মা জ্ঞানী ভক্তদের উৎসাদন ক'রে। কারণ তারা ঠিকই ধরেছিল (যা আজকের নাস্তিক বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমন্তেরা ধরতে পারেন নি, যে "লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে"—মানুষকে ধারণ ক'রে আছে তপস্বীদের তপস্যা—তাই তারা সিদ্ধান্ত করেছিল (লজিকের দুই আর দুইয়ে চার) যে "তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্"—তপস্বীদের নির্বংশ করলে জগৎ-ও ধ্বংস হবেই হবে।

আমাদের তাই একটিমাত্র করণীয় আছে—তপস্যা ক'রে গুরু ও ইষ্টের পায়ে আত্মসমর্পণের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া। এ যদি পারি তবে আমাদের দিয়ে ঠাকুর করাবেনই করাবেন যা তিনি চান বিশ্বমঙ্গলের জন্যে "জগদ্ধিতায়"। আর এ যদি না পারি তবে কোনো ইস্‌ম্‌, কোনো "পঞ্চবার্ষিকী দশবার্ষিকী বা শতবার্ষিকী প্ল্যানেই" মানুষ বাঁচবে না। দেখছ না কি স্বচক্ষেই মানুষ কী মহোল্লাসে উদোম চলেছে উন্মত্ত মারণযজ্ঞের যাজ্ঞিক হ'য়ে বিশ্বহত্যার আগুন জ্বালাতে বিজ্ঞানের নামে, জাতীয়তার নামে, রাষ্ট্রের নামে, সৌভ্রাত্রের নামে? আর এই বাইরের দানবিক টঙ্কার তো আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের আসুরিক হুঙ্কারেরই প্রতিধ্বনি। বাইরের বৈষম্য অবিচার অত্যাচার সবই তো আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের অশান্তি ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছায়াই বটে। এ-দুষ্প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ না ক'রে ভগবৎ-দ্রোহী পারে কখনো যথার্থ মানবপ্রেমিক হ'তে? সন্ধিপত্রে নামসই ক'রে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা আর আইনের জোরে মানুষকে দেবতা ক'রে তুলতে চাওয়া—এ-দুইই কি একজাতের মূঢ়তা নয়? কিন্তু আর নয়। য়ুরোপে আবার যুদ্ধ বাধল ব'লে—এক রণদুর্মদ রাষ্ট্রনায়কের রেডিও ভাষণ সেদিন শুনতে বাধ্য হয়েছিলাম হঠাৎ সুরথদার ওখানে। তাই এ-খেদের পুনরাবৃত্তি। ত্রুটি মার্জনীয়। যাই। মার অসুখ হঠাৎ বেড়েছে। প্রণব বলছে ভয়ের কারণ আছে। তাই আজ আর নয়। কাল আশা করি এ-চিঠি শেষ ক'রে ডাকে দিতে পারব।

* * *

ভাই, কাল এ-চিঠি শেষ করতে পারি নি। কেন? কী আর বলব? অনুমান করতে পারবে সহজেই—কিন্তু দুঃখ করব না করব না করব না—কারণ মা-র বারণ ছিল।

হঠাৎ তাঁর অবস্থা খারাপ হয় পরশু বিকেলের দিকে—ঠিক যখন তোমাকে চিঠি লিখছিলাম। কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন স্নিগ্ধ হেসে (সে যে কী সুন্দর হাসি অসিত, আহা, দেখতে পেলে না!) যে, সত্যিই তাঁর ডাক এসেছে। বললেন মা শান্ত সুরেই:

"তোমরা দুঃখ কোরো না বাবা! আমি চলে যাচ্ছি না তো। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। ডাকলেই আমাকে কাছে পাবে তোমরা। ঠাকুর বললেন তাঁর কাজ চলবে তেমনিই তোমাদের মধ্যে দিয়ে। আমাকে দিয়েও করিয়ে

নেবেন যা আমি পারি।" ব'লে ললিতাকে বললেন "গাও মামণি—কিন্তু দুঃখের গান নয়—শুধু ঠাকুরের বাঁশির গান…আনন্দের গান…আনন্দ আনন্দ আনন্দ…"

ললিতা ধরল তোমার কাছে শেখা একটি গান :

শ্যামল মুরলী উঠিল উছলি' বিরহ উজলি' বিজলিভায়।
কে গো প্রিয়তম নীল নিরুপম! ঝরিলে হে মম যুগতৃষায়!
দেখেছি স্বপনে করুণা যাহার,
যে-অরুণ বিনা ভুবন আঁধার,
সেই তুমি আজি সুরে সুরে বাজি' এলে কি হে সাজি রূপমালায়!
যার বাঁশি তরে রজনীবিহান
পথ চেয়ে রয় পথিক পরাণ,
সে-তুমি মোহন এলে কি শরণ শিখাতে বরণ-মুরছনায়।
যার দীপবরে ফুলে ছায় শাখী,
বরি' নীল যার পাখা পায় পাখী,
সে-তুমি সুদূর এলে কি নূপুর রণিয়া মরুর বিফলতায়!

আমি জানি ভাই, মা কাছেই আছেন। আরো জানি—সত্যি বলছি তোমায়—অন্তরে তাঁর আরো নিবিড় স্নেহস্পর্শ পেয়েছি। এও নিশ্চয় জানি—তাঁর কাজ তিনি করিয়ে নেবেনই নেবেন। তাঁর কৃপা অঘটনী এও কি দেখি নি বারবারই? তবু যতই বলি না কেন ভাই বাইরের জগতে যতদিন চলাফেরা করছি ততদিন সে জগতকে পূর্ণই দেখতে চাই—শূন্য নয়। মা ছিলেন শুধু তো আমাদের অন্তর্জগতে তাঁর প্রেমের আলো জ্বালিয়েই নয়, ছিলেন বাইরের জগতেও তাঁর স্নেহ, বাণী, হাসি চাহনির সুর সেধে—সব বেসুর বেতাল কুরূপকে ঢেকে সব ফাঁককে রসে ভ'রে দিয়ে। সকালে উঠেই ধরতাম মাথায় তাঁর মধুর স্পর্শ—স্নেহের আশীর্বাদ। পাব না আর। ঘুরতে ফিরতে শুনতাম তাঁর ডাক—"দুলাল!" শুনব না আর। ভাগবত পড়ার সময় দেখতাম তাঁর ভাবসমাধি। দেখব না আর। সবার উপর কথায় কথায় শুনব না তাঁর স্নিগ্ধ হাসি…অকারণ হাসি যার ছোঁওয়ায় আমাদের চোখের জলে রঙিয়ে উঠত ইন্দ্রধনু…অসিত! কে এসেছিল আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করতে…আজো কি জানি ভাই?

ইতি। তোমার প্রেমল

পুনশ্চ। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরের জন্যে তুমি কিছু তাঁর স্মৃতিতর্পণে লিখে পাঠালে সুখী হব—ললিতা ও প্রণবের অনুরোধ। ললিতা সে তর্পণটি গাইবে সেদিন।

(পরদিন অসিত লিখল)

প্রেমল, কী বলব? তোমরা তাঁকে পাচ্ছ—অন্তরে। কিন্তু আমার তো নেই তেমন অনুভূতি। আমার কাছে তাই এ ক্ষতি অপূরণীয়। তাঁকে আমি মনে মনে বরণ করি কী নাম দিয়ে জানো?—গুরুর চারণী। সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়েই লিখেছি এ-তর্পণটি তাঁর পুণ্য আত্মার স্তবগানে:

শান্তি মা মহীয়সী!

তোমার হাসির তোমার বাঁশির আলোয় পথের ক্লান্তি, মাগো,
কতবার মুছে গেছে মনে পড়ে—যেমনি তুমি এ হৃদয়ে জাগো।
কোনোদিনই তুমি সম্পদে ভুলে যাও নি তো তাঁরে—যাঁর কৃপায়
প্রতি পদে সুখ পেয়ে তবু মনে রাখি না আমরা তাঁরে ধরায়।

বিপদেও ছিলে তেমনি অটল; করেছিলে যাঁরে গুরুবরণ
অন্তরে বরি' তাঁর আলোমণিকান্তি জিনিলে কালো মরণ।
প্রতি তৃণে তুমি দেখেছিলে তাঁর চিন্ময় রূপ প্রেমের ধ্যানে,
শুনেছিলে প্রতি মর্মরে তাঁর মোহন মুরলী গহন প্রাণে।

যারে দেখে মুখ ফেরাই আমরা, 'হীন প্রাণী' বলি দিনরজনী
তুমি তারো মাঝে দেখেছিলে বালগোপালে তোমার হে সুনয়নী!
যত ভাবি তব বিকাশের কথা, ওগো অপরূপা অতুলনীয়া!
রোমে রোমে জাগে পুলকশিহর, অন্তরে প্রেম উচ্ছ্বসিয়া।

দুদিনে আপন ক'রে যারে তুমি নিয়েছিলে টেনে স্নেহে অপার,
দিব্য নয়ন দিতে, সে গুরুরে চিনেছিল মাগো, বরে তোমার;
তোমায় প্রণাম করি তাই, থাকো যেখানেই দেবী, আশিস দিও:
রাখি যেন মনে—কৃষ্ণময়ীর প্রসাদে গরলও হয় অমিয়।

স্নেহাশ্রিত অসিত

ষষ্ঠ পর্ব

(সাতবৎসর বাদে)

এক

অসিত ভুমেল যোগাশ্রমে এসে প্রেমলকে যেন নতুন ক'রে পেল তার দীপ্ত পত্রাবলীর মাধ্যমে। কোথায় পড়েছিল—দম্পতী কেবল অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়ে মিলনের পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে না, থেকে থেকে চাই ছাড়াছাড়ি হওয়া নৈলে তারা বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পরস্পরের নিটোল পরিচয় লাভ করতে পারে না, যে লাভের পরে মিলনের অনুভূতি শুধু যে আরো উজ্জ্বল সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তাই নয়, বিরহী চিত্তে পত্রালাপের প্রেমদৌত্যে উপচিত হয় এক নব মধুস্বাদ। তাছাড়া প্রেমলের নানা ভাবগভীর পত্রের মাধ্যমে তার এমন এক আশ্চর্য রসরূপ মূর্ত হ'য়ে উঠত যে, অসিত সময়ে সময়ে সত্যিই আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠত। গুরুদেব ছাড়া আর কারুর চিঠিতে সে এত রস কি আলো পায় নি। "আত্মশক্তি ও আত্মজ্ঞান যে ওর সহজাত কবজকুণ্ডল ভাই," বলতেন সুরথদা প্রায়ই। সত্যি কথা। অসিত কেবল জুড়ে দিতে চাইত—গুরুভক্তি। প্রণবও বলত: "গুরুভক্তির প্রসাদেই ও পেয়েছে আত্মজ্ঞান, চিনতে পেরেছে আত্মশক্তিকে।"

অসিতের মধ্যে গুরুভক্তির তৃষ্ণা ছিল সত্যিই গভীর। তাই সে আরো উজিয়ে উঠেছিল স্বামী স্বয়মানন্দের মতন মহাযোগীকে গুরুবরণ ক'রে। তাঁকে যতবারই দেখত বা তাঁর কণ্ঠে শুনত ভাগবতের ভাষ্য, মনে হ'ত যেন এক বৈদিক যুগের ঋষি এসেছেন পাঠ দিতে। কিন্তু আশ্রমে যখন নানা গুরুভাইয়ের মুখে শুনত যে, তিনি সাক্ষাৎ "অবতার", তখন ওর মন কেমন যেন বিমর্ষ হ'য়ে পড়ত। কারণ রাম, কৃষ্ণ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে ওর অবতার ব'লে মেনে নিতে বাধত। তাছাড়া অবতার বলতে ঠিক কী বোঝায় অনেক ভেবেও কোনোদিনই ও ঠাহর পায় নি। একবার প্রেমলকে জিজ্ঞাসা করেছিল এ বিষয়ে। তাতে সে সে সময় জবাব দিয়েছিল: "পরিভাষা নিয়ে, কেন মিথ্যে মাথা বকানো ভাই?—সাধনা করতে গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়েছ, চলো না সাধনা ক'রে। বাজে জল্পনা-কল্পনা, তর্কাতর্কি, কে কত বড় যোগী, কে ঋষি, কে মুনি, কে অবতার কে অবতারী—এ-সব বাগাড়ম্বরে কাজ কি? মনে রেখো—সব পরিভাষা বা সংজ্ঞাই খাঁটি সাধকের কাছে খতিয়ে দাঁড়ায়—সেক্সপীয়রের ভাষায়

—কেবল 'কথা, কথা কথা!' কারণ খাঁটি সাধক মাত্রেই চায় অনুভূতি উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে নিজের প্রকৃতিকে ঢেলে সাজাতে; কিসে কী হয় তার ব্যাকরণ লিখতে নয়—ঠাকুরের করুণায়, ও গুরুর আশীর্বাদে তা-ই হ'য়ে উঠতে যা সে হ'তে চায় কৃতকৃত্য হ'তে: এককথায় খাঁটি যোগপন্থী চায় শিখা, শিখার ছবি নয়। কারণ শিখার ছবি যতই নিখুঁৎ হোক না কেন তার তাপে শীত কাটে না, ঠিক যেমন নদীর ছবি যতই সুন্দর হোক না কেন তাতে পিপাসা মেটে না।"

প্রেমলের লক্ষ্যভেদী কথায় অসিত আবছা আঁধারে লক্ষ্যের দিশা পেত বটে, কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, "পরিভাষা" নিয়ে দুমেল আশ্রমের গুরুভাইদের নানা আতপ্ত আলোচনাকে অলীক মুরুব্বিয়ানা ব'লে চিনেও অনেক সময়েই সেসব বাদবিতণ্ডায় যোগ না দিয়ে থাকতে পারত না। যাদের সঙ্গে ঘর করতে হয় তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন নৈযুজ্য ঘোষণা ক'রে চলবেই বা কেমন ক'রে? তাছাড়া অসিত ছিল স্বভাবে মিশুক মানুষ, তাই আশ্রমের সব আলোচনায় জয়ধ্বনিতেই যোগ দিতে চাইত। কিন্তু চাইলে হবে কি, প্রতি বাদানুবাদের পরেই বিতৃষ্ণায় ওর মন ছেয়ে যেত—যার ফলে ওর দাবিয়ে রাখা বৈরাগ্য ওকে যেন ফের পেয়ে বসত। ও ভেবে পেত না—সর্বগ্রাহী হ'য়েও কেন ওর মন বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকত থেকে থেকে! একবার প্রেমলকে অনুযোগ ক'রে লিখে ধমক খেয়েছিল বিষম। সে লিখেছিল: "অনুযোগ করছ তুমি কোন্ মুখে শুনি? এই বৈরাগ্যই তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে জেনো। নৈলে সৌখীন শিল্পীদের আবদার শুনতে শুনতে তোমাকে পথে বসতে হ'ত। কি জানো? পপুলার হ'তে না চেয়েও তুমি পারো না, আবার পপুলারিটি তোমার আদৌ হজম হয় না। হবে কেমন ক'রে? পপুলারিটির মতন গুরুপাক ক্ষীরসর কি দুটি আছে দিনদুনিয়ায়? কিন্তু তবু তুমি তোমার 'ফ্যান'দের উপরোধ এড়াতে না পেরে এ-জয়ধ্বনির মিষ্টান্ন খেতে খেতে এমন স্থূলকায় হ'য়ে পড়তে যে, শেষে তোমার অব্যর্থ সাইকিক ডায়াবিটিস হ'ত। তোমার অচলপ্রতিষ্ঠ গুরুদেবকে দেখে তোমার অনেক কিছু শিখবার আছে ব'লেই তোমাকে এমন অসামাজিক অর্ধমৌনী গুরুর কাছে আসতে হয়েছে মনে রেখো। তাই মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ো না যে, তোমার গম্ভীর গুরু আনন্দগিরির মতন সুলভ সারথি বা শ্যামঠাকুরের মতন মিশুক মিত্র নন। জীবনে কিছুই অকারণ 'দৈবাৎ' ঘটে না বন্ধু! যারা

ঠাকুরের কৃপার্থী তাদের জীবন সম্বন্ধে একথা আরো বেশি খাটে, কারণ তারা ঠাকুরের পরিচালনা, leadership, কামনা করে ব'লেই ঠাকুর তাদেরকে সর্বনেশে পরিচালকদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেন। তুমি ঠিক গুরুই পেয়েছ—মা-ও বলতেন প্রায়ই।"

উত্তরে অসিত ক্ষুন্ন হ'য়ে লিখেছিল "বেদরদী হ'তে নেই বন্ধু। তোমার গুরুদেবী ছিলেন শুধু তোমার সারথী নন—সাক্ষাৎ মা। তুমি কী বুঝবে আমাদের মতন গুরুসঙ্গবঞ্চিতদের দুঃখ? আমার গুরু চমৎকার সারথি জ্ঞানী ঋষি ভক্ত সবই—মানি, কিন্তু বড় রাশভারি লোক যে ভাই! স্নেহ করেন বৈ কি, কিন্তু সঙ্গ দিতে চান কই? চিঠি লেখেন অপূর্ব বটে, কিন্তু ভাবো তো পরমহংসদেব কী ভাবে মিশতেন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে, মা কী ভাবে মিশতেন তোমাদের সঙ্গে, তুমি কী ভাবে মেশো ললিতার সঙ্গে! শুধু ধমকালেই হয় না! ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝতে হয়।"

উত্তরে প্রেমল লিখল: "কিন্তু তোমার গুরু তোমাকে তো একেবারে বঞ্চিত করেন নি। তাঁর দেখা তো তুমি পাও মাঝে মধ্যে। সব সময়ে যদি না পাও তাঁর সঙ্গ মনে করো না কেন এইই ঠাকুরের ইচ্ছা? গুরুর ইচ্ছা তো ইষ্টের ইচ্ছা থেকে ভিন্ন নয়।" অসিত আপত্তি তুললে: "তোমাদের ঐ এক বুলি—ইষ্ট আর গুরু এক।' তোমরা হয়ত একথা উপলব্ধি করেছ, কিন্তু আমি তো করি নি। পরের মুখে ঝাল খেতে আমি রাজী নই। তবে আমি একথা মানি যে, গুরুদেব আমাকে নানাভাবে তাঁর স্নেহস্পর্শ দেন—বিশেষ ক'রে তাঁর স্নেহোচ্ছল চিঠিতে আমার নানা বন্ধু-বান্ধবীকে আশীর্বাদ দিয়ে। তিনি জানেন তো আমি বন্ধুবৎসল, অতিথিসংকার করতে ভালোবাসি, তাই আমাকে দিয়েছেন রকমারি অতিথির তদারকের ভার। না দিলে কি আমি আশ্রম-জীবন বরণ করতে পারতাম? আমি চিরদিনই নিজের ইচ্ছায় চ'লে এসেছি গুরুদেব জানেন, তাই এখানেও আমাকে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন বৈকি। আর সব সাধকদের কত শাসন করেন, কিন্তু আমাকে পারৎপক্ষে রাশ ক'ষে থামান না। আমার এক বন্ধু আসতে চেয়েছিলেন দীক্ষা নিতে। গুরুদেব ব'লে পাঠালেন: 'সে পারবে না এ-কাঁটাপথে চলতে। তবে যদি তুমি তাকে চাও তো সে আসতে পারে—থাকুক তোমার কাছেই, দুদিন পরে তুমি নিজেই দেখতে পাবে সে কেমন আধার।' এইভাবে তুতিয়ে-পাতিয়ে তিনি প্রায়ই

আমার অবাধ্য সংশয়ী মনকে পোষ মানাতে চান তাঁর স্নেহের মিড়ে। তাই তোমার ও-কথা ঠিকই যে, গুরু সব শিষ্যকে একই প্রেস্ক্রপশন দেন না, কাউকে দেন ছেড়ে কাউকে ধরেন চেপে। আমাকে তিনি অনেকখানি ছেড়ে দিয়েছেন্ একথা সকৃতজ্ঞেই স্বীকার করব। তবুও ভাই, থেকে থেকে কেন যে মন পালাই পালাই করে বুঝি না—বিশেষ যখন তিনি মাঝে মাঝে তাঁর 'আইভরি টাওয়ারে' ঢুকে ব'লে পাঠান কারুর সঙ্গেই দেখা করবেন না, কি কাউকেই চিঠি লিখবেন না। কিন্তু তখনও তিনি আমাকে চিঠি লিখতে শুধু যে বারণ করেন না তাই নয়। আমি লিখলে পিঠ পিঠ উত্তর দেন—গুছিয়ে, বুঝিয়ে, রসিয়ে। এ-মৌনব্রতের সময়েও কখনো কখনো তিনি আমাকে দশ-বারো এমন কি ষোলোপাতারও চিঠি লিখেছেন। এজন্যে আমি তাঁর কাছে কী যে কৃতজ্ঞ বলতে পারি না। কারণ তাঁর চিঠির মধ্যে দিয়ে তাঁর জ্ঞানের যে আলো পাই তাতে আমার বহু গভীর অজ্ঞানের আঁধারই কেটেছে। আমার জীবনে এত বড় দ্রষ্টা জ্ঞানী আমি দেখি নি। সত্যিই আমার তাঁকে সময়ে সময়ে যুগর্ষি মনে হয়! এ-জগতের নানামুখী সমস্যার খবর তিনি শুধু যে রাখেন তাই নয়, তাঁর অতুল্য মনীষার আলোয় আশ্চর্য নির্দেশ দেন পরম সমাধানের। তাঁকে দেখে আমার প্রায়ই কানে বাজে শান্তিপর্বে মহাভারতের সেই জীবন্মুক্ত ঋষির কথা যিনি নিজেকে 'আত্মনিষ্ঠ' ব'লে চিনে অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, আত্ম-সাধনার দৌলতেই তিনি আত্মার মণিকোঠায় ঠাঁই পেয়েছেন—'আত্মন্যেবাত্মনা জাতঃ'। কিন্তু তবু ভাই—ফের কাঁদুনি না গেয়ে পারছি না, মাফ কোরো—সত্যিই সময়ে সময়ে আমার কী যে কষ্ট হয় তাঁর এই একান্ত আত্মারাম রূপ দেখে—মনে হয় যদি আর একটু শিষ্যারাম হ'য়ে আনন্দগিরি বা মা-র মতন আমাদের কাছে ডাকতেন সঙ্গ দিতে!"

প্রেমল উত্তরে একটু নরম হ'য়ে লিখেছিল: "তুমি সব বুঝেও তবু কেবল কেবল কেন সেই একই বায়না ধরো বলো তো? আমরা এখানে মা-র স্নেহসঙ্গ পেতাম একথা ঠিকই। এ-ও আমি কবুল করতে রাজী আছি যে, তোমার গুরুদেবের দীক্ষায় আমি পথ চলতে পারতাম না। কারণ আমি চেয়েছিলাম কৃষ্ণকে—তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিরূপে অভিভূত হ'য়ে। তোমার কাছেই শুনেছি তোমার গুরুদেব ঠিক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন না। তাঁর যোগের লক্ষ্য না কি অন্য। জানি না তোমার এ ভাষ্য ঠিক না ভুল। কারণ আমার মন বলে—

মধুসূদন সরস্বতীর সুরে সুর মিলিয়ে: 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বম্ অহম্ ন জানে' কৃষ্ণের পরে আর কী তত্ত্ব থাকতে পারে জানি না আমি। জানতেও চাই না। কিন্তু তুমি যাঁকে গুরু ব'লে বরণ করেছ, মহাপুরুষ ব'লে চিনতে পেরেছ, তাঁর নির্দেশে চলতে না চেয়ে যদি ঘড়ি ঘড়ি এদিক ওদিক তাকাও (শেলির ভাষায়—look before and after and pine for what is not.) তাহ'লে তোমাকে দোষ দিলে সেটা কি খুব বেদরদী সমালোচনা হয়? না, শোনো অসিত, মিথ্যে কান্নাকাটি ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। গুরুবরণ করার পরেও আর নিস্ফল ক্ষোভ-রাগে অশ্রু-তানে গেও না: 'এমন কেন হ'ল অমন না হ'য়ে—হায় হায়!' তুমি আমি উভয়েই গুরুমুখী সাধক একথা ভুললে চলবে না। তাই এসো, let us both hitch our chariots to the Guru's star,—এছাড়া সত্যিই আর পথ নেই ভাই। অতএব কবির ভঙ্গিতে আগুপাছু চেয়ো না, মনে রেখো তোমার গুরুদেবের কথা—যে, তুমি গুণী ও কবি হ'লেও সব আগে যোগী—আর যোগীর সাজে না যোগ ছাড়া আর কোন আদর্শের চিন্তাকে মনে ঠাঁই দেওয়া। দিলে শুধু সময় নষ্ট—কেন না তোমাকে আমাকে যোগী হ'তেই হবে এ আমাদের গুরুর কথা—কাটবে কেমন ক'রে?'

অসিত এ-ধরণের কথায় মনে জোর পেত ব'লেই প্রেমলকে লিখত। আশ্রমের অনেক প্রবীণ সাধক এতে রাগ করতেন, বলতেন: "গুরুর কাছে এসে আর কারুর কাছে হাত পাতা ঠিক নয়।" একথা সময়ে সময়ে অসিতেরও মনে হ'য়ে আসত চিত্তগ্লানি। কিন্তু হ'লে হবে কি, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন: "ন', প্রেমল তোমার সাধনার সহায়। এমন বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। তুমি আশ্রমের এর ওর তার কথায় কান দাও কেন—আমি যখন তোমাকে বলছি তুমি ঠিক পথেই চলছ?"

ওর খুব গৌরব বোধ হ'ত একথায়। তাই আরো প্রেমলের চিঠি একে ওকে দেখাত। প্রেমল একবার জানতে পেরে রাগ ক'রে ওকে ধমকায়। তারপর থেকে ও তার চিঠি বাইরে কোথাও পাঠাত না বটে, কিন্তু আশ্রমে কোনো বন্ধুবান্ধবী এলে না দেখিয়ে থাকতে পারত না—শুধু ব্যক্তিগত আনন্দ পেত ব'লেই নয়, সত্যিই বিশ্বাস করত ব'লে যে মহৎ কিছু দেখে আনন্দ পাওয়ার দায়িত্ব আছে যার নাম—অন্যকে সে-মহত্ত্বের স্বাদ দেওয়া। পরমহংসদেবের উপমা: আম খেয়ে আমের খবর দেওয়া পাঁচজনকে, বলা—যাও যাও অমুক

গাছের আম মিষ্টি যেন গুড় !…এখানে ওর প্রেমলের সঙ্গে কিছুতেই মতে মিলত না। সে বলত মুখহলসা হ'য়ে এ-সব প্রচার ভালো নয় সাধক অবস্থায়। কিন্তু এতে গুরুদেব আপত্তি করতেন না ব'লে ও প্রেমলকে লিখেছিল বেশ ফলিয়েই যে, ও গুরুর মতেই চলছে। তারপর থেকে প্রেমল আর ওকে ধমকাত না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার বন্ধু ও শিষ্যের কাছে বলত—অসিতের এ-উৎসাহ আদৌ সমর্থনীয় নয়। শুনে অসিত লিখত: "ভাই, একটু আধটু মতভেদ থাকলে শুধু যে ক্ষতি নেই তাই নয়—তার ফলে মতৈক্যের তৃপ্তিও বাড়ে, বন্ধুত্বের রসস্বাদও বিচিত্র হ'য়ে ওঠে। প্রতি ব্যাপারেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে—এ-আশা কি এ-সংসারে দুরাশা নয় ? প্রেমল একথা অস্বীকার করতে পারত না ব'লেই আরো ওকে বেশি ধমকাতে পারত না। এজন্য ললিতা খুব খুশী হ'য়েই ওকে একবার লিখেছিল: তুমি বাপীকে প্রচার ক'রে বেশ করেছ দাদা! এখানে আমি ষোলোআনা তোমার দিকে: বাপী যে কতবড় আধার সবাই জানুক এ আমিও চাই।"

দুই

অসিত সময়ে সময়ে দুমেল আশ্রমে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত ব'লেই হাঁপ ছাড়তে বাইরে গিয়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসত। তাছাড়া এসূত্রে বাইরে গিয়ে আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে টাকা তোলার হৈ চৈ-এর বৈচিত্র্যও ছিল—কিঞ্চিৎ গুরুসেবাও হ'ত বৈকি। যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখী। কেবল মুস্কিল এই যে, এতে ক'রে গুরুসেবা হলেও ওর চিত্তবিক্ষেপ কমত না, ফলে ফিরে এসে যোগে মন বসাতে আরো বেগ পেত। শেষে একবার প্রেমলকে লিখল একথা খোলাখুলি। তাতে প্রেমল লেখে: "তোমাকে বলিনি যে, বাইরে গিয়ে বেশি হৈ-চৈ করা ভালো নয়। তবে এ বিষয়ে আমার কিছু বলা সাজে না যখন তোমার গুরুদেব তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তোমাকে বলেছি, মনে থাকতে পারে তোমার, যে, গুরু যদি বাঘের মুখে যেতেও হুকুম করেন—যাবে। কারণ নিশ্চয়ই জেনো গুরু শিষ্যদের সংকটযাত্রায় পাঠান কেবল তখনই যখন তিনি জানেন যে তা থেকে তাদের কিছু প্রত্যক্ষ লাভ হবে। নৈলে তোমার গুরুদেব তোমাকে এ-ভাবে বাইরে গিয়ে গান গেয়ে টাকা তুলতে অনুমতি

দিতেন না ব'লেই আমার মনে হয়। তুমি সামান্য আধার নও একথা তিনি জানেন ব'লেই হয়ত মনে করেন এতে তোমার ক্ষতি হবে না। তাই তুমি মিথ্যে ভেবো না ভাই—তিনি যখন ভরসা দিচ্ছেন তখন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমিও তোমাকে এ নিয়ে আর বকাবকি করব না। কেবল একটা কথা বলব বারবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—কিছু মনে কোরো না ভাই—যে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখো, তাহলে কুমীর তোমাকে গ্রাস করতে এলেও তারই ঘাড়ে চ'ড়ে তুমি গঙ্গা পার হবে—হবেই হবে, মিলিয়ে নিও একথা পরে। হ্যাঁ, আর একটি কথা: আমার চিঠিগুলি শুধ্ তোমার জন্যে। তোমার গুরুদেবকে দেখাতে পারো অবিশ্যি, কারণ তার কাছে তোমার কোনো কথাই লুকোনো উচিত নয়। তবে আর কাউকে দেখিও না, দেখিও না, দেখিও না—লক্ষীটি ভাই।"

কিন্তু ও বাইরে গিয়ে যত্রতত্র গান গাইত, রকমারি নরনারীর সঙ্গে অবাধে মিশত এবং নানা অবাঞ্ছিত অতিথিকেও তার ওখানে ঠাঁই দিত ব'লে কয়েকজন সাধক ওর প্রতি বিষম অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠে ওর বিরুদ্ধে নানা কথা বলা স্বরু করেন। আশ্রমের কয়েকজন উদার সাধক এতে দুঃখ পেয়ে ওকে বলতেন "হিংসুক"-দের কথা কানে না তুলতে। কিন্তু অসিত ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর তাই বার বার সংকল্প করা সত্ত্বেও বিচলিত হ'য়ে উঠত। নিজের দোষ ও যে দেখতে পেত না তা নয়, কিন্তু মুস্কিল এই যে, অপরের মুখে সে-সব দোষের কথা শুনলে ওর মনে বিষম ক্ষোভ জমত। ফলে ওর সাধনার ক্ষতি হ'ত বৈ কি। কিন্তু উপায় কি? ওর এক ক্রিটিক সতীর্থ বলতেন প্রায়ই: "Can the leopard change its spots?" ও গুরুদেবকে জানাত, কিন্তু গুরুদেব ব'লে বা লিখে পাঠাতেন চিত্তস্থৈর্য না হারাতে। তখন অগত্যা ক্ষুব্ধ হ'য়ে ও ফের প্রেমলকে লিখত সহানুভূতি চেয়ে কিন্তু সে ওর দুঃখে দুঃখ পেলেও কিছুতেই ওর ক্ষোভকে আমল দিত না। একবার ফের ধমকেই লিখেছিল: "গুরুর আশ্রয় ও সমর্থন পেয়েও কি ক্ষতিপূরণ মেলে নি তোমার? তাছাড়া যদু মধু বিধু সিধু-র কথায় না চ'টে তাদের তরফের কথাও তোমার একটু ভেবে দেখা উচিত নয় কি? তুমি তোমার গুরুদেবের প্রায় নিত্য সমর্থন পাও, তারা পায় না। তাঁর কাছ থেকে বড় বড় চিঠি পাও—তারা পায় না। দরকার হ'লে তাঁর দেখাও পাও—তারা পায় না। তোমার ওখানে তোমার বন্ধুবান্ধবীরা এসে থাকেন ও গানে গল্পে আশ্রমে নিত্যনতুন হিল্লোল আনেন—তারা থাকে একটানা

একঘেয়ে জীবনের মধ্যে। সবার উপর, তুমি বাইরে গিয়ে আশ্রমের জন্যে মোটা টাকা এনে গুরুদেবকে প্রণামী দাও—তারা দিতে পারে না। তুমি কি সত্যি মনে করো—তারা যোগ করতে এসেছে ব'লেই সবাই রাতারাতি স্থিতপ্রজ্ঞ তৈলঙ্গ স্বামী হ'য়ে বসেছে? ভাই, মানুষের স্বভাবের কথা ভেবে একটু দরদী হ'তেই হবে তোমাকে। তাছাড়া গড়পড়তাদের কাছে অসামান্য মহত্ত্বের আশা করা সাজে না। মানুষ সত্যিই বড় দুঃখী অসিত। শুধু দুঃখী নয়, দুর্ভাগা। তাই তো যে অভিমানকে জয় করতে যোগী হ'তে চাওয়া, সেই অভিমানকেই সে প্রশ্রয় দিয়ে বসে পদে পদে। তাছাড়া এ-বেচালও সাধকদের হবেই হবে—অন্ততঃ প্রথম দিকে। বহু পোড় খেয়ে তবে স্বভাব বদলায়। অগ্নিপরীক্ষা বিনা কি চিত্তসীতার শুদ্ধি লাভ হয় কখনো? তুমি তাই এর ওর তার কথা ভেবে 'মনের বাজে খরচ' না ক'রে চেষ্টা করো না কেন গুরুকৃপার নির্দেশে চলতে—স্বেচ্ছাবিহারের দুষ্প্রবৃত্তিকে আমল না দিয়ে? তাছাড়া মনে রেখো একটা কথা: যে, আমাদের শত্রুরা আমাদের ছোট করতে এসে হেরে গিয়ে আমাদের বিকাশের সহায় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে যদি আমরা একটু নম্র হ'য়ে তাদের নিন্দাবাদ থেকেও শিখতে চাই। মানে, শান্ত মনে দেখতে চাই তাদের নিন্দার মধ্যে সত্য আছে কিনা। যদি থাকে তবে তারা তো সত্যের দিশারি মতন হ'য়ে গুরুরই কাজ করছে বলব। যদি দেখতে পাও যে, তারা তোমার নামে যে অপবাদ দিচ্ছে সে অপবাদের অল্পকিছুও ভিত্তি আছে তবে তোমার এমন আচরণ হোক যাতে এ-ভিত্তিটুকুও লুপ্ত হয়। হ'লে দেখতে পাবে এক আশ্চর্য ব্যাপার: যে, তাদের নিন্দা অপবাদ আর মনে লাগছে না একটুও! ভেবো না ভাই, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি। বিশ্বাস কোরো—একথা বলছি আমি নিজে ভুক্তভোগী ব'লে। আর একটি কথা ভুলো না: যে, আশ্রমে থাকার যেমন অসুবিধা আছে তেমনি সুবিধাও আছে। সুবিধাটুকু ভোগ করব কিন্তু অসুবিধা বরদাস্ত করব না—এ হয় না। You can't have it both ways. তাই যারা তোমার নিন্দা করছে তাদের পাল্টে নিন্দা ক'রে তাদের স্তরে নেমে যেও না। তাদের নিন্দা থেকেই আত্মশোধনের দিশা সংগ্রহ ক'রে তাদের দুয়ো দাও। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ভাই। There is no royal Road to salvation—কোনো মুষ্টিযোগেই আত্মাদর-রোগ সারে না। যে সত্যি নিরাময় হ'তে চাইবে

তাকে আপ্রাণ দীনতা সাধনের সঙ্গে বরণ করতেই হবে গুরুকৃপালব্ধ বলিষ্ঠতা।
ইতি। প্রেমল।"

অসিত মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করত—গুরুদেবের কাছ থেকেও সাধনপথে যে-শক্তির পাথেয় জুটত না—অর্থাৎ আত্মশোধনের অভীপ্সা—সে-শক্তি প্রেমলের কাছ থেকে পেত কেমন ক'রে? প্রেমল তো সত্যিই কিছু ওর গুরু দিশারি কি সারথি নয়: তবে? কেমন ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হ'ল?

এ-প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল একদিন ললিতার একটি ছোট পত্রে। সে লিখেছিল:

জানো কি দাদা, বাপীর কথায় কত লোক জোর পায়? আমাদের এখানে মাঝে মাঝে একটি মেয়ে আসে আলমোরা থেকে। বাবা মা সঙ্গতিপন্ন। মেয়েটিও সুন্দরী তার ওপর চঞ্চলা—প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ফল যা হবার: হাজারো প্রজাপতি হাত পাতা সুরু করল তার প্রসাদ পেতে। সে-ও ',বহুৎ আচ্ছা" ব'লে তাদের নিয়ে খেলাতে লাগল উস্কে দিয়ে ও বেড়া বেঁধে। এমনি সময় বিধাতা এক খেলা খেললেন—বলে না ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে? হ'ল কি, এক নাগরকে খেলাতে গিয়ে তার সঙ্গে হঠাৎ বিষম প্রেমে প'ড়ে যায়। এ-নাগরটি তারই চালে তাকে টেক্কা দিল। ঘা খেয়ে নাজেহাল হ'য়ে মেয়ে বিষ খেতে যায়। সে দীর্ঘ কাহিনী। ভবি তো হ—আমি এ সময়ে ছিলাম তাদের কাছেই—সুরথদার ওখানে। তাই ডাক দিলাম তাকে আমাদের আশ্রমে একটু জুড়োতে। "আশ্রম" শুনেই প্রথমে সে শিরপা তুলেছিল: শেষে এল, কিন্তু বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। ছেলেবেলা থেকে মা মাসী সকলেরই কাছে শুনে এসেছে—সে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—ধরাকে সরা জ্ঞান করবে না কেন বলো? এ হেন মেয়ে—যে কারুর কথায়ই কান দেয় না সে—বাপীকে দেখেই অভিভূত হ'য়ে তাঁর কাছে কেঁদে পড়ল। বাপী তাকে আশীর্বাদও করেছিল। কিন্তু তার পরে সে তার প্রণয়ীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে না বলতে বাপী বলল: "আমাদের আশ্রমে এসে ঠিক সংসারীর চালেই চললে কিছু পাবে না মা। আমাকে যদি সত্যিই সাধু—মানে জ্ঞানী—মনে করো—তবে এর ওর তার নিন্দেয় আমার সায় পেতে এসো না। তার জন্যে তোমার সংসারী সখা সখী আত্মীয়স্বজন দরদীরা তো রয়েছেনই অজস্র। তাঁদের কাছে যেতে না যেতে তাঁরা সমস্বরে বলা সুরু করবেন: 'তা বটেই তো, তা বটেই তো—যে-প্রণয়ী তোমার মূল্য

না বোঝে সে অতি পাপিষ্ঠ, দুর্জন…' এইসব মনরাখা কথা। কিন্তু আমার কাছে যদি সত্যিই কিছু পথের পাথেয় পেতে চাও তো মনে রেখো যে, সব আগে আমার বেদরদী ধমককে মেনে নিতে হবে—অর্থাৎ চাইতে হবে সব আগে আত্মশোধন। যোগ করতে না চাও কোরো না, কিন্তু সাধুর কাছে এসেও চেও না তোমার অহমিকার খোরাক। দেখতে শেখো—তোমার নিজের মধ্যে কোথায় কী খুঁৎ, গলদ, ভাবের-ঘরের-চুরি লুকিয়ে আছে গা-ঢাকা হ'য়ে। এ যদি পারো তাহ'লেই যথার্থ সাধুসঙ্গ করা হবে শান্তি পাবে। নৈলে শুধু মনঃকষ্টই হবে কণ্ঠমালা। বুঝলে মা?"

আশ্চর্য, মেয়েটি এ কথায় কেঁদে বাপীর পায়ে মাথা কুটে বলল: "আমি শুনব আপনার কথা গুরুজি! কেবল আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি ভাবের ঘরে চুরি ছেড়ে নিজেকে বদলাতে পারি—ক্ষোভ জয় ক'রে পারি নির্মল হ'তে।"

তারপর থেকে সে সত্যিই কত যে বদ্‌লে গেছে কী বলব তোমাকে? পরের বার যখন এখানে আসবে তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, দেখতে পাবে—আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নি। বাপী আমার সোজা লোক নয় দাদা, বুঝলে? হুঁ হুঁ। তোমার গুরুদেব যুগর্ষি হ'তে পারেন, কিন্তু আমিও সোজা গুরু পাইনি জেনে রেখো।

ইতি। তোমার স্নেহধন্যা বোন
ললিতা

তিন

এই সময়ে অসিতের সঙ্গে দেখা হ'ল তপতীর—এক বিচিত্র পরিবেশে।

অসিতের নানা গল্প ও কবিতা প'ড়ে সাধন মিত্র ব'লে এক অধ্যাপক ওকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। একদা অসিত তাঁর নিমন্ত্রণ পেল জব্বলপুরের রবার্টসন কলেজ থেকে। মিত্র মহাশয় সবে রবার্টসন কলেজের অধ্যক্ষ পদ পেয়েছিলেন। লিখলেন—"অসিতবাবু, ধর্ম ও গুরুবাদ সম্বন্ধে যদি একটি ভাষণ দেন কলেজের বাৎসরিক উৎসবে তাহ'লে আমরা বাধিত হব। ছাত্রেরাও সবাই চাইছে আপনাকে। তবে তারা বেশি চায় আপনার গান শুনতে…" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসিতের নিমন্ত্রণ ছিল আমেদাবাদে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি

বললেন ওকে জব্বলপুরে দুচারদিন থেকে আমেদাবাদ যেতে। অসিত সানন্দেই রাজী হ'য়ে তার ক'রে দিল : তথাস্তু।

সভামণ্ডপে ওর সঙ্গে মিত্রমহাশয় আলাপ করিয়ে দিলেন চীফ গেষ্ট শ্রীমতী তপতী দেবীর সঙ্গে : "এখানকার সব কালচারাল উদ্যোগেরই প্রধানা নেত্রী ব'লে।"

কমনীয় কান্তি, ধনীর কন্যা, পারিবারিক জীবন সুখের—তবু চোখে মুখে বিষাদের ছাপ কেন? গান ও ভাষণের শেষে ঘরে ফিরে অসিত মিত্র মহাশয়কে শুধাতেই তিনি উত্তর দিলেন সোচ্ছ্বাসে : "সামান্য মেয়ে নন উনি স্বামীজি! উচ্চশিক্ষিতা, এখানকার মহিলা সমাজের নেত্রী, পাঞ্জাবের এক ক্রোরপতির কন্যা। সর্বত্রই সুনাম।

"তবে হবে না কেন বলুন?" বললেন ভাষ্যকার, "এ-ও বুঝলেন না স্বামীজি, তারকনাথ গাঙ্গুলি তাঁর একটি উপন্যাসে লিখেছিলেন—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তার ওপরে বাপ ক্রোরপতি—মুসুরিতে তাঁর সাভয় হোটেলে থাকেন শুধু সাহেবসুবোই তো নয়, যত সব হোমরাও চোমরাও ন্যাশনাল লীডারেরাও অভ্যুদিত হন তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে। সেখানে উনিই তাদের হোস্টেস হন প্রায়ই। হবেন না? বাপের আদুরে মেয়ে তো। শিক্ষাচরিত্র কালচার টাকা চটক কী নেই বলুন? তার ওপর উনি দু দুটি অনাথাশ্রম চালান। তার ওপরে সব রকমের কাজকর্মেই পটু—নার্স ট্রেন করতে, চাঁদা আদায় করতে, কাগজে লিখতে কিসে নয় বলুন? তার ওপরে—"

অসিত (হেসে): আমার এক ভাটপাড়ার বন্ধুর কথার মাত্রা ছিল "চক্রের মানে কি?" আপনার দেখছি—"তার ওপর"।

মিত্র মহাশয় (আরো হেসে): আমি দমবার পাত্র নই স্বামীজি। কারণ "তার ওপরে" এখানে বলতেই হবে বার বার—it is called for. কেন? কারণ তপতী দেবী হ'লেন যাকে বলে চৌখস মহিলা par excellence—তাই ওঁর একটা গুণের খবর দিতে না দিতে আর একটা ঝাঁ ক'রে এসে পড়ে—এ-ও বুঝলেন না! না, স্বামীজি, এ আমার একটুও বাড়ানো কথা নয়—ওঁকে চিনলে বুঝতেন এ কথার মর্ম—তবে সত্যি বলতে, এসবও বাহ্যই বলব। আসল কথা কী জানেন?—উনি যাকে বলে 'প্রতিভাময়ী মহিলা'—One in a million—(দম না নিয়ে হু হু ক'রে) ওঁকে কেউ কেউ নিন্দে করে অবশ্য—তবে জানেনই

তো আমাদের দেশের লোকের হালচাল—কেউ একটু উঠলেই তাদের চোখ টাটায়—নামাতে চায় প্রাণপণে। কিন্তু তবু মিথ্যে অপবাদ তো টেঁকে না স্বামীজি, তাই ওঁর নিন্দুকরাই হ'ল 'বয়কট' ওঁকে বয়কট করতে গিয়ে। সে এক কাণ্ড—মহাভারত বললেই হয়—শুনবেন একদিন আমার স্ত্রীর মুখে—কী ভাবে উনি এক দুঃখিনী মেয়েকে ওঁর অনাথাশ্রমে ঠাঁই দিতে একদল সমাজস্তম্ভ রৈ রৈ ক'রে উঠেছিল—গেল গেল গেল!—ডি এল রায়ের ভাষায়—'ঐ যায় যায় যায়—প'ড়ে এ কলির ফেরে সবই যে রে, ভেঙে চুরে ভেসে যায়!' কিন্তু করলে হবে কী বলুন? ওঁকে টলাবে কে? মেয়েটি প্রসব হ'ল এখানেই—শিশুটি বাঁচল না, কিন্তু মেয়েটির ব্যবস্থা উনি করলেন প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ ক'রে। এমন দানশীলা মহিলা বেশি দেখিনি স্বামীজি, সত্যি বলছি। কেবল ওঁর এক বাই আছে—বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া—ক্রমাগত গুরুগ্রন্থ পড়া। সে আর এক কাণ্ড! আমার স্ত্রীর মুখেই শুনবেন সব, তার সঙ্গে ওঁর খুব ভাব—উনি নাকি গুরুবাদ মানেন না। এখানেই এক ডাকসাহিটে গুরু চেয়েছিলেন ওঁকে শিষ্যা করতে। সে কী আপ্রাণ চেষ্টা স্বামীজি! কিন্তু উঁহুঃ—মনের জোর ওঁর অসাধারণ। ওমুখোই হ'লেন না—সে-বাজিকর মহাগুরু কত লোভ দেখাল ওঁকে রকমারি যোগবিভূতির—'তুমি মস্ত আধার, কেবল নিজেকে এখনো চিনতে পারো নি, আমি চিনিয়ে দেবার জন্যে তোমার প্রতীক্ষা করছি এতদিন…' ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে আপনাকে এসব বলা তো carrying coals to Newcastle, বলে না? গুরুরা চেলা—বিশেষ ক'রে শাঁসালো চেলী—পাকড়াতে কিরকম হন্যে হ'য়ে বেড়ান আপনার তো অজানা থাকার কথা নয়—ঐ যাঃ, মুখ ফ'স্কে স্বামীজি, আমি সদ্‌গুরুর কথা বলছি না—কিছু মনে করবেন না—

অসিত (হেসে): না না, বদ্‌গুরুরা সদ্‌গুরুর চেয়ে ঢের বেশি আসর জম্‌কায় এ-কথা শুধু যে ভুক্তভোগী হ'য়ে জানি তাই নয়, বহুবার বলেছি যত্রতত্র। কিন্তু উনি গুরুবাদী নন অথচ ক্রমাগত গুরুগ্রন্থ পড়েন বলছিলেন?

মিত্র মহাশয়: হিউম্যান নেচার স্বামীজি!—জটিল, সাংঘাতিক জটিল। আমরা ভাবি—মানুষকে লেবেল দিয়ে পরিপাটি ভাগ করা যায়। কিন্তু একই মানুষের মধ্যে যে কতরকম উল্টোপাল্টা স্রোতের লীলাখেলা—তা আপনি সাধুপুরুষ জানবেন কেমন ক'রে বলুন?

অসিত (হেসে): আমি অনেক পোড় খেয়ে তবে সাধু হয়েছি মশাই! তাই বলুন যা প্রাণ চায়। বন্ধুভাবে যাই বলুন না কেন আমি সাদরেই বরণ ক'রে নেব, কথা দিচ্ছি।

তখন মিত্রমহাশয় বললেন তপতী সম্বন্ধে আরো অনেক কথা। স্বামীর বড় পরিবার। একান্নবর্তী। চারটি ভাইয়ের চার স্ত্রী। সবাই তপতীকে মাথায় ক'রে রাখে। স্বামী দৌলতরাম এঞ্জিনিয়ার—ব্রিলিয়াণ্ট। যাকে বলে সেল্‌ফ্‌-মেড ম্যান—ষোলো আনা। শুধু আমেরিকায় নয় রাশিয়ায়ও ছিলেন। সর্বত্রই কর্তারা তাঁর মনীষার উচ্ছ্বসিত গুণগান করেছেন তাঁদের সার্টিফিকেটে। দুটি ছেলে। বড়টির বয়স আট বৎসর। ছোটটি কোলে—দু-বৎসরের ফুটফুটে শিশু। তবু তপতী কত কাজই যে করে ঘরে বাইরে। ঘরে যেমন নিপুণ গৃহিণী, বাইরে তেমনি নামকরা বিদুষী। ইংরাজী তো বলেই মেমসাহেবের মতন—তা হবে না স্বামীজি! লাহোরের বিখ্যাত সেণ্ট মেরি স্কুলে খাস মেমসাহেবদের কাছে থেকে তাদের বোর্ডিং স্কুলে পড়তেন। তাছাড়া উর্দু পাঞ্জাবী গুরুমুখী এমনকি বাংলাও চমৎকার জানেন। ওঁর এক কাকা হরদয়ালজি কলকাতার বড় বণিক। তার কাছে কলকাতায় ছিলেন পাঁচ সাত বৎসর। এককথায়, ওয়াণ্ডারফুল লেডী স্বামীজি—এ একটুও বাড়ানো নয়"…ইত্যাদি আরো কত খবরই যে দিলেন এ-গুণগ্রাহী অধ্যাপক!

ফলে—বলা বাহুল্য—অসিতের কৌতূহল একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠল বৈ কি। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগও হ'য়ে গেল।

জব্বলপুর থেকে ওর আমেদাবাদে নিমন্ত্রণ ছিল এক ক্রোরপতি গুজরাতী বন্ধুর প্রাসাদে: সেখানে এক চ্যারিটি কন্সার্টে গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে টাকা তুলবে। প্রেমলকে লিখে দিল যে "সম্ভব হ'লে আমেদাবাদ হ'য়ে পাড়ি দেবে সোজা আলমোরায় যদি বাধা না পরে অবশ্য।" উত্তরে ললিতা লিখল: "নিশ্চয় এসো দাদা। তবে তোমাকে বাপী লিখে দিতে বলল মৃদু হেসে যে তোমার তো ঝাড়া হাত পা, না আছে স্ত্রী-পুত্র-পোষ্যদের পিছু ডাক—না গুরুর অপেক্ষা—তিনি তো ঘড়ি ঘড়ি চাতুর্মাস্য ব্রতে প্রচ্ছন্ন মৌনী হ'য়েই থাকেন। এক শিষ্য শিষ্যা থাকলেও একটা বন্ধন হ'ত। তা তোমার সে বালাইও নেই। কাজেই তুমি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম যাকে বলে—একেবারে অক্ষরে

অক্ষরে। এ-হেন তোমাকে বাধা দেবে কে বলো? না, ঠাট্টা নয় দাদা। তোমাকে আমাদের সত্যিই কী যে হিংসে হয় কী বলব?

অসিত চিঠি পেয়ে খুশী হ'য়ে ললিতাকে লিখে দিল: "তোমার চিঠি প'ড়ে প্রফুল্ল না হ'য়ে করি কী দিদি? তবে আমার সবচেয়ে মন খুশী হয় কেন জানো? —ভাবতে যে, বিধাতা আমাকে একটি বর দিয়েছিলেন—যতই দুঃখ পাই না কেন I will travel light—যেন মহাভারতী স্বরেই বলেছিলেন তিনি: "লঘুর্ভব মহারাজ! লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি।" কেন না এই-ই হ'ল আমার নিয়তি—destiny বললে আরো জোর হয়।"

"অলক্ষ্যে বিধাতা নিশ্চয় হেসেছিলেন সে সময়ে"—টিপ্পনি করেছিল প্রেমল—যদিও পরে—after the event.

চার

অসিত আমেদাবাদে ওর শেঠ বন্ধুকে আগেই লিখে দিয়েছিল যে, তাঁর নিমন্ত্রণে ও মনে স্বস্তি পেয়েছে বৈকি। ধনপতি সহায় থাকলে কন্সার্টে নিশ্চয় ডবল টিকিট বিক্রয় হবে। বন্ধুও আশ্বাস দিয়েছিলেন অকুতোভয়ে ওর আমেদাবাদ রওনা হবার মুখে: "মাভৈঃ—কন্সার্ট হলে যাতে তিলধারণের জায়গা না থাকে সে-ভার আমার। তাছাড়া আমার বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই আহ্লাদে আটখানা তোমার মুখে মীরাভজন শুনবেন ব'লে। তাঁরা টিকিট তো কিনবেনই—তাছাড়া প্রণামী—ডোনেশনও—দেবেন।"

খবরটা সারা জব্বলপুরে র'টে গেল মুখে মুখে। পরদিনই বিকেলবেলা তপতীর স্বামী দৌলতরাম ওকে এসে ধরলেন যে, তাঁর ওখানেও একটি প্রাইভেট জলসার বন্দোবস্ত করতে চান তিনি—তপতী প্রণামীও পাঠিয়েছে দু-হাজার টাকা দুমেল আশ্রমের জন্যে। ব'লেই চেক দাখিল—তপতীর স্বাক্ষরে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে দৌলতরাম আরো একটি "আর্জি" জানালেন: যে, তপতীর অনুরোধ—স্বামীজি অন্তত দু-তিন দিন তার অতিথি হন। বিশেষ কথা আছে।

অসিত (সকৌতূহলে): কথা? কিসের?

দৌলতরাম (ইতস্তত: ক'রে): আমি ঠিক জানি না স্বামীজি। তবে (হেসে) ভূতের কথা নয় রামনামেরই হবে এটুকু আন্দাজ করা শক্ত নয়।

অসিত (খুশী হ'য়ে) : বেশ বেশ দৌলতরামজী। রসিকদের সঙ্গে আমার বনে ভালো। তাছাড়া আমি তো অনিকেত সাধু—আমার একটি কীর্তনে আমি আঁখর দিয়ে থাকি : "যার নেই ঘর তার নেই পর"। তাই তপতী দেবীকে আমার বহুমান অভিবাদন দিয়ে বলবেন আমি সানন্দেই তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

দৌলতরাম (সবিনয়ে) : এককে চার দিয়ে গুণ করলেও আমি ভড়কাব না স্বামীজি।

অসিত (উচ্চহাস্যে) : সাবাস জী। কথাটা এই : তপতী দেবী হঠাৎ আমাদের আশ্রমে প্রণামী পাঠালেন কেন ? তিনি শুনেছি গুরুবাদে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমাদের আশ্রমের চূড়া বলতেও গুরু, বনেদ বলতেও গুরু।

দৌলতরাম (হেসে) : স্বামীজি, আপনি অনিকেত সাধুপুরুষ ব'লেই জানেন না—যা গৃহীরা সবাই জানে : যে, গৃহিণীর মন গৃহীদের কাছে কায়রোর sphinx-এর চেয়েও রহস্যময়—হো হো হো !

পাঁচ

তপতীর ওখানে অসিতের ভজনের জয়জয়কার রটল সকলেরই মুখে। শুধু পাঞ্জাবীরা স্বভাবে অতিথিবৎসল ব'লেই নয়—অসিতের নানা সুফী উর্দু গজলেও তারা সর্বত্রই সাড়া দিত সোচ্ছ্বাসে।

দু-তিন দিন জাঁকালো পাঞ্জাবী আতিথ্যে অসিতের পরমানন্দেই কাটল। কিন্তু এ কী ব্যাপার ? তপতী দেবী ব'লে পাঠিয়েছিলেন—কথা আছে, কিন্তু তিনি তো কই কিছুই বললেন না ? ভজন শুনে তাঁর চোখে জল আসত—চোখ মুছতেন কিন্তু ব্যস ঐ পর্যন্ত। অসিতের মনে পড়ল দৌলতরামের কনফেশন : যে, গৃহীরা কস্মিন্‌কালেও গৃহিণীদের মনের তল পায় না। তিনদিন বাদে নিরাশ হওয়ার ফলে অসিত একটু গম্ভীর সুরেই তপতীকে বলল আমেদাবাদে তার ক'রে দিতে শেঠজির কাছে যে, সে বিকেলের ট্রেনেই রওনা হবে।

তপতী : যদি কাল সকালে রওনা হন—সম্ভব হবে কি ?

অসিত (সবিস্ময়ে) : কেন ?

তপতী (মুখ নিচু ক'রে) : আমার কিছু—কথা ছিল।

অসিত: দৌলতরামজিও আমাকে তাই বলেছিলেন। কিন্তু তুমি তো এ তিন দিনে একটি কথাও বললে না!

তপতী (একটু চুপ ক'রে থেকে): আমি—আমি মন স্থির করতে, পারিনি কতটা বলব আপনাকে।

অসিত: কী ব্যাপার?

তপতী: আজ বিকেলে মার্বল-রক্‌স্‌-এ ডাকবাংলোয় যেতে চাই—কেবল আপনি আর আমি। এখানে রকমারি মানুষের ঝামেলা। তাই চাইছি আপনি থাকুন অন্ততঃ আর একটা দিন!

অসিত (একটু ভেবে): আচ্ছা। তাই হবে। তার ক'রে দাও—কালই রওনা হব—যদিও পরশু বন্ধুকে লিখেছিলাম আজই রওনা হওয়ার কথা।

তপতী: বহু ধন্যবাদ।

অসিত ভেবে পেল না কী ব্যাপার। গুরুদেবকে এ-অনৈশ্চিত্যের কথা লিখে দিল সব খবর দিয়ে। তারপরে প্রেমলকে লিখল: "তপতীর কথা তোমাকে আগেই লিখেছি ভাই—লোকমুখে যা যা শুনেছি। আজ বিকেলে সে মার্বল রকস্‌-এ আমাকে নির্জনে বলতে চায় সে কেন আমাকে এখানে ডেকেছে। আমার মনে বিষম কৌতূহল জেগেছে। তুমি জানো—ললিতা কী ভাবে আমাকে ঠাট্টা করে উঠতে বসতে যে, মেয়েরা সহজেই আমার কাছে তাদের 'হৃদয় দুয়ার' খোলে। কিন্তু তপতী তার হৃদয়ের দুয়ার খোলা দূরে থাক, আজ পর্যন্ত একটি জানলার খড়খড়ি পর্যন্ত খোলে নি। এ আর এক আশ্চর্য ব্যাপার বৈকি, কারণ ও স্বভাবে খোলামেলাই বলব—আদৌ reserved নয়। যাহোক, ও কী বলে তোমাকে জানাব যথাকালে। কারণ ওর ভাবগতিক দেখে মনে না হ'য়েই পারে না যে, ও যা বলতে চায় তা ভাববার কথাই হবে—নৈলে ও এত সাতপাঁচ ভাবত না কখনই।"

ছয়

মার্বল রক্‌সে নর্মদা তীরে একটি লতাবিতানের নিচে কার্পেট বিছিয়ে তপতী অসিতকে বসতে ব'লে নিজে বসল ঘাসের উপর।

অসিত: ঘাসের উপর কেন?—এখানে—

তপতী : যোগীর আসনে সংসারীরা বসতে পারে না সাধুজি। কেবল একটি কথা : আপনাকে দাদাজি ব'লে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন ?

অসিত (সবিস্ময়ে) : তোমার মুখেও দাদাজি সম্ভাষণে রাগ? ব্যাপার কি ?

তপতী (একটু চুপ ক'রে থেকে) : আপনাকে খুব আপন মনে হয়েছে, অথচ…অথচ আপন বলতে সংসারীরা যা বোঝে ঠিক সেভাবে নয়। আপনাকে আমি বলতে চাই যা কাউকে বলিনি—বলব ভাবিও নি কোনোদিন।

অসিত : কী এমন কথা ?

তপতী (মুখ নিচু ক'রে) : আমার সংসার ভালো লাগে না দাদাজি। এক সময়ে…আমি…আমার মনে হ'ত শুধ্ কালচার ও ভালো কাজের মধ্যে দিয়েই পাব যা আমি চাই। কিন্তু…নানা অনাথাশ্রম চালিয়ে এ-ও-তা সভাসমিতির রকমারি জাঁকালো বা রঙিন বাণীর মধ্যে দিয়ে আমি কিছুই পাই নি।

অসিত : একেবারে শূন্য—Zero ?

তপতী : তাছাড়া কি ?—যদি যা চাই তা না পাই ?

অসিত : কী চাও তুমি ?

তপতী : ঠিক বুঝতে পারি নি এতদিন। প্রথম আভাষ পাই আপনাকে দেখে। আমি চাই পথের দিশা। কোন্ পথে গেলে…আমার হৃদয়ের শূন্যতা ভ'রে উঠবে ? আপনার কাছে জানতে চাই।

অসিত : আমার কাছে ! কেন হঠাৎ !

তপতী : হঠাৎ নয়, দাদাজি ! আপনার গান আমি বহুদিন থেকে শুনে আসছি। আপনার নানা লেখাও পড়েছি—শুধু ইংরেজি নয়, বাংলায়ও। আর যতই পড়েছি মনে হয়েছে…আপনাকে…কি বলব ? বললে ভয় পাবেন না ?

অসিত (সবিস্ময়ে) : ভয় ? মানে ?

তপতী : মানে, আপনি চান একলা চলতে, আর আমি চাই আপনার নিদেশে চলতে—আপনার পিছু পিছু।

অসিত : আমি নির্দেশ দেব কী ক'রে ? তবে যদি দিশা চাও তো আমার গুরুদেবের কাছে তোমাকে পেশ করতে পারি।

তপতী : না। তাঁর নির্দেশ আমি চাই না। আর এই-ই হ'ল আমার

কথা—যা এ তিনদিন ধ'রে বলি বলি ক'রে কোনোমতেই বলতে ভরসা পাই নি—আরো, আপনি আমল দেবেন না নিশ্চয় জানি ব'লে।

অসিত : আমি আমল দেব না? ঠিক বুঝতে পারছি না—কী তুমি বলতে চাইছ?

তপতী (একটু চুপ ক'রে থেকে): বলতে চাইছি—আপনাকেই আমি চিনেছি আমার গুরু ব'লে।

অসিত (চমকে): আমাকে? কবে?

তপতী : প্রথম দিনই আপনার ভাষণ শুনে। না, ভুল বলেছি। ভাষণ শুনে নয়, আপনার কণ্ঠে যে-স্বর বেজে ওঠে আপনার গানে সেই সুরের দোলায়। ভাষণে আপনি করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি।

অসিত : প্রতিধ্বনি? কিসের?

তপতী : যে-ডাকের টানে আপনি সব ছেড়েছিলেন। আপনি গেয়েছিলেন একটি বৃন্দাবনের গান। তার শেষে একটি আঁখর দিয়েছিলেন :

ওরা জানে না—তাই মানে না
আমি জানি—তাই মানি
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি তাই প্রভু আমি জানি।

(গাঢ়কণ্ঠে) আপনার এ আঁখরটিতে আমার বুকের তার বেজে উঠেছিল দাদাজি।

(চোখ মুছে) আমি…আমি শুনি নি এই বাঁশি। কিন্তু তার…তার প্রতিধ্বনি শুনেছি আপনার কণ্ঠে। তাই আমি…আপনার…গুরুদেবকে ভক্তি করলেও তাঁকে গুরুবরণ করতে পারব না। কারণ…ঐ যে বললাম…আমার গুরু ঠিক হ'য়ে গেছে—সে আপনি।

অসিত : আমি! অসম্ভব। আমি গুরু হ'তেই পারি না। আমি শিষ্য—জিজ্ঞাসু—seeker—

তপতী : দাদাজি! মনে আছে কাল আপনি এক ঘণ্টা ধ'রে বলেছিলেন আপনার প্রিয়তম বন্ধু প্রেমল বৈরাগীর কথা?

অসিত : কিন্তু তার সঙ্গে—

তপতী : সম্বন্ধ আছে দাদাজি। তিনিও তো শিষ্য—জিজ্ঞাসু। কিন্তু তবু ললিতা দেবী কি তাঁর শিষ্যা হন নি?

অসিত : হয়েছেন, কিন্তু সে মা-র—মানে প্রেমলজির গুরুর আদেশে।

তপতী : তাহ'লে আপনার গুরুর আদেশে আপনি আমার গুরু হ'তে পারবেন, না কেন ?

অসিত : আমাদের আশ্রমে—মানে কোনো শিষ্যই কাউকে দীক্ষা দিতে পারে না—গুরুদেবের আদেশ এ-ই।

তপতী : কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি যে, প্রেমলজি বলেছিলেন—গুরু নানা শিষ্যকে নানা নির্দেশ দেন—মানে উল্টোপাল্টা নির্দেশ। মানে···আপনার গুরুদেব আপনাকে এমন অনুমতি দিতে পারেন যা আর কাউকেই দেন নি।

অসিত : ভুল। আমাদের গুরুদেব অত্যন্ত ভারিক্কি—গম্ভীর গুরু—মানে strict।

তপতী (হেসে) : আপনি কি ভুলে ব'সে আছেন দাদাজি, আপনি রবার্টসন কলেজে আপনার ভাষণে কী বলেছিলেন ?

অসিত : কী বলেছিলাম ?

তপতী : বলেছিলেন—গুরুর করুণা যে পেয়েছে সে সব আগে জানে একটি কথা : যে, দিন দুনিয়ায় এমন আপন আর কেউ নেই। এ হেন অন্তরঙ্গ বন্ধু কখনো কখনো "গম্ভীর" হ'তে পারেন হয়ত—কিন্তু strict—হ'তে পারেন কি ?

অসিত (বিপন্ন কণ্ঠে) : কিন্তু তাব'লে আমাকে তো তিনি জানেন যে, আমি সাধক মাত্র পথ খুঁজে পাই নি—

তপতী : কী বলছেন দাদাজি ? যে পথ খুঁজে পায় নি সে কি গাইতে পারে বাঁশির ডাকের বাণী এমন সুরে যা শুনে অবিশ্বাসীর প্রাণেও তার প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে ?

অসিত : তুমি কি বলতে চাইছ সত্যিই যে, তিনি আমাকে অনুমতি দেবেন তোমাকে শিষ্যা করতে ?

তপতী : শুধু বলতে চাইছি ন', দাদাজি। আমি জানি যে, দেবেন।

অসিত : অসম্ভব।

তপতী (মৃদু হেসে) : ক্ষমা করবেন দাদাজি, কিন্তু ভয় ভয় করা সত্ত্বেও আপনাকে না টুকে পারছি না। আপনি কালই তো বলছিলেন—আপনার বন্ধু প্রেমলজি বলেন প্রায়ই যে, গুরুর করুণা-যে-সব অঘটন ঘটায় আমাদের বুদ্ধির কাছে অসম্ভব মনে না হ'য়েই পারে না।

অসিত (হেসে): গুরুর করুণা অঘটন ঘটায় কি না জানি না, তবে হবু-গুরুর শিষ্যা হবার উৎসাহে যে বোবার মুখেও খই ফোটে এ চাক্ষুষ করা গেল। কেবল জিজ্ঞাসা করি—আমাকে টুকতে তোমার ভয় ভয় করে বললে কেন? তুমি যে-ভাবে আমার সঙ্গে তর্ক স্বরু করেছ তাতে তো মনে হয় না যে, ভয় ব'লে কোনো কিছুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে।

তপতী (হেসে): দাদাজি, পাষাণচাপা ঝর্ণা আমি দেখেছি স্বচক্ষে। পাথরের ঢাকনাটি যেই খুলে যায় অমনি ঝর্ণা ছুটে চলে টগবগিয়ে কলকল ক'রে। তাই তো শিষ্যা হবার উৎসাহ বেদরদী গুরুর প্রত্যাখ্যানের ঢাকনাকে সরিয়ে দিল—দীক্ষার স্রোতে কলকল ক'রে ছুটে চলতে। কিন্তু তবুও ভয় ভয় করে বৈ কি: যদি ধরুন ভাবেন—শিষ্যা না হ'তেই যে গুরুর সঙ্গে নাছোড় তর্ক জুড়ে দেয়, শিষ্যা হ'য়ে বসলে সে মাথায় চ'ড়ে বসবে না তো?

অসিত: এখন তো পাখী পড়ছে বেশ!

তপতী (হেসে): দাদাজি, কলকাতায় আমি সাত বছর ছিলাম। একটি গান ছিল আমার ভারি প্রিয়। তার শেষে ছিল:

> "আমি তব পোষা পাখী
> যা শেখাও মা, তাই শিখি
> শিখিয়েছ তারা বুলি তাই ডাকি মা তারা তারা।"

কিন্তু ঠাট্টা থাক, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় আপনার গান শুনতে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করেছি। তাই আমার অনুরোধ—আপনি আপনার গুরুদেবকে আমার কথা সব লিখে জিজ্ঞাসা করুন—

অসিত: তোমার কথা তোমার দু'হাজার টাকা প্রণামী পাঠাবার সময় একবার লিখেছি ফলিয়ে—যা যা লোকমুখে শুনেছিলাম। তারপর আজ সকালে আরো লিখেছি এ-কয়দিন তোমার আতিথ্যে তোমাকে যা দেখেছি ও কোনো কথা না শুনেও যা বুঝেছি।

তপতী (হেসে): এবার তেসরা খেপে লিখুন—আমার যে-অভয়া রূপ চাক্ষুষ ক'রে ভয় খেয়েছেন তার কথা।

অসিত (কোপের ভঙ্গি ক'রে): ভয় খেয়েছি? আমি কি তেমনি না-মরদ মনে হয় তোমার?

তপতী (করজোড়ে) : না-মরদ মনে হয় না দাদাজি, বড় বেশি মরদ ব'লেই ভয়।

অসিত : হেঁয়ালি ?

তপতী : না দাদাজি। আপনি পরশুদিন একটি কথা বলেছিলেন যা মরদেরই কথা : যে চায় হাল্কা চলতে—যাকে সাহেবরা বলে travelling light. এঁরা স্ত্রীপুত্রের ভারও যেমন এড়িয়ে চলেন বৈরাগী হ'য়ে তেমনি শিষ্যশিষ্যার ভারও এড়িয়ে চলেন একলা মন্ত্র জপ ক'রে রাতারাতি সিদ্ধ হ'তে।

অসিত : তুমি আমাকে একটু হকচকিয়ে দিয়েছ তপতী, কবুল করছি। কারণ ঠিক এই কথাটিই একদিন প্রেমল আমাকে বলেছিল : যে, গুরুমার কাছে দীক্ষা পাবার পরেও ও ললিতার ভার নিতে চায় নি পাছে লক্ষ্যে পৌছতে দেরি হ'য়ে যায়। তুমি কী ক'রে ধরলে একথা ? বৈরাগ্যের তুমি কী জানো ?

তপতী (একটু হেসে) : বৈরাগ্যের আমি কিছুই জানি না একথা ধ'রে নিলেন কেন দাদা ? বলে না : Things are not what they seem ? তাছাড়া, বৈরাগ্যের খবর না রাখলেও বৈরাগীদের খবর রাখা যায় না কি ?

অসিত : আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলবে ?

তপতী : দাদা, আপনার একটি গল্পে পড়েছিলাম আপনার একটি গান। তাতে আছে এই ভয়ের কথা :

"অপরের ভার কেমনে বহিব আমি
আপনারই ভার বহিতে যদি না পারি।"

অসিত (একটু চুপ ক'রে থেকে) : তপতী ! আমি যা বলেছি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তবে যে-বিলাসে তুমি মানুষ হয়েছ সে-বিলাসের পরিবেশে বৈরাগ্য সচরাচর ঠাঁই পায় না একথা তুমিও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। কিন্তু মরুক গে এসব অবান্তর কথা। আমি (একটু থেমে) মানে, তোমার কথা আমার মনে দাগ কেটেছে—যাকে সাহেবরা বলেন impressed হওয়া। তবে আমি প্রমাণ করবই করব যে, ও-কবিতাটি আমার একটা বিশেষ বৈরাগ্যের ঝোঁকে লেখা—যে-ঝোঁক আমাকে দিয়ে থেকে থেকে অনেক কিছু বলিয়ে নেয় যা আদৌ আমার মনের কথা নয়। মানে, আমি কাউকেই এড়িয়ে চলতে চাই না—যদিও এড়িয়ে চলার সাধ আমাকে নানা সময়ে পেয়ে বসে—বিতৃষ্ণার দুর্লগ্নে।

তপতী : তাহ'লে একটি অনুরোধ রাখবেন আমার ?

অসিত : কী ?

তপতী : গুরুদেব আপনার প্রথম চিঠিটি নিশ্চয়ই পেয়েছেন কাল বা আজ। আপনি আজ রাত্রে তাঁকে ট্রাংক কল-এ টেলিফোন ক'রে জানান আমার কথা—যে আমি দীক্ষা চেয়েছি আপনার কাছে।

অসিত (সকুণ্ঠে) : সে অনেক টাকা লাগবে এতদূর ট্রাংক কল।

তপতী : দাদাজি, দয়া ক'রে এইটুকু দয়া করুন আমাকে। আমি কত সময়ে বিলেতেও ট্রাংক কল করি জানেন ?

সাত

অসিত সেদিন রাতে তপতীর অনুরোধে গাইল তার একটি প্রিয় গান—সে গ্রামোফোনে শুনেছিল :

বসালে অপনে মনমে প্রীত !...
ভারতমাতা হৈ দুখিয়ারী, দুখিয়ারে হৈঁ সব নরনারী,
তূ হি উঠা লে সুন্দর মুরলী, তূ হি বন জা শ্যাম মুরারী,
তূ জাগে তো দুনিয়া জাগে, উঠেঁ সব প্রেমপূজারী,
গায়ে তোর গীত।...

গেয়ে তপতীর অনুরোধে বাংলা অনুবাদটিও গাইল বিশেষ ক'রে বাঙালী শ্রোতাদের জন্যে।

ওরে মন ! কর না প্রেমের গুণগান
ভারতজননী দেখ কাঁদে আজ বেদনায়
নরনারী দিশাহারা : কোথা পথ তমসায় ?
মুরলীধরের বরে মুরলী উঠায় করে
তাঁরি সুরে সুর ওরে, মিলায়ে নে গভীরে।
জাগিলে তুই রে মন, জাগিবে জগৎ জন—
প্রেমের পূজারী আছে যে যেথায় অচিরে
সাধিবে সুরেলা একতান।

* * *

অতিথিরা চলে গেলে দৌলতরাম বিদায় নিলেন। একটি বিশেষ চুক্তির কাজে তাঁকে নাগপুরে যেতে হচ্ছে। বললেন সেখান থেকে সোজা আমেদাবাদ যাবেন তিনদিন পরে তপতীকে নিয়ে।

অসিত (আশ্চর্য): তপতীকে নিয়ে!

দৌলতরাম: বাঃ! তপতী বলেনি আপনাকে?

তপতী: থামো, আমাকে বলতে দাও। শুনুন দাদাজি! আপনি আমেদাবাদে যাচ্ছেন আপনার গুরুদেবের জন্যে টাকা তুলতে শুনেই আমি মুসুরিতে বাবাকে লিখেছিলাম যে, আমি আপনাকে আমেদাবাদ থেকে মুসুরিতে টেনে নিয়ে যেতে চাই। সাভয় হোটেলে আমরা মাঝে মাঝে নানা চ্যারিটি শো দেই। বাবাকে লিখেছিলমে আমরা বার্ণার্ড শ-র ARMS AND THE MAN অভিনয় করতে চাই। অভিনয়ের আগে আপনি গাইবেন আধঘণ্টা। ব্যস। টাকা তোলার ভার আমার। শুধু আপনার গুজরাতী বন্ধুই যে টাকা তুলতে পারেন তা নয়—আপনার পাঞ্জাবী বন্ধুরাও পাল্লা দিতে পারে দেখাব আমরা। এতে দৌলতরামজির পুরো সায় আছে আরো এইজন্যে যে ও দারুণ পেট্রিয়টিক।

অসিত: পেট্রিয়টিস্‌ম্ বুঝতে পারি—কিন্তু আমাকে তো বলো নি।

তপতী: বাবার উত্তরের অপেক্ষা করছিলাম। আজ সন্ধ্যায় তিনি টেলিফোন করেছেন মুসুরি থেকে—যখন আপনি গাইছিলেন। তিনি খুবই উৎসাহিত। বলেছেন ওঁকে: স্বামীজি আমার অতিথি হবেন এ তো আমার ভাগ্য। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় নিয়ে এসো তাঁকে। বাকি যা বলেছেন—পরে তাঁর মুখেই শুনবেন।

অসিত: কিন্তু আমার যে এবার ডুমেল ফিরে না গেলেই নয়।

দৌলতরাম: সে হচ্ছে না দাদাজি। মানে এখন আর হয় না। আমরা সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। আপনার গুরুদেব অমত করবেন না তপতী জোর দিয়েই বলেছিল। মানে, আপনি তো আশ্রমের জন্যে টাকা তুলতেই বেরিয়েছেন—দু চার দশ দিন দেরী হ'লে কী এমন ক্ষতি? মুসুরিতে বেশ মোটা টাকা উঠবে স্যর মেলারামজী পেট্রন থাকলে। মুসুরিতে তিনি যাকে বলে The first citizen, সাধে কি তপতী বলে উঠতে বসতে: I am proud like a peacock of my father, the lion—হো হো হো!

তপতী : হয়েছে হয়েছে—মনে রেখো Whistle and train wait for no man.

দৌলতরাম : you are right—(কব্জি ঘড়ির দিকে চেয়ে) Oh, I must fly like a fairy! প্রণাম দাদাজি। আমেদাবাদে দেখা হবে। (ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উধাও—কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফের ঘরে ঢুকে তপতীকে) : ভুলে যাচ্ছিলাম—এই আমার নাগপুরের টেলিফোন নম্বর (কার্ড দিয়ে)—দরকার হ'লেই টেলিফোন কোরো। তোমার সম্প্রতি হাঁপানি বেড়েছে—তাই উদ্বিগ্ন থাকব মনে রেখো। প্রণাম দাদাজি। (প্রস্থান)

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

আট

তপতী (টেলিফোনে) : কে ?···ও (অসিতকে) তুমেল, দাদাজি।

আমি (টেলিফোনে) : কে ?···সোহনলাল ? ও। ও গুরুদেব··· আচ্ছা, আমি ধরছি···(একটু পরে) গুরুদেব ?

গুরুদেবের স্বর : হ্যাঁ। কী ব্যাপার ?

অসিত : আমার চিঠি পেয়েছেন—চেক শুদ্ধু ?

গুরুদেবের স্বর : পেয়েছি আজই। তপতীকে আমার আশীর্বাদ দিও।

অসিত : তা তো দেব। কিন্তু ও বলে দীক্ষা চায়। আমি ওকে বলেছি অসম্ভব, আমি সাধক, নিজেই পথ খুঁজছি—পথের দিশা দেব কেমন ক'রে ?

গুরুদেবের স্বর : প্রেমলও কি পথ খুঁজছে না ?

অসিত (বিপন্ন) : কিন্তু সে মস্ত আধার।

গুরুদেবের স্বর : আর তুমি ছোট্ট আধার ? শোনো—বাজে কথা থাক। তপতীকে বোলো আমি তাকে দেখেছি।

অসিত (চমকে) : দেখেছেন ? কবে ?

গুরুদেবের স্বর : আজই সন্ধ্যায়—তোমার চিঠি ও তার চেক পাওয়ার পরেই। তুমি তখন গাইছিলে একটি উর্দু গান আর ও চোখ মুছছিল। ওর পাশে ব'সে ছিলেন বোধহয় ওর স্বামী দৌলতরাম ?

অসিত (হেসে) : প্রমাণ দিচ্ছেন নাকি গুরুদেব ?

গুরুদেবের স্বর (হাসির শব্দ): না দিয়ে কী করি বলো—শিষ্যের কাছে মান রাখতে হবে তো।

অসিত: তপতী খুব খুশী হবে শুনে। কিন্তু ওকে কী বলব দীক্ষার কথা?

গুরুদেবের স্বর: তুমি ওকে দীক্ষা দিতে পারো। ও তোমার সাধনার সহায়ই হবে—বাধা হবে না।

অসিত: কিন্তু—আপনি আশ্রমে—

গুরুদেবের স্বর: আমি আশ্রমের জন্যে যে-সব নিয়ম করি তা অনড় অটল নয়। ধর্মজগতে আদালতের আইন সর্বেসর্বা নয়, যে বলে: "আমার কাছে অ আ ক খ গ ঘ···সব সমান।" যোগধর্ম বলে: "অ আ ক খ গ ঘ··· প্রত্যেকের জন্যেই আমার বিধান আলাদা।" তাইতো এত দরকার গুরুর—পরমহংসদেবের কথা পড়েছ তো মা নানা সন্তানের জন্যে নানা পথ্যের ব্যবস্থা করেন।

তপতী (মৃদুস্বরে): মুসুরির কথাটা—

অসিত: গুরুদেব, তপতী একটু কথা বলতে চায় (তপতীকে) না না কেন? বলো, বলতেই হবে—তুমি না "অভয়া"?

তপতী (বাধ্য হ'য়ে টেলিফোন ধ'রে): গুরুদেব, প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। আপনি টেলিফোনে যা যা বলেছেন সব শুনতে পেয়েছি পরিষ্কার পাশ থেকে। আমার একটি আর্জি আছে···

গুরুদেবের স্বর: জানি মা। মুসুরিতে অসিতকে নিয়ে যেতে চাও তো? আমার অনুমতি আছে।

তপতী: আবার প্রণাম, গুরুদেব। কেবল আর একটি অনুমতি—মুসুরি থেকে আমি সোজা একমাসের জন্যে তুমেল যেতে চাই দাদাজির সঙ্গে।

গুরুদেবের স্বর: তোমার স্বামী?

তপতী: তিনি অনুমতি দেবেন। দাদাকে তিনি গভীর ভক্তি করেন।

গুরুদেবের স্বর: তাহ'লে আসতে পারো।

টেলিফোন সংযোজকের স্বর: Times up!

তপতী: প্রণাম।

গুরুদেব: শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ। কেবল একটি কথা মা—একটু সাবধান থেকো—তোমার উপর একটা ছায়া আছে।

তপতী (টেলিফোন রেখেই অসিতের পায়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে) : কী আনন্দ দাদা—দাদা—দাদা—(হঠাৎ দারুণ কাশি)

অসিত (ব্যস্ত হ'য়ে) : কী ব্যাপার ?

তপতী (কোনো মতে) : ভয় নেই…আমার (কাশি) এ হাঁপানির কাশি (ফের কাশি) মাঝে মাঝে হয়—(কাশি) উত্তেজনা হ'লেও চেপে ধরে কখনো কখনো। (কাশি) ও ঠিক হ'য়ে যাবে…(বলতে বলতে ফের কাশতে কাশতে নেতিয়ে পড়ে)

নয়

তপতীর মূর্চ্ছা ভাঙল একটু পরেই। সে ক্ষীণ স্বরে জোর ক'রে হাসি টেনে বলল : 'ভাববেন না দাদাজি! আমার এমন মাঝে মাঝে হয়—বুকে হঠাৎ একটা বেদনা হয়…কিন্তু কিছু ভয়ের কারণ নেই। আপনি যান বিশ্রাম করুন। কাল আপনাকে ভোরে উঠতে হবে ট্রেন ধরতে।"

অসিত : আমি সকালের ট্রেনে যাব না। বিকেলের ট্রেন ধরব।

তপতী : আমার জন্যে ?

অসিত : তা শিষ্যা হ'তে চাইছ যখন—

তপতী : চাইছি মানে ? হই নি নাকি এখনো—এর পরেও ?

অসিত (একটু আশ্বস্ত হ'য়ে হেসে) : ফের যে কথা ফুটেছে দেখছি।

তপতী : আমি শিখ মেয়ে দাদা—pretty tough—বেশ ভালোই হ'ল। কাল সকালে রীতিমত বা-কায়দা দীক্ষা দেবেন ধূপ ধুনো জেলে আপনার গুরুদেব ও ইষ্টদেবের ছবির সামনে। দেবেন তো ? না ফের গুরুদেবকে ট্রাঙ্ক কল দিতে হবে ?

অসিত : না, হবে না—হার মেনেছি যখন।

* * *

অসিত প্রেমলকে সব খবর দিয়ে এক দীর্ঘ আট পাতার চিঠি লিখে শেষে পুনশ্চ জুড়ে দিল। সব লেখা হ'ল না তবু। কারণ রাত বারোটা বেজে গেছে। কেবল একটা কথা তোমাকে বলতে চাই ভাই। এই সেদিনই ললিতাকে লিখেছিলাম—বিধাতার একটি বিধানের জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ : যে,

আমি হাল্কা হ'য়ে চলতে পারি এ ব্যবস্থা তিনি করেছেন আমার স্কন্ধে অবান্তর মোট না চাপিয়ে। তপতী আমাকে শ্লেশ দিয়ে বলেছিল আমারই একটি গানের দুটি চরণ উদ্ধৃত ক'রে :

'অপরের ভার কেমনে বহিব আমি
আপনারই ভার বহিতে যদি না পারি ?'

কিন্তু গুরুদেব যখন জোর দিয়েই বললেন যে, ওর ভার নিলে আমার সাধনার ক্ষতি হবে না তখন প্রথমটায় মনে জোর পেলেও এখন ফের দুশ্চিন্তা আসছে ভিড় ক'রে। একি সত্যি আমি পারব ? ভাবনা আরো বেড়ে গেছে হঠাৎ ওর মূর্ছা দেখে। তবে মনে পড়ে তোমার একটা কথা—তুমি বলতে প্রায়ই : "কোনো দায়িত্ব যে নিতে চায় না সে যে সব সময়ে সাধনায় বেশি লাভ করে তা নয়—গতি মানেই প্রগতি নয়—সে দুর্গতির দিকেও মোড় নিতে পারে।" শিষ্যের দায়িত্ব বরণ করলে একটা মস্ত লাভ হয় এই যে, তাকে তৈরি করতে গেলে নিজেকেও খানিকটা তৈরি করতে হবেই হবে। কাজেই বলা চলে যে, দীক্ষা দেওয়ার ফলে দীক্ষাদাতার লোকসান হয় না, কারণ দীক্ষিত শিষ্য মনের মতনটি হ'য়ে গ'ড়ে উঠলে সে গুরুর মস্ত সহায় হ'য়ে দাড়ায় ; দ্বিতীয় কথা, বলতে তুমি : 'শিষ্যের মন প্রাণকে ঊর্ধ্বমুখী করতে হ'লে গুরুকেও পদে পদেই নিতে হয় সংযমের শুদ্ধাচারের পাঠ।' আমি স্বভাবে স্বেচ্ছাবিহারী একথা আমার মনে হয়েছে বিশেষ ক'রে ললিতার ভার নিয়ে তুমি কত কী পেয়েছ চাক্ষুষ ক'রে। তাই তপতীর কথা ভেবে মন আমার একটু ভয় পেলেও হৃদয় সত্যিই নির্ভরসা হয় নি, বিশ্বাস কোরো। মনে পড়ে তুমি প্রায়ই বলতে : 'সাধনায় যতই মনকে দাবিয়ে হৃদয় এগিয়ে আসে ততই সংশয়ের কুয়াশা কেটে যায়।' তপতীকে দীক্ষা দিয়ে হয়ত আমার এইখানে একটা সত্যি লাভ হবে, কে জানে ? তাছাড়া আমার একটা মস্ত বাঁচোয়া—ওর দুই ছেলে রয়েছে—সংসারের খুঁটি ওর দৃঢ়, স্বামীকেও ও ভালবাসে, স্বামীও ওকে গভীর শ্রদ্ধা করে। তাই ও দীক্ষা নিয়েও সংসারেই থেকে সাধনা করবে তো। কাজেই আমার ভয়ের বিশেষ কারণ নেই।"

* * *

বিধাতা অলক্ষ্য থেকে এই সময়ে বোধহয় দ্বিতীয়বার হেসেছিলেন।

দশ

পরদিন সকালে উঠে অসিত প্রাতভ্রমণ শেষ ক'রে প্রেমলের চিঠিটি ডাকে দিয়ে ফিরে বাগানে সবে ধ্যানে বসেছে এমন সময়ে এক নার্স এসে বলল: "মা বলতে বললেন আপনি ভাববেন না, আর চা আসতে একটু দেরি হচ্ছে ব'লে দয়া ক'রে কিছু মনে করবেন না।"

অসিত (উঠে দাঁড়িয়ে): চা থাক। কেমন আছে ও বলো—সত্যি বোলো কিন্তু, লুকিয়ো না।

নার্স (একটু চুপ ক'রে থেকে): লুকিয়ে কী হবে বলুন? আপনি তো জানেনই ওঁর শরীরের কথা।

অসিত: ওর ক্রনিক হাঁপানি আছে শুনেছি দৌলতরামজির মুখে। এছাড়া আর কিছুই জানি না। তাই আরো কাল হঠাৎ ওর মূর্ছা দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছি।

নার্স (আবার একটু চুপ ক'রে থেকে): স্যর! আসল ব্যাপারটা মূর্ছা নয়। ঠিক যে কী ডাক্তারেরাও এখনো ডায়াগ্নোসিস করতে পারেন নি।

অসিত: ক্রনিক হাঁপানি না?

নার্স: হ্যাঁ—cardiac asthma—ওঁর ছিলই বরাবর। তারপরে নানা complication আছে। সে সব ব'লে কী হবে?

অসিত: না না বলো, আমি শুনতে চাই।

নার্স: সে আপনি ওঁর কাছেই শুনবেন। কারণ আমি নিজেও ভালো জানি না। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, খুব বেশি ঘা খেলে বা আনন্দ হ'লে ওঁর হঠাৎ মূর্ছা হয় আর তার পরেই মুখ দিয়ে রক্তস্রাব হয়। আমি অনেকবারই ওঁকে নার্স করেছি। এমন মানুষ হয় না স্যর। (চোখ মুছে) তাই হয়ত ওঁর এত কষ্ট সইতে হয়। সংসারে ভালো লোকই তো বেশি ভোগে স্যর। তবে বাঁচোয়া এই যে কী একটি দৈবী শক্তি যেন ওঁকে প্রতিবারই সঙ্কট থেকে টেনে তোলে ঠিক যখন আমরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছি। কেবল—এবার (ফের চোখ মুছে) খুবই সাংঘাতিক অবস্থা। বিছানায় এক পাশ থেকে অন্য পাশ ফিরতে পর্যন্ত পারছেন না, ফিরিয়ে দিতে হয়। তার ওপর···দুবার রক্তবমন করেছেন গত দশ ঘণ্টায়। দিল্লীতে টেলিগ্রাম করা হয়েছে হার্ট স্পেশালিস্টের জন্যে। কেবল ওঁকে বলবেন না। উনি ডাক্তার ডাকতে আপত্তি করেন

প্রতিবারই। আর হয়ত ঠিকই করেন কারণ এ যে কী রোগ তারা তো কই কেউ ঠিক ধরতে পারছে না! আন্দাজে ইঞ্জেকশন হয়ত না দেওয়াই ভালো।

অসিত (একটু পরে): এখন কেমন আছেন?

নার্স: নাড়ী খুব দুর্বল। ভয়ের কারণ আছে বৈ কি, তবে এসব কথা আপনাকে বলা বারণ। তাছাড়া আমি নিজেও ঠিক জানি না তাই বলবই বা কী স্বর? শুধু বলি—আপনি সাধু মানুষ, প্রার্থনা করবেন ওঁর জন্যে।

অসিত: তুমি তো ক্যাথলিক না?

নার্স (হেসে): তাতে কি স্বর? সাধু সব দেশেই সাধু—এঁরা সবাই জীসাসের প্রতিনিধি এই-ই আমি সার জেনেছি।

অসিত: আমি একবার দেখতে চাই তপতীকে।

নার্স: আমি ওঁকে বলছি। আপনি চা-টা খান তো আগে।

অসিত: চা থাক। আমি আগে দেখতে চাই। ডাক্তারের নিষেধ নেই তো?

নার্স: ওঁর family physician ওঁকে পরীক্ষা করছেন—আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই ভালো হয়। তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।

এইসময়ে চা টোষ্ট পনীর ও ফল এল যথাবিধি। নার্স নমস্কার ক'রে চলে গেলে অসিত চা পান সাঙ্গ ক'রে ধ্যানে বসে গুরুদেবকে ডাকল খানিকক্ষণ। কিন্তু বৃথা। একটু পরে চঞ্চল হ'য়ে উঠে গুরুদেবকে তার করল—দীর্ঘ তার নিজেই টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে এক্সপ্রেস লিখে ফিরতেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। অসিতের গান শুনতে তিনি আসতেন প্রতি আসরেই। তাই বেশ হৃদ্যতা হ'য়ে গিয়েছিল। অসিতকে নমস্কার ক'রে বললেন: "ভয়ের কারণ আছেও বটে, নেইও বটে, স্বামীজি। আমি দেখছি তো অনেকদিন। আমরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি: she lives a charmed life. তবে এবার একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।" (নানা সিমটমের কথা ফলিয়ে ব'লে শেষে) তবে আমরা কীই বা জানি বলুন, স্বামীজি? তা যাক এসব কথা? আপনি যান—উনি ডাকছেন আপনাকে।"

অসিত গিয়ে তপতীর শিয়রে দাঁড়াতেই সে ক্ষীণ হেসে বলল: "ভাববেন না দাদাজি। আপনাকে বলেছি—I am rather tough."

অসিত কোন কথা না ব'লে ওর মাথায় হাত রেখে খানিকক্ষণ গুরুমন্ত্র

জপ ক'রে বলল : "আমি আর একবার ট্রাংক কলে গুরুদেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই।"

তপতী : না দাদাজি। কিছুই দরকার নেই।

অসিত : তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে। আমি আসছি একটু বাদে। (প্রস্থান)

এগারো

(আধঘণ্টা পরে অসিতের ঘরে)

টেলিফোনে গুরুদেবের স্বর : কী ব্যাপার, অসিত ?

অসিত : আপনি কাল কী ছায়া দেখেছিলেন একটু জানতে চাই। ও দুতিনবার রক্তবমন ক'রে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। দিল্লীতে তার করা হয়েছে হার্ট স্পেশালিষ্টকে।

গুরুদেবের স্বর : ওরা যা করে করুক। তুমি কেবল গুরুমন্ত্র জপ ক'রে যাও, ব্যস।

অসিত : জপ তো করছি গুরুদেব, কিন্তু জানেনই তো আপনার শিষ্যের বিশ্বাসের দৌড়। মন আমার অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে।

গুরুদেবের স্বর : না। এসময়ে স্থৈর্য চাই-ই চাই। অশান্ত মনকে শান্ত করতেই হবে। বিশ্বাস নেই বললে চলবে না—যদি ওকে বাঁচাতে চাও।

অসিত : আমি ? আমার কী শক্তি, গুরুদেব ?

গুরুদেবের স্বর : পরমহংসদেবের উপমা মনে নেই ? পুকুরপাড়ে লোকে নোংরা করত, বললে শুনত না। শেষে যেই চাপরাসী এসে নোটিস মেরে গেল : "এখানে কেহ নোংরা করিও না"—অমনি সবাই তটস্থ। চাপরাসীর কথায় তটস্থ হয় কেন ? যিনি চাপরাস দিয়েছেন তাঁর শক্তির জন্যে, এই না ? কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা থাক এখন। এখন তোমাকে বিশেষ ক'রেই মনে রাখতে হবে একটি কথা : যে, এ-অসুখের মূলে আছে যেসব নেপথ্য মানে occult—শক্তি আমাদের বুদ্ধির টেলিস্কোপে কি যুক্তির মাইক্রোস্কোপে তাদের হদিস পাওয়া যায় না।

কেবল একটা কথা: তুমি উপস্থিত অন্ততঃ কিছুদিন ওখান থেকে কোথাও যেও না।

অসিত: আমেদাবাদ?

গুরুদেবের স্বর: না। তুমি ওখানে থাকো—আর যতটা পারো তপতীর কাছে কাছে। ঠাকুরের শক্তি তোমার মধ্যে দিয়েই কাজ করবে।

অসিত: আপনার যোগশক্তির প্রসাদ—

গুরুদেবের স্বর: আমার নিজের কোন যোগশক্তি নেই—সবই তাঁর। তবে ওর জন্মে আমি ধ্যানে বসব বৈকি—ওকে বোলো। বলার দরকার আছে—ওর মন একটু প্রফুল্ল হবে। ওকে এখন প্রফুল্ল রাখাই চাই। তাই তুমি ওর সামনে অবিশ্বাস সংশয়ের নামও কোরো না, বলা রইল।—হ্যাঁ, আর আমাকে লিখো খুলে কখন কী হয়। বিশেষ দরকার হ'লে টেলিফোনও করতে পারো।

অসিত: যে আজ্ঞে গুরুদেব। কেবল একটা কথা: নার্স বলছিল—ডাক্তারেরা কোনো ডায়াগনোসিসেই পৌছতে পারেনি। আপনি কি কিছু দেখেছেন?

গুরুদেবের স্বর: না দেখলে কি বলতাম কাল ছায়ার কথা?—না থাক। ছায়া বলতে কী বোঝায় তা-ও এখন তুমি বুঝবে না, আর বুঝবার দরকারও নেই। তুমি শুধু থাকো ওখানে আমার—মানে ঠাকুরের—প্রতিনিধি হ'য়ে। মনে রেখো তোমার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কেন কী বৃত্তান্ত পরে বলব, এখন শুধু এইটুকু বলি—ঠাকুর সবই করেন বটে, কেবল শূন্য থেকে করেন না—করেন তাঁর কোনো না কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে। তাই ঠাকুর কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে পাঠিয়ে উস্কে দিয়েছিলেন। এ-লীলার মহিমার খুব অল্পই ধরতে পারি আমরা বুদ্ধি দিয়ে। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

বারো

তপতীর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে অসিত সব খুলে বলল। তার পাণ্ডুর মুখও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে "গুরুদেবের অশেষ করুণা!" ব'লেই নার্সের দিকে ফিরে বলল: "তুমি ব'লে এসো দিল্লীতে ফের তার করতে—হার্ট স্পেশালিষ্টের কোনো দরকার নেই। আমার গুরু

আছেন আর—" ব'লে হেসে: "আমার গুরুর গুরুও রয়েছেন তাঁকে জোর দিতে। এর পরে ডাক্তারের কী দরকার?"

তপতীর দেবর, জা ও ননদরা ওর এ-হুকুম শুনেই ঘোর আপত্তি ক'রে কলরব স্বরু ক'রে দিল। কিন্তু তপতী অচল অটল। বলল: "ডাক্তার যদি ডাকো—আমি তাঁকে ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দেব না ব'লে রাখছি।" ব'লে নার্সকে: "আর শোনো ভাই, লক্ষ্মীটি, তুমি তো অন্ততঃ জানো ডাক্তারেরা কেউ ধরতেই পারবে না আমার কী হয়েছে। ওদের বুঝিয়ে দাও। আর আমার নামে দৌলতরামকে তার ক'রে দাও যে—হ্যাঁ আর বাবাকেও তার ক'রে দাও যে, কোনো ভয় নেই। আমি মরব না।"

তেরো

(দশ দিন পরে)

ভাই প্রেমল,

তোমাকে এর আগের চিঠিতে সব খবরই দিয়েছি। কেবল আর একটি কথা বলার আছে। যমে মানুষে এ টানাটানি দশদিন ধ'রে চললেও— তপতীর মুখে বিষন্নতার ছাপ দেখি নি এক মুহূর্তের জন্যেও। থেকে থেকে রক্তবমন হয়েছে—কিন্তু আবার সামলে নিয়েছে—কেমন ক'রে বারবার টাল সামলালো ডাক্তারেও ধরতে পারে নি। ডাক্তার মানে, শুধু ওর family physician আসতেন রোজ দুবার ক'রে কিন্তু কোনো ওষুধ কি ইঞ্জেকশন দিতে নয়—' এ-দশদিনে ও এক ফোঁটা ওষুধও খায় নি) তিনি আসতেন শুধু শুভার্থী সুবাদে ওর খবর নিতে। তিনচারবার নাড়ী ছেড়ে গেছে—কিন্তু তখনও ওর ঠোঁট কেবল জপ ক'রে চলেছে দেখেছি। মুখে কথা নেই, স্বর অতি ক্ষীণ— কান মুখের কাছে নিয়ে তবে শুনতে হয় ওর ফিশ ফিশ—কিন্তু জপের বিরাম নেই। আর থেকে থেকে ওর আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা আমার একটি হাত ওর মাথায় চেপে ধ'রে। এ-রকম বিশ্বাস যে—মানুষের হয় দেহের যন্ত্রণার মাঝেও—আর সে কী যন্ত্রণা যে—দেখতেও বুকের মধ্যে টন টন ক'রে ওঠে। বিশেষ, যখন এক একবার হাঁপানির কাশি স্বরু হয়—কাশতে কাশতে মনে হয় দম বন্ধ হ'য়ে গেল ব'লে যাকে বলে touch and go: কাশির তোড়ে ঐ দুর্বল

দেহ ধনুকের মতন বেঁকে ওঠে কয়েক ইঞ্চি—তারপরেই ধপাস ক'রে বিছানায় প'ড়ে যায় কাশির তোড় থামার সঙ্গে সঙ্গে। বার বারই দেখেছি রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ঠোঁট নীল হ'য়ে যেতে, এক একবার এমনও মনে হয়েছে আমার যে, বৃথা চেষ্টা চ'লে যাই—চোখে দেখতে পারি না আর এ-যন্ত্রণা। কিন্তু গুরুদেবকে যতবারই টেলিফোন করি ও বাঁচতেই পারে না ব'লে—তিনি ততবারই বলেন: সে চিন্তা তোমার আমার নয়—কী হবে না হবে জানেন এক ঠাকুর। এ-কুরুক্ষেত্রে তোমাকে আমাকে শুধু লড়তে হবে তাঁর প্রতিনিধি হ'য়ে। কারণ এইটুকুই তিনি আমাদের কাছে চান—তারপরে শুধু তাঁর 'পরে ছেড়ে দাও জীবন মরণের ভার। শুধু ডেকে যাও তাঁকে—যদি প্রার্থনা আসে অন্তর থেকে রুখো না। কেবল সর্বদা মনে রেখে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা হ'ল: 'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—Thy will be done!'

একটি চিঠিতে একথা লিখেছিলেন আরো ফলিয়ে, শোনোই না:

"তোমাকে বলেছি ওর জীবন নিয়ে টানাটানি চলেছে দুটি শক্তির মধ্যে—দৈবী ও আসুরী। ওর পরে আজ হানা দিয়েছে সেইসব ভগবৎদ্রোহী শক্তিরা যারা যুগে যুগে দৈবী শক্তির সঙ্গে লড়াই ক'রে এসেছে। কেন তাদের এ-দুর্গতি ঠাকুর আবহমানকাল স'য়ে এসেছেন সে আলোচনা নিষ্ফল; কেন না তার নিদান মিলতে পারে কেবল পরা প্রজ্ঞা দিয়ে—তাও পুরোপুরি নয়। আমরা কিছুতেই সৃষ্টির মূলে পৌঁছতে পারি না আমাদের মানবিক নামরূপের কাঠামোয়। বিন্দু সিন্ধুকে জানতে পারে না যদি তার মধ্যে ডুবে সিন্ধুর সত্তা না পায়। পরমহংসদেব বলতেন মনে নেই যে, সাধারণ মানুষ যদি হয় ক্ষুদে পিঁপড়ে তবে মহাপুরুষেরা বড় জোর ডেও পিঁপড়ে। সীমিত চেতনা—যথা মানুষ—অসীম চেতনার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে স্তব ক'রে আনন্দে আত্মহারা হয়—এইই তার স্বধর্ম। অসীমকে সে মাপতে পারে না শুধু তার স্পর্শ পেয়ে কৃতকৃত্য হ'তে পারে পরমানন্দে। তাব'লে বলি না—এ জানতে চাওয়া অন্যায়—কারণ জানতে চাওয়ার মূলেও তো তিনিই আছেন। তিনি এ চাওয়ার সমর্থন করেন—এর মধ্যে দিয়ে সীমিত চেতনা তাঁর একটু কাছে আসতে পারে ব'লে। আর যতই কাছে আসে ততই আনন্দ। এইই তো বেশ। এর বেশি চাও কেন? জানতে চেয়ে জানতে না পারার ফলে আসে রহস্যবোধ—sense of mystery-এই যে অবোধ্য অনির্ণেয় অথচ প্রিয় হ'তে প্রিয় রহস্যময় বন্ধু পিতা মাতা সখা বল্লভের

সঙ্গে প্রেমের ঘটকালিতে আদান প্রদান—এ যখন সম্ভব—মানে সাধ্য—তখন আর কী চাই? কিন্তু এর পরে কী আছে—যার এক নাম বস্তুলাভ—তার একটু আভাষ দেওয়া যায় মাত্র—তাও শুধু উস্কে দিতে: যে, যাও এইটুকু জেনে জিজ্ঞাসু আগ্রহী হ'য়ে এগিয়ে চলো—কী কী পাবার আছে পেলে পরে তবে জানতে পারবে—এইই তাঁর বিধান।" ইতি তোমার স্নেহানুগত

অসিত

চোদ্দ

(এক সপ্তাহ পরে)

ভাই অসিত,

তোমার দুটি চিঠিই পেয়েছি। তুমি যে শুধু শিল্পী নও যোগীও বটে, তোমার মুখে বহুবারই শুনেছি। কিন্তু এ-উক্তিটির মর্ম এমন ক'রে বোধহয় কোনদিন বুঝতে পারিনি। কী চমৎকার রঙে রেখায় উপমায় উৎপ্রেক্ষায় তুমি ফুটিয়েছ তপতীকে! ললিতা কেবলই বলছে: "তপতীকে দেখতে আমার কী যে ইচ্ছে করছে।"—এই প্রথম ওর সত্যিকার দুঃখ হয়েছে যে, ওর পাখা নেই। তবে ও ছেলেমানুষ বোঝে না তো যে পাখা থাকলেই মেলা যায় না যদি আকাশ —মানে নিয়তি—অনুকূল না হয়। কিন্তু ফিলসফি থাক। তোমার গুরুদেবের কাছে তো সাধ মিটিয়ে পাচ্ছ ও-বস্তুটি। বলাই বেশি যে, তাঁর চিঠিটি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত ভালো লেগেছে। কেবল আমি একটু ভাষ্য জুড়ে দিতে চাই।

আমার বলবার কথা এই যে, আমাদের উপনিষদে এই বাণীটিকে বড় চমৎকার ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন ঋষিরা নানাভাবে যে, আনন্দের চরম উপলব্ধিতেই সব প্রশ্নের সমাপ্তি বটে, কিন্তু তার আগে নয় নয় নয়। তাই অন্নকে ব্রহ্ম ব'লে জানলেও মন বলে ততঃ কিম্—তারপরে আরো আছে কি?—আছে: প্রাণ ব্রহ্ম? তারপরে? আছে—মন? তারও পরে? না বিজ্ঞান? এইখানেই শেষ তো? বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা পাবার পরে, মানে পরা প্রজ্ঞা হ'লে আর চাই কি? ঋষি টুকলেন: চাই বৈ কি—কারণ জ্ঞানের পরেও প্রশ্ন থাকে—এতে ক'রে খতিয়ে পেলাম কি? কেন জ্ঞান চাইব? তখন এল অন্তিম উত্তর: ব্রহ্ম

হ'লেন আনন্দঘন। এ-পরম সমীকরণের পরে আর প্রশ্ন থাকতে পারে না, কারণ আনন্দ এমন নিটোল পূর্ণতা, পরম প্রাপ্তি, স্বয়ংসিদ্ধ তৃপ্তি যে, সে-অমৃতসিদ্ধির পরে আর কোনো প্রশ্ন মনে ঠাঁই পায় না। টইটুম্বুর পাত্রে জল ঢালো ধরবে না—গড়িয়ে প'ড়ে যাবে। তেমনি আনন্দ কেন চাই মন এ-প্রশ্ন করবে না, করতেই পারে না ব'লে— তারপরে সব প্রশ্নকেই অবান্তর—ধৃষ্টতা মনে হয় ব'লে। কোনো কিছু ভালো লাগল বা কোনো কিছুতে রস পেলাম—ব্যস কেল্লা ফতে। আর কী চাই? তাই না বলেছেন ঋষি যে, আনন্দই সৃষ্টির মূলে—তার সুরুতেও আনন্দ, স্থিতিতেও আনন্দ, লয়েও আনন্দ। প্রশ্ন করেছেন: আকাশে আনন্দ চারিয়ে রয়েছে ব'লেই মানুষ নিশ্বাস নেয়, নইলে নিশ্বাস নিতে মানে বাঁচতে চাইত কোন্ অর্বাচীন? রহস্যবোধ এই আনন্দকে জীইয়ে রাখে ব'লেই সে মঞ্জুর। পাখী যদি আকাশকে পেরিয়ে যেত তাহ'লে সে কি তাকে দুয়ো দিত না—"তুমি কী এমন চীজ বাপু?—যাকে আমার ছোট্ট পাখায়ও পেরিয়ে গিয়ে ঠাউরে পাই তোমায় দৌড়?" ঋষি আরো নানা দিক দিয়েই দেখেছেন এই অচিন রহস্যময় সত্তাকে যে খতিয়ে আমাদের আনন্দের মধ্যে, রসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেই আছে। যদি এ-অচিনকে আমরা মাপতে পারতাম তাহ'লে তার সঙ্গে মিলনের আনন্দ দুদিনে বাসি হ'য়ে তিনদিনে ফুরিয়ে যেত না কি?

কিন্তু ঐ দেখ—স্বভাব যায় না ম'লে: ফিলসফি থাক ব'লেও মিথ্যে মাথা বকালাম তত্ত্বকথা নিয়ে। না ভাই, যতই দিন যায় ততই এইটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারবার কিনারায় এসেছি যে কথাও নয়, তথ্যও নয় তত্ত্বও নয়—অন্তিমে মানুষে চায় রস ওরফে আনন্দ। তথ্য বা তত্ত্বও মন টানে এই জন্যেই যে তাতে রসের ছোঁয়াচ আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ছোঁয়াচ। মানে ভোগ করতে না করতে সে হ'য়ে ওঠে দুর্ভোগ—একঘেয়ে boring, tedious……ইত্যাদি অর্থাৎ কিনা দুঃসহ।

যে-ভোগে এই বিস্বাদ নেই তারই নাম রস। তার আভাস মিলতে পারে কেবল স্নেহে প্রণয়ে ভক্তিতে প্রেমে। তাই বলো তপতীর কথা। কেমন জ'মে উঠছে তোমাদের নব সম্বন্ধের রসটি—আনন্দে বিস্ময় চমকে রহস্যে। তুমি দেখতে পেয়েছ তো এতদিনে কেন অধ্যাত্ম জগতে প্রীতি প্রেমের এত দাম? একলা চ'লে জ্ঞান সে তো অজ্ঞানেরই ফাঁকি—প্রবঞ্চনা। যে-জ্ঞান একলা থেকেই

খুশী তাকে খোদ ব্রহ্মও সইতে পারেন না বললে ভুল বলা হবে না যেহেতু আপ্তবাক্যে পাই—ব্রহ্ম একলা আনন্দ পেলেন না ব'লেই বহু হয়েছিলেন—সৃষ্টি হয়েছিল পতি পত্নী। আমার মনে হয় ভাই যে সৃষ্টির আদি কারণ বা তত্ত্বের তল পাওয়া না পেলেও একটু আভাষ পাওয়া যায় কেবল প্রেমে। তাই শুনতে চাই কীভাবে তোমাদের দিন কাটছে—তপতী তোমাকে কী ব'লে কোণঠেশা করছে। তুমি তাকে কেমন ক'রে ফস্কে যাচ্ছ—এইসব। ললিতাও জানতে চায়। তাই লিখো। আমাদের কথা ঢের লিখেছি। এখন একটু তোমাদের কথা শুনি। ইতি।

তোমার স্নেহতৃপ্ত

প্রেমল

পনেরো

(দু' সপ্তাহ পরে)

ভাই প্রেমল,

অনেকদিন বাদে তোমার স্নিগ্ধদরদী চিঠি পেয়ে কী যে আনন্দ হ'লে, ব'লে বোঝাব কেমন ক'রে? বলতে কি, আমার একটু ভয় ভয়ই করত পাছে আশ্রম ছেড়ে বিষয়ীদের এলাকায় এতদিন থাকার দরুণ তুমি আমাকে ভুল বোঝো বা। আমি সত্যিই ভাই থাকতে চাই নি এখানে। আমেদাবাদে আমাদের আশ্রমের জন্যে কন্সার্ট দিয়ে কয়েক হাজার টাকা তুলে মুতরিতেও ঐ একই বৃত্তির অনুশীলনের পর তপতীকে নিয়ে দুমেলে যাব এই-ই স্থির ছিল। তপতী সেখানে অন্ততঃ মাস দুই থাকবে এইরকমই জল্পনা ছিল। কিন্তু সব ভেস্তে গেল ওর সাংঘাতিক অসুখ হ'য়ে। আমাকেও বাঁধা পড়তে হ'ল। ললিতারই খেদের প্রতিধ্বনি: পাখা থেকেও না থাকার অবস্থা। কেবল এক্ষেত্রে এইটুকু তফাৎ যে, পাখা থেকেও মেলতে না পারার জন্যে যে-খেদ তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে তপতীকে চিনে জেনে—ওর কাজে এসে—বিশেষ ক'রে ওর দুর্দিনে—প্রাণ-সঙ্কটের দুর্লগ্নে।

না, ক্ষতিপূরণ মিলেছে আরো এক দিক থেকে—অপ্রত্যাশিত ভাবেই বলব। অর্থাৎ গুরুদেবের এক নব রূপ এই সূত্রে ফুটে ওঠার দরুণ। কথাটা একটু

পরিষ্কার ক'রে বলি আগে—তারপর আসছি তপতীর কথায়। এলাম ব'লে।

গুরুদেবের জ্ঞানের দিকটা দেখেছিলাম, কিছু চেখেও ছিলাম—জ্ঞান আমার বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু তাঁর প্রেমের দিক্‌টার কিছু খবর পেলেও তাতে কেমন যেন মন ভরে নি। মনে হ'ত—কী যেন একটা তাঁর মধ্যে নেই নেই—কিম্বা হয়ত আমি দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। ফলে মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ না হোক খুঁৎখুঁতে ভাব আমাকে থেকে থেকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলত যার জন্যে তুমি আমাকে এত ধম্‌কাতে। কারণ জ্ঞানের কোঠায় আমার বেশি সঞ্চয় না থাকলেও এটুকু আমি টের পেয়েছিলাম যে, আমাদের অন্তর সব আগে চায় বহুজ্ঞ হ'তে নয়—ভালোবাসতে। জ্ঞান যখন এই প্রেমের দিশারি হয় তখনই সে হয় আমাদের প্রকৃত বন্ধু। নইলে সে বড়জোর একটু আধটু বাঁচায় নানা স্খলন থেকে—দেখিয়ে দিয়ে মোহকে কী ভাবে জয় করা যায়।

কিন্তু তপতীর অসুখের সূত্রে গুরুদেবের যে-রূপটি ফুটে উঠতে দেখলাম তাঁর জ্ঞান সে-ছবির কিছুটা রং মশলা জোগালেও—সে-ছবির রসমূল্য হ'ত খুবই কম যদি না তাঁর প্রেম এসে যোগ দিত। না, এ-ও ঠিক বলা হ'ল না। তাঁর প্রেমকে আমরা দুজনেই অনুভব করেছিলাম ব'লেই তাঁর চিঠিতে ও নানা টেলিফোনের মন্তব্যে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম। কে কোথাকার এক ফ্যাশনেবল গৃহের গৃহিণী, ক্রোড়পতির বিলাসিনী দুলালী—তার জন্যে তাঁর কী এত মাথাব্যথা যে আমাকে শুধু আমেদাবাদ যেতে বারণ করা নয়, আশ্রমেও ফিরতে মানা না ক'রে পারলেন না? শুধু তাই নয়, দিনের পর দিন আমাকে তার অসুখের খুঁটিনাটি সিমটম জানিয়ে চিঠি লিখতে বললেন, আশ্বাস দিলেন—তিনি ধ্যানে চেষ্টা করবেন সাধ্যমত ঠাকুরের রক্ষাকর্ত্রী করুণাকে ডাক দিতে! টেলিফোনে যতবারই তাঁকে ডেকেছি শুনেছি তাঁর কণ্ঠে প্রত্যক্ষ স্নেহের স্পন্দন। জ্ঞানের মর্মজ্ঞ না হ'তে পারি, কিন্তু স্নেহের ছন্দ তো চিনি কিছুটা। তাই অভিভূত হ'য়ে পড়েছি আমি—শুধু আমিই নয় তপতীও। প্রায়ই বলে ও: "একটা নগণ্য মেয়ের জন্যে দাদা গুরুদেব তোমার মতন প্রিয় শিষ্যকেও কিনা শান্তিময় আশ্রম ছেড়ে পাঠিয়ে দিলেন এক অশান্তির রাজ্যে দিনের পর দিন কাটাতে!" আমি ওকে যতই বলি: "বাইরে থেকে নানা যোগাশ্রমকে রমণীয় শান্তিনীড় মনে হ'লেও কাছে গেলে ভুল ভাঙেই ভাঙে"—ও মানে না, বলে: "এতটুকু কল্পনা আমার আছে দাদা, যে, আশ্রমের সাধক সাধিকারা সবাই রাতারাতি দেবদেবী

ব'নে যায় না। কিন্তু তবু সংসারে যে বেসুরের হাট বসে আশ্রম তো ঠিক্ তা নয়। সেখানে আর কোনো সুর নাই থাকুক গুরুর দেবকণ্ঠ তো শোনা যায়।"

কী বলব বলো এমন উচ্ছ্বাসের উত্তরে। গুরুদেবকে একবার লিখেছিলাম তিনি নিশ্চয় প'ড়ে মৃদু হেসেই লিখেছিলেন: "ও যা ভাবে ভাবুক না—ভুল ভুল ব'লেই একদিন না একদিন ভাঙেই ভাঙে। যোগের একটি মস্ত অবদান এই যে আমরা তার প্রসাদে দেখতে শিখি—মানুষের প্রবৃত্তি কিরকম পাঁচমিশেল, তাই কোনো একটা লেবেল দেওয়া যায় না কারুর কপালেই মহৎ বা নীচ, বীর বা ভীতু, বা পাপী দেবতা ব'লে। প্রতি সাধকের হৃদয়ই এক একটি জীবন্ত কুরুক্ষেত্র—যেখানে আবহমানকাল চ'লে এসেছে দেবাসুরের যুদ্ধ অর্থাৎ আলোর সৈন্যের সঙ্গে কালোর চমূর চিরন্তন লড়াই। এইভাবেই মানুষের জীবনের বিকাশ হয়। যোগাশ্রমে এলেও সেই দ্বন্দ্বই চলে, কেবল তফাৎ এই যে, সেখানে দেখা যায়—বা গুরু প্রতিপদে তাঁর কথায় বা মৌন শক্তির মাধ্যমে দেখিয়ে দেন আমরা কোথায় কখন কী ভাবে কার তল্পি বইছি—আসুরিক শক্তিদের না দৈবী শক্তির—কার সুর সাধছি অহঙ্কারের না শরণাগতির।"

কিন্তু এবার গুরুদেবের কথা রেখে বলি তপতীর কথা—বিশেষ তুমি জানতে চেয়েছ ব'লে।

ওর কাছ থেকে ভাই এই একমাসে আমি কত কী শিখেছি কী বলব? মাঝে মাঝে সত্যিই আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি--কে কার গুরু? এ সত্যিই উচ্ছ্বাসী কথা নয়। ওর মধ্যে এমন অনেক অসামান্যতা এরই মধ্যে চোখে পড়েছে যা আমাকে চম্‌কে দিয়েছে সত্যিই। দুএকটা কথা উদাহরণ দিই শোনো।

যখন ওর অসুখের সঙ্কট অবস্থা—আমি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর শিয়রে জপ করছি—ও আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে—তখনও থেকে থেকে জেগে উঠে ও এমন স্নিগ্ধ হাসে যে, মনে হয় ওর দেহের যন্ত্রণা ওকে যেন স্পর্শ করতেও পারে নি। এ যে আমার অনুমান নয় একদিন দেখেছিলাম হঠাৎ ওর মুখের ভাবে। বলি।

হ'ল কী, ওর কাশি সুরু হ'ল—সেই বিষম কাশি যা দেখাও কষ্ট। কাশতে কাশতে দমবন্ধ হয় আর কি, মনে হয় এই বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেল—এমনি সময়ে ওর কাশি থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে ফুটে উঠল কী যে শান্তির আভা! ও চোখ বুজে রইল ক্লান্তিতে, কিন্তু সে-ক্লান্তিকে ছাপিয়ে ফুটে উঠল

এক দিব্য প্রভা। ও হঠাৎ মধুর হেসে বলল: "দাদা, যন্ত্রণার মধ্যেও আমার মনে শান্তি ছিল নিটোল হ'য়ে, সত্যি বলছি। আর কেন জানো? কে যেন গান গাইছিল একটি—কী সুন্দর যে গান—সব যেন জুড়িয়ে গেল।"

"গান?"

"হ্যাঁ দাদা। আর গাইছিল একটি অপরূপা সন্ন্যাসিনী! তার মুখের যে কী অপূর্ব কান্তি—আর কী অতুলনীয় কণ্ঠ! শুনতে শুনতে যেন আমার সব তাপ গ'লে আলো হ'য়ে গেল, স্নিগ্ধ আলো।"

"কী গান মনে আছে?"

তপতী হাসে: "সে কি ভোলা যায় দাদা, যে, মনে থাকবে না? প্রতি কথাটি আমার মনে গেঁথে গেছে।" ব'লেই সে একটু চোখ বুঁজে চুপ ক'রে থেকে আবৃত্তি ক'রে গেল, আমি টুকে নিলাম:

> পূজা করনে আই পুজারিন হরিগুণগানে আঈ হূঁ।
> মন মন্দিরকে খোল দুয়ারে পিয়া রিঝানে আঈ হূঁ॥
> চাঁদসে চন্দন, রৈনসে কজরা, টীকা তারোঁসে লাঈ।
> কলীসে হঁস্না, নদীসে চলনা, পবনসে লী শীতলতাঈ॥
> হরিচরণনমে মালা বাহোঁকী পহনানে আঈ হূঁ।
> হৃদয়দীপমে হরিপ্রেমকী, জ্যোতি জলানে আঈ হূঁ॥
> উনকী মেরী প্রীত পুরাণী, জনম মরণকে মীত পিয়া।
> প্রভু সাগর হৈঁ, তরঙ্গ হূঁ মৈ, সাজ হু মৈ, সঙ্গীত পিয়া॥
> তন মন অর্পণ কর প্রীতমমে আজ সমানে আঈ হূঁ।
> ফির মীরাকী প্রেম কহানী সুনো, সুনানে আঈ হূঁ॥

শেষ চরণটিতে মীরার নাম শুনেই গায়ে কাঁটা দিল। বললাম: "এর মানে? তোমার কাছে যিনি গাইতে এসেছিলেন তিনি মীরা?"

ও ম্লান মুখে বলল: "জানি না দাদা! মনে তো হয় না যে এ সম্ভব—ভাবতে অবিশ্যি ভালো লাগে, কিন্তু মন মাথা নাড়ে, ব'লে: 'It's too good to be true'—অথচ দাদা কী সুন্দর পদাবলী দেখো তো! মনে হয় কি যে, এ-গান মীরার ছাড়া আর কারুর কণ্ঠে মানাতে পারে? তাছাড়া যে-আমি কোনো দিন একটি ছত্রও কবিতা লিখি নি, সে-আমি হঠাৎ সংকট অসুখে এমন গান বাঁধব একি ভাবা যায়? কিন্তু সে যাই হোক দাদা, শুনি তোমার কী

মনে হয়? আমি তো মন্ত্র দীক্ষা যোগ এসবের ক-খ-ও জানি না, কেমন ক'রে বলব এমন অঘটন ঘটতে পারে কি না কোনো বিদেহী চারণীর করুণায়?"

আমি বললাম: "আমি কী জানি বলো এ-সব অদেখা রাজ্যের অচিন্ সুর তালের কথা? কেবল এইটুকু বলতে পারি—গানটি অপূর্ব—আর মনে হয় যিনি এ-গান তোমাকে শোনাতে এসেছেন তিনি আরো শোনাবেন। অর্থাৎ এ-গানটি হ'ল গৌরচন্দ্রিকা—এবার হয়ত শুরু হবে পালা গান—তবে কবে বা কেমন ক'রে—তা বলতে পারি না। আমি সত্যি থ হ'য়ে গেছি তপতী!"

ও একটু উঠে বসতে পারে আজকাল, হাততালি দিয়ে বলল হেসে: "কেমন? তোমাকেও হকচকিয়ে দিয়েছি তো? এবার শোধবোধ, গুরুকেও হার মানতে হ'ল বলতে হ'ল শিষ্যার মধ্যে দিয়ে কী ঘটছে না ঘটছে ভাবতে তাঁর ধাঁধা লাগছে—ঠিক যেমন আমার মনে হ'ত গুরুর সম্বন্ধে। কিন্তু সে থাক, এ-গানটির তুমি একটি সুর দাও না দাদা লক্ষীটি! আমি চাই এটি শুনতে তোমার অপূর্ব কণ্ঠে। রাখবে না অনুরোধ?"

আমি হেসে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম: "কী পাগল! এ তো আমি করব নিজের গরজেই। এমন গান! আহা! আমি ধ্যানের খবর বিশেষ না রাখলেও গানের খবর তো রাখি। এ যে অপূর্ব গান—যেমন ভাব তেমনি মিল ছন্দ—একেবারে নিখুঁৎ যাকে বলে। আজই সন্ধ্যায় তোমাকে শোনাব গানটি—আর শুধু মূল-হিন্দিতে নয়, আমার বাংলা তর্জমায়ও—কথা দিলাম, তাতে ধড়ে প্রাণ যায় আর থাকে।"

ব'লেই ঘরে গিয়ে ব'সে তর্জমা ক'রে দুটি গানেরই সুর দিলাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'লে ললিতাকে শিখিয়ে তবে জলগ্রহণ—ব'লে রাখলাম, সাবধান! এবার শোনো আমার অনুবাদ—অবশ্য মূল হিন্দির মতন হয়নি মানছি—কিন্তু সুরে এত চমৎকার শোনায় যে, তোমাদের অনুবাদ ব'লে মনে হবে না, হবে না, হবে না—এ বাজি রেখে বলতে পারি। যাহোক শোনো এবার:

> এসেছি পূজার তরে পূজারিণী শ্যামলের গান গাহিতে।
> মনমন্দির দ্বার খোল্, চাই আজ তার প্রীতি সাধিতে।
> চাঁদ হ'তে সোনা, কুঁড়ি হ'তে হাসি, সমীরণ হ'তে শীতলতা,
> কাজল রজনী হ'তে, তারা হ'তে টিকা, নদী হ'তে উছলতা।
> বাহুবন্ধনমালায় চরণ চাই আমি তার বাঁধিতে,

অন্তরদীপে কান্তের প্রেমশিখা চাই আজ জ্বালিতে।
জনমে মরণে বন্ধু সে, ভালোবাসি আমি চিরব্রজবালা।
সিন্ধু সে, আমি লহরী, বীণা সে, আমি মূর্ছনা রাগমালা।
তনু মন প্রাণ সঁপি' প্রিয়তমে তারেই চাই আরাধিতে।
মীরার প্রেমের কাহিনী এসেছি নবসুরে ঝংকারিতে॥

আচ্ছা, এবার বলো তো ভাই, সত্যি মনে হয় না কি তোমারও যে, যিনি তপতীর ধ্যানে এসেছিলেন তিনি তাকে গান শোনাতেই এসেছিলেন—আর সে-গান মীরার প্রাণের সুরেই বাঁধা? তুমি জানো—আমি রাজস্থানে নানা গায়কের কাছেই মীরার গান সংগ্রহ ক'রে যত্রতত্র ছড়িয়ে দিয়েছি আমার নিজের বসানো সুরে। দিয়েছি, কারণ গানগুলি গাইতে আমার ভালো লাগত—কিন্তু তবু (তোমাকে বলছি তোমার মনে থাকতে পারে) মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করতই। এসব গানে ভক্তি আছে মানি, অন্তরের ব্যাকুলতাও পাই, কিন্তু তবু উজিয়ে উঠতে পারলাম কই? ছন্দ মিল ভাবের গতি থেকে থেকে ব্যাহত হ'ত না কি? অনেক অনবদ্য চরণের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছে (হয়ত প্রক্ষিপ্ত) শ্রুতিকটু চরণ বা কর্কশ শব্দ—একথা ললিতাও বলত প্রায়ই, মনে পড়ে? কিন্তু তপতী এ-কয়দিনে যে-দশবারোটি গান শুনে আবৃত্তি ক'রে, আমাদের চমকে দিয়েছে তাদের কোথাও এতটুকু খিঁচ নেই। এই গানটিই ধরো না। যেমন কবিত্ব, তেমনি উপমা ছন্দ মিল—সর্বোপরি, ভাব ভক্তি প্রেমের অনাবিল আবেগে—গান চলেছে যেন ঝর্ণার নির্বাধ নটনে। তাই মনে হয় আমার যে, এসব গান শুধু যে মীরার রচনা তাই নয়, সেই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে আছে এ-যুগ্ম প্রেমপূজারিণীর প্রাণের পরশ, অন্তরের আলো—যদিও ঠিক কী ভাবে যে এ-মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে সে-রহস্য ভেদ করতে আমি অক্ষম। একথা আরো বেশি ক'রে মনে হচ্ছিল যখন কাল গানটি গাইতে গাইতে প্রাণে হঠাৎ-জাগা ভক্তির জোয়ারে আঁখর এসে গেল:

কে তুমি ওগো উদাসিনী······অমরণী ব্রজবাসিনী!
পুণ্যপ্রতিমা! গীতিমধুরিমা ঝরাতে এলে পূজারিণী!
শ্যামের প্রেমসোহাগিনী!
গাও কে মা তুমি ফিরে ফিরে: "শুনেছে যে তার মুরলীরে,
তারি কানে প্রাণে আমি যুগে যুগে গাই প্রেমরাগ মধুমিড়ে।"

এর পরে—সে আর কী বলব ভাই, দিনের পর দিন ঘটতে লাগল সেই একই অঘটন : ভাবাবেগে ও শোনে একের পর এক এই চিরন্তনী ব্রজবালার গান, আর সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হ'য়ে অর্ধবাহ্যদশায় নির্ভুল ছন্দে মিলে আবৃত্তি ক'রে যায় ধ্যানশ্রুত পদাবলী! আমার অনেকদিন থেকেই একটা সাধ ছিল যোগ-শক্তির কিছু অঘটনী ক্রিয়া দেখবার। মা বলতেন প্রায়ই (মনে আছে ?) : "ঠাকুর কল্পতরু!" তাই কি তিনি আমার সাধ মিটিয়ে দেখিয়ে দিলেন যা আমি দেখতে চেয়েছিলাম : তাঁর করুণার নানা দিব্য অঘটন আমারি ভানুমতী শিষ্যার মাধ্যমে ? জানি না। জানি কেবল একটি কথা : যে, এক এক সময়ে সাধকের বা সাধিকার সামনে যেন এক একটা আলোর তোরণ খুলে যায়—আর অম্নি অঘটনী জ্যোতির ঢেউ বিহ্বল প্রাণের তটে পাড় ভাঙতে ভাঙতে চলে। অন্ততঃ তপতীর চিত্তলোকে যে আজ এ-গানের ঢেউ একের পর এক কলোচ্ছ্বাসে এসে ভেঙে পড়ছে—এতো সকলেই দেখছে দিনের পর দিন! ও ভাবাবেগে যখন গান আবৃত্তি ক'রে চলে তখন সকলেই ছুটে আসে শুনতে —এ কী কাণ্ড! কোত্থেকে আসে গানের পর গান—কার অভ্যুদয় হয় অফুরন্ত নিখুঁৎ ছন্দে মিলে উপমায় ছবির পর প্রেমের ছবি আঁকতে! শুধু গানই নয় অবশ্য নানা অঘটনই ঘটছে—ও কত কী যে দেখে ওর ধ্যানে—কখনো ব'সে, কখনো শুয়ে, কখনো এমন কি চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে—সে না দেখলে সত্যি বিশ্বাস হয় না ভাই! তবে তোমরা অবিশ্বাস করবে না ব'লেই লিখছি এসব : একের পর এক ওর কত রকমই যে দর্শন হয়—আলো জ্যোতি নানা মূর্তি—কত সময়ে শোনে কত রকম স্বর—এই তো পরশুই বলল—আমার এক দাড়িওয়ালা বন্ধুকে দেখেছে আমার সঙ্গে কথা কইতে—যে লিখেছিল এক জাহাজে বিলেত যাচ্ছে। তাই তার এখানে আসার কথা নয়। তবু সে এল তো'—(একে বুঝি বলো তোমরা prophetic vision ?) তরশুদিন দেখল তুমি চিঠি লিখছ ললিতার ঠাণ্ডা লাগার খবর দিয়ে—সে চিঠি পেয়েছি আজই দুপুরে—তুমি লিখেছ ললিতার ঠাণ্ডালেগে টনসিলাইটিসের কথা। এরকম আরো কত কী-ই যে ও দেখে ছায়াছবির মতন—সময়ে সময়ে মনে হয় সত্যিই—বুঝি স্বপ্ন দেখছি এক হারিয়ে যাওয়া পৌরাণিক যুগের তটে ব'সে! ভালোকথা : সেদিন হয়েছিল বেজায় মজা! বিজ্ঞানের এক দীর্ঘশ্মশ্রু অধ্যাপক এসে গম্ভীরভাবে আমাকে বলছিলেন—কার মুখে যেন

শুনেছিলেন এসব ব্যাপারের কিছু কানাঘুঁষো—যে, তিনি বিশ্বাস করতে অক্ষম যে মিরাক্ল ব'লে কোনো কিছু থাকতে পারে। ঠিক এই সময়ে তপতী ঘরে ঢুকে বলল: "দাদা, পিওন একটি চিঠি দিয়ে গেল এইমাত্র—এসেছে ডুমেল ঘুরে। আমার মাথায় দুষ্টুমি চাপল। আমি বললাম: "কে লিখেছে বলো তো?" ও ব্যাপারটা মুহূর্তে এঁচে নিয়ে অধ্যাপকের দিকে চেয়ে বলল: "দেখুন তো এ-খামটি—কেউ খুলেছে কি?" তিনি শিলমোহর করা খামটি দেখে অবাক হ'য়ে বললেন: "না তো! খুলবে কেন?" ও তৎক্ষণাৎ খামটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে আমাকে বলল: "তোমার লক্ষ্ণৌয়ের এক বণিক বন্ধু লিখেছেন তাঁর মেয়ের আবার বুকে দারুণ বেদনা হয়েছে। তিনি চান ডুমেল আশ্রমে যেতে। আর তিনি আশ্রমে কিছু কাপড় ও খাবার পাঠাতে চান—গুরুদেবকে প্রণামী।"

আমি খামটি ঘটা ক'রে সশব্দে ছিঁড়ে অধ্যাপকের হাতে দিলাম: অধ্যাপক অবাক। বন্ধু অবিকল ঐ কথাগুলিই লিখেছিলেন।

আমি চাই এসব অঘটনের কথা পাঁচজনকে বলতে, কিন্তু তপতী একদম চায় না। তবে আমি ওর গুরু তো—কাজেই আমি এসব কথা রটিয়ে দিলে কী করবে বলো? ও নিজে কাউকে বলে না ওর যৌগিক দর্শন-টর্শনের কথা—এক আমার কাছে ছাড়া। এমনকি আমাকেও সময়ে সময়ে বলে যেন আধা অনিচ্ছায়—কেন না আমি সবাইকে "ব'লে বেড়াই"। ও তর্ক করে কেবল আমার এই একটি "দুষ্প্রবৃত্তি" নিয়ে। বলে: 'তোমার মুখেই শুনেছি যে, সাধুদাও বলেন এসব পাঁচজনের কাছে না বলাই ভালো।' উত্তরে আমি বলি: 'কিন্তু আমি তো সাধুদা নই, দিদিমণি! তার কাছে যা স্বধর্ম আমার কাছে যে পরধর্ম হ'তে পারে একথা তো তুমিও মানো। আমার ভালো লাগে না প্রেমলের এই hush-hush,' ও তখন তোমার হ'য়ে লড়ে, বলে: 'সাধুদা চুপচুপ করেন তো এই জন্যেই যে, এসব কাণ্ড অনেকে স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করতে চায় না, ভাবে কোনো বুজরুকি আছে লুকিয়ে। ধরো, তোমার ঐ অধ্যাপক বন্ধুটি। তিনি স্বচক্ষে দেখেও কি বিশ্বাস করেছেন মনে করো? আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, তিনি ভেবেছেন এ মিথ্যে ছলচাতুরী—সব সাজানো?"

কিন্তু এই সময়ে হ'ল আর এক কাণ্ড। জব্বলপুরে আমার এক বৃদ্ধ বন্ধু ছিলেন। খুব রসিক, তাই মাঝে মাঝে আমি তাঁর গল্প শুনতে যেতাম, আরো

তপতীরই অনুরোধে। ও মনে করত আমার জব্বলপুরে দিনের পর দিন কাটাতে ভালো লাগছে না আশ্রম ছেড়ে। খুব ভুল ভাবে নি। তাই আমি যেতাম এই বৃদ্ধ বন্ধুটির কাছে হেসে একটু হাল্কা হ'তে। সেদিন হ'ল কি, ও বলল সকালে: "তোমার বৃদ্ধ বন্ধুটি কাল রাত ন-টায় মারা গেছেন।" আমি বললাম: 'সেকি? আমি কাল বিকেলেই যে তাঁর মুখে কত মজার গল্প শুনে এসেছি? তাঁর তো কোনো অসুখই নেই?" ও শুধু বলল: "তিনি আমাকে এসে ব'লে গেলেন এই কথা—তবে আমার ভুলও হ'য়ে থাকতে পারে।"

আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে তক্ষণি উঠে ওর মোটরে চ'ড়ে গেলাম বন্ধুটির বাসায় গেটে ঢুকতেই কানে এল চাপা কান্নার শব্দ। জোর ক'রে কুণ্ঠাকে দাবিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখি—তাঁর স্ত্রী মাটিতে ব'সে বড় মেয়েটি তাঁর পাশে ব'সে তাঁকে হাওয়া করছে। আমাকে দেখেই বৃদ্ধা কেঁদে উঠলেন। আমি একটু চুপ ক'রে থেকে তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল: "কাল রাতে বাবার হঠাৎ বুকে বেদনা হয়। ডাক্তার এসে পৌঁছবার আগেই দশমিনিটে সব শেষ।" ব'লে চোখ মুছল। আমি একটু চুপ ক'রে বললাম: "কখন?" সে বলল: "রাত ন-টায়।"

আমি ফিরে এসে তপতীকে বলতে সে বলল: "কিন্তু ভাবো কি তোমার অধ্যাপক বন্ধুটির কাছে তুমি সে-মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেও তিনি বিশ্বাস করবেন তোমাদের এজাহার?"

অঘটন সম্পর্কে আমার মনে পড়ে ভাই তোমার একটি চমৎকার কথা। তুমি প্রায়ই বলতে: "বুদ্ধিমানেরা বিশ্বাসের গোঁড়ামিকে নিশানা ক'রে নানা ব্যঙ্গবাণ হানেন। কিন্তু বুদ্ধির গোঁড়ামিও কিছু কম যায় না। তবে এ কী ব্যাপার জানো? বুদ্ধির অবিশ্বাসের মূলে আছে আত্মরক্ষার রোখালো সংকল্প অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে হাজার চেষ্টা ক'রেও অঘটনকে বুঝতে পারি না ব'লেই তাকে ডিসমিশ ক'রে দিই—হয় কল্পনা নয় বুজরুকি, নয় স্রেফ মিথ্যা সাজানো এজাহার ব'লে।"

আমার মন কিন্তু তাই সেদিন তোমার এ-কথা পুরোপুরি নিতে পারে নি। কারণ হয়ত এই যে, আমার নিজের মধ্যেও একটা প্রবল বুদ্ধির অহঙ্কার ছিল—(গুরুদেবের কাছে বহু ঘা খেয়ে তবুও হয়ত সে-অহঙ্কার হার মানে নি, কে জানে?)—কিন্তু তপতীর মাধ্যমে নানা অঘটন দেখে প্রথম প্রথম অবিশ্বাস এলেও

আজ আমার আর একটুও সন্দেহ নেই যে, তোমার কথাই ঠিক: বুদ্ধির অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিলে নানা দৈবী জ্যোতির অবতরণ হ'তে দেরি না হ'য়েই পারে না। কিন্তু মরুক গে এ-সব অঘটনের গালগল্প। আমি চেয়েছিলাম দেখতে ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন—(মা কি আর মিথ্যে বলতে পারেন যে ঠাকুর স্বভাবে "কল্পতরু"?)—ব্যস চুকে গেল। কেবল একটি অঘটন আজ আমার কাছে সমানই আদরণীয় মনে হয়—তপতীর দিনের পর দিন এই সব অপূর্ব ভজন শোনা। এ-সম্পর্কে গুরুদেবও সায় দিয়েছেন আমার মূল্যায়নে, লিখেছেন যে এ-ভজনগুলির সৃষ্টিতে তপতীও মীরার সহকর্মিণী—collaborator. তবে মুস্কিল এই যে, একথার নিগূঢ়ার্থ আমি ঠিক বুঝি না। তবে তপতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর আমার অন্ততঃ একটি উন্নতি হয়েছে: আমার একথা স্বীকার করতে আজ আর একটুও বাধে না যে, অনেক ঊর্ধ্বলোকের সত্যেরই নিহিতার্থ তথা ঘটনভঙ্গি আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়—হয়ত কোনোদিন হবেও না। নাই হ'ল। তোমার একথাও আমার মন নিয়েছে: "হাবিজাবি নানা কিছুই তো আমরা বুঝি না, নাই বুঝলাম—যদি এটুকু বোঝার মতন বুঝতে পারি যে, কৃষ্ণকে পেলে সবই পাব তাহ'লেই হ'ল। কী হবে অবান্তরের সমঝদার হ'য়ে?"

কিন্তু তবু এ-গানগুলির সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা না ব'লে ইতি করতে মন সরছে না।

প্রথম কথা: আমার মনে ক্রমশঃ একটা নব বোধোদয় মতন হচ্ছে: যে, মীরা ওর কাছে এসেছেন তাঁর গানের মাধ্যমে আমার সাধনার কিঞ্চিৎ সহায়তা করতে। একে আমি তাঁর করুণা ব'লেই গ্রহণ করছি কৃতজ্ঞচিত্তে।

দ্বিতীয় কথা: আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, মীরা ওর মাধ্যমে গান ছাড়াও আরো কিছু দেবেন।

তৃতীয় কথা: মীরাকে বিশ্বাস করার এই প্রবণতা আমার পক্ষে শুভঙ্করীই হবে, কেননা তাঁর গানের ছত্রে ছত্রে দীনতা, শরণাগতি ও ভগবৎপ্রেমের বাণীই ফুটে উঠেছে নানারঙা গন্ধপুষ্পের মতন। এ-হেন প্রেমের নিত্যচারণী কখনই ভুল দিশা দিতে আসতে পারেন না। গীতার ভাষায় মীরার প্রেরণাকে অকুণ্ঠে "দৈবী" ব'লে বরণ করলে আমার মনের নানা কুটিল সংশয়ের গ্রন্থিমোচন হবেই হবে।

কেবল একটা আশঙ্কা আমার মনে কালো ছায়া ফেলে সময়ে সময়ে। যদি

দেহের এত দুঃখের ফলে ওর অকালমৃত্যু হয়? এক বড় সন্ন্যাসী জ্যোতিষী নাকি বলেছেন—ও বেশিদিন বাঁচবে না, বড় জোর ৪৫ বৎসর। মীরারও শুনেছি ৪৫-এ দেহাবসান হয়েছিল। তবে এ নিয়ে মাথা বকিয়ে ফল কী বলো? ও যতদিন আছে ততদিন যেন ওকে মাথায় ক'রে রাখতে পারি—গুরুদেবের কাছে সত্যিই এই প্রার্থনা জানিয়েছি—যাঁর আশীর্বাদে এ-যাত্রা ওর ফাঁড়া কেটে নবজীবন লাভ হয়েছে নবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে।

কেবল এখন ঠিক কী করব ভেবে পাচ্ছি না। এ-শীতে ওকে নিয়ে আলমোরা, মুসুরি কি ডুমেল যাওয়া অসম্ভব। জব্বলপুরের শীতেই ও কষ্ট পাচ্ছে—ডাক্তারও বলেছে ওকে এমন কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার যেখানে শীত কম। তুমি কী বলো?

ইতি। তোমার স্নেহধন্য অসিত।

ষোলো

(পনেরো দিন বাদে)

ভাই অসিত,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি, একথা বোধহয় না বললেও চলবে! আমাদের সকলেরই সবচেয়ে ভালো লেগেছে জেনে যে, তপতী এখন উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছে। জ্যোতিষী? ওদের সব কথা নিও না। ওরা অনেক কিছু ঠিক বললেও আবার অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ভুলও তো হয়।

কিন্তু ধর্মজীবনে এসব ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয় খতিয়ে অবান্তরই বলব। ভগবান্‌কে পাওয়ার পরে এসব বিচারের স্থান থাকতে পারে একথা মানতে আমি নারাজ নই। কিন্তু যখন কোনো সাধক বা সাধিকার সত্যিকার দীক্ষা হয় তখন তাদের একটিমাত্র লক্ষ্য থাকবে: ভগবানকে পাওয়া ও তাঁর হাতের যন্ত্র হওয়া। ভগবানকে পেলে তার পর দৃষ্টি বদলে যেতে পারে, যায়ও—কিন্তু পাবার আগে পর্যন্ত লক্ষ্যভেদী সাধকের একান্ত হ'তে হবে ধনুর্ধর অর্জুনের ম'ত, যে মাছের শুধু চোখটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি শরসন্ধানের সময়ে। তাই তোমাকে আমাকে ভাই সব আগে হ'তে হবে যাকে ভাগবতে বলেছে—একান্তী—গীতায় বলেছে "একভক্তি"। আশা করি তপতীকেও তুমি এই দীক্ষাই দেবে।

ওর মধ্যে যোগবিভূতির পরিচয় পাচ্ছ—ভালোই। কিন্তু এতে অভিভূত হ'লে চলবে না। একটা সময়ে এসব বিভূতি কাজে আসে ব'লেই তাদের বিকাশ হয়। কিন্তু তাব'লে যোগের লক্ষ্য যে যোগবিভূতির চমকসিদ্ধি নয় একথা তুমি জানোই জানো হাড়ে হাড়ে, তাই এ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলতে চাই না শুধু এই কথাটি ছাড়া যে, ওর মধ্যে তুমি যে-যোগশক্তির অলৌকিক লীলা চাক্ষুষ করেছ—সে-অভিজ্ঞতাকে খাটানো চাই সব আগে তোমার তার্কিক সংশয়কে অপদস্থ করতে। এ যদি পারো তবেই এসব অভিজ্ঞতা তোমার সত্যি কাজে আসবে। কেবল ললিতা আমাকে টুকছে আরও একটা কথা তোমাকে জানাতে যে, তপতীর আধার যে বড় তার একটা প্রমাণ ওর মধ্যে এই যোগবিভূতির বিকাশ। একথা আমিও মানি, কিন্তু আমি এর 'পরে জোর দিতে চাই না, কারণ যোগবিভূতির দ্রুত বিকাশ হ'লে একটা মস্ত বিপদও আছে: তাতে ক'রে আমাদের অহমিকা খোরাক পায়। একথা ভুললে তোমার আমার চলবে না, কারণ আমাদের লক্ষ্য এ ও তা প্রমাণ করাও নয়, লোককে চমকে দিয়ে যোগের দিকে টানাও নয়, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—নিজের প্রকৃতিকে ঢেলে সাজিয়ে ভগবানকে পাওয়া। তবে তোমাকে এ-বিষয়ে এর বেশি কিছু বলার দরকার নেই, কারণ তুমি সত্যনিষ্ঠ কৃষ্ণেকান্ত একথা মার মুখে শুনেছি বরাবরই, আর মার লোক চিনতে ভুল হ'তে কখনো দেখি নি।

আজ তোমাকে আরো দু-একটা কথা লিখব ভেবেছিলাম বিশেষ ক'রে তপতীর অন্তঃশ্রুতির সম্বন্ধে। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিজে বহুজ্ঞ নই, মানে এধরণের উপলব্ধির আমি খবর রাখি না। তাই কেবল এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, তপতীর পূজারিণী গানটির ভাব ও মাধুর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ললিতা বলছে: 'লিখে দাও আমার চোখে জল এসেছে বিশেষ ক'রে দাদার অনুবাদের ঐ চরণটি গুন গুন ক'রে গাইতে গাইতে:

তনুমনপ্রাণ সঁপি' প্রিয়তমে তারেই চাই আরাধিতে।

ওর এ-রায়ে আমি পুরো সায় দিই কারণ ভক্তি যেখানেই শরণাগতির দিকে ঝোঁকে সেখানেই ঠিক সুরটি বেজে ওঠে যার প্রসাদে আঁধারে আলো নামে, সংশয়ে প্রত্যয় আসে। অদূর ভবিষ্যতে এ-গানটি তোমার মুখে শুনবার ইচ্ছা রইল। ললিতা বলছে তোমাকে আরো একটু লিখে দিতে যে, তপতীর শোনা

আরো গান তুমি ক্রমাগত পাঠিও পাঠিও পাঠিও। ভক্তির গানে ওর আগ্রহ কিরকম গভীর জানোই তো। তাই ওর অনুরোধ তুমি রাখবে নিশ্চয় নিজের গরজে—শিষ্যার প্রতিষ্ঠা কোন্ গুরু না চায়—আর তপতীর মতন এমন ভক্তিমতী বুদ্ধিমতী শিষ্যার মতন শিষ্যা!

কেবল ওর বুকের কষ্ট হাঁপানি রক্তবমন ইত্যাদি খবরে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছি বৈকি। তাই মাঝে মাঝে ওর কুশল সংবাদ পেলে যে আশ্বস্ত হব একথা বলাই বাহুল্য। ওকে আমার আশীর্বাদ দিও। প্রার্থনা করি ও যেন ললিতার মতন "একভক্তি" হ'তে পারে—অর্থাৎ সব রেখে ভগবানকে চাওয়া নয়, সব ছেড়ে ভগবানকে চাইতে পারে।

ইতি। তোমার স্নেহতৃপ্ত

প্রেমল।

পুনশ্চ। কাল এ চিঠিটি পোষ্ট করা হয় নি ষ্ট্যাম্প ছিল না ব'লে। ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আজ পোষ্টাফিসে ষ্ট্যাম্প কিনতে যেতেই পেলাম সুরথদার এক চিঠি। তিনি দুমাসের ছুটি নিয়েছেন তাঁর রিসার্চের জন্যে। যাচ্ছেন কলকাতায় একাই: ফ্লোরা বৌদি থাকবেন আলমোরায়। কলকাতায় তাঁর এক ধনী আত্মীয়ের একটি চমৎকার বাড়ী আছে—একেবারে গঙ্গার ওপরে। তিনি লিখেছেন আমাকে ও ললিতাকে তাঁর অতিথি হ'তে—'তোমরা দুজনে যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারো আমার 'তদারকে'—আর ললিতার একটা চেঞ্জ হওয়াও দরকার তো······" ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়। ললিতার বাঁ পায়ে একটা নতুন ব্যথা সুরু হয় এখানে ফিরে। সে-ব্যথাটা এখন এত বেড়েছে যে, বেচারী অতি কষ্টে চলে—কোনমতে। প্রণব কেবলই বলছে কোনো বড় ডাক্তারকে দিয়ে একবার পরীক্ষা করা দরকার। তাই ভাবছি এক্স-রে পরীক্ষা করতে যাব কলকাতায়। ললিতা তো সুরথদার নিমন্ত্রণ পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। ও কিরকম ছেলেমানুষ জানোই তো। বলল হাততালি দিয়ে—প্রথম কথা: "দাদাকে লিখে দাও তপতীকে নিয়ে আসতে।" আমি বললাম: "কী পাগল! সুরথদার সুবিধে হবে কিনা—" ও আমার কথা শেষ করতে দিল না, বলল: "আহা, সুরথদাকে যেন তুমি জানো না। দাদাকে তিনি মাথায় ক'রে রাখবেন। আর দাদার সঙ্গে তপতী—এ তো রাজযোটক। আমি বাজি রেখে বলতে পারি—আমি যদি

আহ্লাদে আটখানা হ'তে পারি তবে সুরথদা হবেন অন্তত: আটাত্তর খানা।"

প্রণব আজই সকালে—একটু বাদে—যাচ্ছে আলমোরা, সে সুরথদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে লিখলে আমি কাল পাবই পাব। আর পাওয়ামাত্র তোমাকে জানাব। তোমরা দুজন এলে কী আনন্দই যে হবে আমাদের বুঝতেই তো পারো। তাছাড়া কলকাতায় শীতও কম, তপতীর পক্ষে হয়ত ভালোই হবে। জিজ্ঞাসা কোরো ওর ডাক্তারকে। আর হ্যাঁ—অবিশ্যি ওর স্বামীকেও—যদিও আমার মনে হয় না যে সে না করবে। তবু—

সতেরো

(দুদিন বাদে)

ভাই প্রেমল,

তোমার চিঠি পেয়ে তপতী কী যে খুশী! বলল: "এ-সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না—সাধুদা ললিতাদি সুরথদা—যাঁদের কথা এত শুনেছি তাঁদের সঙ্গ পাব—আমি যাবই যাব।"

আমি হেসে বললাম: "দাঁড়াও, আগে প্রণবের কাছ থেকে খবর আসুক—সুরথদা কী বলেন—"

ও বলল: "সুরথদার ওখানে আমার ঠাঁই না হ'লে আমার কাকা হরদয়ালজি তো বালিগঞ্জে বাড়ী করেছেন—তাঁর ওখানেই উঠব।"

আমার একথা মনে হয় নি। তাই তোমার চিঠি পেয়েই সকালে টেলিফোন করলাম গুরুদেবকে। তাঁকে বলতেই তিনি বললেন তাঁর মত আছে—প্রেমল ও ললিতার মতন সাধক সাধিকার প্রভাব তপতীর সাধনারও অনুকূলই হবে! কেবল দৌলতরামের মত নিতেই হবে। বললেন তার অমতে তপতীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এর একটু পরেই সুরথদার কাছ থেকে এল এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম—প্রণবের কাছেই তিনি তপতীর ঠিকানা পেয়ে থাকবেন। টেলিগ্রামে লিখেছেন: "এমন শিষ্যা পেয়েছ। অভিনন্দন। কলকাতায় আমার 'জাহ্নবী নিলয়'-এ স্থান অঢেল। তোমরা এসো নিশ্চয়। প্রেমল ও ললিতা আসবে স্থির হয়েছে। তাদের নিয়ে আমি কালই ভোরে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। পৌঁছব আগামী রবিবার

—অর্থাৎ তরশু সন্ধ্যাবেলা। তুমি সেখানে আমাকে টেলিফোন করতে পারো টেলিফোনের নম্বর আমি কলকাতা গিয়েই পাঠাব টেলিগ্রামে।”

আমি এ-চিঠি ‘জাহ্নবী নিলয়ে’র ঠিকানাতেই পাঠাচ্ছি। দৌলতরামের অমত নেই। শুধু কলকাতা থেকে সুরথদার তার পাওয়ার অপেক্ষা। তপতীর প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর উপরে দিলাম। তুমি বা ললিতা টেলিফোন করতে পারো।”

ইতি। তোমার স্নেহধন্য
অসিত

আঠারো

দৌলতরামকে তপতী নাগপুরে টেলিফোন করল যে, উপস্থিত যখন শীতে চেপ্তে মুসুরি যাওয়া অসম্ভব তখন কলকাতা গেলে মন্দ কি? ডাক্তারের মত আছে……ইত্যাদি। দৌলতরাম জবাব দিল তৎক্ষণাৎ: “দাদাজি যদি তোমাকে নিয়ে যান কলকাতায়—তাতে আপত্তি করবে কে? তাছাড়া ডাক্তারে আমাকে বলেছেন (বিশেষ ক’রেই) তোমার মনকে প্রফুল্ল রাখতে। তাই তুমি যেতে পারো কলকাতায় স্বচ্ছন্দে। কেবল আমি জব্বলপুরে ফেরার আগে নয়। আমি দাদাজিকে স্বহস্তে কিছু প্রণামী দিতে চাই।”

অসিত (পাশ থেকে শুনে সবিস্ময়ে): প্রণামী? কেন?

তপতী (টেলিফোনে হেসে): দাদাজি বলছেন—প্রণামী কেন?…কী?… (অসিতকে) শুনলে তো? উনি বলছেন: যিনি গুরু হ’য়ে এসে বৈদ্যরূপ ধ’রে স্ত্রীকে বাঁচান তাঁকে কি স্বামীপ্রবর প্রণামী না দিয়ে থাকতে পারে? (ফের দৌলতরামকে) কিন্তু তুমি দেরি কোরো না তাহ’লে।…কী?…মোটরে আসবে?…বেশ বেশ, চমৎকার!

দৌলতরাম এককথার মানুষ: সেদিনই এক ট্যাক্সি ক’রে এসে হাজির রাত এগারোটায় (তপতী তখন বিছানায় ঘুমিয়ে)—অসিতকে প্রণাম ক’রে বলল: “আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি দাদাজি। কিন্তু আমাকে মোটরে ছুটে আসতে হ’ল একদিনের জন্যে—নৈলে পাছে আপনাকে স্বহস্তে এই ক্ষুদ্র

উপহারটি দেওয়ার সুযোগ না পাই—না, উপহার নয়, 'প্রণামী' বলাই ভালো।" ব'লেই ওর হাতে দিল দুটি হাজার টাকার নোট।

অসিত (ঈষৎ কুণ্ঠিত): কিন্তু তপতী তো এই সেদিনই দু'হাজার টাকা প্রণামী দিয়েছে।

দৌলতরাম: সে তো ওর টাকা। এ-টাকা আমি কালই পেয়েছি নাগপুরে—একেবারে হঠাৎ। আর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেছিলাম দাদাজি যে, আপনাকে প্রণামী দেব আমার কৃতজ্ঞতা জানাতেও বটে।

অসিত (আরো কুণ্ঠিত): তপতী বলছিল আজই ঠাট্টা ক'রে যে তুমি মনে করো তপতীকে আমি মুস্কিলাশান হ'য়ে বাঁচিয়েছি—কিন্তু আমি—

দৌলতরাম: জানি দাদাজি, তপতী আমাকে বলেছে যে, আপনি মনে করেন—আপনার গুরুদেবই তাঁকে বাঁচিয়েছেন তাঁর যোগশক্তিতে। কিন্তু ক্ষমা করবেন দাদাজি। আমি একটু প্র্যাকৃটিক্যাল গোছের মানুষ। আমার কথা এই যে, আমি আপনার গুরুদেবের যোগশক্তির কোনো খবরই রাখি না—যদিও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনাকে আমি খাঁটি সাধুপুরুষ ব'লে চিনেছি বিশেষ ক'রে তপতীর এই অসুখে। তাই—কিছু মনে করবেন না দাদাজি—আমার···আমার কৃতজ্ঞতার প্রণামী দিতে চাই আপনাকেই। কেবল একটি কথা: আপনাকে আমি ভক্তি করতে শিখেছি শুধু এইজন্যেই নয় যে, আপনি মুস্কিলাশান হ'য়ে দেখা দিলেন। না—আপনি আমার মন টেনেছেন সব আগে এই জন্যে যে, তপতীকে আপনি আপনার পার্সনালিটির আলোহাওয়ায়ই ফুটিয়ে তুলেছেন। আর কেন সে-বিকাশে আমি মুগ্ধ হয়েছি জানেন? আপনি ওকে দীক্ষা দিতে না দিতে ওর সমস্ত প্রাণ যেন রাঙিয়ে উঠেছে গানে—ভজনে। নৈলে কি ও এমন অপূর্ব গান বাঁধতে পারত দিনের পর দিন? দাদাজি, আমি ভক্ত না হ'লেও ভজন আমার মনকে নাড়া দেয় যদি-সে-ভজন প্রাণকাড়া ভাবে সুরে ঝলকে ওঠে। কী অপূর্ব ভজনের পর ভজন ও দিয়ে চলেছে দিনের পর দিন ভাবুন তো! আর কে সে? না, এমন মেয়ে যে কোনোদিনও কবিতা লেখেনি। এই জন্যেই আমি আরো অভিভূত হয়েছি ওর ভজনে। (ঘড়ির দিকে চেয়ে) কিন্তু উচ্ছ্বাস থাক দাদাজি, রাত হ'ল, কালই হয়ত কলকাতা থেকে ডাক আসবে—তাই আপনার আর সময় নেব না—

অসিত: না না—বলো না—

দৌলতরাম: না, আর মিথ্যে ফেনিয়ে কী হবে? আমি চেয়েছিলাম আপনাকে জানাতে—কেন আমি গুরু বলতে কী বোঝায় না জেনেও পরমানন্দে মেনে নিয়েছি আপনাকে তপতীর গুরু ব'লে—ওর ভাষায়—"পিতা মাতা বন্ধু দিশারি"—আর এমন গুরু যে ওকে পটুয়ার মতনই গ'ড়ে তুলেছেন তাঁর ব্যক্তিরূপের পবিত্রতার ছাঁচে, প্রতিভার আলোয়। জানেন আমাকে আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে সাবধান করতে এসেছিলেন আপনার সম্বন্ধে। আমি তাঁকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলাম: "দাদাজি কী বস্তু তা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।" আর কেন একথা বলেছিলাম জানেন? কারণ তপতীকে আপনি যা দিয়েছেন যার প্রসাদে আজ ও নবজীবন পেয়েছে সে-বস্তু আমারা কেউই দিতে পারতাম না। বলতে কি, দাদাজি, ওর সঙ্গে আমি দশবৎসর ঘর ক'রেও ওকে বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে, ও আমাদের থাকের জীব নয়। তাই তো ওকে আমি সুখে রেখেও সুখী করতে পারিনি কোনোদিনই। আপনিই ওকে প্রথম সত্যিকার আনন্দ দিলেন দশ বৎসর বাদে, ও বলে—আপনার গুরু শক্তির প্রসাদে, আমি বলি—আপনার সঞ্জীবনী শক্তির ছোঁওয়ায়। এই শক্তিকে গড় করতেই আমি ছুটে এসেছি নাগপুর থেকে সব কাজ ফেলে—শুধু আপনাকে সামান্য কিছু প্রণামী দিতে নয়—আপনাকে জানাতে—কেন আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। (গাঢ় স্বরে) এ-হেন আপনি ওকে কলকাতায় চেয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—এ শুধু ওরই গৌরবের কথা নয় দাদাজি, আমরা সকলেই ওর এ-গৌরবের শরিক। প্রণাম দাদাজি।

অসিত (ওকে আলিঙ্গন ক'রে): শুধু একটা কথা বলি ভাই—আমাকে বিশ্বাস করার জন্যে তোমাকে কোনদিনই আফশোষ করতে হবে না।

উনিশ

পরদিন ভোরে উঠেই অসিত গুরুদেবকে এক দীর্ঘ পত্র লিখল সব খবর দিয়ে—বিশেষ ক'রে দৌলতরামের কথা শেষে লিখল:

"আরো অনেক কিছু লেখার ছিল গুরুদেব। তবে সে হবে—এখনি হয়ত স্বরথদার তার আসবে—আমার আবার দেখা করতে যেতেই হবে সেই বন্ধুটির স্ত্রীর সঙ্গে যিনি সেদিন হঠাৎ মারা গেছেন—যাঁর কথা আপনাকে আগেই

লিখেছি। তিনি বড়ই শোকার্তা গুরুদেব, আপনি দয়া ক'রে তাঁকে সোজা টেলিগ্রামে আপনার আশীর্বাদ পাঠাবেন। বাকি যা বলার আছে কলকাতা পৌঁছে লিখব। আপনি আমাকে কলকাতায় সুরথদার ঠিকানায়ই লিখবেন।"

তপতী (চা-জলযোগ নিয়ে ঘরে ঢুকে): একি! এত সকালেই চিঠি?

অসিত: গুরুদেবকে লিখছিলাম। দৌলতরামের কথা সব লিখে দিয়েছি।

তপতী: হ্যাঁ, সে আমাকে সব বলেছে আজ ভোরে উঠেই। (হেসে) তুমি দাদা, যে সত্যিই সদ্‌গুরু এর পরে আশা করি আর অস্বীকার করবে না?

অসিত (হেসে): কিসের পরে? দৌলতরামের সার্টিফিকেট?

তপতী (জিভ কেটে): ছি ছি, এমন কথা বলে? (ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে, অনুযোগের সুরে) তুমি যে কী দাদা! আর কখনো যদি এমন কথা বলো তো তোমার সঙ্গে আড়ি আড়ি আড়ি।

অসিত: কিন্তু আমি যে সত্যিই তোমার গুরু হবার যোগ্য নই তপতী।

তপতী: ফে—র! গুরু হবার যোগ্য বুঝি কেবল তারা, যারা লম্বা লম্বা সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ বলতে পারে?—যারা শিষ্যদের কাছে অনর্গল প্রমাণ দাখিল করতে পারে যে, তারা—তোমারই ভাষায়—শুধু সবজান্তা নয়, সবপার্তা?

ক্রিং……ক্রিং……ক্রিং

তপতী (টেলিফোন ধ'রে): জব্বলপুর।……হ্যাঁ, আমি তপতী। আপনি?……ললিতাদি?……ও। হ্যাঁ। আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন? …কলকাতায় পৌঁছেছেন কাল রাতে?…হ্যাঁ। সুরথদার তার পেয়েছি পরশুদিন বিকেলেই।……হ্যাঁ দিদি, আমার স্বামী শুধু অনুমতি দেওয়া নয় দাদাজিকে বলেছেন যে, আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি এতে তাঁর গৌরব নাকি বিষম বেড়ে গেছে।…না দিদি, তিনি আমার নেওটো নন, তবে নরম মানুষ—চান সত্যিই আমাকে সুখী করতে।…কী?…এরপরে কি আর না গিয়ে উপায় আছে দিদি?…কী? আপনারই জিৎ?…না মেনে আর উপায় কী বলুন?…আমার? না দিদি, আমি জিৎব কোত্থেকে বলুন—যার গুরু উঠতে বসতে গুরুদাসীকে হুকুম করতে ভয় খান?…না দিদি, এবার আপনার একটু ভুল হয়েছে—দাদাজির নিজের 'পরে একটুও বিশ্বাস নেই।…হ্যাঁ দিদি, কখনো কখনো এর ওর তার মনের কথা আমি পরিষ্কার ধরতে পারি…কী?…যোগবিভূতি কিনা জানি না

দিদি, তবে মাঝে মাঝেই স্পষ্ট পড়তে পারি দাদাজির দুশ্চিন্তার কথা।…কী?… হ্যাঁ তিনি আজ সকালেও ভাবছিলেন—সাধুদা আমাকে মঞ্জুর করলে তবেই আমাকে তুমেলে নিয়ে যাবেন। কী?…হ্যাঁ, আজই বিকেলের ট্রেনে রওনা হব ভাবছি। কেবল—কিছু মনে করবেন না দিদি, আমি উঠব আমার কাকার ওখানেই, তবে সারাদিন আপনাদের ওখানেই কাটাব। কী?…কিন্তু আপনাদের অসুবিধে …মস্ত বাড়ী?…আচ্ছা দিদি, বহু ধন্যবাদ—কেবল মিনতি রইল ভুলচুক হ'লেও একেবারে ফেল করিয়ে দেবেন না। একটা ট্রায়াল দেবেন অন্তত:—লক্ষ্মীটি!… দাদাকে? আচ্ছা (অসিতকে) ধরো দাদা!

কুড়ি

অসিত (টেলিফোনে): ব্যাপার কী, ললিতা?

ললিতা: কেন ওকে দমিয়ে দিচ্ছ দাদা? ও আসুক—আমি ওর দিকে।

অসিত (হেসে): এ তো দিক বিদিক-এর কথা নয় দিদি, পারা-না-পারার কথা। গুরু হওয়া অভ্যেস নেই ব'লেই ওকে দমিয়ে দিতে হচ্ছে।

(টেলিফোন ঘটক: Time up, please

ললিতা: Never mind. Book another call, please!

টেলিফোন ঘটক: Okay, madame, thank you.)

ললিতা: শোনো দাদা, তর্কাতর্কির কথা নয়। ওকে আমাদের এখানেই উঠতে হবে। আমি ওকে স্বপ্নে দেখেছি।

অসিত (উৎসুক): কী দেখেছ?

ললিতা (হেসে): বলব কেন? তোমার যে সন্দেহ বাতিক—বলবেই বলবে—wish-fulfilment—না, শোনো। বাপী আমার স্বপ্নের কথা শুনে বলেছে—খুবই আশাপ্রদ। বাপীর কথা কি ভুল হয় কখনো?

অসিত (হেসে): হঠাৎ এত গুরুভক্তি?

ললিতা (প্রফুল্ল স্বরে): বোধহয় তপতীর নম্রতার ছোঁয়াচ লেগেছে। কিন্তু বাজে ঠাট্টা থাক—টেলিফোনওয়ালারা ফের নোটিশ দিল ব'লে শোনো— ওকে নিয়ে এসো চলে সটাং। কিন্তু মনে রেখো—ওর কাকাটাকার ওখানে ওকে থাকতে দেব না, দেব না: আমাদের ওখানেই উঠবে ও।

অসিত (অনিশ্চিত) : কিন্তু—সুরথদার উপর একটু বেশি চাপ দেওয়া হবে না কি ?

ললিতা : সুরথদাকে আমি নাম দিয়েছি এঁটেল মাটি—যত চাপ দেবে ততই মজবুত। এক বাজিকরের ভাঁড় দেখেছিলাম—যতই জল ঢালো ততই ধরে। তুমি দেখনি ?

অসিত : দেখেছি, কিন্তু তপতীর স্বামী ব'লে একটি পদার্থ আছে।

ললিতা : তোমার চিঠিতে যা লিখেছ তা'তে তো মনে হয় সে তোমার কাছে আসতে না আসতে অপদার্থ হ'য়ে গেছে—মানে, putty in your hands.

অসিত (হেসে) : অতটা না হোক, তবে সে—জানি না, হয়ত আপত্তি করবে না। কেবল তপতী বলছিল সে ওকে ওর কাকার ওখানেই উঠতে বলেছে।

ললিতা : আমি একবার তার সঙ্গে কথা বললে আর বলবে না। তার নাগপুরের টেলিফোনের নম্বর দাও, আমি তাকে ট্রাংক-কল করব। আমি মানুষকে পোষ মানাতে জানি।

অসিত : জানি লক্ষ্মীময়ী—যে গুরুকেও পোষ মানাতে পারে তার অসাধ্য কী আছে ?

ললিতা : শ্‌—শ্‌! ব্ল্যাসফেমি! (সুর ক'রে) গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ—চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছ ?

অসিত : না, তবে গুরুভক্তির দাপটে গলায় ভূমিকম্প হয়েছে, শুনতে পাচ্ছি।

ললিতা : তপতী তো ক্লেয়ারভয়েন্ট, তার কাছে শিখে নিও—তুমি গুরু হ'য়ে বায়না ধরলে তাকে শিখিয়ে দিতেই হবে—হি হি হি।

টেলিফোন ঘটক : Half-a-minute more, please !

ললিতা : আচ্ছা যাই ভাই, কিন্তু পাকা কথা হ'য়ে গেল, মনে থাকবে তো ?

অসিত (হেসে) : না থাকলে কি আর তুমি রক্ষে রাখবে দিদি ?

একুশ

বেলুড় মঠের কাছে গঙ্গার ধারে থাকা স্বরথদার আতিথ্যে। তার উপর প্রেমল ও ললিতার সাহচর্য। অসিত মুখে মুখে চতুষ্পদী বেঁধে গাইত ললিতা ও তপতীর সঙ্গে কোরাসে :

> On earth to drink the milk of paradise !
> To be a squanderer is to be wise,
> Ah, children, sing : "Who loses all, gains all,
> Hailing His mystic Flutlet's dangerous call !"

* * *

কিন্তু সেই "গোলাপের সাথী কাঁটা" যেন জীবন্ত হ'য়ে হুল ফুটিয়ে বাদ সাধা সুরু করল নানাভাবে। প্রথম—ললিতার শুধু যে কাশী সেরেও সারতে চায় না তাই নয়, ওর ফুলো বাঁ পায়েও কিছুতেই জোর পায় না। কী হয়েছে কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে thrombosis of the leg, কেউ বলে হাঁটুতে জল জমেছে—নানা মুনির নানা মত। পা টিপে টিপে চলতে হয়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

কিন্তু ললিতা গ্রাহ্যও করে না। তপতীকে পেয়ে সে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই এসে অসিতকে বলে : "দাদা বাপীকে দেখে মা বলতেন এ-রাম মনুষ্য নয় রে বুঝলি? আমি আরো এক কাঠি যেতে যাই তপতীর সম্বন্ধে, বলব : এ সীতা ক্রোরপতির ঔরসে জন্মায় নি রে—এ ভুঁইফোঁড়, সংসারের জন্যে তৈরী হয় নি, হয় নি, হয় নি। যখন ও পরে তোমার মতন মহাবিবেকী গুরুর দীক্ষায় ফুটে উঠবে পারিজাত হ'য়ে তখন তুমি বুঝবে আমি কেমন নবী—মিলিয়ে নিও—মানে, যখন আমি থাকব না।"

স্বরথদা ওকে ধমকায় : "কী যে সব অলুক্ষুণে কথা বলিস যখন তখন! যোগিনী হ'তে হ'লে সব আগে চাই বাকসংযম, বুঝলি?"

তপতীর মুখেও ছায়া নামে, বলে : "অমন কথা বলে না দিদি, ছি!"

ললিতা হেসে বলে : "বলে না কেন বোন? দাদার মুখে কালই শুনলে না মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কথা যে,

সবচেয়ে ভাই কী আশ্চর্য ?—রোজ যায় জীব যমালয়ে
রইল যারা ভাবে তবু—বাঁচবে চিরজীবি হ'য়ে !"

কিন্তু তবু অসুখকে তো সুখ ব'লে ভুল করা যায় না : তপতীর চোখে জল আসত দেখে কত সন্তর্পণে প্রেমল ললিতার বাঁ পাটি ধ'রে তুলে দিত মোটরে —যেমন শিশুকে দেয় তার মা। বলত : "দাদাজি, প্রেমলদা ললিতাদির শুধু গুরু নন—এমন কি বাপও নন, সাক্ষাৎ মা। এমন সদাসজাগ স্নেহ মা ছাড়া আর কারুর মধ্যে কি সম্ভব ?"

কিন্তু অচিরে গোলাপের দ্বিতীয় কাঁটা গজিয়ে উঠল অসিতেরই লীলাঙ্গনে—অভাবনীয় রূপে : ওর আত্মীয় স্বজন দেখতে দেখতে প্রবল বন্যার মতনই সকল্লোলে এগিয়ে এল। তারা কি ছাড়বার পাত্র ? ওকে পাকড়ে নিয়ে যাবেই যাবে এখানে ওখানে সেখানে গান করতে—ভাষণ দিতে, 'প্রাইজ' বিতরণ করতে …তপতী (প্রেমলের আদেশে) সর্বদা অসিতের সঙ্গে যেত ব'লে ওর ফ্যানের দল ওর সঙ্গে প্রায়ই রূঢ় ব্যবহার করা সুরু করল। অবশ্য, অসিতের সামনে না। অসিতের অনুপস্থিতিতে কখনো তারা ওকে বচন দিত, কখনো খোলাখুলিই করত ভ্রূকুটি। তপতী চোখের জল কোনোমতে চেপে বলত এসে কেবল ললিতাকে। বলতে বল্‌তে কোনো কোনোদিন চোখের জল ফেলত। ললিতা রেগে আগুন হ'য়ে অসিতকে ধমকাত : "দাদা, তোমার সব ভালো, কেবল এই একটি মস্ত দোষ—কাউক্কে তুমি 'না' বলতে শেখো নি। অথচ এই এক পাপে তোমার সব পুণ্যের ভরাডুবি হ'তে বসেছে।"

প্রেমল ললিতাকে মানা করত অসিতের সঙ্গে এমন চড়া সুরে কথা বলতে, কিন্তু ললিতা ঘাড় নেড়ে বলত : "যদি দাদা শোনে তবে এই সুরে বলছি ব'লেই শুনবে। দেখছ না—ওকে নিয়ে ওর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা কী ভাবে ছিনিমিনি খেলছে ? কিন্তু এও সইতে পারতাম যদি ওরা তপতীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করত। ওরা বলে কি জানো বাপী ? বলে—তপতী এসেছে ওদের কাছ থেকে অসিতকে ছিনিয়ে নিতে। ঠিক যেমন বৌকাঁটকি শাশুড়ী বলে বৌ-এর সম্বন্ধে। অথচ দাদা নির্বিকার—কিছুই বলে না—না রাম না গঙ্গা !"

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্॥ (মহাভারত—বনপর্ব)

প্রেমল : কিন্তু অসিতের সামনে তো ওরা তপতীর খুবই গুণগান করে! ও কাকে পাকড়াবে প্রোটেষ্ট করতে?

ললিতা (ঝংকার দিয়ে): আমার এই আর এক জ্বালা হয়েছে বাপী, তোমাকে নিয়ে। তুমি কি জানো না double-faced ব'লে একটি কথা আছে তোমাদেরই অক্সফোর্ড ডিকশনরিতে? বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই এই মুখোষ প'রে এখানে একরূপ দেখান, আবার মুখোষ খুলে সেখানে আর এক রূপ। তপতী পাঞ্জাবী ব'লেই আরো ওদের রাগ। অগুস্তি বাঙালী মেয়ে থাকতে কেন দাদা পাঞ্জাবী মেয়েকে শিষ্যা করতে গেল—বলে না ওরা?—তোমারই তো সামনে বলেছে সেদিন দাদুর এক মাসী না পিসী না খুড়ী না মামাতো বোন—মনে পড়ছে না, কারণ এখানে সব শেয়ালেরই এক রা।

সুরথদা (অসিতের দিকে চেয়ে): ললিতার সব ভালো কেবল এই একটি দোষ যে, ও কিছুতেই বুঝতে পারে না—কেন কেউ বৈরিগি হ'য়ে বেরিয়ে গেলে মাসী পিসীর দল শেয়াল না হ'য়েও তাকে কাছে টানতে এত ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন।

ললিতা : বুঝতে পারব না কেন সুরথদা? এতো পাতঞ্জল মুনির অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নয়। তোমাকে বলি নি কি—আমাকেও কত লড়তে হয়েছে আমার মাসী পিসীর সঙ্গে—যাঁরা একবাক্যে বলেছিলেন—গুরুই যদি করতে চাই তবে হরিদ্বারে তো কত ছাইমাখা মহাত্মা আছেন? ভাবটা—হিন্দু মহাত্মা গুরু হ'লে আমি তাঁদের কাছেই থাকব, সাহেব গুরু হ'লে না জানি কী হবে?

প্রেমল : রোসো, রোসো—এ-তর্ক থাক। আগে শুনি—অসিতের মাসী পিসীর দল জানতে পারলেন কোত্থেকে যে তপতী ওকে গুরুবরণ করেছে? কে রটালো?

ললিতা (মুখ টিপে হেসে): সেকথা আর পাপমুখে কেমন ক'রে বলি বাপী?

প্রেমল (আশ্চর্য): তুমি! সে কি!! কেন রটালে?

ললিতা (রুখে উঠে): রটাব না কেন শুনি! যারা এমন মুখে-সুধা-মনে-বিষ তারা নিজের বিষের জ্বালায়ই জ্ব'লে পুড়ে মরুক না দেখে—যে, দাদার এত অগুস্তি বাঙালী মেয়ে ভক্ত থাকতেও তার চেলী হ'ল শেষ মেষ

এক পাঞ্জাবী মেয়েই। (তপতীর গলা জড়িয়ে) ওরা যেমন আমার এমন বোনটিকে জ্বালিয়েছে তেম্‌নি ঘরে গিয়ে জ্ব'লে পুড়ে খাক হ'য়ে যাক না ভাবতে ভাবতে যে, দাদা ওদের পর হ'য়ে গেল। Quits! শোধবোধ শোধবোধ শোধবোধ (হাততালি দিয়ে) অনুতাপ যাদের হয় না কিছুতেই—তাদের শাস্তি না হ'য়ে পারে?

অসিত (আশ্চর্য): কিন্তু তপতী এই তো সবে সেদিন আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছে—জব্বলপুরে!

প্রেমল: আর নিয়েছে ঠিক সময়েই ভাই—not a moment too soon: তোমার গুরুদেব কি সাধে তোমাকে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে লিখেছিলেন—তপতীকে চটপট শিষ্যারূপিণী রক্ষাকবচ ব'লে বরণ ক'রে তবে কলকাতায় উদয় হ'তে?

অসিত (হেসে): দেখ তপতী! তোমার আদরের সাধুদা তোমাকে কী উপাধি দিলেন: রক্ষাকবচ!

তপতী (হেসে): দাদাজি, আপনাকে সেবা করার অধিকার যদি সত্যি দেন তবে এর চেয়েও দুর্বহ উপাধি বইতে আমি রাজী আছি। কেবল একটা কথা বলব—যদি কিছু মনে না করেন অবিশ্যি?

অসিত: কী, শুনি?

তপতী: আমার মনে পড়ছে সেই ঈশপের বিখ্যাত গল্প: যে সবাইকেই তুষ্ট করতে চায় সে কারোরই মন পায় না।

অসিত: জানি তপতী। বুঝিও সবই···কেবল—

প্রেমল (টুপ ক'রে): স্বভাব বদ্‌লাতে চাই না কিছুতেই—এই না? অসিত, অসিত, অসিত! তপতী ললিতাকে কালই কী বলেছে জানো? শুনে আমার কী যে ভালো লেগেছে! বলেছে—দাদাজির আত্মীয়দের কি চোখ নেই? দেখতে পায় না তারা—কেন তিনি সব থাকতেও সব ছেড়ে চ'লে গেলেন বৈরাগী হ'য়ে হাজার মাইল দূরে অজ্ঞাতবাসে? বাংলা দেশে কি কেউ সন্ন্যাসী হয় নি কখনো? রামকৃষ্ণ মিশনের মহাত্মা সাধুদের কি ওরা কেউ চোখে দেখে নি? না, তাঁদের মধ্যে কাউকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারত—আজ এখানে চা-য়ে, কাল ওখানে ডিনারে পরশু ওখানে লাঞ্চে ডেকে? না, শোনো অসিত, তুমি যদি সত্যিই একান্তী

হ'তে চাও তবে এই সব বাজে হট্টরঙ্গ আত্মীয়দের "না" বলতে তোমাকে শিখতেই হবে, তাদের মায়া কাটাতেই হবে—যারা তোমার মধ্যেকার বড় অসিতকে দেখতে না চেয়ে তোমাকে কেবল নিচু দিকে টেনে তাদের দলে ভিড়োতে চাইছে। এরা চায় কেবল একটি জিনিষ: এই সব দহরম মহরমের সর্বনেশে দ-য়ে তোমার সাধনাকে মজাতে। তুমি এভাবে যত রাজ্যের ফালতো মাসী পিসী ভাই বোন মামা ভাগনী ভাইঝিদের ডাকে সাড়া দিয়ে ফের মজলিশি মানুষ হ'তে চাইবে এ ভাবাই যায় না। তাই তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, তুমি যাঁর জন্যে সংসার ছেড়েছ শুধু তাঁর ছাড়া আর কারুর ডাকে সাড়া দিলে ডুববেই ডুববে। তোমার এ-দুর্বলতা তপতীর চোখ এড়ায় নি এজন্যে আমি ওকে মনে মনে শুধু যে সাধুবাদ দিয়েছি তাই নয়, ওকে বরণ ক'রে নিয়েছি—ঐ যে বললাম, তোমার "রক্ষাকবচ" ব'লে। ও এসেছে তোমার কাছে ঠাকুরের দয়ার দৈবী দূতী হ'য়েই বলব। তোমার গুরুদেবও নিশ্চয় ওকে দেখবামাত্র আমার এ-রায়ে সায় দেবেন।

তপতী (সকুণ্ঠে): কী যে বলেন সাধুদা! আমি অত শত ভেবে দিদিকে বলি নি এসব কথা।

প্রেমল (তপতীর মাথায় হাত রেখে): তোমার অত কুণ্ঠিত হওয়ার দরকার নেই মা। অসিত যাই হোক অন্ধ নয়। তাই তোমার মূল্য বুঝবেই বুঝবে। মা, আমি নিজেও কিছু নিখুঁৎ সাধু নই। কত দুর্বলতার সঙ্গে যে আমাকে লড়তে হয়েছে, আর এখনো পদে পদেই লড়তে হয় জানি কেবল আমি আর জানে ললিতা। তাই তো মা ওকে রেখে গেছেন আমার ধাত্রী নিয়োগ ক'রে। শুধু শিষ্যই গুরুর কাছ থেকে বর পায় না মা, শিষ্যের মতন শিষ্য হ'লে সেও গুরুকে বর দিতে পারে জেনো। ললিতা জানে একথা। তাই তো তোমাকে দেখবামাত্র বরণ ক'রে নিয়েছে নিজের দোসর ব'লে।

ললিতা: এবার আমার ওপর এক হাত নিয়েছ বটে বাপী! এক ঢিলে দুই পাখী! বা বা বা!

প্রেমল (হেসে): শোধবোধ হ'ল প্রকৃতির বিধান, বৎসে!

ললিতা (একগাল হেসে: শোধবোধই বটে! মনে প'ড়ে গেল আমার

এক মাসিমার কথা। মেসোমশায় তাঁর এক কান ম'লে দেবামাত্র তিনি স্বামীর শুধু দুকান ম'লেই ক্ষান্ত হতেন না—তার উপর তাঁর নাক ম'লে বলতেন: "ব্যস্, শোধবোধ।" কিন্তু ঠাট্টা না, বাপী! দাদাকে নিয়ে তাঁর অগুন্তি আত্মীয় বন্ধুর সংঘ কী কাণ্ড করেন, জানো না। শোনোই না একটু তপতীর মুখে। (তপতীকে) বলো না ভাই!

তপতী (অসিতের দিকে চেয়ে): বলব দাদাজি?

অসিত (করুণহাস্যে): বলো। ললিতা প্রেমলের কাছে আমি আসি তো চলার ছন্দ শিখতেই—আমার পথচলায় কোথায় কোথায় ছন্দপতন হচ্ছে ওরা দেখিয়ে না দিলে আরো যে কত ভুগতাম জানি তো।

ললিতা ও প্রেমল } এ তোমার ভারি অন্যায় দাদা—
অমন কথা বলে না অসিত—

অসিত: বলব না কেন প্রেমল? আমার নানা দুর্বলতা সম্বন্ধে তুমি আমাকে বারবারই চোখ খুলে দাও নি কি—?

প্রেমল (বাধা দিয়ে, অসিতের কাঁধে হাত রেখে): শ্-শ্! তুমি এ-ঢঙে কথা বললে আমি আর কক্ষনো কোনো কথা বলব না। না, শোনো অসিত, আমি কি তোমাকে বলি নি বারবারই যে, তোমাকে আমি যখন ধমকাই তখন সেই সঙ্গে নিজেকেও ধমক দিই ব'লেই এত নিষ্পরোয়া হ'য়ে তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে পারি?—তোমার চোখ খুলে দেবার গুরু আমি নই। তবে শুনবে আমার নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতা—যাকে বলে ঠেকে শেখা!' ভাই, দুর্বলতা এ-সংসারে নেই কার?—না, শোনো আগে, তারপর তর্ক কোরো।

(একটু থেমে) তোমাকে আমি বলেছি যে, আমি আগে আগে ছুটিতে দু-তিন বৎসর অন্তর একবার ক'রে লণ্ডনে ফিরে যেতাম আমার বাপ মা-র কাছে। ক্রমশঃ দেখতে পাচ্ছিলাম অবিশ্যি যে, তাঁরা আমার জীবনের মোড় যে-দিকে ঘোরাতে চান সে-দিকে তাকাতেও আমার চিত্তগ্লানি হয়। কিন্তু তবু নিজেকে শাসাতাম উঠতে বসতে: বাপ-মার মনে কষ্ট দিতে নেই নেই নেই। মাত্র আর দু'দিন আছি বৈ তো নয়—না হয় শুনলামই ওঁদের কথা একটু।

কিন্তু দেখি—ক্রমশঃ ওঁরা ডাক দেওয়া সুরু করলেন নানান্ শুধু আমুদে

লোককে নয়—এমন সব মেয়েকে যাদের চলন বলন কিছুই আমার ভালো লাগত না। কিন্তু হ'লে হবে কি, দুচারদিন বাদে ক্রমশঃ সবই গা সওয়া হ'য়ে আসতে থাকে, মনে হয়—এরা তো তেমন অন্যায় কিছু করছে না—একটু ফুরত্তি—এ তো human nature……এই সব মন ভোলানো যুক্তি। কিন্তু শেষে মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থা হ'ল যে, আমি ধ্যান করতে বসলেই তাদের রং ঢং ভেসে উঠত চোখের সামনে! ক্রমশঃ মনে হ'ল—আমি যেন চলেছি ডুব সাঁতার কেটে—ক্রমশই গভীর জলে—আলো ঘোলাটে হ'য়ে আসতে থাকে। শেষটায় আর পারলাম না। মা-কে একটি চিঠি লিখে চম্পট। কয়েকদিন বাদেই উড়ে বম্বে। তোমার আত্মীয় স্বজনেরা তো পদে আছেন—চান বড় জোর সভা-উজ্জ্বল গীতাসিংহ দাঁড় করিয়ে তোমাকে Lionize করতে—গান গাইয়ে।

তপতী: কিন্তু শুধু গান গাওয়াই নয় সাধুদা। শুনুন তবে যা বলতে যাচ্ছিলাম—দাদাজি যখন অনুমতি দিয়েছেন। (একটু থেমে) কাল ভোরবেলা আমি বাগানে ঠাকুরঘরের জন্যে ফুল তুলছি এমন সময় এক ভারিক্কি ভদ্রমহিলা মোটর হাঁকিয়ে ভোঁক ভোঁক করতে করতে গেটে ঢুকলেন। পাশে তাঁর সারথিই হবে। তাঁর হাঁকানো দেখেই বুঝলাম—এখনো ভালো চালাতে শেখেন নি, কিন্তু তাঁর মুখে সে কী প্রবল আত্মবিশ্বাস! যাক। (ফের থেমে) বাগানে আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন শুধু: "অসিত?" আমি বললাম: "দাদাজিকে খবর দিচ্ছি, আপনি বসুন।" তিনি বললেন: "তোমাকে খবর দিতে হবে না—আমি চিনি তোমাকে।" ব'লেই সোজা ঘরের দিকে হন্ হন্ হন্। কী করি? পিছু নিলাম। তিনি নক্ষত্রবেগে সোজা দাদাজির শোবার ঘরে ঢুকে বললেন: "এই যে অসিত! চলো চলো চলো—সবাই এসে গেছেন—প্রভাতী আসর। চাঁদা জুটবে প্রচুর তোমার গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে। আর কথাটি নয়—গা তোলো।" আমি চৌকাঠ থেকে বললাম: "সাধুদা গঙ্গাস্নান সেরে আসছেন—একটু বসুন দাদা!" মহিলাটি চোখ পাকিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে ব'লে উঠলেন: "সাধুদা ফাধুদা রাখো। বসবার সময় নেই, আমি ওর দিদিমণি—চলো না অসিত! গণ্যমান্য সবাই এসে ব'সে আছেন সভায় তোমার অপেক্ষায়।"

দাদাজি কী করেন? গেলেন গুড় গুড় ক'রে—গুরুদেবের আশ্রমে প্রচুর চাঁদা-দেনেওয়ালারা হাজির, 'না' বলা চলে না তো! আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে দিদিমণি তো দাদাজিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন মোটরের পিছনের

সীটে—নিজে সারথির পাশে ব'সে। আমি চক্ষের নিমেষে শুড়ুৎ ক'রে মোটরে ঢুকে বসলাম দাদাজির পাশে। দিদিমণি তো রেগে কাঁই! "তুমি এসেছ কেন? •তোমাকে যেতে হবে না। অসিত আমাদের—তুমি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছ শুনি? যাও।"

আমি দাদাজিকে বললাম: "কী বলেন দাদাজি?" দাদাজি বিপন্ন কণ্ঠে বললেন: "না না, ও আমার শিষ্য, যাবে বৈ কি।" দিদিমণি অগত্যা মোটরে ষ্টার্ট দিলেন—হর্-র্-র্-র্। কিন্তু একেবারে গুম্। সারা রাস্তা আর একটি কথাও না।

অস্বস্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। একবার ভাবলাম—নেমে যাই। কিন্তু ফুর্সৎ পেলাম কই! তাছাড়া চলতি গাড়ী থেকে নামাও তো চাট্টিখানি কথা নয়। কাজেই—ছ'কে নিন ছবিটা মনে মনে: কলকাতায় দাদাজির একান্ত আপনার লোক দশাসই দিদিমণির মুখে ঘনঘটা। পাশে বিমলা সারথি! পিছনের সীটে যোগী দাদাজি ম্লান মুখে ছুটেছেন অচিন আসরে অদেখা শ্রোতাদের সামনে গান গেয়ে আশ্রমের জন্যে "প্রচুর" টাকা তুলতে! আর সব ছাপিয়ে পাশে তাঁর এক পাঞ্জাবী শিষ্য—দিদিমণি ও প্রচুর চাঁদাদেনেওয়ালাদের কাছে অচ্ছুৎ কন্যা—persona non grata। সত্যিই সাধুদা আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে!! (হাসি চেপে) মিনিট পনেরো পরে পৌঁছলাম এক তালি-দেওয়া শামিয়ানার নিচে। এসেছেন বটে কয়েকজন শ্রোতা, কিন্তু মনে হ'ল না তাঁরা কেউ নিমন্ত্রিত। আর জনে জনে কৌতূহলের একেবারে প্রতিমূর্তি! দাদাজির তো চক্ষুস্থির! কিন্তু তখন আর উপায় কি? too late! ফিরে যাওয়াও চলে না। কাজেই গান গাইলেন—ঝাড়া দু ঘণ্টা। ভিড় অবশ্য ফুলে উঠল, কৌতূহলীর দলও মেতে উঠল—যাদের মুখপাত্রী দাদার মুখরা দিদিমণি। তখন আমাকে বাধ্য হ'য়েই টুকতে হ'ল: "দাদাজির পরশুদিন গলা ভেঙে গিয়েছিল বেশি গেয়ে। কাল ফের গাইতে হবে তাঁকে য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে। তাই আজ আর গাওয়া চলবে না।" কিন্তু কে শোনে? সকলের উপরোধে তাকে গাইতে হ'ল আরো দুটি গান—তবে ওরা ছাড়ল। আর প্রচুর চাঁদা উঠল কত জানেন? সাড়ে পঞ্চান্ন টাকা!!

প্রেমল (সকলের মিলিত হাসির রেশ থামলে): কিন্তু অসিত, এ হাসির কথা নয় মোটেই, কান্নারই কথা বলব। এইসব ছিনে জোঁকদের প্রশ্রয় দিলে

তুমি শুধু যে নিজের আখের নষ্ট করবে তাই নয়, তোমার গুরুদেবেরও বদনাম হবে জেনো। কারণ মনে রেখো—তুমি কলকাতায় এসেছ এবার শুধু দুটি উদ্দেশ্যে: এক, আমাদের সঙ্গে ভজন করতে; দুই, তোমার গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে (হেসে) প্রচুর চাঁদা তুলতে। কিন্তু এরা কী করছে দেখছ তো? আশ্রমের জন্যে টাকা তুলবে এই টোপ ফেলে তোমাকে গেঁথে শুধু খেলাচ্ছে। এইজন্যেই আমার মনে গান গেয়ে টাকা তোলায় ব্যাপারে দ্বিধা ছিল বরাবরই। মনে আছে তো, ভাগবতে পরীক্ষৎ কলিকে কী বলেছিলেন—যখন সে বলেছিল God made him, কাজেই সেও একটা আস্তানার দাবি করতে পারে?

অসিত: আছে—বলেছিলেন টাকার মধ্যে থাকো তুমি—কারণ টাকার আস্তানায় সব রকম পাপই মহা আরামে থাকে।

প্রেমল (সায় দিয়ে): অন্য ভাষায়, টাকা হ'ল কলির রাজধানী। কথাটা কি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি নয়? যেখানেই টাকার নাম গন্ধ সেখানেই রাজ্যের অনর্থ—দুর্দান্ত মৌমাছিরা কি দলে দলে ছুটে আসে না টাকার রস ছেঁকে পাপের মৌচাক বানাতে?

ললিতা: ঠিক বলেছ বাপী! আমি কেবল আর একটু জুড়ে দিতে চাই—যে, ওরা টাকার লোভ দেখিয়ে দাদাকে ওদের দলে নামিয়ে আনতে চায় কেবল তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে, বলতে: অসিত?—He is a jolly good fellow—হিপ হিপ্ হুর্‌রে!

সুরথ: বটে, কিন্তু মুস্কিল কি জানো দিদিমণি? অনেকদিন ধ'রে যাদের মানুষ আপন জন ব'লে মান দিয়ে এসেছে তাদের হঠাৎ—one fine morning মুখের উপর বলা কঠিন যে, "তোমাদের সঙ্গে আর মিশতে পারব না।"

প্রেমল: মিশতে পারে, কিন্তু ওরা অসিতের স্তরে উঠে এলে তবে। অসিত ওদের স্তরে নেমে গিয়ে মিশলে ওর যোগফোগ সব ভেস্তে যাবে। (অসিতকে) তোমাকে মনে রাখতেই হবে ভাই যে, তুমি এ কয় বৎসর আশ্রমে অজ্ঞাতবাস ক'রে তোমার আপনজনদের মধ্যে ফিরে এসেছ পুনর্মষিক বনতে নয়—ফিরেছ যোগী রূপে—সংসারী রূপে নয় নয় নয়। তাই যাঁরা তোমার এ-রূপের মর্ম বুঝবে তারাই তোমার সত্যিকার আপনজন জেনো, যারা তোমার কাছে সেই সাবেকী অসিতের ঠুংরি গজল শুনে তোমার সঙ্গে দহরম মহরম করতে

আসবে ভিড় ক'রে, তারা তোমার সাধন পথের সবচেয়ে বড় অন্তরায়—বিশেষ ক'রে কলকাতার পরিবেশে—যেখানে তাদের দুর্গ। আমি চাই, ওরা বরং কান্নাকাটি করুক—কেন তুমি সাত আট বৎসর যোগ ক'রে একেবারে বদ্‌লে গেছ; কিন্তু একগাল হেসে যেন বলতে না পারে: "অসিত কি আমাদের তেমন ছেলে গা? একেবারে হীরের টুকরো—দেখ না, আজও কি ঠিক তেমনি 'তু' ক'রে ডাকতে না ডাকতে সাড়া দেয়!"

সুরথদা (হেসে): মনে পড়ল বিখ্যাত রোমান রাজপুরুষ কেটোর উক্তি:

"I had rather men should say why my statue is not set up than why it is."

ললিতা (হাততালি দিয়ে): চমৎকার সুরথদা! তুমি যে কী মজার মজার কথা বলো টুক টুক ক'রে—

প্রেমল (ভ্রূকুটি ক'রে): চুপ করো ললিতা, এর নাম মজা নয়—মজানো। তপতী কালই তোমার কাছে বলেনি কি—অসিতের কে এক মামা না ভগিনী-পতি বলেছিলেন অসিতের সামনেই যে অসিত কি বদ্‌লাবার পাত্র—"Can the leopard change its spots?"

সুরথদা (হাত তুলে): ব্যস প্রেমল, ব্যস করো—আপ্তবাক্যে আছে: "ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্ মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ —তোমার আগুনের মতন বাণে বেচারী হরিণের মতন নরম অসিত তনু ছিন্নভিন্ন কোরো না। ঢের হয়েছে। ও বুঝবেই বুঝবে—আজ না হোক দুদিন বাদে—

ললিতা: কিন্তু দুদিন বাদে মানে? দাদার যে শিরে সংক্রান্তি সুরথদা!—সত্যিই গলা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গিয়েছিল পরশুদিন—একেবারে কথা কইতে পারছিল না, মনে নেই? বাপী চাইছে ওকে বাঁচাতেই বলব—বাণ হানছে তো ওর আপনজনেরাই—

ক্রিং……ক্রিং……ক্রিং

অসিত (টেলিফোন ধ'রে): কে?…সন্দীপ? হ্যাঁ, আমার জন্মদিনে সব ঠিক?…কোথায়? গড়ের মাঠে প্যাভিলিয়নে?…কে? ঝুনঝুনওয়ালা আর দবদব দেশাই?…হ্যাঁ জানি। ওঁরা গুরুদেবকে সত্যিই ভক্তি করেন…কে প্রেসিডেণ্ট?…স্যর গজেন্দ্র নারায়ণ দস্তিদার?…হ্যা তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিও।

…কী ? প্রেমল মহারাজ ?…হ্যাঁ, এখানেই আছেন…তাঁকে ডাকব ? (প্রেমল সন্ত্রস্তভঙ্গে হাত নাড়ে—"না না না")…তিনি টেলিফোনে আসেন না। তোমরা সদলবলে আসছ তাঁকে ধরতে ?…বেশ বেশ। আসবে বৈ কি। তোমরা সবাই মিলে অনুরোধ করলে তিনি কি আর "না" করতে পারবেন ?…কী ? …কী ?…of course তিনি আমার জন্মোৎসবে যোগ দেবেন এ কি আমি না চেয়ে পারি ? (প্রেমল থামতে ইঙ্গিত ক'রে হাত তোলে, কিন্তু অসিত ভ্রূক্ষেপও করে না) বটেই তো—এত বড় সাধু মহাত্মা আমার জন্মদিনে আমাকে আশীর্বাদ করতে না এলে চলে ?…হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমিও বলব বৈকি—আমার নিজেরই গরজ যে, বলব না ? বাঃ…কী ?…তোমরা এক্ষুনি রওনা হচ্ছ ?…হ্যাঁ, তিনি পথ চেয়ে থাকবেন তোমাদের জন্যে।…ধন্যবাদ।

বাইশ

প্রেমলের মুখে বিদ্যুৎবাহিনী ঘনঘটা।…খানিকক্ষণ গুম্ হ'য়ে থেকে মুখ তুলে বলল : "ওদের কেন আসতে বললে ?"

অসিত : বাঃ। ওরা যে চাইল তোমাকে ডাকতে আমার জন্মদিনে ! বলল প্যাভিলিয়ন চমৎকার সাজিয়েছে। সবাই চায়ই তোমার উপস্থিতি।

প্রেমল : চায় তো মানুষ অনেক কিছুই। তোমাকেই কি চায় না ওরা দিগ্‌দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে দ-য়ে মজাতে ?

সুরথদা : কিন্তু এ তোমার অন্যায় প্রেমল। ওরা তো শুধু অসিতের জন্মোৎসব করছে না, সত্যিই তুমেলে গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে টাকা তুলছে। আমাকে সন্দীপবাবু বলেছেন শ্রীমৎ ঝুনঝুনওয়ালা আর দবদবদেশাই দুজনে মিলে দশহাজার টাকা দিয়েছেন—আরো অনেকে চাঁদা দিচ্ছে "প্রচুর" ! ইতিমধ্যেই নাকি বিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে। ওরা চল্লিশ হাজার টাকা তুলবে পণ নিয়েছে। এ ঠিক অসিতের দশাসই দিদির জোর জুলুম আবদার নয়—অসিতের পঞ্চাশ বাৎসরিক শুভ জন্মোৎসব। এতে তুমি না থাকলে চলে ?

প্রেমল : খুব চলে। আমাকে ওরা চায় কেন ? কলকাতায় মান্যগণ্য লোকের কি অভাব আছে ? না, সুরথদা, আমি যাব না কিছুতেই। তুমি জানো—আমি কোনো সভাসমিতিতেই যাই না। মা-ও আমাকে ব'লে গেছেন

কোনো সভামঞ্চে উঠে মালা চন্দনের অভিনন্দন নেওয়া আমার পক্ষে বিষ।

ললিতা: কিন্তু এখানে ব্যাপারটা তো ঠিক সভাসমিতি মালাচন্দনের নয় বাপী! ওঁরা তোমাকে বঁধুবরণ করতেও তোমার কাছে দরবার করছেন না। চতুর্দোলের ব্যবস্থা হয়েছে কেবল দাদার জন্যে। তোমাকে গিয়ে বসতে হবে শুধু সভা-উজ্জ্বল সাধুজি হ'য়ে—সবাই বলবে: "আহা, দেখরে মরি মরি! নয়ন ভ'রে দেখ!—কেমন খাস সাহেব এসেছে হিঁদু সন্নিসি হ'য়ে অসিতের জন্মদিনে তাকে আশীর্বাদ করতে!" তুমি নন-কোঅপারেট করলে এমন রোমান্টিক ড্রামা গ'ড়ে উঠবে কী ক'রে শুনি?

প্রেমল: ঠাট্টা রাখো ললিতা। আমি এখন ঠাট্টার মুডে নেই—বিষম রেগে গেছি।

অসিত: সাধুর কি রাগ করতে আছে ভাই? তুমি গিয়ে শুধু ভজন শুনবে বৈ তো নয়।

প্রেমল: ভজন? সেখানে রকমারি গান হবে—শাঁক, সানাই, উলু-উলু, ব্যাণ্ড—

অসিত: না। কিচ্ছু হবে না। Even the devil is not as black as you paint him, বন্ধু! আমি ওদের বলেছি—আমি আজে বাজে লোকের বক্তৃতা চাই না। শুধু আমাদের আশ্রমের একজন সাধক বলবেন গুরুদেবের আদর্শ সম্বন্ধে খানিকক্ষণ। তারপর আমি গাইব ও শেষে দু চারটে কথা বলব গুরুদেবের সম্বন্ধে। ওরা চাইছে আমার আগে তুমিও কিছু বলো।

প্রেমল (তড়পে উঠে): আমি? সভায় বক্তৃতা? তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি?

ললিতা: বালাই! ক্ষেপে যাবে কেন? তুমি বলবে দুটো ভালো কথা বাপী, হরি কথা—যা ওরা কস্মিনকালেও শুনতে পায় না—বিশেষ ক'রে টোয়ান্টি-ফোর-ক্যারাট-গোল্ড সাধুর মুখে।

প্রেমল (সব্যঙ্গে): ফুঃ! বক্তৃতা দিতে দিতে nil carat gold বক্তাই হ'য়ে উঠব—সাধু আর থাকব না, মনে রেখো।

ললিতা: ঈ-শ্! ব্রজনন্দিনী মা-র শিষ্য, শ্রীমস্তিনী ললিতা দেবীর গুরু

—সর্বত্যাগী—কী বলে যেন? হ্যাঁ—পরম ভাগবত—এহেন মহাজন ছুটো বক্তৃতা দিতে না দিতে রাতারাতি অসাধু ব'নে যাবেন? কলিরও সাধ্য নেই—তা, ঝুনঝুন দবদব সভাসদরা তো কোন্ ছার। সিংহকে কেউ মিঁউ মিউ করাতে পারে? করে নামগর্জন।

প্রেমল (রাগ সত্ত্বেও হেসে ফেলে): না। কিন্তু আমি তো এখানে গর্জন করতে আসি নি। এসেছি তোমার চিকিৎসার জন্যে।

ললিতা: খুব খাসা কাজ করেছ। কিন্তু তাই ব'লে দাদার জন্মোৎসবে তুমি যাবে না—এ কি একটা কথা হ'ল বাপী? না, শোনো বাপী। এ ঠাট্টা না। তুমি জানো—দাদার হৈ চৈ দহরম মহরম রঙ্গরাগে আমাদের কারুরই মনের সায় নেই। এইমাত্র আমরা একজোটে চড়াও হ'য়ে বেচারীকে কী দুর্দান্ত ধম্‌কেছি আর ও মুখ বুজে শুনেছে—এও দেখেছ স্বচক্ষেই। এজন্যে ওকে একটু তারিফ করলেও কিছু ভাগবত অশুদ্ধ হবে না। তোমাকে কেউ এর সিকি পরিমাণ ধমক দিলেও কি তুমি পারতে স'য়ে থাকতে? তাছাড়া একটা কথা ভুলো না: দাদা কলকাতায় ওর আত্মীয় স্বজনের অগুন্তি মৌচাক ছেড়ে এত দূরে এসে রয়েছে নিরালায় কেবল তোমার টানেই তো। নৈলে ও পরমানন্দেই আশ্রয় নিত ওর অজস্র দাদা দিদি মাসি পিসিদের কোনো না কোনো মৌচাকে। দিনের পর দিন বেচারী এখানে ভজন করছে—ওর হাজারো "ফ্যান"-দের এড়িয়ে—শুধু তোমার খাতিরেই। মাত্র একটি দিন ওর বন্ধু ও গুরুভাইরা মিলে লোকজন ডেকে ওর জন্মোৎসব করতে চায় এতে অন্যায় কি হয়েছে শুনি—বিশেষ যখন সে-উপলক্ষে ওরা গুরুদেবের আশ্রমে প্রণামীর ব্যবস্থা করেছেন?

প্রেমল: আমি কি বলেছি—অন্যায়?

ললিতা: বানান ক'রে না বললেও যা বললে তার মোদ্দা কথাটা তা-ই দাঁড়ায় না কি? সভা সমিতি, শাঁক সানাই, মালাচন্দন, গণ্যমান্যদের গাঁদি—সবই বিষ এই ধরণের একটা ইঙ্গিত করো নি বলতে চাও? কিন্তু মরুক গে—এসবই খতিয়ে অবান্তর। আসল প্রশ্নটি হচ্ছে—ওঁরা তোমার কাছে যা চাইছেন তা কোনো 'টোয়েন্টি ফোর ক্যারাট গোল্ড্' সাধুর কাছে চাওয়া চলে কিনা? তুমি বলছ—'না, চলে না', আমরা বলছি—'হ্যাঁ, চলে।' কারণ ভেবে দেখ—তোমার কাছে ওঁরা ঠিক কী চাইছেন? চাইছেন কি—তোমাকেও দাদার

সঙ্গে মালাচন্দন অভিনন্দন নিতে হবে—বক্তৃতা কি ভাষণ দিতে হবে? তাঁরা চাইছেন তবু তোমার শ্রীমুখে দুটো হরিকথা শুনতে তাতেও যদি তোমার ঘোর আপত্তি থাকে, বেশ হরিকথাও না হয় নাই শোনালে। কিন্তু কলকাতায় উপস্থিত থেকেও দাদার জন্মদিনে তার সত্যিকার বন্ধুদের এত-যত্ন-ক'রে-গ'ড়ে-তোলা উৎসব সভাকে তুমি বয়কট করলে তার মনে কতখানি আঘাত লাগবে একটিবারও ভেবে দেখেছ কি? তোমার কাছেই শুনেছি বাপী—আর একবার নয় বারবারই—যে, মনগড়া নীতিবাদ প্রিন্সিপ্‌ল্‌ তুমি মানো না—মানো কেবল 'গুরুবাক্য, আর অন্তরে অন্তর্যামীর নির্দেশ।' এ-অন্তর্যামী তোমাকে কি সত্যি এই নির্দেশ দিয়েছেন বলতে চাও যে, দাদার জন্মোৎসবে তুমি উপস্থিত থেকে তার আনন্দের দেয়ালি জ্বালালে তুমি যোগভ্রষ্ট হবে? ভেবে দেখ—তুমি ওর সভায় উপস্থিত থাকাটা বহু শুদ্ধাচারী ভক্তিমান্‌ ভক্তিমতী কী ভাবে গ্রহণ করবেন। তাঁরা বলবেন না কি গদ গদ কণ্ঠে—"দেখ্‌ রে, নয়নভ'রে দেখ্‌—কতবড় একজন সর্বত্যাগী মহাজন এসেছেন এ-সভাকে পবিত্র করতে!"

প্রেমল (আঙুল তুলে শাসিয়ে): ফে-র!

ললিতা: আচ্ছা, যেতে দাও। নাহয় তাঁরা বলবেন (তোমার মন রাখতে) যে, দাদার এক সাধু বন্ধু এসেছেন তাঁর ভজন শুনতে। এতে তো তোমার আপত্তি নেই! বেশ, তাই শুনবে।

প্রেমল: অসিতের ভজন কি আমি রোজ সকাল সন্ধ্যা শুনি না ঠাকুর ঘরে?

তপতী (করজোড়ে): সাধুদা! আমি একটা কথা বলতে পারি কি?

প্রেমল (নরম স্বরে): পারো বৈ কি মা। তোমার কথার দাম আমার কাছে খুবই বেশি—বিশেষ ক'রে অসিতের সম্পর্কে—কারণ তুমি আজ ওর শিষ্যা হ'য়ে এসেছ ওকে আগলাতেই বলব।

তপতী: অমন কথা বলবেন না সাধুদা। আমার কতটুকু সাধ্য বলুন? আমি শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। দিদির কাছেই শুনেছি—মা নাকি প্রায়ই বলতেন—তাঁর তিনটি ছেলে—অসিত, প্রেমল, প্রণব। আপনি কি মনে করেন আজ তিনি কলকাতায় থাকলে খুশী হতেন আপনি দাদাজির জন্মোৎসবকে বয়কট করলে?

প্রেমল (হেসে ফেলে, দু হাত তুলে): এবার হার মানতে হ'ল: capitulation ! মুঠোর মধ্যে পেয়ে সবাই মিলে জোট বেঁধে আমাকে সভায় smuggle—হোক, আমি যাব—কেবল তিনটি সর্তে: এক, আমাকে সভামঞ্চে বসাবে না মালাচন্দন দিতে; দুই, আমার নাম খবরের কাগজে ছাপা হবে না; তিন, তুমি "বৃন্দাবনের লীলা" গাইবে।

অসিত (সোৎসাহে দুহাত তুলে): রাজি—all along the line !

ললিতা (সুর ক'রে): জয় জয় জয় হরিনাম—শান্তির কী যে আরাম! দাদা ভাই, শান্তিপাঠে গাওনা তোমার ঐ গানটি: হরিনাম কর অনিবার—যেটি আমাকে আর তপতীকে পরশু শেখাচ্ছিলে। আমরাও দোয়ার দেব-- (তপতীকে) কেমন ভাই ?

তপতী: নিশ্চয়। (ব'লেই এগিয়ে গিয়ে প্রেমলকে প্রণাম ক'রে) আপনি দাদাজির জন্মোৎসবে যাবেন শুনে কী যে আনন্দ হচ্ছে সাধুদা! আর কেন হচ্ছে বলব ?

প্রেমল (ওর মাথায় হাত রেখে হেসে): বলবে বৈ কি মা! এইমাত্র বলি নি কি তোমার সায়-এর দাম এক্ষেত্রে আমার সম্মতিকেও ছাড়িয়ে যায় ?

তপতী (ফের পায়ের ধুলো নিয়ে): ছি ছি, অমন কথা বলে? কোথায় আমি আর কোথায় আপনি? আমার সায়-এর মূল্য শুধু এইটুকু যে, আমি দাদাজির মধ্যেকার সাধকটিকেই মালাচন্দন দিয়েছি, তাঁর প্রতিভা, রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধিকে নয়। চাই আমি তাঁকে সেবা করতে—তাঁকে গুরুবরণ ক'রে—যেমন তিনি করেন তাঁর গুরুদেবকে। কিন্তু আপনি তাঁর জীবনে একটি আবির্ভাব সাধুদা! আমি যতদূর বুঝেছি—তাঁর মনে একটা চাপা দুঃখ আছে—গুরুদেবকে তিনি ভক্তি করলেও অন্তরঙ্গ ব'লে বরণ করতে পারেন নি এখনো। কিন্তু আপনি তাঁকে কাছে টেনেছেন গাঢ় নির্মল—দিদির ভাষায়—টোয়েন্টিফোর ক্যারাট গোল্ড্ স্নেহের চুম্বকে। তাই হয়ত যে আশ্বাস গুরুদেবের মুখে শুনলেও তাঁর সংশয় কাটে না সে-আশ্বাস আপনার মুখে ফুটলে তাঁর হৃদয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠে, আর ওঠে এইজন্যেই যে, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও খানিকটা ছদ্মবেশী বিবেকের মতন হ'য়েই এসেছেন। এ আমার ছোটমুখে বড় কথা জানি সাধুদা! তবু না ব'লে থাকতে পারছি না যে, আপনি দাদাজির জন্মোৎসবে যাবেন বলাতে আনন্দে আমার বুকের সব তার গুলিই বেজে উঠেছে। আপনি তাঁর জন্মোৎসবে থাকবেন

এ-আশ্বাসকে আমি সত্যিই মনে করি ঠাকুরের কৃপায় ভরসা—না, symbol-ই বলব: যে, আপনিও আছেন ওঁর পিছনে। এই জন্যেই আমি আপনাকে প্রণাম্ করেছি—বরণের মালাচন্দন দিতে চেয়েই বলব।

বলতে বলতে চোখের জলে তপতির শেষ কথাগুলি স্তিমিত হ'য়ে আসে। ললিতাও আঁচলে চোখ মোছে। সুরথদা মুখ ফিরিয়ে চোখে অশ্রু আভাষ গোপন করেন। প্রেমল সস্নেহে তপতীর মাথায় হাত রাখে। অসিতের চোখেও জল ভ'রে আসে কিন্তু দাবিয়ে রেখে গান ধরে—ললিতাও তপতী দোয়ার দেয়:

হরিনাম কর অনিবার মরণের দুর্লগনে,
জপিলে অমরতার পাবি বর এইজীবনে।
কেন তুই ভাবিস ভোলা: হরিনাম চায় না কেউ আর?
দিয়ে যা নামের দোলা শুধু তুই চিত্তে সবার।
নামে যার ধরায় জাগে আলো রোজ বুকে বুকে,
প্রাণে তার ঢেউ যে লাগে পুলকের যুগে যুগে।
শোনে বা না শোনে—যা ছড়িয়ে নামের সুধা:
বীজ তুই যা বুনে যা— ফলে যার মেটে ক্ষুধা।

* * *

প্রেমল আর অসিত এক ঘরে শুত, ললিতা ও তপতী পাশের ঘরে। সেদিন রাতে ঘণ্টা দুই ধ'রে গুরুদেবকে এক ষোলো পৃষ্ঠা চিঠি লিখে রাত পৌনে বারোটায় অসিত প্রেমলকে বলল: "চিঠিটা শুনবে ভাই?" প্রেমল মাটিতে কুশাসনে ব'সে ভাগবত পড়ছিল, বই রেখে মাদুরের বিছানায় শুয়ে প'ড়ে হেসে বলল: "শুনব বৈ কি। এখন যে তুমি আরো সমব্যথী ভাই! শুধু গুরুকরণই তো নয় শিষ্যাকরণও হয়েছে।—আর এমন শিষ্যার মতন শিষ্যা—সত্যি অসিত, তুমি ভাগ্যবান। মানতেই হবে।"

তেইশ

ওরা পাশাপাশি শুত মাটিতেই কম্বলশয্যায়। প্রেমল নরম তোষকের উপর শোওয়া ছেড়ে দিয়েছিল দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কাজেই অসিতকেও

কলকাতায় কম্বলশয্যায়ই শুতে হ'ত। অন্যত্র হ'লে এতে সে অস্বস্তি বোধ করত বৈ কি। কিন্তু প্রেমলের পাশে শুয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে পরমানন্দে তার মনের যেন পাখা উঠত—কঠিন শয্যা তার কী করবে যে বিছানায় শুয়েও হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়? কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ আনন্দ পাওয়া যায় এ-সত্য অসিত কোনদিন ভাবতেও পারে নি। প্রেমলের সান্নিধ্যে এসে—বিশেষ ক'রে কলকাতায়—সে প্রথম এ-আশ্চর্য সত্যটিকে আবিষ্কার ক'রে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল—সে-কথা গুরুদেবকে বেশ ফলিয়েই লিখেছিল প্রথম দিকেই।

অসিতের চিঠির প্রথম পাতাটি শুনতে না শুনতে প্রেমল হেসে বলল: "আমার সম্বন্ধে একী সব উচ্ছ্বাস করেছ বলো দেখি? শেষ পর্যন্ত এইভাবে কলম চালিয়েছ না কি? তাহ'লে ধন্যবাদ, আমি এখন নিদ্রাদেবীর শরণ নেব তোমার হাত থেকে বাঁচতে।"

অসিত (হেসে): না না শোনোই না—শুধুই উচ্ছ্বাস কেন হবে? কঠিন তর্কাতর্কি—তোমার তর্জনগর্জন—ললিতার হাসিঠাট্টা কিছুই বাদ দিই নি। যোগী হ'য়ে উচ্ছ্বাসী হ'লে চলতে পারে, কিন্তু অধৈর্য হ'লে চলে না—এ আমার কথা নয় দাদা, সাক্ষাৎ গীতায় ধমকেছেন খোদ কর্তা!

প্রেমল এক গাল হেসে বলল: "আচ্ছা। Quits-go on!"

চিঠি পড়া শেষ হ'তে প্রায় আধঘণ্টা লাগল। প্রেমল খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল: "তোমাকে আজ অনেক ধমকেছি ভাই। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই চাই। আমি সত্যি থ হ'য়ে গেছি তোমার স্মৃতিশক্তি দেখে।"

অসিত (পুলকিত): বহু ধন্যবাদ।

প্রেমল: না ভাই এ কথার কথা নয়। শুনেছি শ্রী-ম-র অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। জানি না। কিন্তু তুমি যে ভাবে আমাদের তর্কাতর্কি হাসিঠাট্টা প্রশ্ন-উত্তরের অনুলিপি লিখেছ এ যেন—কী বলব—ছবি ছবি—ঐ কথাটাই খুঁজছিলাম। চিঠিতে এ-দুই কৃতিত্ব—স্মরণশক্তি আর অঙ্কনশক্তি—সত্যি অসিত ফের বলছি—আমি অবাক হ'য়ে গেছি। কেবল একটি কথা বলতেই হবে। আমার তর্জন গর্জনকে তুমি যে-ভাবে ফুটিয়েছ তাতে আমি নিজে একটু যেন—কী বলব!—চম্‌কে উঠেছি।

অসিত (বিস্মিত): চম্‌কে?

প্রেমল: হ্যাঁ। কারণ আমার মনে হচ্ছে—আমি হয়ত অজান্তে খানিকটা

moralist গোছেরই হ'য়ে পড়ি তোমাকে ধম্‌কাবার পরমানন্দে। ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হ'তেই হবে—নীতিবাদের পাঠ দিলে চলবে না। কারণ গুরুদীক্ষায় আমি যদি শেষটায় ফুলটি হ'য়ে ফুটতে না পেরে বোলতা হ'য়ে হুল ফোটাতে সুরু করি, তাহ'লে মা বৈকুণ্ঠেও উশখুশ করা সুরু করবেন তাঁর দুলালের দুর্গতি দেখে। কিন্তু যাক গে এ-ঠাটা। তোমার চিঠি প'ড়ে আমার আর একটি কথা মনে হয়েছে। সে কথাটি বলেই এবার ঘুমব—রাত হ'ল প্রায় একটা—তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে আজকাল এত রাত হ'য়ে যায় যে ব্রাহ্মমুহূর্তে ওঠা হয় না।

অসিত : এ-ও তো নীতিবাদেরই সগোত্র।

প্রেমল : না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে ধ্যান ভারি জমে।

অসিত : আমার ঘুম আরো বেশি জমে।

প্রেমল : প্রগল্‌ভতা ঢের হয়েছে, শোনো। যে-কথাটা বলতে চাই সেটা বলার ম'ত। কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনতে হবে তোমাকে। (একটু থেমে)।

আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে তোমার চিঠিতে তপতীর ছবি। ওর ফটো দেখে ললিতারও ভালো লেগেছিল—প্রথমেই। কিন্তু এ-কয়েকদিনে ওর যে পরিচয় পেয়েছি—তাতে সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছি। তোমাকে ভাগ্যবান্‌ ব'লে চিনেছি আমি অনেক দিনই। আজ তোমার ভাগ্যে এখন শিষ্যার আবির্ভাব হ'তে সে-ধারণা আমার আরো পাকা হ'ল। না, এ কথার কথা নয়। এদিক দিয়ে আমিও ভাগ্যবান্‌—তাই জানি এ-ভাগ্যের মূল্য। তবে কি জানো? আরো অনেক শব্দের মতন ভাগ্য বললে অনেক সময় ভুল বোঝানো মতন হয়। বলা উচিত—করুণা। তুমি ঠাকুরের করুণায় পেয়েছ কত সাধুসন্তের স্নেহ ও আশীর্বাদ! সদ্‌গুরুও পেয়েছ তাঁরই বরে। কিন্তু এমন কন্যাশিষ্যা—daughter disciple—ভাগ্যবান সাধকদের কপালেও খুব বেশি জোটে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও এসেছে তোমার পথের নানান্‌ বাধা কাটাতে। তাই তোমাকে আজ দুটি কথা বলতে চাই বিশেষ ক'রে। অবহিত হও।

প্রথম কথাটা এই যে, করুণা আমরা প্রায়ই পাই, কিন্তু করুণা পাওয়ার যে দায়িত্ব আছে এই গোড়াকার কথাটা ভুলে যাই ব'লেই করুণা পেয়েও অনেক সময়ে

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি। তাই তোমাকে বলা যে, তপতীকে তুমি যে পেয়েছ ঠাকুরের করুণায়—এই কথাটি ভুলো না কোনোদিন। মানে, don't take her for granted ; ওর জন্যে তোমাকে যে সব আত্মীয় স্বজনেরা তোমার প্রতি বিমুখ হবেন, তুমি ধ্রুব জেনো—তাঁরা তোমার সত্যিকার শুভার্থী নন। তোমার সত্যিকার শুভার্থী হবে কেবল তারাই যারা তপতীকে শুধু শ্রদ্ধাই না, সাদরে বরণ ক'রে নেবে। এই হ'ল আমার প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে, যেমন পিতাপুত্রের চেয়ে মা-ছেলের সম্বন্ধ বেশি মিষ্টি—তেম্‌নি গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের চেয়ে গুরু শিষ্যার সম্বন্ধ বেশি অন্তরঙ্গ হ'য়ে থাকে। এর কারণ : সত্যিকার শিষ্যা আমাদের সাধনার সহায় হয় শুধু তার নিষ্ঠার গুণে নয়, তার মাতৃস্নেহের প্রসাদে। একথা সবাই জানেন যে, বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হ'লেও স্নেহে ও প্রেমে মেয়েরা বড়। তপতীর চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার এ কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে—মিলিয়ে নিও যখন আমি থাকব না।

অসিত : এ আবার কী সুরেলা আলাপে বেসুরোর হুম্‌কি ?

প্রেমল (এড়িয়ে গিয়ে) : সে আর একদিন বলব—সময় হ'লে। এখন শোনো—আমার কথাটা শেষ করতে দাও। আমি বলতে চাইছি—তোমার মধ্যে যে ভক্ত ও বৈরাগী আছে—(যাকে তোমার চার ডজন "তুত" ভাই বোনেরা আর তিন ডজন মাসি পিসি মামা মেশোরা চিনতে পারেন নি, পারবেনও না কোনোদিন)—সে-মানুষটিকে তপতী এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছে ব'লেই ওকে আমিও চিনতে পেরেছি তোমার খাঁটি কন্যাশিষ্যা ব'লে। তাই বলছি—ওকে তুমি তোমার মনঃশক্তির প্রসাদ দিও আর ওর কাছ থেকে নিও ওর স্নেহশক্তির প্রসাদ। অন্য ভাষায়, তোমার কাছ থেকে ও পাবে জ্ঞানের নানারঙা আলো, আর ওর কাছ থেকে তুমি পাবে ভক্তির রকমারি রস।

অসিত : জ্ঞান ? কিন্তু আমার জ্ঞান কোথায় ভাই ? তোমাকে যতই দেখি ততই একথা মনে হয়।

প্রেমল : বাজে বোকো না। জ্ঞান তোমার যথেষ্ট আছে। কেবল খবর নেই। জ্ঞান না থাকলে তুমি কি যত্র তত্র সাধুদের এত শত প্রশ্নবাদ করতে না সে-সব প্রশ্নের অনুলিপি লিখে এমন গভীর আনন্দ পেতে ? একথা মানি যে ভক্তিই তোমার প্রাণের মুখ্য উপজীব্য। কিন্তু জ্ঞানও তুমি প্রতি পদে খোঁজো,

যদি না খুঁজতে তাহ'লে উঠতে বসতে এত রকম সংশয় তোমাকে পেয়ে বসতে পারত না, নিজের প্রতি অনাস্থা তোমাকে এত ভোগাতেও পারত না। এই আত্মসংশয় কাটাতে তুমি এত বেগ পাও ব'লেই আরো তোমার কাছে ওকে আসতে হয়েছে তোমার সাধনার এ-গর্ভাঙ্কে। এ-ও তুমি পরে মিলিয়ে নিও। কিন্তু একদিক দিয়ে এসবই খানিকটা অবান্তর। কথা হচ্ছে এই যে, সাধনার পথ সুদীর্ঘ। বর্তমান যুগের প্রভাব বা আবহ সাধকদের সাধনার অনুকূল নয়। তাই আমাদের পথ চলতে সহযাত্রী চাই-ই চাই। আশ্রমের মন্দ দিকটাই তোমার বেশি চোখে পড়েছে—এ-মন্দ দিকটা আছে এ-ও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আশ্রমের একটা ভালো দিকও আছে এই যে কেবল সেখানেই দরদী ও সহযাত্রীরা হাত তথা কাঁধ মেলাতে পারে—যা আত্মীয় স্বজনের রাজধানীতে পারে না। তোমাদের আশ্রমে তুমি ওকে নিয়ে যেও। তোমার গুরুদেব ওকে গ্রহণ করেছেন শুনে আমি যে কতখানি নিশ্চিন্ত হয়েছি বলতে পারি না। কারণ আমি জানি—এর ফলে তোমার আশ্রম-জীবনও আর তেমন নীরস থাকবে না। তবে তপতীকে তুমি সত্যি চিনতে পারবে—যেদিন তোমার নিজের আশ্রম গ'ড়ে উঠবে। এ-ও হবেই হবে জেনো—আশ্রম তোমাকেও গড়তেই হবে—তুমি হাজার travel light মন্ত্র আওড়াও না কেন। আর সেদিন তুমি নতুন চোখে দেখতে পাবে যে, ওর কাছ থেকে তুমি আনন্দের খোরাক আহরণ করার দিকেও কিছু কম লাভ করো নি। একথা আমি এত জোর দিয়ে বলছি ললিতাকে পেয়ে কিসে কী হয় দেখেছি ব'লে। তৃতীয় বা শেষ কথাটি এই যে, তোমার গুরুদেবের দেহরক্ষার পরে যখন তুমি গভীর নিরাশায় পড়বে—কিছু মনে কোরো না ভাই একথা বলছি ব'লে, কারণ এ-ও অবশ্যম্ভাবী—তখন তোমার সবচেয়ে বড় আশ্রয় হ'য়ে উঠবে এই মেয়েটি যে আজ তোমার কাছে আশ্রয় চাইছে। (হেসে) আমার লেকচার লম্বা হ'য়ে গেল—যেমন প্রায়ই হয়। তাই শেষ করি এবার—আর একটিমাত্র কথা ব'লে। কথাটি এই যে, ওর কাছে তুমি যে-আশ্রয় পাবে তার মধ্যে দিয়েই ওকে তোমার আশ্রয় দেওয়াটা সম্পূর্ণ হবে—যাকে আমরা বলি বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়া। একে জীবনেরই একটি বিধান—law বলা চলে। যথা, বাপ-মা যে সন্তানকে আশ্রয় দেন সেই পরে তাঁদের আশ্রয় দেয়। গুরু শিষ্যার অন্যোন্যতা—mutuality—আরও গভীর স্নিগ্ধ ও সার্থক। তাই তুমি ওকে বরণ ক'রে নিও তোমার আত্মার

আত্মীয়া ব'লে—আর যারা ওকে এভাবে বরণ ক'রে নিতে পারবে না তাদের ছায়াও মাড়িও না। মনে রেখো—কৃপাকে কৃপা ব'লে চেনাই যথেষ্ট নয়, তাকে গ্রহণ করা চাই নতজানু হ'য়ে—on bended knees : ব্যস, আর লেকচার না। এবার ঘুমের পালা। জানো তো—"ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।" জয় গুরু।

চব্বিশ

অসিতের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ ক'রে শেষে সন্তর্পণে উঠে গিয়ে বসল গঙ্গার ঘাটে।

গঙ্গা গঙ্গা গঙ্গা! কেন চিরদিনই গঙ্গা ওকে এত টানে? ঘাটে বসতেই যেন সব চিন্তা থিতিয়ে এল। স্নিগ্ধ দখিণ হাওয়ায় ওর তপ্ত কপাল জুড়িয়ে গেল। দশমীর চাঁদ গঙ্গার ঝিকিমিকি বুকে তার সোনার আঁখরে কী বলতে চাইছে? থেকে থেকে হঠাৎ-জাগা জোয়ারের মৃদুমধুর কলধ্বনিতে মনে কী অপার শান্তি বিছিয়ে যায় যে! ও প্রণাম করে জীবনবিধাতাকে যিনি পুণ্য দক্ষিণেশ্বরের তটচুম্বিতা ভাগীরথীর কূলে ওর জন্মভূমির নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রেমলের কথা মনে পড়ে : "করুণাকে সজাগ হ'য়ে করুণা ব'লে বরণ ক'রে না নিলে তাকে মান দেওয়া হয় না।" মন ওর আজ ভ'রে গেছে। গুন গুন ক'রে ফের ধরে নাম গানটি : "হরিনাম কর অনিবার মরণের দুর্লগনে।" গাইতে গাইতে আরো কয়েকটি চরণ ভিড় ক'রে আসে—ঠিক যেন কে গাইছে আর ও শুনছে···তাই না? তাই তো! ওর অঙ্গে শিহরণ জাগে, ও গেয়ে চলে—গাইতে গাইতেই গানটি মুখস্থ হ'য়ে যায়—ওর স্মৃতিশক্তি—এও তো তাঁরই দান।—কোনটাই বা নয়? ও গায় :

কেন তুই এত শত ভাবনার গাঁথিস মালা?
পেলি যে নামের ব্রত প্রাণে তার প্রদীপ জ্বালা।

চিরদিন যার করুণায় প্রণয়ের বাজে বাঁশি,
তরু তৃণ তপন তারায় তাঁরি তো হাসি রাশি!

জয় জয়! তার মধুনাম গেয়ে যা আপন হারা,
বিলিয়ে যা অবিরাম স্থর তার বিশ্বে সারা।

নামী-সে দেখা দেবেই সাধলে নামভজনে,
তার আপন ক'রে নেবেই লুটালে তার চরণে॥

বারবার নানা আঁখর দিয়ে কীর্তনটি গাইতে গাইতে ওর মনে হ'ল যেন আকাশগঙ্গার আশীর্বাদ ওর প্রাণের তারে বেজে উঠছে প্রতি মিড়ে গমকে তানালাপে।

ওপারে চাঁদের আলোয় দেখা যায় পুণ্য দক্ষিণেশ্বরের আলোক মন্দির। আলোকমন্দিরই বটে—তথা আলোক স্তম্ভ এ-আঁধার জগতে। Lighthouse, lighthouse, lighthouse! মনে পড়ে প্রেমলের একটি প্রিয় উক্তি: "এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যে ভারতবর্ষকে বুঝতে চাইবে সে ভুল বুঝবে, কারণ তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষের ভুলে যাওয়া আত্মিক সত্যের সঙ্গে আমাদের ফের মুখোমুখি ক'রে নিজেকে চিনিয়ে দিতে।"

বুকের মধ্যে ওর অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। ওপারের মন্দিরকে এপার থেকে প্রণাম ক'রে ফিরে গিয়ে সন্তর্পণে শুয়ে পড়ে প্রেমৈকান্ত বন্ধুর পাশে।

পঁচিশ

পরদিন সকালবেলা উঠে গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকুর ঘরে ঢুকে জপ করতে বসবে এমন সময়ে ললিতা ঢুকল ঘরে—মহানন্দে। পিছনে তপতী।

"দাদা! দাদা! বলিনি তোমাকে যে এ মেয়ে সামান্যি নয়। কে জানে হয়ত তোমাকেও ছাড়িয়ে যাবে!"

তপতী (লাল হ'য়ে): কী যে বলো দিদি! কোথায় দাদাজি—কুলীন কবি, আর কোথায় আমি এক কাঁচা novice!

ললিতা: দিদি, আমাকে যত মুখ্যু ঠাউরেছ আমি ঠিক তত মুখ্যু নই। প্রণবদার ভাষায়—I am not the fool I look: তুমি যে গান শুনলে সে শুধু যে গান হিসেবে চমৎকার তাই নয়—তোমার দাদাজিটিকে বাপীও এমন চুটিয়ে ধমকাতে পারত না।

তপতী (রাগতঃ): যাও দিদি, তোমার কাছে আর যদি কখনো কিছু বলি!

এই সময়ে হাতে ফুল নিয়ে তিলকধারী প্রেমলের অভ্যুদয়।

প্রেমল: ব্যাপার কী? ব্যাপার কী? কাল রাতে চোর এসে তোমাদের সব শাড়ী নিয়ে চম্পট দিয়েছে নাকি?

ললিতা: না বাপী। চোর এসেছিলেন ঠিকই। তবে এত চুপি চুপি যে তাঁকে আমি দেখতে পাইনি। কেবল তপতী তাঁকে পাকড়াও করতে যেতে তিনি ওর কাছে গানের একটি পুঁটলি ফেলেই চম্পট দিয়েছেন।

প্রেমল: গানের পুঁটুলি? (তপতীকে) ব্যাপার কী মা?

তপতী (ললিতাকে): তুমিই বলো দিদি।

ললিতা: এ তো খাসা কথা ভাই, বলতে লজ্জা কি? তোমার কথা তোমার মুখে শোনাই ভালো—নইলে দাদার কাণ্ড তো জানো—সন্দেহ করবে, বলবে hearsay, ডিশমিশ!

প্রেমল: হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বলো মা! গান শুনেছ? প্রেরণা?

তপতী: তা জানি না সাধুদা। কেবল এইটুকু বলতে পারি—কাল শেষরাতে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল দাদাজির দিদি ও এক মাসিমার বচনে। কেঁদে ঠাকুরকে ডাকছি—যেন দাদাজির সেবা করতে এসে তাঁর ভার হ'য়ে না দাঁড়াই—এমন সময়ে হঠাৎ কেমন যেন ঘোর মতন এসে গেল। তারপর দেখলাম—অনেকদিন বাদে—সেই সন্ন্যাসিনীকে যিনি জব্বলপুরে আমার রোগশয্যায় দিনের পর দিন আমাকে তাঁর নানা গান শোনাতেন। ধ্যানে এ-গানগুলি শুনলেও জাগার পর আমি শুনতাম না একটি কথাও—কোনদিনই না। দাদা খুবই আশ্চর্য হ'তেন আমার স্মৃতি শক্তির দৌড় দেখে (হেসে) কারণ এ তিনিও পারতেন না তো—

অসিত: সত্যি তপতী, বিশেষ ক'রেই আশ্চর্য লাগত যখন তুমি বিশ পঁচিশ লাইন গান আবৃত্তি ক'রে যেতে সমানে।

ললিতা: একটি গান তুমি পাঠিয়ে ছিলে দাদা—"পূজা করনে আই পূজারিণ—তোমার অনুবাদ শুদ্ধ॥ কী চমৎকার গান যে, আহা! গানটি তোমার মনে আছে বাপী?

প্রেমল: খুব আছে। (হেসে তপতীকে) জানো, আলমোরায় এক

এক সময়ে যখন আমার ঘুম পেত—বিছানায় শুয়ে জপে মন রাখতে পারছি না, শুনতাম পাশের ঘরে ললিতা গাইছে এই গানটি, অমনি আমার জপে মন ব'সে যেত—আর ঘুম যেত পিছিয়ে, অন্ততঃ তখনকার মত।

অসিত: তাহ'লে দেখেছ তো গান কেমন সহায় হ'তে পারে মহাযোগীর যোগেও?

প্রেমল: ঠাট্টা রাখো, আমি শুনতে চাই তারপর কী হ'ল। বলো তো মা? রোসো, একটা কথা: ইনি কি তোমাকে শুধু গানই শোনাতেন, না তোমার সঙ্গে কথাও কইতেন?

তপতী: না, কথা কইতেন না। তবে কাল যখন আমি তাঁকে ধ'রে পড়েছিলাম—"আমাকে বলতেই হবে আপনি কে?" তখন তিনি শুধু বলেছিলেন: বলব—সময় হ'লেই"—ব'লে সমানে গেয়েই চললেন।

প্রেমল: তারপর?

তপতী: গানটি শেষ হ'তেই তিনি মিলিয়ে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমার ধ্যান—বা ঘোর বলাই ভালো—ভেঙ্গে গেল। ওমা! পায়ের কাছে এক ফালি সূর্যের আলো! দেরি হ'য়ে গেছে ভেবে তাড়াতাড়ি উঠতেই দেখি দিদি গঙ্গাস্নান সেরে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গুনগুন ক'রে গাইছেন: "গোবিন্দ জয় জয়······" আমি তখন তাঁকে সব বললাম। তিনি মহানন্দে শুধু গানটি টুকে নেওয়াই নয়—তক্ষনি ব'সে অনুবাদ করলেন—কী চমৎকার যে!

অসিত: বটে! দেখি—

প্রেমল (তপতীকে): না তুমি গেয়ে শোনাও।

তপতী: হা অদৃষ্ট! আমার কি সুর মনে থাকে যে গেয়ে শোনাব সাধুদা? শুধু এক আধটা মিড় মনে আছে—কিন্তু শুধু মিড় তো আর গেয়ে শোনানো যায় না।

অসিত: কিন্তু গান আর অনুবাদটা প'ড়ে শোনানো তো যায়—(ললিতাকে) দেখাও না দিদি!

ললিতা (হাতের খাতা খুলে): হুঁ হুঁ, এনেছি খাতা তোমাদের চম্‌কে দিতে। আবহমানকাল কেবল গুরু মহাপ্রভুরাই বেচারা শিষ্য শিষ্যাদের চমকে দিয়ে দুলকি চালে চ'লে এসেছেন, কিন্তু শিষ্যা বেচারীরা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছে না কি যে, কোনোদিনও শোধ তুলবে

না? তাই তো শুধু হিন্দি ভজনটিই না, তার তর্জমাটিও এনেছি আমি সাক্ষাৎ কবি ললিতা দেবী—হুঁ হুঁ—তোমাদের চমকে দিতে। শোনোই না! (তপতীকে) এবার হিন্দিটা তুমি আবৃত্তি করো ভাই—তোমার তো সবই মনে আছে—তারপর আমার বাংলা তর্জমাটা আমি আবৃত্তি করব—division of labour.

তপতী অগত্যা গুন গুন ক'রে আবৃত্তি করে :

দিখে জো ধন—হরীকা, মন! সজন পা সব হী পায়েগা।
খিবৈয়া ভী রখৈয়া ভী, রহ নৈয়া পার লায়েগা।
তূ সোচ সোচ কেঁ্যা মরে?
হোগা রহী—জো রো করে
অয় মন! তূ কব্ "দিখে জো সব হরী, হৈ তেরা"—গায়ে গা?
"কভী য়হ রোম রোম ভী তুমহারা হী হো জায়েগা?

বনায়ে মীত তূ জিনহেঁ, য়হ বন্ধু সব জো প্যারে হৈঁ,
বঁধে ইসী মৈ-মেরীকে হি জালমে রো সারে হৈঁ
য়হ মেরী হী কি প্যাসমে
করেঁ রো প্রেম আসমে,
জো টুট আস জায়েগী—তূ ফির উন্‌হেঁ ন ভায়েগা,
সজন বনা উসীকো তূ—জো অন্ত কাম আয়েগা।

ললিতা (মহোৎসাহে): এবার শোনো হিন্দি কবির কীর্তির পাশে বাংলা কবির কীর্তি (আবৃত্তি করে):

দেখে যা কিছু নয়ন সবই তার মন, সবই পাবি তুই পেলে তারে।
তোর পারের পারী সে, প্রাণবিহারী সে, খেয়া নিয়ে যাবে সে-ই পারে।
মন, কেন তোর এত ভাবনা ভয়?
চায় যা সে—তা-ই ঘটে বিশ্বময়,
'নাথ, যা কিছু আমার সকলই তোমার—গাহিবি কবে রে আঁখিধারে?
কবে রোমে রোমে শুধু তারই প্রেমমধু উছলিবে নামঝঙ্কারে?

তুই প্রাণের বন্ধু বলিস যাদের, ভালোবেসে কাছে আসে যারা,
তারা "আমি-ও-আমার"-জালে সকলেই কেঁদে মরে চিরদিশাহারা।

সেই অন্ধমমতামায়ায় রে,
তারা ডাকে তোকে প্রেম-আশায় রে !

তারা পাবে না যেদিন প্রতিদান—তোর পানে আর ফিরে চাবে না রে !
রবে শেষের দিনে যে বন্ধু—বরণ কর প্রিয় ব'লে শুধু তারে।

অসিত (খুশী) : অনুবাদ সত্যিই চমৎকার হয়েছে—না, মিথ্যে কমপ্লিমেণ্ট নয়—ছন্দ মিল সবই নিখুঁৎ—তাই একই সুরে হিন্দি ও বাংলা গাওয়া চলবে।

ললিতা (প্রেমলকে) : তুমি একেবারে গুম্ কেন বাপী ? না হয় বললেই একবার মুখ ফুটে—আমার আশা আছে ?

প্রেমল (হেসে) : আমি না বললে তুমি নিজেই বলবে যখন জানি তখন কেন মিথ্যে পণ্ডশ্রম করি বলো ? (তপতীকে) কিন্তু মা একটা কথা বলব ? (তপতী প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাকাতে) তোমার পূজারিণী-র গানটিতে কবিত্ব ও ভক্তির সঙ্গম হয়েছে চমৎকার। কিন্তু এ গানটি (অসিতের দিকে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে) যেন কাউকে বলছে "সাবধান !"

ললিতা (অসিতকে) : কিন্তু তাহ'লে এবার তুমি সত্যিই ডুবলে দাদা। একে রামে রক্ষে নেই তায় সুগ্রীব দোসর। বাপীর বকুনিতেই তোমার চক্ষু চড়কগাছ—এখন তার ওপর চড়াও হ'লেন মীরাবাই তোমাকে "সাবধান" করতে।

প্রেমল (ললিতাকে) : তোমার সবতাতেই ঠাট্টা।

অসিত : কিন্তু হয়ত এ ঠাট্টা নয় প্রেমল—কে জানে ? হয়ত…ললিতার কথাই সত্যি—এ-সন্ন্যাসিনী যিনিই হোন—হয়ত তপতীর মধ্যে দিয়ে এসেছেন আমাকে "সাবধান" ক'রে আমার সাধনার সহায় হ'তে—কে বলতে পারে ! (একটু পরে) কী বলো তুমি ?

প্রেমল (একটু ভেবে) : ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই, কবুল করছি। হয়েছে কি জানো ? কবিতা গান শিল্পকলা—এসব ঠিক আমার জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে না তো। আমি বলতে পারি কেবল একটি কথা : যে, এ-সন্ন্যাসিনী যিনিই হোন না কেন তাঁর গানগুলি অনবদ্য। মানে, এ-ভক্তিকাব্যের প্রেরণা—কী বলব ?—"দৈবী" বললে হয়ত উচ্ছ্বাস মতন শোনাবে—তাই বলি : মনের প্রাণের উপরওয়ালা কোনো স্তর থেকে যাকে বলা যেতে পারে রসসিদ্ধ—

মানে যে এলে তাকে না মেনে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বাইবেলে, জানোই.তো, একে উপাধি দেওয়া হয়েছে authority—কি না, যাকে কাটা যায় না। (তপতীকে) না মা, এ আমার কথার কথা নয়। আমার মনে হয় সত্যিই যে, তুমি অসিতের কাছে এসেছ শুধু এরকম গানের গঙ্গোত্রী নামাতেই নয়—এই সূত্রে ওকে উৎসাহ দিতে আর সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করতে কী কী এড়িয়ে চলতে হবে—যেমন করলে এই গানটিতে।

তপতী (প্রণাম ক'রে): আমি কিছুই করিনি, সাধুদা। গানটি তো আমার নয়—মীরাবাইয়ের।

প্রেমল: কে বলল? আমার মনে হয়—গানটি তাঁরও বটে, তোমারও বটে—দুয়ে এক একে দুই। অর্থাৎ তাঁর প্রেরণা উস্কে না দিলে তোমারও মুখ ফুটত না, আর তোমার চেতনার আলো না গললে তাঁর ঝর্ণা ঝরত না।

ললিতা: গবেষণা ঢের হয়েছে বাপী। (অসিতকে) এখন গান দুটি শোনাও না ভাই। পারবে পারবে দাদা, কেন মিথ্যে বিনয়? ও কি তোমাকে মানায়? চলো ঠাকুরঘরে—সুরথদাও শুনবে। সে সবে ধ্যানে বসেছে—তার ধ্যানভঙ্গ না করলে চলে?

সুরথদা (ঠাকুর ঘর থেকে চেঁচিয়ে): ধ্যানে বসি নি এখনো দিদি। তাছাড়া এমন মোহিনী আর ভাবিনীর কলস্বরে ধ্যানভঙ্গ না চায় কোন্ মুনি? এসো চ'লে—আমি ধূপ জ্বালাচ্ছি।

সকলকে একে একে ঠাকুর ঘরে ঢুকে বসতেই ললিতা সুরথদাকে গানটির ইতিহাস ব'লে অসিতকে ধরল: "এবার ধরো দাদা।"

অসিত বেহাগ ও শঙ্করায় মিশিয়ে গাইল গান দুটি পর পর।

প্রেমল (ললিতাকে): এবার কে কাকে চমকায়? পারতে তোমরা কেউ ওর মতন সবে-পাওয়া গান দুটি এমন চমৎকার গাইতে?

ললিতা: ফুঃ! গাইতে না-ই পারলাম—composer তো আমরা। আর্টে বড় কে শুনি? Composer, না singer?

(সকলের মিলিত হাসিতে ঘর ভ'রে ওঠে)

ছাব্বিশ

এলো অসিতের জন্মদিন। সকালেই এলেন ওর তিনটি মাসিমা, চারটি মেশো ও একডজন মাস্‌তুত পিসতুত মামাতো খুড়তুত ভাই বোন। তপতীকে প্রেমল বলেছিল বৈঠকখানায় বসিয়ে প্রত্যেককে বলতে যে, যেহেতু সন্ধ্যায় অসিতকে গান গাইতে হবে—সেহেতু ও সারাদিন ঠাকুর ঘরে থাকবে!

প্রেমল ওকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গিয়ে বসালো তার ঠাকুর ঘরে। মিথ্যা কথা বললে তো চলবে না। নৈলে অসিত বসত গঙ্গার ঘাটে।

ওদিকে অসিতের স্বজনেরা আগুন হ'য়ে উঠলেন তপতীর 'পরে! তপতী অচল অটল। বলল: "গুরুদেব আমাকে বলেছেন আজ সন্ধ্যার আগে কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না।"

তারা ধরল অন্দরে যাবেই যাবে। তপতী তার জন্যে প্রস্তুত ছিল। ডাকল সুরথদাকে। সুরথদা এসে শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললেন: "অসিত আমার অতিথি। সম্প্রতি বেশি গান ক'রে গলা ওর ক্লান্ত। ও এখানে এসেছে গুরুসেবা করতে, লাঞ্চ ডিনার টি-পার্টিতে গিয়ে হৈ চৈ করতে নয়।"

ওরা রেগে তপতীকে গাল দিয়ে ব'লে, গেল: "এই মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া।"

ওরা একে একে রেগে প্রস্থান করার পরে অসিত নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রেমলের ঠাকুর ঘরে গিয়ে ব'সে জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে জপ সুরু করে। প্রেমল ধ্যানস্থ।

একটু পরে অসিতের মনে গঙ্গার সুর বেজে উঠল। পকেট থেকে ডায়রি বের ক'রে লিখল চোখের জলে।

আমার চাইতে শেখাও প্রাণে:
তোমায় যেমন সুরে চাইলে মেলে আপনহারা গানে।
আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করো তোমার বরদানে,
ধূলি কঙ্করে পঙ্কজ ফুটিয়ে তোমার সুধার বানে।

আমি আজো আমার সব নিবেদন করতে পারি নি মা!
আজো শিখি নি তো করতে বরণ তোমায় তারিণী মা!

যত আশা বিধুর পথ হারিয়ে কাঁদে অভিমানে,
মাগো, তোমার কৃপায় আজ ভাষা পায় আপনহারা গানে।

আমার কাঁটা যত তোমায় চেয়ে সাধুক রূপান্তর :
ফুলের পরশমণির ছোঁওয়ায় আনো কুসুম-যুগান্তর।
তোমার চরণে মা চাইতে শরণ শেখাও প্রেমের টানে,
যত কালো বেসুর হোক আলোসুর আপনহারা গানে।

এসো নেচে নেচে সুরধুনী, মধুর মূর্ছনায়,
রঙিন ঝিনুক নয় আর, মুক্তা তোমার অন্তর আমার চায়
সোনার এই সকালে চরণতীরে বরণসন্ধানে,
দিশা পেয়েছি সব সমর্পণের আপনহারা গানে।

টুক টুক টুক……

প্রেমল ধ্যানে বিভোর। অসিত সন্তর্পণে উঠে দোর খুলতেই তপতী প্রেমলকে দূর থেকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে বলল ফিশ ফিশ ক'রে : "চিঠি এসেছে দ্যুমেল থেকে।"

অসিত মহানন্দে চিঠিটি নিয়ে পাশের বারান্দায় গিয়ে একটি বেঞ্চির 'পরে ব'সে তপতীকে কাছে ডেকে পড়ল :

অসিত,

তোমার দীর্ঘ চিঠির বর্ণনা খুব চমৎকার হয়েছে। পড়তে পড়তে সত্যিই মনে হচ্ছিল যেন মানুষগুলির কথা শুনতে পাচ্ছি। ছবি আঁকবার ক্ষমতা তোমার আছে মানতেই হবে।

প্রেমলের মন্তব্যগুলি যেমন উজ্জ্বল তেমনি গভীর। একথাও ঠিক যে, যেখানেই অর্থের ছোঁয়াচ আসে সেখানেই আদর্শ একটু না একটু মলিন হ'য়ে যায়। কিন্তু তবু অর্থের শক্তিতেই জগৎচক্র ঘুরছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। এ শক্তি একটি প্রবল শক্তি মাত্র তাই ভালোও না, মন্দও না। কী ভাবে এর প্রয়োগ করি তার নিরিখেই এর ভালোমন্দ বিচার হ'তে পারে। তাছাড়া আর একটি কথা আছে : আজকের দিনে অর্থের বিপুল শক্তির লাগাম

ভগবৎ বিমুখ শক্তিমদমত্তদেরই হাতে। রামরাজ্য আসতে পারে না যতদিন না ভগবানের বাহন যাঁরা তাঁরা এ-শক্তির পরিচালক হ'য়ে দণ্ডধর হবেন। কিন্তু সে-বাহন কোথায়? আগে সাধনার ডাকে ভগবৎকরুণার অবতরণ না হ'লে তাকে গ'ড়ে তোলা যাবে কেমন ক'রে? আমি যে-আভাষ পেয়েছি তার কথা বলার এখনো সময় হয় নি। শুধু এইটুকু বলি যে, আমি দেখতে পেয়েছি—এমন এক ভাগবতী শক্তির অবতরণ আসন্ন যার আবির্ভাবে মানবসভ্যতার যুগান্তর হবেই হবে। তার আবাহনেই আমি তপস্যামগ্ন। এ-শক্তি না নামলে মানুষের মহৎবিকাশনাট্যের কোনো উজ্জ্বল পটপরিবর্তন হ'তে পারে না—অর্থাৎ, চেতনার দ্রুত ঊর্ধ্বপ্রগতি হ'তে পারে না। এ-যুগ আসবেই, তবে কবে সে প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই—যে-প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেকেরই করতে হবে নিজেকে সে হ'ল—আমাদের প্রত্যেকের প্রস্তুতির জন্যে নিজের অহঙ্কার ও মমকারকে ভগবানের চরণে নিবেদন করতে আমরা রাজী কিনা। একান্তী হ'য়ে এই মন্ত্র জপ করতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি কি না—যে মন্ত্র ভগবতে কৃষ্ণকে দেখে ইন্দ্র উচ্চারণ করেছিলেন:

"ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ"

অর্থাৎ তুমি একাধারে ভগবান্ গুরু ও আত্মা তাই আমি চাই তোমার শরণ।

আশা করি এ-চিঠি তোমার জন্মদিনের আগেই তোমার হাতে পৌঁছবে। তোমাকে ও তপতীকে আমি সর্বান্তরকরণেই আশীর্বাদ করছি। প্রেমল তার সম্বন্ধে যা বলেছে আমিও সত্য ব'লে জেনেছি। তাকে ফিরবার সময় তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারো—যদি অবশ্য সে আসতে পারে।

প্রেমলের সম্বন্ধে তপতীর মন্তব্যও সবই সত্য। এখানকার আশ্রমে নানা ভাবের লোক আছে। তারা সবাই চলেছে অন্ধকার থেকে আলোর তীর্থ পানে। কেউই আলোয় প্রতিষ্ঠা পায় নি এখনো। তাই প্রেমলের সম্বন্ধে তাদের মতামতের কোনো মূল্যই নেই। ভবিষ্যতে যদি তপতীর বিরুদ্ধে তারা নানা কথা বলে তাতেও তুমি বিচলিত হোয়ো না। মনে রেখো—প্রেমল যা বলেছে সেই কথাই সত্য—আমি যদি তোমাকে সমর্থন করি তবে তারও পরে আর কারুর নিন্দাবাদে মন খারাপ করলে আমার সমর্থনেরও যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হবে না।

তোমার জন্মোৎসবের বিবরণ পাঠিও। আশীর্বাদ করি—তোমার ভজন,

ভাষণ, অভ্যর্থনা সবই ঠাকুরের করুণায় অনবদ্য হোক। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

ইতি। শ্রী স্বয়মানন্দ

ললিতা পাশের ঘর থেকে সবই শুনেছিল, এই সময়ে এসে তপতীকে জড়িয়ে ধরল। তপতী তার বুকে মুখ ডুবিয়ে অশ্রুল কণ্ঠে বলল: "দিদি! দিদি! গুরুদেব আমাকে গ্রহণ করেছেন।"

ললিতা তপতীর শিরশ্চুম্বন ক'রে বলল: "না ক'রে পারেন? যাকে বাপী বলেছে—না তা এখন বলব না।"

এমন সময়ে প্রেমলের আবির্ভাব। সে হেসে বলল: "তপতী জানে আমি কী বলেছি।"

ললিতা: কেমন ক'রে জানল? যোগবলে?

তপতী: না দিদি। পাশের ঘর থেকে শোনার কর্ণবলে। ও-বিদ্যায় শুধু তুমিই নও—সব মেয়েরাই পাকা। (ব'লেই প্রেমলের পায়ে গড় হ'য়ে) অপরাধ নেবেন না সাধুদা। আমার কান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।'

প্রেমল (হেসে): ভয়ের কারণ আছে বৈ কি—আরো এই জন্যে যে তোমার বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ণ।

সুরথদা (মিলিত হাসির কলধ্বনির মাঝে এসে প'ড়ে): আমিও একটু হরির লুটের ভাগ পাই না?

ললিতা: পেতে সুরথদা, যদি ভবদীয় কর্ণ ও বুদ্ধি আমাদের মতন তীক্ষ্ণ হ'ত।

প্রেমল: গুরুদেব অসিতকে জন্মদিনে আশীর্বাদ করেছেন সুরথদা, আর তপতীকেও বরণ করেছেন অসিতের গুরুমারা শিষ্যা ব'লে।

তপতী: তা দিদির বোন তো আমি।

(ঘণ্টা পড়ল প্রাতরাশের)

ললিতা: চলো চলো—চা জুড়িয়ে যাবে। Time and tea wait for no man। (সকলের কলহাস্য)

সাতাশ

গুড়ের মাঠে একটি মনোরম ছাউনির নিচে নানা রঙের বিজলি বাতি জাপানি লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে। সভামঞ্চে একটি শ্বেত পাথরে পঞ্চাশটি প্রদীপ জ্বলছে। মঞ্চে মান্যগণ্য অতিথিবৃন্দ আসীন। মঞ্চের পিছন দিকে স্বামী স্বয়মানন্দের ছবি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত।

যথাবিধি নানা অতিথির ভাষণ—মঙ্গলাচরণের পরেই। তারপর অসিতের নানা বন্ধু ও গুণগ্রাহী অসিত-গুণকীর্তন চিরাচরিত ঢঙে। তারপরে গান আরম্ভ।

অসিত প্রথমে গায় দ্বিজেন্দ্রলালের: "ভারত আমার ভারত যেখানে মানব মেলিল নেত্র" তারপর বহু শ্রোতার অনুরোধে গায় গিরিশচন্দ্রের: "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো!" তারপরে গায় ওর স্বরচিত গঙ্গাস্তব:

"আমায় চাইতে শেখাও প্রাণে।"

গাইতে গাইতে ওর বুকের মধ্যে আবেগের জোয়ার জেগে ওঠে—ও আঁখরের পর আঁখর দিয়ে চলে এ বাউল গানটির।

সবশেষে গায় "বৃন্দাবনের লীলা"। গাইতে গাইতে ওর মানস চক্ষের সামনে ফুটে ওঠে আলমোরার আশ্রম। হঠাৎ যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মা-র স্নেহসজল মুখ!···দৃশ্য বদলে যায়।···দেখে তাঁর বিহ্বল ভাবসমাধির অবস্থা··· চোখে জল, মুখে দিব্য হাসি। তারপরেই কানে বেজে ওঠে: "দেখতে পেলে না বাবা?"

ওর মনে হয়—কে জানে, আজও হয়ত ঠাকুর এসেছেন, শুনছেন—ও দেখতে পাচ্ছে না? ভাবতে না ভাবতে ওর বুকে ভক্তির বান ডেকে যায় ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আঁখর দিয়ে চলে:

ওরা জানে না······তাই মানে না

তুমি এসেছিলে ভালোবেসেছিলে বঁধু, জানে না,
তোমার করুণার তরে পাতে নি যে কান, তাই তো জেনেও জানে না,
বঁধু, করুণা তোমার যে জেনেছে তার আকাশ অশনি হানে না,
দেখে দামিনীদীপে সে তোমার কেতন, অশনিরে তাই মানে না,
সে যে আলোরি আলাপ মানে—জ্বালাতাপ বেদনা তাই সে মানে না···

আমি জানি···তাই মানি

আমি শুনেছি তোমার বাঁশি অন্তরে তাই নাথ, আমি জানি···

গানের শেষে চোখের জলে অসিত কিছুই দেখতে পায় না আর। চোখ মুছে যখন তাকায়, দেখে—সামনের আসনে ললিতা চোখ মুছছে, তপতী দু হাতে মুখ ঢেকে মাথা হেঁট ক'রে, প্রেমল স্থির হ'য়ে ব'সে পাথরের মতন।

কয়েকজন এসে ওকে প্রণাম করতেই সভাপতি স্যর গজেন্দ্রনারায়ণ দস্তিদার তাদের নিরস্ত ক'রে হাঁকলেন: "এবার আমাদের আদরণীয় অতিথি তাঁর ভাষণ দেবেন। প্রণাম পরে হবে।"

অসিত কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে সকলকে যথাবিধি ধন্যবাদ দিয়ে বলল:

"আমার সবচেয়ে আনন্দ যে এ-সভায় আমার জন্মদিনে আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন মহাসাধক ও মহামনীষী শ্রীপ্রেমল বৈরাগী যাঁর ত্যাগ জ্ঞান ভক্তি ও পুণ্য চরিত্র—

বলার উচ্ছ্বাসে ও লক্ষ্য করেনি যে প্রেমল উঠে দ্রুতপদে সভামণ্ডপ থেকে বাইরে চলে গেছে···ও সমানে ব'লে চলল:

"আমার জন্মদিনে তার অভ্যুদয়কে আমি বরণ ক'রে নিয়েছি ঠাকুরের করুণার নিদর্শন বা প্রতীক রূপে। মানুষের প্রীতির বিকাশ হয় নানা সুরে তালে ছন্দে, কিন্তু তার পূর্ণিমা রঙিয়ে ওঠে কেবল ঠাকুরের প্রেমেন্দুর আশীর্বাদে।···

আটাশ

প্রেমল ঝটিতি ললিতাকে প্যাভিলিয়নে ফেলেই চ'লে এসেছিল সুরথদার মোটরে। ললিতা ও তপতীকে নিয়ে অসিত ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে—স্যর গজেন্দ্রনারায়ণের মোটরে। গেটে মোটর ঢুকতেই সুরথদা হাত তুলে থামতে বললেন। অসিত নামতেই বললেন ফিশ ফিশ ক'রে "প্রেমল খুব চ'টে গেছে। তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—এখন ওর কাছে ঘেঁষো না। সে ঠাকুর ঘরে বজ্রবাহন ধ্যান করছে।"

ললিতা (হেসে): এত ভয় কিসের? আমি দাদার দিকে। চলো দাদা, let us beard the lone lion in his thundering den.

ওরা চারজনে পা টিপে টিপে ঠাকুর ঘরে ঢুকতেই প্রেমল চোখ মেলে অসিতের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল : "আর কক্ষনো তোমার কথা বিশ্বাস করব না।"

ললিতা (অসিতকে থামিয়ে) : কেন শুনি ? দাদা কী এমন পাপ করেছে জানতে পারি ?

প্রেমল : পাপ নয় তো কী ? আমাকে কথা দেয় নি যে—

ললিতা : মোটেই না। দাদা কথা দিয়েছিল এক, তোমাকে মঞ্চে বসাবে না ; দুই, তোমার নাম খবরের কাগজে বেরুবে না—যদিও জানি না রিপোর্টারদের সে ঠেকাবে কেমন ক'রে ; তিন, তোমাকে মালা চন্দন দেওয়া হবে না বা কোন বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হবে না। এর মধ্যে কোন কথাটা দাদা রাখে নি—বলবে আমাকে ?

প্রেমল (গম্ভীর) : সব কিছুই হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয় ললিতা !

ললিতা : অবাক্ ! হাসিঠাট্টা করলাম আমি কখন ? আমার ঠোঁটের বা চোখের কোনে কি হাসির ফিনকিও ঠাঁই পেয়েছে বাপী ? না, আমার ঘাড়ে পাঁচটা মাথা আছে যে, তোমার ব্রতকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করব ?

প্রেমল : তাছাড়া কী করছ শুনি ? আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা ষড় করেছিলে আমাকে নিয়ে হৈ চৈ করবে। এমন কি সুরথদাও আছে এর পিছনে।

সুরথদা : এ তোমার অন্যায় প্রেমল ! অসিত শুধু তোমার নাম ক'রে ওর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে মাত্র।

প্রেমল : ফুঃ ! আমি গান শুনতে গিয়েছি নিজের গরজে—এতে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে ?

ললিতা : এবার তুমি জেগে ঘুমতে চাইছ বাপী, তোমাকে জাগাব কী ক'রে বলো তো ?

প্রেমল : জেগে ঘুমনো ?

ললিতা : নয় তো কী ? তুমি কি জানো না—কলকাতায় বহু সাধক সাধিকা ছাড়াও অনেক ভদ্রলোক আছেন যাঁরা তোমাকে খাঁটি সাধু ব'লে ভক্তি করেন ? নানা ভক্তিমন্তের ঠাকুর ঘরে তোমার ছবি তুমি কি দেখো নি স্বচক্ষে ?

প্রেমল : কী সব অবান্তর—

ললিতা : অবান্তর ? মোটেই না। আমি বলতে চাইছি—যে-তোমার সাধু মহাত্মা ব'লে এত নামডাক যার সাধুতায় অবিশ্বাসীরাও অনেকে মুগ্ধ—সে তুমি যখন দাদার জন্মোৎসবে গেলে তাকে আশীর্বাদ করতে—

প্রেমল : বাজে বোকো না—আমি আশীর্বাদ করবার কে ? আমি মনে করি না যে আমি অসিতকে আশীর্বাদ করবার অধিকারী।

অসিত : এবার আমি চিঁ চিঁ ক'রেও বলতে বাধ্য হচ্ছি ভাই, যে, তোমার নিজের সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয় সেইটাই এখানে অবান্তর। আমার পাশে দু-তিনজন বন্ধুকে আমি বলাবলি করতে শুনেছি যে, তুমি আমার জন্মদিনে আমাকে আশীর্বাদ করতেই সভায় এসেছিলে।

প্রেমল (ঘাড় নেড়ে) : তারা মূর্খ। অনেকেই যা প্রাণ চায় তাই বলে ব'লে তাদের সকলের এজাহারকে বেদবাক্য ব'লে মনে করতে হবে নাকি ?

সুরথদা : অসিত তা বলে নি ভাই, কেন রাগ করছ ? ও শুধু বলতে চেয়েছে—সাধু ব'লে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ার দরুণ সভার অনেকেই তোমার অভ্যুদয়কে ঠাকুরের আশীর্বাদের নিদর্শন—symbol—ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। অসিত এদের মধ্যে একজন মাত্র।

প্রেমল (বিব্রত) : তা হ'তে পারে। কিন্তু…তাই ব'লে…মানে, সভায় অসিত যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার দিকে—

তপতী : কিছু যদি মনে না করেন সাধুদা, তবে আমি একটি কথা পেশ করতে চাই।

প্রেমল (আরো বিব্রত) : কী ?

তপতী : আপনি বা দাদাজি কোনো সভায় গেলে যে লোক আপনাদের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে এ কি আপনার কাছে সত্যিই অজানা ? দিদি কথায় কথায় বলে—আগুন ছাই চাপা থাকে না। যার রূপ আছে তার কি বিজ্ঞাপন দিতে হয় পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ?

সুরথ (মৃদু হেসে) : বিশেষতঃ যদি সে-রূপের পিছনে তপস্যার আগুন ঘুপটি মেরে থাকে।

প্রেমল (কোন ঠেশা হ'য়ে) : রূপ আগুন তপস্যা এ সব কী ছাইভস্ম বকছ সুরথদা ? আমি কি অসিতের সভায় গিয়েছিলাম রূপ দেখাতে না তপস্যার আগুনে লঙ্কাকাণ্ড করতে ?

সুরথদা : তপতী তো একথার চমৎকার উত্তর দিয়েছে ভাই—আগুনকে লঙ্কাকাণ্ড করা থেকে ঠেকানো গেলেও ছাই চাপা রেখে ছাইয়ের বড়কুটুম্ব দাঁড় করানো যায় না। আমি আর একটি মামুলি কিন্তু কুলীন উপমা দেব? —সূর্যকে দীপ জেলে দেখাতে হয় না।

ললিতা : কিন্তু আমি এ ধরণের উপমার অ্যাপলজি করতেই রাজী নই। কারণ আমি মনে করি এখানে দাদার এতটুকুও জবাবদিহি নেই। সে সরল আনন্দে বলেছে তার প্রিয়তম বন্ধু তার জন্মোৎসবে এসে তাকে ধন্য করেছে। একথা ব'লে সে কী এমন ক্রিমিনাল অপরাধ করেছে শুনি যে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছ? (প্রেমলকে) না বাপী আমি আরো বেশি বলব—কারণ fact is fact—যে, এক্ষেত্রে অপরাধী তুমিই যে বন্ধুর জন্মদিনে তার সরল আনন্দের আলোয় অনর্থক মেঘ হ'য়ে হানা দিতে চাইছ। মনে করো কি—মা খুশী হ'তেন তোমার এ আচরণে? তিনি দাদাকে ডেকে আশীর্বাদ করতেন—নিজে তার সভায় গিয়ে এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

সুরথদা : তুমি আরও একটা কথা ভুলে যাচ্ছ প্রেমল যে, আজ অসিত বৃন্দাবনের লীলা গেয়েছে বিশেষ ক'রে তোমার জন্যেই।

ললিতা : আর গেয়ে আনন্দ দিয়েছে তোমাকেই সব চেয়ে বেশি। তুমি মনে করো কি ওর এ-গানের মর্ম তোমার মতন আর কেউ বুঝেছে বা বুঝতে পারে? মা এ-গানটি শুনে কী দেখেছিলেন তাও কি ভুলে গেলে ছাই?

তপতী (হাতজোড় ক'রে): ফের ছোট মুখে বড় কথা হবে জানি, সাধুদা। কিন্তু দাদাজি আমার গুরু, তাই না ব'লে থাকতে পারছি না। ওঁর গানের সময় আমি আপনার গুরুমা-র মুখ দেখেছি। আমি কখনো কখনো ধ্যানে নানা সাধুদের দেখি। কিন্তু এত পরিষ্কার দর্শন এর আগে কখনো হয় নি।

প্রেমল (উৎসুক কণ্ঠে): মা-কে দেখেছ? কী দেখলে মা?

তপতী (হাতজোড় ক'রে): হয়ত সব আমার কল্পনা সাধুদা! কারণ দাদাজি এ-বিষয়ে আমাকে একটি কথাও বলেন নি। তবে আপনি যখন জানতে চাইছেন তখন বলি। আমি দেখলাম মা-র চোখে জল। আর তিনি দাদাজিকে আশীর্বাদ ক'রে খাটে ব'সতে ব'লে বললেন :—দাদাজিকে ধ্যান ট্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না—তিনি গানের মধ্যে দিয়েই ঠাকুরকে পাবেন।

প্রেমল (চোখে অশ্রু-আভাষ): আর বলতে হবে না মা! তুমি ঠিকই দেখেছ। আমারই ভুল হয়েছে। (অসিতকে) কিন্তু অসিত, আমি বলবই বলব (হেসে) যে, এ unequal fight : সুরথদা, তুমি, ললিতা, তপতী—সবার ওপর মা—আর বৃন্দাবনের লীলা। আমি হার মেনেছি।

ব'লে উঠে অসিতকে আলিঙ্গন করতেই ললিতা চোখ মুছে বলে : "হিপ হিপ —আর সকলে (হাততালি দিয়ে): হুর্ রে—!

ঊনত্রিশ

পরদিন সকালে প্রেমল অসিত ও সুরথের সঙ্গে ধ্যানে বসেছে এমন সময়ে ললিতা এসে হাজির। হাতে একটি টেলিগ্রাম। মুখ ম্লান।

প্রেমল (উদ্বিগ্ন স্বরে): ব্যাপার কি?

ললিতা : প্রণবদার খুব অসুখ। তার করেছেন ফ্লোরা বৌদি।

প্রেমল : অসুখ? কী অসুখ?

ললিতা : তা লেখেন নি। ফ্লোরা বৌদি আলমোরা থেকে গিয়েছেন আমাদের আশ্রমে প্রণবদার দেখাশুনো করতে। এই দেখ না।

প্রেমল (প'ড়ে সুরথদাকে): বৌদিকে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে তার ক'রে দাও সুরথদা। আর আজই ট্রেনে দুটো সীট—

সুরথ : সে হবে—কিন্তু এবার ফার্ষ্ট ক্লাশে যেতে হবে মনে রেখো। না—ললিতার জন্যে বলছি। আমি কোনো কথা শুনব না।

প্রেমল : ও ফার্ষ্ট ক্লাসে যাক—আমি থার্ড ক্লাসেই যাব।

ললিতা : না, তাহ'লে আমিও থার্ড ক্লাসে যাব।

প্রেমল : কিন্তু—

তপতী : একটা কথা বলব সাধুদা? আপনিই সেদিন দাদাজিকে বলেছিলেন যে, মা আপনার হাতে দিদিকে গচ্ছিত রেখে গেছেন। তাঁর শরীর খুব খারাপ। এরূপ ক্ষেত্রে আপনার সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকা চাই-ই চাই। ধরুন আমার যদি আজ খুব অসুখ করে আর দাদাজি বলেন আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিয়ে নিজে থার্ড ক্লাসে যাবেন তাহ'লে কি আপনি আপত্তি করবেন না?

অসিত : তাছাড়া তুমি বলো নি কি তুমি নীতিবাদী—moralist—হ'তে চাও না ?

প্রেমল : আচ্ছা সুরথদা, দুটো ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটই কাটতে পারো।

*   *   *

সন্ধ্যায় ওরা সকলে প্রেমল ও ললিতাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেল হাওড়া ষ্টেশনে।

ফার্স্ট ক্লাসে ছিলেন এক ইংরাজ মহিলা! খাস মেমসাহেব নন—অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। প্রেমলের গেরুয়া, তিলক, মালা ইত্যাদি দেখে আপত্তি করলেন। কিন্তু উপায় কি ? আর কোনো কামরায়ই তিলধারণের স্থান নেই। তাছাড়া ললিতার নামাঙ্কিত একটি নিচেকার বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছিল। তবু মেমসাহেব "নেটিভ" শব্দটি উচ্চারণ ক'রে আপত্তি করতে ললিতা বলল দোমনা হ'য়ে: "সুরথদা, দেখ না ভাই, যদি অন্য কোনো কামরায় জায়গা থাকে"—বলতেই "না দিদি" ব'লে ললিতাকে থামিয়ে তপতী মেমসাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে ইংরাজীতে বলল : "you have to grin and bear it, dear madame, since you haven't reserved the whole compartment." ব'লেই গার্ডকে ডেকে বলল : "Please make her understand that she must learn to behave herself.

মেমসাহেব অগত্যা ভ্রূকুটি ক'রে চুপ ক'রে রইলেন। কিন্তু একটু বাদে প্রেমলের দিকে তাকিয়ে বললেন : "I see you are an Englishman. How is it that you feel no shame at all in hobnobbing with these natives ?"

তপতী ফোঁস ক'রে উঠল : "Dear madame, you would do well not to make a fool of yourself like this. For, believe me folly never pays."

প্রেমল একটু অবাক হ'য়ে তাকায় : নম্র মৌনমুখীর এ কী রূপ !

মেমসাহেব তপতীকে কিছু না ব'লে প্রেমলকে বললেন ইংরাজীতেই কিন্তু ঈষৎ সংযত ভাষায় : "আপনি খৃষ্টান হ'য়ে জন্মেছেন। নিজের ধর্ম দেশ কালচার ছেড়ে এ দেশের pagan ধর্ম বরণ ক'রে কী পেলেন জানতে পারি কি? "

প্রেমল অম্লান বদনে তার ঝুলির থেকে নিত্যপূজার ছোট্ট কৃষ্ণ বিগ্রহটি বার ক'রে বলল : "আমি পেয়েছি এই কৃষ্ণকে মাদাম !"

ত্রিশ

পরদিন সকালে অসিত তপতীকে বলল: "এবার আমাদেরও রওনা হ'তে হবে।"

তপতী ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল।

অসিত: তোমার স্বামী?

তপতী: তাঁকে আমি তিন চারদিন আগে লিখেছি যে আমি আপনাকে গুরুবরণ ক'রে ঠিক করেছি—গুরুর উপদেশেই চলব।

অসিত (অনিশ্চিত): তা তো হ'ল—কিন্তু তুমি জব্বলপুরে ফিরবে না?

তপতী: গুরু বরণ করার পরে গুরুর আশ্রয়েই থাকা বিধি নয় কি?

অসিত: কিন্তু···মানে, তোমার স্বামী যদি আপত্তি করেন?

তপতী: সাধুদা বলেছিলেন একদিন যে, তাঁর বাপ মা-ও আপত্তি করেছিলেন। (হেসে) দেখলেন তো স্বচক্ষেই তাঁর স্বজাতীয়ারও কী বিষম আপত্তি! তিনি দেশ ধর্ম ভাষা সব ছাড়তে পেরেছেন—আমাকে ছাড়তে হচ্ছে তো শুধু স্বামীর আশ্রয়।

অসিত:. তোমার বড় ছেলের বয়স আট বৎসর হ'লেও ছোট ছেলের বয়স এখন মাত্র দুবৎসর—তার ব্যবস্থা কী হবে? তাকে নিয়ে যাবে তুমেলে?

তপতী (চকিতে চোখের জল মুছে): আমার স্বামী তাকে ছাড়বেন না লিখেছেন। তাই তার আশা ছাড়তেই হবে।

অসিত (একটু চুপ ক'রে থেকে): পারবে?

তপতী: ললিতাদি পারল, আমি পারব না?

অসিত: তাকে সন্তান ছাড়তে হয় নি, শুধু স্বামীকে—

তপতী: সকলের পরীক্ষার রূপ কি একই হয় দাদাজি?

অসিত (ঈষৎ অপ্রতিভ): না। তবু—

তপতী: জানি—আপনি ভাবছেন—এ আমার ঝোঁকালো মনের রোখ মাত্র। কিন্তু আমি···জীবনে সবচেয়ে কাছের মানুষ মনে করেছিলাম কাকে জানেন?—এক সখীকে যে স্বামী সন্তান দেশ আহার বিহার সব ছেড়েছে জিসাস ক্রাইষ্টের জন্যে।

অসিত : মানে—নান্?

তপতী : হ্যাঁ। একটি স্কচ মেয়ে। এখন সে বাঙ্গালোরে আছে একটি মঠে।

অসিত আর একটি কথাও না ব'লে গুরুদেবকে তার ক'রে দিল যে তপতীকে নিয়ে ডুমেল রওনা হচ্ছে।

*　　　　*　　　　*

দমদমে দিল্লীমুখী বিমানে ওদের বসিয়ে সুরথদা বিদায় নেবার সময়ে অসিত তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যেতেই তিনি বললেন : "ভাই, ধন্যবাদ দেওয়া চলে না তাকে যে ধারে। কেবল···(তপতীকে) তোমার কথা মনে থাকবে, তপতী। পরে লিখব।"

সুরথদা চ'লে গেলে অসিত তপতীকে শুধায় : "কী লিখবে সুরথদা?"

তপতী (একটু চুপ ক'রে থেকে) : দিদি কেমন থাকেন।

অসিত (একটু বিস্মিত স্বরে) : ব্যাপার কী তপতী?

তপতী (চোখে আঁচল দিয়ে) : দিদির সঙ্গে আর দেখা হবে না আমাদের।

সপ্তম পর্ব

এক

দমদম বায়ুযান প্রায় খালি। অদূরে সামনের দুটি সীটে মাত্র দুটি লম্বা দাড়ি খৃষ্টান ফাদার—ব্যস। তপতী ও অসিত পিছনদিকের একটি সীটে পাশাপাশি বসতেই হাঁপাতে হাঁপাতে এক স্থূলকায় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের আবির্ভাব। তপতী ঘাড় ফেরাতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: "তপতী! হ্যালো! ইউ—ইউ—ইউ ইন ক্যালকাটা!!"

তপতী উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তপতী নিজেকে কোন মতে ছাড়িয়ে নিয়ে অসিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়: "আমার কাকা হরদয়ালজি—যাঁর কথা আগে বলেছি···আমার গুরু অসিতকুমার···"ইত্যাদি

হরদয়ালজি চোখ কপালে তুলে বললেন: "Guru! Good heavens! Am I dreaming or what?"

তপতী হেসে তাঁর হাতে চিম্‌টি কেটে বাংলাতে বলল: "এই দেখুন কাকা, লাগছে তো? কাজেই ড্রীম নয়—মানতেই হবে।—শুনুন, আমি তো বাবাকে লিখেছিলাম গুরুদীক্ষার কথা।—হ্যাঁ বাংলায়ই কথাবার্তা হোক। আমার গুরু দেখুন—পাঞ্জাবীরা· কী চমৎকার বাংলা বলে!" (ব'লেই সামনের ফাদার যুগলের প্রতি অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত।

হরদয়ালজি (হেসে): বাংলা বলব কি রে! আমাতে কি আর 'আমি আছি? একেবারে যে থ হ'য়ে গেছি। (অসিতকে) কিছু মনে করবেন না স্যর, কিন্তু তপতী আমাকে একবারও জানায় নি—আসুন বসুন—(তপতীকে পাশে ও অসিতকে সামনের সীটে বসিয়ে)—বলছিলাম কি, ও একবারও জানায় নি আমাকে যে, ও কলকাতায় এসেছে It is monstrous, I say!

তপতী (সান্ত্বনার সুরে): রাগ করবেন না কাকা, আমি ইচ্ছে ক'রেই আপনাকে খবর দিই নি। কারণ এ যাত্রা আমি এসে উঠেছিলাম এক সাধুর সঙ্গ পেতে। আপনি সাধু সন্ত পছন্দ করেন না ব'লেই আপনাকে জানাইনি—পাছে আপনি আমাকে আপনার ওখানে উঠতে পীড়াপীড়ি করেন।"

হরদয়াল (অসিতকে বাংলায়): শুনুন সাধুজি, আপনার চেলীর কথা

শুনুন একবার। আমি সাক্ষাৎ কাকা থাকতে ও উঠবে এক সাধু—মানে আর এক জায়গায় আর আমি স'য়ে থাকব ?

অসিত (হেসে) : কিন্তু স্যর, সাধু সন্ত যদি আপনাদের চক্ষুশূল হয় তবে দু' দুটি জলজ্যান্ত সাধুর খপ্পরে প'ড়ে ও কেমন ক'রে আপনাকে জানায় বলুন ? ও আমার চেলী হয়েছে তো মাত্র মাসখানেক হ'ল—আপনি ওকে টানাটানি করলে দোটানায় প'ড়ে ওর কী রকম নাজেহাল অবস্থা হ'ত একবার ভাবুন তো ?"

হরদয়াল (জিভ কেটে) : ছি ছি, এমন কথা বলে ?—সাধুসন্তরা আমার চক্ষুশূল ! মাই গড ! আমি কি এতই পাষণ্ড যে খাঁটি সাধু দেখলে প্রণাম করব না ? আমার দাদার কাছে আর কিছু শিক্ষা পাই বা না পাই, সাধুকে নমস্কার করতে শিখেছি ছেলেবেলায়ই।

অসিত : তিনি বুঝি—

হরদয়াল : তপতী বলেনি আপনাকে ? বাঃ দাদা আমার যে এক নামকরা সাধুসন্তদের ফ্যান। সাধু দেখলে আর রক্ষে আছে ? কিন্তু এ বাজে কথা যাক—কোথায় যাচ্ছেন আপনি ওকে নিয়ে ?

তপতী : দিল্লী হ'য়ে রাওলপিণ্ডি, সেখান থেকে ডুমেল।

হরদয়াল (অসিতকে) : এ তো হ'তে পারে না সাধুজি !

অসিত : আমাকে সাধুজি বলবেন না, নাম ধ'রেই ডাকবেন !

তপতী : সে কি হয় ? কাকা, আপনি ওঁকে দাদাজি ডাকুন, সব দিক দিয়েই শোভন হবে। উনি সবারই দাদা, যেমন—জানেনই তো—মা কালী সবারই মা।

হরদয়াল (এক গাল হেসে) : বেশ বেশ দাদাজি বলতে আমার বুকে একটু বলও আসবে। যতই বলি না কেন, সাধুজি বলতে একটু ভয় ভয় করে তো ! মরুকগে : শুনুন দাদাজি, তপতী কলকাতায় এসেও আমাকে খবর না দিয়ে যা অপরাধ করেছে ক্ষমা করলেও করতে পারি। কিন্তু এখন ডুমেল গেলে বিষম বেঁকে বসব, সাবধান ! না না না, দাদাজি ডুমেল ওর কিছুতেই যাওয়া হবে না এখন।—না, ভয় পাবেন না, আমি মানি ও যেতে পারে, আর যদি বায়না ধরে যাবেও—ওকে কি আমি জানি না—যা একবার ধরেছে না ক'রে ছেড়েছে কোনোদিন ? কিন্তু দাদার আমার অসুখ। আমি যাচ্ছি মুসুরি,

তপতীকেও যেতেই হবে আমার সঙ্গে—মানে, অবিশ্যি আপনারও আসা চাই সেই সঙ্গে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদা আপনাকে নিমন্ত্রণ করবেন বৈ কি—যদি যান তাঁর সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে দেবেন দিল্লি—আমি দিল্লি পৌঁছিয়েই তাঁকে টেলিফোন ক'রে সব ব্যবস্থা করব।

তপতী : নিমন্ত্রণের জন্যে ভাবনা নেই, বাবা মাসখানেক আগে মুসুরি থেকে দাদাজিকে নিজেই ফোন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের যে ডুমেল যাওয়া একেবারে ঠিক হ'য়ে গেছে কাকা। এখন কী করি বলুন তো?

হরদয়াল (হেসে): এ-সংসারে কিছুই ঠিক নয় রে বেটী। সবই বেঠিক। না ঠাট্টা নয়, কাল দাদার সেক্রেটারি টেলিফোন করেছিলেন ট্রাংক কলে—দাদার অসুখ—শক্ত ব্রঙ্কাইটিস। তাই আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করেছি দিল্লিতে। তাঁকে নিয়ে মুসুরি যাব। আপনাকেও যেতে হবে দাদাজি। না করবেন না, দোহাই ধর্ম! দাদা ওকে কি রকম ভালোবাসেন জানেন না। ও গেলেই তিনি সেরে উঠবেন—আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

অসিত (তপতীকে): কী বলো?

তপতী : তুমি কী বলো তাই বলো আগে। গুরুদেব—

অসিত : গুরুদেব কিছু মনে করবেন না দুদিন দেরি হ'লে। আমি কেবল ভাবছি—তোমায় বাবার যখন অসুখ তখন তুমি একাই যাও না—আমি দিল্লিতে এক সপ্তাহ তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

তপতী : না, সে হবে না। ললিতাদি প্রায়ই বলত একটা কথা : এক যাত্রায় পৃথক ফল। না না না—মুসুরি যাই যদি, তোমাকেও যেতে হবে। কি বলেন কাকা?

হরদয়াল : আমি তো গোড়ায়ই বলেছি—দাদা সাধু সন্ত দেখতে না দেখতে উজিয়ে ওঠেন। তাছাড়া (অসিতকে) আপনি তো শুধু হার্মলেস সাধুই নন দাদাজি, তার ওপর গাইয়ে, কবি। আর দাদা ভজন বলতে পাগল। আপনার ভজন শুনতে না শুনতে তিনি সেরে উঠবেন।

তপতী (সগর্বে): এ কথায় আমারও সায় আছে কাকা। তাছাড়া আমাদের কথা ছিল জব্বলপুর থেকে সোজা মুসুরি যাওয়ার। হঠাৎ আমার অসুখ করার জন্যে সব ভেস্তে গেল। তাই ভেবেছিলাম ডুমেল হ'য়ে দু'তিনমাস বাদে যাব মুসুরি। কিন্তু বাবার যখন অসুখ তখন

না হয় মুসুরি হ'য়েই তুমেল যাওয়া যাবে—যদি দাদাজির মত থাকে অবিশ্যি।

অসিত : মত আমার আছে, তবে—

পক্ষিরাজ হ্রেষাধ্বনি ক'রে উঠল…

রথ-সেবিকা : Put on the belt please…

দুই

অসিত দিল্লীতে পৌঁছিয়েই গুরুদেবকে তার ক'রে জানিয়ে দিল যে, তপতীর পিতৃদেবের অসুখ, তাই মুসুরি হ'য়ে দিন পনেরো বাদে তুমেল রওনা হবে। সেই সঙ্গে (তপতীর অনুরোধে) লিখে দিল যে, মুসুরিতে তপতী এই সুযোগে একটি নাটক অভিনয় ক'রে তুমেল আশ্রমের জন্যে কিছু টাকা তুলতে চায়, তাই হয়ত তুমেল পৌঁছতে আরো দশ বারো দিন দেরি হ'তে পারে।

প্রেমলকেও লিখে দিল সব কথা একটি ছোট চিঠিতে। শেষে লিখল পুনশ্চ দিয়ে : "জানি চ্যারিটি অভিনয়াদি ক'রে আশ্রমের জন্যে টাকা তোলায় তুমি খুশী হবে না। কিন্তু কী করব বলো ভাই। আমি এভাবে আশ্রমের কিছু সেবা করতে পারলে মনে বল পাই—আরো এই জন্যে যে, জানি গুরুদেবের এতে সায় আছে।"

প্রেমল এ চিঠির উত্তরে শুধু লিখল : "সাধু, সাবধান! মনে বল আসার ছিদ্র দিয়ে যেন দুর্বলতা না পেয়ে বসে টাকা তোলার নাটুকে ধুমধামে। যাহোক, ললিতা তোমার দিকে। সে বলে তুমি আর যাই করো ভাবের ঘরে চুরি করবার পাত্র নও। আমাদের ভালোবাসা নিও। প্রণব একটু ভালো আছে।"

অসিত একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল বৈ কি। কিন্তু উপায় কি? যেখানে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যবধান গভীর সেখানে গোঁজামিল দিয়ে তো আর মনের মিলের পত্তন হ'তে পারে না।

তিন

স্যর মেলারাম অসিতকে হেঁট হ'য়ে প্রণাম করলেন আরাম কেদারা থেকে উঠে। অসিত ব্যস্ত হ'তেই বললেন: "সে কি হয় দাদাজি! আপনার মতন সাধু এলেন আমার 'মেহমান' হ'য়ে—আর আমি কিনা আরাম কেদারায় এলিয়ে আরাম করব? হা হা হা!"

অসিত (হেসে): না আরামের কথা নয়, স্যর মেলারাম। আপনি অসুস্থ তো—

স্যর মেলারাম: ফুঃ। ব্রঙ্কাইটিস আমার মাঝে মাঝেই হয়। ও আবার একটা অসুখ নাকি? তবে ভাগ্য ভালো আমার যে, ও ঠিক এই সময়েই এসে আমাকে চেপে ধরেছে—নৈলে আপনাকে পেতাম না তো—শুধু আপনাকে নয়, সেই সঙ্গে আমার এই অবাধ্য মেয়েটাকেও। কেবল একটা অনুরোধ: আমাকে স্যর মেলারাম ব'লে অপদস্থ করবেন না। আমি যা-ই হই স্নব নই সাধুজি। চাই নিজের নামেই পরিচয় দিতে। তাছাড়া আপনি সাধু, আপনার কাছে স্যর, লেডী ডিউক ডাচেস তো নেই। আর একটি কথা সাধুজি: আমরা—মানে বিষয়ীরা—যোগার্থী না হ'লেও কৃপার্থী জানবেন।

তপতী: বাবা, আপনার মাননীয় মেহমানকে দাদাজি ডাকলেই উনি বেশি খুশী হবেন। ও-ই তাঁর ডাকনাম। তিনি আমাদের সকলেরই দাদাজি।

হরদয়াল (টুক ক'রে): কিন্তু তপতী আজ ওঁর চেলী ব'লে যদি সকলেরই মাতাজি হ'য়ে দাঁড়ায়?

অসিত (হেসে): মাতাজি কেন? দিদিজি হ'তে দোষ কি?

তপতী: শুধু যে দোষ নেই তা নয়—দিদিজি উপাধিই বেশি সুস্বাদু। মাতাজি হ'লেই হয়ত বা (হরদয়ালকে) রাতারাতি জগন্মাতা হ'য়ে ফুটে উঠব কাকা, কে জানে?

স্যর মেলারাম: যা বলেছিস। এদেশে দুটি ফ্লাওয়ারিং সব চেয়ে সহজ—জগৎগুরু আর ওয়র্ল্ড-মাদার। দুঃখ এই যে, ওয়র্ল্ড্‌ফাদার ব'লে কোনো কথা চালু হয় নি—নৈলে দাদাজিও বিপদে পড়তেন—হা হা হা!

চার

দিন সাতেক বাদে অসিত লিখল প্রেমলকে :

তোমার চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরি হ'ল। কারণ তপতী এসেই কয়েকটি সখী ও সখাকে তালিম দিচ্ছে বার্ণার্ড শ-র Arms and the man-এর নানা পার্ট-এর। ও যে কী চমৎকার শেখায় জানো না। অভিনয় হবে আমাদের সাভয় হোটেলেই। স্যর মেলারাম—যদিও আমি তাঁকে শুধু মেলারামজি ব'লেই ডাকি—খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। মেয়ে চমৎকার অভিনয় করে—বলেন তিনি সগৌরবেই। শুধু অভিনয় নয়—কথাবার্তা, নাচগান গল্পগুজব ফ্লাওয়ার শো ডেয়ারি সবতাতেই ও আছে—বলেন তিনি বড় গলা ক'রে। ওর কাকাও তপতী বলতে অস্থির। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী বলত ওকে ললিতা—মনে পড়ে এঁদের তারিফে। সত্যি, বাপ মেয়ের এমন সহজ গভীর স্নেহসম্বন্ধ আমি বেশি দেখি নি। ওঁর দুই ছেলে আছে কিন্তু উনি তপতী বলতে অজ্ঞান।

তবে ওঁর মেয়ে অন্ত-প্রাণে একটা দারুণ দুঃখ আছে যে, মেয়ে বড় ঘরে বিয়ে ক'রেও সংসারী হ'ল না। ওঁর বিষম ভয় পাছে সে নানদের মতন আত্মীয়বিমুখ হ'য়ে দাঁড়ায়। ছেলেবেলা থেকে যেমন তপতী নান দেখলেই উজিয়ে উঠত, তেমনি উনি উঠতেন বিরূপ হ'য়ে। হেতু অবিশ্যি জলের মতন পরিষ্কার : উনি চান—মেয়ে নামকরা গৃহিণী হ'য়ে এক রাশ ছেলেমেয়ে নিয়ে গৌরবিণী শ্রীমন্তিনী হ'য়ে ফুটে উঠুক। সমাজের সেবা, দেশের কাজ, মেলামেশা……এই সব আর কি। ঠাট্টা ক'রে ওকে বলেন প্রায়ই : 'আমি চাই তুই হবি pillaress of society, হা হা হা!' এককথায়, স্যর মেলারাম হচ্ছেন বলিষ্ঠ নিযুতপতি—হরদয়ালজি বলেন প্রায়ই : 'He started from scratch and made his mark—as a pillar of society. তাই তো চেয়েছিলেন—মেয়ে বাপকী বেটী হ'য়ে pillaress heiress হ'য়ে দাঁড়াক।'

কথাটা সত্যি। এমন চৌখস লোক বেশি দেখি নি আমি—বিশেষ ক'রে ধনীদের মধ্যে। উনি এম এস সি পর্যন্ত সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হ'য়ে এক ধনপতির কর্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। তারপর নিজের দুর্দম শ্রমশক্তি, কল্পনা, প্রতিভা ও সততার জোরে দ্রুত বেগে ! ওঠেন ব্যবসায়। শেষে মিলিটারি কনট্রাক্টর হ'য়ে

গত যুদ্ধে অজস্র টাকা উপায় ক'রে ক্রোরপতি হ'য়ে রিটায়ার ক'রে এই হোটেল কেনেন। এখানেই তিনি বেশি থাকেন। প্রায়ই বলেন—টাকার সাধ মেটে না এ-গুজবটা ভুল। উনি আর চান না মুনফা বাড়াতে। তবে ওঁর একটি উচ্চাশা আছে—তিনি তার নাম দেন hobby—যে, সাভয় হোটেলটিকে তিনি প্রথম শ্রেণীর হোটেল ক'রে দাঁড় করাবেন স্ববিশনেস বাদ দিয়ে। করেছেনও—বলাই বেশি।

সত্যি ভাই, ধনীদের মধ্যে এমন সহজ বিনয়ী তথা সদাচারী মানুষ আমি আর একটিও দেখি নি। বই পড়া ওঁর আর এক হবি—বিশেষ নানা ধর্ম গ্রন্থ। এ আর এক আশ্চর্য: মোটেই চান না যে, মেয়ে যোগিনী হোক—অথচ সাধু, সন্ত, মোহান্ত, মণ্ডলেশ্বর, অমুক মা, তমুক মা সবাইকেই প্রণাম করেন সাগ্রহে। সবচেয়ে ভালো লাগে আমার ওঁর মুখে গুরু নানকের কথা শুনতে। গুরু গ্রন্থ পাঠকে উনি শুধু যে স্বাধ্যায় ব'লে বরণ করেছেন তাই নয়, গুরুগ্রন্থের অজস্র শ্লোকই ওঁর মুখস্থ। অর্থাৎ উনি আদৌ গুরুবাদী নন। বলেন হেসে প্রায়ই: 'জানেন দাদাজি, অনেক সাধু আমার মতন বিষয়ীকেও পটাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি বোকা হ'লেও বুদ্ধি ধরি তো—কারুর কাছেই ধরা দিই নি, হা হা হা! বলি: কাজ্ কি? ভালো কাকে বলি জানি, মন্দকে এড়িয়ে চলা মানি। ব্যস আর কি? কেন চাইব গুরুর তাঁবেদার হ'তে? তাঁরা বলবেন এ কোরো না তা কোরো না, মাছ মাংস ছাড়ো, ধূমপান বন্ধ করো—কাজ কি ফ্যাসাদে? হয়েছে কি জানেন? ধার্মিক হ'য়েও যে আয়েষী হওয়া যায় এ আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। সত্যি বলছি দাদাজি, তাই তো আমার ভয় পাছে আমার এই পাগলী মেয়েটা রাতারাতি যোগিনী ব'নে বুঁদ হ'য়ে একলাটি ব'সে থাকে নাক টিপে। না—আপনাদের রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমার ভারি ভালো লাগে যে, এ জগতের আলো হাওয়া লতা পাতা ফুল ফসল এককথায় সুন্দরের আনন্দ মেলাকে আমি ষোলো আনা বরণ করি মনে প্রাণে।—চোখ কান বুঁজে, জিভ উল্টে, জড়সমাধির পরমানন্দ আমি বুঝি না—বুঝতেও চাই না, হা হা হা!"

সত্যিই বিচিত্র মানুষ ইনি। যেমন হাসিখুশি, তেমনি বলিষ্ঠ। যেমন সামাজিক তেমনি স্বাবলম্বী। যেমন ধনপতি তেমনি দিলদরিয়'। কত রকমের বন্ধুকে যে রোজ নিমন্ত্রণ করেন কী বলব? বিশেষ ক'রে আমি আসার পর থেকে ওঁর যেন আনন্দের অবধি নেই। ওঁর আদরের 'দাদাজি-'টির ভজন শোনাতে

উনি কত রকমের লোককে যে শুধু ডাকা নয়, খাওয়ান দাওয়ান—সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অবশ্য নিজে হোটেলপতি, তাই খানা খাওয়ানো এঁর পক্ষে সহজ। কিন্তু লোক খাওয়াতে জলের মতন টাকা খরচ করতে এঁর জুড়ি অন্ততঃ আমার তো চোখে পড়ে নি আজ পর্যন্ত। প্রত্যহই এঁর নিজের কটেজে সাত আট দশজন ক'রে অতিথি থাকে—কখনো বা দশ পনেরো বিশজন—এখানে কোনো উৎসব মানেই আমার ভজন তার পরেই 'ব্রাহ্মণভোজন।' স্যর মেলারাম বড় গলা ক'রেই বলেন: ব্রাহ্মণ নয় তো কি? একশোবার। যাঁরাই ব্রহ্মের নাম শুনতে আসেন তাঁরাই তো ব্রাহ্মণ। কি সংসারী কি সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত হ'লেই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞানী—একশোবার। গুরু নানক সুখমনীতে বলেন নি কি—

ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ
জৈসে জলমে কমল অলেপ?"

আমি তাঁকে গুরু নানকের এ-বিখ্যাত শ্লোকটি গেয়ে শুনিয়ে দিলাম বাংলায় তর্জমা ক'রে

নির্লিপ্ত যে ব্রহ্মজ্ঞানী সে-ই।
কমল যেমন জলে থেকে জলে নেই।

এঁর কাছে এসে আমার এই একটা সত্যিকার লাভ হয়েছে—যে, আমি এঁর গুরুগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে গুরু নানকের সিন্ধু-উদার মহিমার যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেয়েছি। সত্যি, গুরু নানক মহাসন্ত একথা জানলেও তিনি যে এতবড় দার্শনিক বা ভাবুক তা জানতাম না। বিশেষ ক'রে নাম নাম নাম—নানক পন্থীরা বলে 'শবদ'। স্যর মেলারামের ব্যাখ্যা শুনে মনে হয়—খতিয়ে নানক পন্থীদের সাধনাও প্রণব সাধনা বর্গীয়—যাকে আমরা বলি অনাহত শব্দ, তুমি বলতে ওঙ্কার, মনে পড়ে? বাস্তবিক গুরুগ্রন্থ পড়বার সময় এঁর মুখচোখের গোটা চেহারাই যেন বদ্‌লে যায়—মনে হয় আর একটা মানুষ—অর্থাৎ যে-মানুষ ভোগসুখে বিলাসের অজস্র উপকরণে সাড়া দেয় সে নয়—সাধক না হোক, এমন এক খাঁটি শরণার্থী যার বলতে বলতে চোখে জল আসে: 'তেরা কীতা মীঠা লাগে'—তুমি যা-ই করো না কেন আমার কাছে মধুর।

হয়ত ললিতা হাসবে—বলবে: "দেখ দেখ বেচারী দাদার উচ্ছ্বাস—যাকেই ধরবে তারই গুণগান করতে করতে বিশ্ব ভুল!" কিন্তু সত্যিই উচ্ছ্বাস নয় ভাই,

ধনীদের মধ্যে যে এমন খাঁটি বৈরাগী না হোক ভক্ত লুকিয়ে থাকতে পারে এঁকে স্বচক্ষে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না।

কিন্তু শোনো, একটি কথা বলি। মনে আমার একটু খটকা লাগছে ব'লেই তোমাকে শুধাচ্ছি—কিং কর্তব্যম্। গুরুদেবকে এসব কথা লিখতে মন সরে না। কারণ জানোই তো তিনি সহজে জবাব দেন না। কাজেই তোমার কাছে দরবার করা ছাড়া উপায় কী বলো?

কথাটা এই যে, সাভয় হোটেলে শ-র Arms and the Man নাটক দেখতে যাঁরা আসবেন তাঁরা সবই ষোলো আনা সংসারী তথা ফ্যাশনেবল ইদানীন্তন—অর্থাৎ একেবারে হানড্রেড পার্সেণ্ট মডার্ন। তপতী সাজছেও chocolate cream soldier—যাকে সিগারেট খেতে খেতে জবাবদিহি করতে হবে নিজের চরিত্রের। তাছাড়া নাটকটির নানা স্থানে আরো এমন সব রসিকতা আছে যাতে ধর্মার্থীদের মন খুঁৎ খুঁৎ না ক'রেই পারে না। অথচ ও বলে (আর বেশ জোর দিয়েই) যে, যখন এর উদ্দেশ্য মহৎ—গুরুদেবের সেবা—তখন এসব ছোটখাট পান থেকে চুন খসায় কিছুই আসে যায় না।

সে যাই হোক, এই সূত্রে ওর আর একটি প্রতিভা আমার চোখে পড়ল: কী অদ্ভুত অভিনয়! কিন্তু তবু যখন ও chocolate cream soldier সেজে রিহার্সালে নানা কটাক্ষ করে, মনে আমার প্রশ্ন জাগে—তুমি থাকলে ভ্রূকুটি করতে কি না? অথচ শ-র এ-নাটকটি আমার সত্যিই ভালো লাগে, তাই তপতীকে জোর ক'রে বলতেও বাধে যে, পুরুষ সেজে ফেরারী সৈনিক হ'লে ওর সাধনার ক্ষতি হবে। অশ্লীলতা যেখানে নেই সেখানে রসালতার দোষ কোথায় ভেবে পাই না। বিশেষ ক'রে নির্ভেজাল হাসির রঙ্গমঞ্চে। তুমি কী বলো?

শেষে আর একটি কথা বলি। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের অভিনয় করেছিলেন—পাই তাঁর জীবনীতে। কিন্তু কোনো নাটকেই সবাই কৃষ্ণ রাধা হ'তে পারেন না। 'জটিলা কুটিলাও থাকবেই লীলা পোষ্টাই করতে'—বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই মনে হয়—যদি কোনো নাটকের পরিণতি হয় শোভন সুন্দর ও মর্মস্পর্শী যার মূল আবেদনে হৃদয় উর্ধ্বচারী হয় তাহলে সে-নাটকে এমন কি দুরাত্মা সাজলেও নটের পক্ষে অন্যায় হবে না। অবশ্য শ-এর এ-নাটকটি কিছু আদর্শবাদী নাটক নয়—নিছক রসাল কমেডি, কাজেই এখানে উচ্চাঙ্গের

নৈতিকতার প্রশ্নই ওঠে না। তবু মনে হ'ল যে, যখন নাটকটি দেখে প্রাণ শেষমেশ প্রফুল্লই হ'য়ে ওঠে, হাসতে হাসতে মনের ভার ক'মে যায়, তখন কেনই বা-এ নাটক মঞ্চস্থ করা সাধক সাধিকার পক্ষে অন্যায় হবে? যতই বকি না কেন, আমরা তো আর সেকেলে সাধক হ'য়ে শরশয্যায় শুয়ে ব্রহ্মনির্বাণ চাইতে পারি না—দেশকাল পাত্র ভেদে উচিত অনুচিতের বোধও কিছু না কিছু তো বদলাবেই? তাই বার্ণার্ড শ-র নাটকের মহলা দেওয়ায় তপতীর বা আমার সাধনার ক্ষতি হবে কেন?

ঐ দেখ, অনর্গল নিজেদের কথাই ব'লে চলেছি, তোমাদের খবর জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। তপতী পরশু ললিতার একটি ছোট্ট চিঠি পেয়েছে তাতে জেনে একটু আশ্বস্ত হয়েছি যে, প্রণব একটু ভালো আছে—ঘরের মধ্যে একটু আধটু চলাফেরা করা সুরু করেছে। কিন্তু ললিতা নিজের পায়ের খবর দেয় নি। কেমন আছে সে? ফুলো কি একটুও কমে নি এখন? তপতী বিশেষ উদ্বিগ্ন আছে—নাটকটা শেষ হ'য়ে গেলেই ওকে লিখবে মস্ত চিঠি—বলল আমাকে আজই। কিন্তু ও লিখুক বা না লিখুক, তুমি অন্ততঃ একছত্র লিখেও জানিও—আরো ভালো হয় যদি তার করো। ভুলো না ভাই—তপতীর ও আমার মিলিত মিনতি। ইতি—

তোমার স্নেহ-ঋণী অসিত।

পুনশ্চ। কাল বিকেলে এ-চিঠিটি লিখে রেখে দিয়েছিলাম আজ সকালে ডাকে দেব ব'লে ইতিমধ্যে ঘটল এক কাণ্ড কাল রাতে। বলবার মতো। তাই বলি শোনো।

স্তর মেলারামের গুরুগ্রন্থ পাঠের সময় হরদয়ালজি গোপনে তাঁর টেপরেকর্ডারটি পরিপাটি মেলে রাখেন দাদার নাকের নিচেই। জানেন তো, দাদা অন্যমনস্ক—ধরতেই পারবেন না ষড়যন্ত্র। যাই হোক শোনো। (আমি (টেপরেকর্ডার-এর এজাহার থেকে উদ্ধৃত করছি মনে রেখো।

মেলারামজি পড়ছিলেন সুখমনী থেকে।

সাজন সন্ত করহ ইহ কাম: আন তিয়াগি জপহ হরিনাম

(আমি পরে এর অনুবাদ করেছিলাম
সাধু সজ্জন! শুধু এ-সাধনা চাই:
সব কাজ ছেড়ে নামগান করো ভাই!)

এমন সময়ে—lo and behold—তপতীর ভাব সমাধি! সেই স্থির মূর্তি, মুখ আনত, চোখের কোণে জল—ঠিক যেমন কলকাতায় হ'ত। এখানেও এতদিন প্রাণপণ চেষ্টায় ভাবসমাধিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আমাকে তিন চারবার বলেছিল—"বাবার গুরুগ্রন্থ পাঠ শুনতে শুনতে আমার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা প্রবাহ উঠতে থাকে—ঠিক কলকাতায় যেমন হ'ত। এ-প্রবাহ মাথা পর্যন্ত উঠলেই আমি সংজ্ঞা হারাই, তাই আমি ক্রমাগত মাথা চাপড়ে প্রকৃতিস্থ থাকি কোনোমতে।"

কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী দেবী কি কথা শোনবার পাত্রী ভাই! কাল হ'ল কি, ওর মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে সেই প্রবাহ জাগতে না জাগতে ও দেখল মীরাকে আর শুনল তাঁর গান। (একথা অবশ্য বলেছিল আমাকে পরে—কাল রাতে শুতে যাবার আগে)। তারপর আর কিছু মনে ছিল না—যাকে বলে ওর 'আমাতে আর আমি ছিল না'—ও ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে চলল ওর ধ্যানশ্রুত গান: (ধন্য টেপরেকর্ডার):

গোবিন্দ লীনো মোল সখী, মৈ লীনো গোবিন্দ মোল।
লোগ কহেঁ মৈ পায়ো মহঙ্গা লিয়ো তরাজু তোল॥

রূপ নহী গুণহীন সখী, মৈ রতন অমোলক পায়ো।
জ্ঞান ধ্যান তো জানূঁ নাহী, প্রেমকা বাট চটায়ো।
ছলিয়াকো ছল লীনো মৈনে, নাম উসীকা বোল।
গোবিন্দ লীনো মোল সখী, মৈ লীনো গোবিন্দ মোল॥

নৈননমে অব রাখুঁ প্রীতম, পলকোঁকী চিক ডাল।
বৈরী জগৎ না ছীনে ধন য়হ, লূট ন পায়ে কাল।
জনমজনমকী টূটী বাঁধী মীরা কবহুঁ ন ভোল
গোবিন্দ লীনো মোল সখী, মৈ লীনো গোবিন্দ মোল॥

মেলারামজী সমাধি কোনোদিন দেখেন নি, যদিও গুরুগ্রন্থে গুরু নানকের সমাধির বর্ণনা পড়েছিলেন। কিন্তু বইয়ে পড়া আর চোখে দেখা! আর শুধু দেখাই তো নয়, মেয়ের মুখে স্বকর্ণে শোনা এমন অপরূপ মীরাভজন! এককথায় তিনি একেবারে অভিভূত! (পরে বলেছিলেন আমাকে যে, ঘরের

মধ্যে কেমন যেন একটা অশরীরী দৈবী আবির্ভাব অনুভব করেছিলেন—কিন্তু সে অন্য কথা) আবৃত্তি শেষ হ'তেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে (শতাধিক শ্রোতার উপস্থিতির কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে) বললেন : 'আমার চোখ খুলে গেছে মা! তোকে আর আঁকড়ে ধরে থাকব না আমার মেয়ে ব'লে—আর বাধা হ'য়ে দাঁড়াব না তোর সাধনার পথে। আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোর চালচলন আর পাঁচজনের মতন হ'লেও তুই এমন কিছু নিয়ে জন্মেছিস যার ফলে হ'য়ে গেছিস একেবারে একটা আলাদা মানুষ।'···শুধু তিনিই নন, সবাই কেমন যেন অভিভূত মতন হ'য়ে পড়ল। দু-একটি মহিলা চোখ মুছতে লাগলেন। এক বৃদ্ধ শিখ তো হাতজোড় ক'রে কান্না সুরু ক'রে দিলেন।

তখন আমার মনে হ'ল—এ-মেয়ের ভয় নেই নেই নেই—যাকে স্বয়ং ভগবান ধ'রে আছেন মীরার মাধ্যমে। কাজেই ও কোথায় কোন্ নাটকে কী বোলচাল দিচ্ছে না দিচ্ছে তাতে কিছুই যায় আসে না। পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ল : ছোট ছেলে বাপের হাত ধ'রে চলতে চলতে প'ড়ে যেতে পারে হাত ফসকে, কিন্তু বাপ যে-ছেলের হাত ধ'রে নিয়ে চলেন তার ভয় নেই। একথা ওকে আমি সেদিন রাতে বলেছিলাম মেলারামজির সামনেই। তিনি কেবল এইটুকু মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁরও একথা মনে হয়—তবু মেয়ে তাঁর সংসারের রংমহল ছেড়ে যোগের গহ্বরে পড়বে ভাবতে তাঁর বুকের মধ্যে এখনো কেমন ক'রে ওঠে। কী বলো তুমি ?"

পাঁচ

অসিত তপতীকে না ব'লেই চিঠিটা পোস্ট ক'রে দেবার পরে মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি মতন বোধ করল। তপতীর সম্বন্ধে রায় চাওয়া এমন এক বন্ধুর কাছে যে তার গুরু নয়—এতে তপতীর মনে দুঃখ হ'তে পারে বৈকি। তাই ভেবেচিন্তে ঠিক করল গুরুদেবকে ফোন করবে। পরদিন তপতী যখন সাভয়ের রঙ্গমঞ্চে রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত তখন সে ট্রাংক কলে ডুমেলের সঙ্গে যোগ চাইল।

ঘণ্টা খানেক বাদে সাড়া মিলল। গুরুদেবের প্রাইভেট নম্বর দিয়েছিল তাই তৎক্ষণাৎ শুনল তাঁর সমৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর—বুকের মধ্যে রক্ত উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ওর।

"গুরুদেব ?"

"অসিত ? কি ব্যাপার ?"

অসিত প্রেমলকে যা যা লিখেছিল তার সংক্ষিপ্তসার জানিয়ে বলল : "আমার মনে হয় গুরুদেব যে আমার আপনাকেই জানানো উচিত ছিল প্রেমলকে না জানিয়ে।'

"তাতে ক্ষতি হয় নি। তবে আমার মনে হয় যে, প্রেমল তোমার কথা ঠিক ধরতে পারবে না। না, শোনো তোমাকে আর কিছুই ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি গতকাল টের পেয়েছিলাম তুমি একটা সংকটে পড়েছ—যদিও ঠিক কী সংকট জানতাম না। যাহোক আমি খুব খুশী হয়েছি যে, তুমি আমাকে আজ টেলিফোনে সব জানালে। আগে জানালে আরো ভালো হ'ত কারণ তাহ'লে প্রেমলকে তোমার অত কথা লিখতে হ'ত না।"

"এখন পরিতাপ হচ্ছে গুরুদেব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"না, ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তুমি কোনো অপরাধই করো নি। তবে আমার একটা কথা মনে হয়, ক্ষুব্ধ হোয়ো না : তপতী উচ্চকোটির সাধিকা ব'লেই অভিনয়-টভিনয়ে ওর কোনো ক্ষতি হবে না বা গড়পড়তাদের মতন সাবধানে পা গুণে গুণে চলতে হবে না। অর্থাৎ, তপতী স্টেজে Shavian রসিকতা করলেও যোগভ্রষ্ট হবে না। শুনতে পাচ্ছ ?"

"পাচ্ছি গুরুদেব, কেবল—"

"না। মনে খুঁৎখুঁতি রেখো না। তপতী এমন শুদ্ধ আধার যে, ওর পক্ষে কী ভালো না ভালো জানতে আর কারুর কাছে ধর্ণা দিতে হবে না। ওকে যিনি বরণ করেছেন তিনিই ওকে শরণ দিয়ে চালাবেন ঠিক পথে।"

"মীরা ?"

"শুধু মীরা নয়। গুরুশক্তি। না—তোমার অত কুন্ঠিত হবার দরকার নেই, কারণ এক্ষেত্রে তোমার মধ্যে দিয়ে যে-দিব্য গুরুশক্তি ওকে চালাচ্ছে সে-শক্তি তোমার অজান্তেও কাজ করতে পারে ও করবেও ভবিষ্যতে—তুমি পরে মিলিয়ে নিও।"

টেলিফোনের ঘটক : Time's up please !

* * *

অসিত মহা ভাবনায় প'ড়ে গেল। এ কী ব্যাপার ? গুরুশক্তি ঠিক কী

বস্তু ? গুরুর তোয়াক্কা না রেখে গুরুশক্তি শিষ্যাকে চালাতে থাকবে—এই-ই বা কেমনতর কথা ? ওর বাল্যসাথী দুরন্ত সংশয়, হু হু শব্দে জেগে উঠল ফের। কিন্তু মনে প'ড়ে গেল ললিতার একটা কথা—সে বৃন্দাবনে একবার বলেছিল : "দাদা, বললে বিশ্বাস করবেন না হয়ত, কিন্তু আমি এতবার দেখেছি যে, আমার পক্ষে অবিশ্বাস করা আর সম্ভব নয় যে, যখনই আমি পাকে পড়েছি বাপীর মধ্যে দিয়ে এক অচিন মুস্কিলাশান তেড়েফুঁড়ে উঠে আমাকে পথ দেখিয়েছে। অথচ বাপী নিজেও জানত না কী ভাবে ঘটেছে এ-অঘটন তার প্রভাবেই। এ সত্যি হয় দাদা। বিশ্বাস কোরো—আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না।"

ছয়

অসিতের পাষাণভারি মন পালকের মতন হাল্কা হ'য়ে গেল মুহূর্তে। ও রঙ্গমঞ্চের পাশ দিয়ে বাইরে বেড়াতে যাবে এমন সময়ে তপতী ওকে জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে ডাকল : "দাদা, একবার আসবে ?

অসিত ঢুকতেই "গোবিন্দ লীনো মোল" গানটির সুর কানে এল। পরশু গানটি সুরে বসিয়ে ও তপতীকে শিখিয়েছিল। তপতী খুশী হ'য়ে তিনটি মেয়েকে সেই সুরটিতে তালিম দেওয়া সুরু করেছে।

মেয়েরা অসিতকে দেখেই থেমে গেল। অসিত প্রসন্ন স্বরে বলল : "থামলে কেন ! বেশ তো গাইছিলে ?"

তপতী : সুরটা ঠিক হয়েছে কি না বুঝতে পারছি না দাদা।—যদিও শাদামাটা সুর—তবু।

অসিত (হেসে) : শাদামাটা সুর হ'লে তবুর প্রশ্ন ওঠে কেমন ক'রে ? কেবল একটা কথা : এর বাংলা তর্জমাটিও শেখানো চাই।

তপতী : বাংলা উচ্চারণ কি ওরা পারবে ?

অসিত : তুমি যাদের নায়িকা তারা কোন্ অসাধ্য সাধনে পিছপাও শুনি ? আর এ আমার কথা নয় যে, হেসে উড়িয়ে দেবে—বলেছেন সাক্ষাৎ গুরুদেব।

তপতী (সবিস্ময়ে) : গুরুদেব ? টেলিফোনে ?

অসিত : নয়ত কি আমার ধ্যানশ্রুতি ? আমি তো তুমি নই।

তপতী : ঠাট্টা রাখো। বলো কী ব্যাপার ?

অসিত : সে হবে-পরে। এখন এ-গানটি তোলো তো সবাই মিলে যখনকার যা। (পকেট বুক বের ক'রে) শোনো আমি গাই—তোমরা সব দোয়াম দাও—ঐ একই স্বর—পারবে পারবে পারবে। আর না পারলে আমি তো আছি শুধরে দেব। ধরো—

অগত্যা ওরা দোয়ার দেওয়া সুরু করে—আধ ঘণ্টার মধ্যেই গানটি রপ্ত হ'য়ে গেল :

নিয়েছি গোবিন্দেরে কিনিয়া সজনী, আমি গোবিন্দে কিনেছি অতুল্য।
লোকে বলে : "এত দাম দিবে কে অবোধ? শুধু আমি জানি—এ নহে বাহুল্য।

নাই রূপ গুণ ধন, দুর্লভ সে-রতন কেমনে তবুও হ'ল আমারি?
ধ্যান জ্ঞান সাধনার জানি না কিছুই, শুধু জেনেছি—প্রেমেরি আমি পসারী।
ছলীরই শিখেছি ছল, তারি আপনার নামে চিনেছি নামীরে যে অমূল্য।
নিয়েছি গোবিন্দেরে চিনিয়া সজনী, আমি গোবিন্দে চিনেছি অতুল্য।

নয়নে আমার প্রাণবল্লভে ঢেকে আঁখিপল্লবে রচিব আড়াল রে!
জগৎও বৈরী হ'লে সে-ধন হবে না চুরি, লুটিতে পারে না তায় কাল রে।
বহু জনমের ক্ষতি পূরণ হয়েছে আজ, তাই মীরা মিলন-প্রফুল্ল।
নিয়েছি গোবিন্দেরে কিনিয়া সজনী, আমি গোবিন্দে কিনেছি অতুল্য।

গানটি ওদের তোলা হ'য়ে গেলে অসিত বলল : "এবার শোনো বলি—কেন এ-গানটি ওদের দিয়ে গাওয়াতে চাই। সামনের সপ্তাহে নাটকটি অভিনয় হবার আগে আমি প্রথম গাইব তুলসীদাসী ভজন তো!"

তপতী : হ্যাঁ, তাই তো ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। (হেসে) বাবা কী বলেছেন জানো? বলেছেন—ভিড় হবে বিশেষ ক'রে তোমার ভজন শুনতে—কিন্তু নাম কিনব আমরা থিয়েটারের নামে।

অসিত (হেসে) : তাঁকে বোলো যে এরই নাম fishing for compliments—কারণ তিনি বেশ ভালো ক'রেই জানেন এক্ষেত্রে কার টানে লোকে দলে দলে দামী টিকিট কিনছে—সেকেলে ভজন-গাইয়ের গান শুনতে, না মডার্ন মেয়ের চকোলেট ক্রীম সোলজার রূপ দেখতে।

স্যর মেলারাম (দোর খুলে উঁকি মেরে) : আমি না শুনতে চেয়েও

শুনেছি দাদাজি—তবে কানে এল ব'লে, আমি eaves-dropper ব'লে নয়। আর আপনার কথা কাটবার জন্যেই বাধ্য হ'য়ে ঢুকতে হ'ল। কারণ এক্ষেত্রে যাকে বলে boot is on the other leg, Your Holiness!—অর্থাৎ কমপ্লিমেণ্টের জন্যে ছিপ ফেলছেন খোদ ডাক সাহিটে দাদাজি—এ অবলা বালা নয়—হা হা হা!

সাত

নাটকটি রিহার্সালে খুব জ'মে উঠল বৈ কি—বিশেষ ক'রে তপতীর শেখানোর গুণে। সবাই অবাক হ'ল ওর উৎসাহ তথা প্রতিভা দেখে। স্যর মেলারাম তো উচ্ছ্বসিত। কেবলই বলেন হায় হায় ক'রে "এমন মেয়েকে ভগবান্ গড়েছেন কি বিদেশে বিভুঁয়ে নাক টিপে দমবন্ধ হ'য়ে থাকতে?" হরদয়ালজি আরো এককাঠি, বললেন অসিতকে: "ঠিক কথা দাদাজি। তাই আসুন একটা আপোষ হোক। ও ফি বছর তিনমাস দমবন্ধ যোগিনী হ'য়ে থেকে ফিরে এসে বাকি নমাস এখানে প্রাণখোলা মোহিনীর পার্ট করুক—যা ওর স্বধর্ম—এ তো আপনাদের গীতায়ও আছে—নয় কি—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ? আমরাও একটু আধটু গীতার অন্দরমহলের খবর রাখি, দাদাজি। তাই ভাঁওতা দিতে পারবেন না ব'লে যে, গীতায় শুধু নাকের ডগায় দৃষ্টিকে বেঁধে রাখার কথাই আছে। বলতে কি গীতা তো স্পষ্টই বলেছেন যে, যেকাজ আমাকে মানায় না সে-কাজ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কেননা স্বভাব কিছুতেই বাগ মানবে না, নাজেহাল ক'রেই আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে—যা করতে না পেলে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—বলে নি?"

স্যর মেলারাম হেসে টিপ্পনি করলেন: "দাদাজি, হরদয়ালের কথা ধরবেন না। ও গীতা ক'ষে পড়ে শুধু নিজের যা প্রাণ চায় তাই করতে, আর ধার্মিকদের সঙ্গে মার মুখো হ'য়ে তর্ক করতে। সাফাই-ও তো রয়েছে খোদ গীতারই—যায় প্রাণ যাক মার মার কাট কাট করার নামই বীরের ধর্ম—এ না করলে মন্দ

* স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। (গীতা ১৮।৬০)

লোকে সন্দ করবে যে তুমি কাপুরুষ, ক্লীব যাচ্ছেতাই······and so on and so forth.

এমন সময়ে চাকর একটি চিঠি দিয়ে গেল অসিতকে। তপতী খামের দিকে চেয়েই ব'লে উঠল "সাধুদা?"

স্যর মেলারাম: মানে—প্রেমল বাবা?

অসিত "হ্যাঁ ব'লেই উঠে চ'লে গেল তপতীকে ইশারা ক'রে। ঘরে ফিরে দুজনে মিলে পড়ল:

ভাই অসিত,

তোমার চিঠি পেয়েছি। প্রণব এখন ভালো আছে অনেকটা, তবে কেবলই কুডাক ডাকছে যে, ওর মুক্তির দিন আসন্ন। ললিতার তাই মন খারাপ—আরো এই জন্যে যে, তাকেও ফোলা পা নিয়ে ভুগতে হচ্ছে সাংঘাতিক। তবে এসব কথা ব'লে ফল কি? তুমি সাভয় হোটেলে খাওয়া দাওয়া নাচগান অভিনয় দহরম মহরম নিয়ে পরমানন্দে আছ তোমাকে কেনই বা পিছুডাক দেওয়া?

না ভাই, এ আমার ক্ষোভের "খোঁটা" নয়। কারণ ললিতা একটা কথা ঠিকই বলে: যে, তোমাকে বা তপতীকে নিছক যোগের গুরুগম্ভীর ছকে বসিয়ে কাজ হাসিল হবে না। তোমাদের দুজনেরই চরিত্রের অনেকগুলি দিক আছে যাদের প্রত্যেকটিই মন টানে যদিও তপতী এত ভালো অভিনয় করতে পারে এ জানতাম না। তবে এ-ও তো তাঁরই লীলা ভাই! কাজেই আমি আপত্তি করব—এ-ভয় তুমি করলে কী দুঃখে? আর তোমাকে রুখে উঠে "সাবধান" বলবই বা কেন—যখন তোমাকে সাবধান করার জন্যে স্বয়ং তোমার গুরুদেব বিদ্যমান! তিনি যখন নাটক ক'রে তাঁর আশ্রমের জন্যে টাকা তোলার সমর্থন করেছেন তখন তোমার ভয় কি? তাছাড়া স্যর মেলারামের মতন ভক্তের সঙ্গ পাচ্ছ এ-ও কি কম কথা। আমি তাঁকে জানি না বটে, তবে সুরথদা তাঁর বিশেষ বন্ধু, বলে তাঁর মতন দিলদরিয়া সদাশয় ও সদাচারী ধার্মিক সে ধনীদের মধ্যে আর একটিও দেখে নি। কেবল আমার দুঃখ হয় ভাবতে যে, তাঁর মেয়েকে তিনি হাণ্ড্রেড-পার্সেন্ট যোগিনী বনতে দেখলে গভীর দুঃখ পাবেনই পাবেন—তা মুখে হাজার বলুন না কেন যে, মেয়ে যে-ঘরে জন্মেছে সে-ঘরের ঘরণী সে নয় নয় নয়। তবে বাঁচোয়া এই যে, তিনি তার ভাবসমাধি চাক্ষুষ করেছেন—এ-ঘোর ইন্দ্রিয়বাদী যুগে seeing-ই হ'ল

believing-এর ঘটক, বটেই তো। শুধু তাই নয়, তিনি হিন্দি তথা উর্দুর রসজ্ঞ, তাই মেয়ের মুখে অপূর্ব 'গোবিন্দ লীনো মোল' আবৃত্তি শুনেছেন—তুমিও নিশ্চয়ই এ-গানটি সুর দিয়ে ওঁকে শুনিয়েছ? মরুক গে, শ্বশুর মেলারামের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার আমার না আছে সময়, না যোগ্যতা। আমি শুধু জানাতে চাই—ললিতা হিন্দি গানটি প'ড়ে অবধি কেবলই আমাকে বলছে—"দেরি কোরো না, দাদাকে লিখে দাও পত্রপাঠ এর বাংলা অনুবাদ ও স্বরলিপি পাঠাতে, আমি গাইবই গাইব।" জানোই তো—একবার উজিয়ে উঠলে ওকে ঠেকায় কার সাধ্য? ও তপতীর একটি গান প্রায়ই গায় হিন্দি ও বাংলায় (তুমিই ওকে আর তপতীকে এক সঙ্গে গান দুটি শিখিয়েছিলে কলকাতায় গঙ্গাতীরে—মনে পড়ে?):

বাবুলকা ঘর ছোড় পিয়াঘর মীরা আজ চলী
(অব) কোই ন রোকনহার, পিয়া ঘর মীরা আজ চলী।

তবে ও বাংলা অনুবাদে এ গানটি গাইতে বেশি রস পায়:

স্বজনের ঘর ছেড়ে আজ মীরা প্রিয় অভিসারে ধায়।
কে রুধিবে তারে—যবে সে অধীরা প্রিয়-অভিসারে ধায়?

আজ আর বেশি লিখব না ভাই। নানা কারণে মনটা একটু উদ্বিগ্ন আছে। তাই আরো তোমাদের খবর চাই মন ভালো করতে লিখো লিখো লিখো—তপতী কী কী গান আবৃত্তি করল আর তুমি কেমন গাইছ। ললিতা আমাকে কেবলই বলছে—তোমাকে অনুরোধ করতে যে তুমি এ-গানগুলির অনুবাদ তাকে পাঠাও যতগুলি গানের পারো—the more the merrier—অন্ততঃ "গোবিন্দ লীনো মোল" গানটির। এ-গানটি ললিতার কী যে ভালো লেগেছে! প্রণবেরও। ইতি।

তোমার স্নেহবদ্ধ

প্রেমল

আট

সাত দিন পরে অসিত লিখল :

ভাই প্রেমল,

Arms and the Man খুবই জমেছিল। তোমার হয়ত ভালো লাগত না তপতীকে চকোলেট ক্রীম সোলজার হ'য়ে সিগারেট ফুঁকতে দেখলে, বা অম্লানবদনে "No, damn your horse!" বলতে শুনলে। কিন্তু লোকে খুব উপভোগ করেছে শ-র নানা রসিকতা ও repartee।

হ্যাঁ, আমি "গোবিন্দ লীনো মোল" গানটির শুধু অনুবাদ করা নয়, বাংলায় সুরটি শিখিয়েছিলাম কয়েকটি পাঞ্জাবী মেয়েকে। অভিনয়ের আগে তারা এ গানটি প্রথমেই গাইল আমার সঙ্গে। তারপর আমি পাঞ্জাবী শ্রোতাদের অনুরোধে একলা গাইলাম মূল হিন্দি ভজনটি তান টান দিয়ে—অনেক্ষণ ধ'রে। সবশেষে গাইলাম তুলসীদাসের বিখ্যাত রামভজন "ভজ মন রামচরণ সুখদায়ী।" স্যর মেলারাম ভক্ত লোক, মানতেই হবে। তপতী বলল : গানের সময় কেবলই চোখ মুছেছেন। সত্যিই চমৎকার মানুষ কেবল ঐ এক দুঃখ তাঁর যে, মেয়ে যোগিনী হ'তে চলল। এ আর এক উদাহরণ সেই চিরন্তন প্রহেলিকার : একই মানুষের মধ্যে কত রকম স্ববিরোধী ভাবের খেলা চলে—কখনো এ প্রকট হয় কখনো ও, কখনো বা দুই-ই যুগপৎ—পাশাপাশি! ওঁকেই দেখ না কেন : গর্বের ওঁর সীমা নেই যে, মেয়ে ভাব সমাধিতে এমন সব চমৎকার চমৎকার গান বাঁধে। না বাঁধলে পিতৃগর্ব তো কিছুটা অন্ততঃ কম হ'ত। অথচ সেই সঙ্গে এ সব গান সংসারীর মুখে মানায় না মনে ক'রে উনি বিষম অস্বস্তি বোধ করেন। গুরুগ্রন্থ পড়তে পড়তে ওঁর বুকে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে, কিন্তু তার পরেই যেন মনে হয়—করছি কি? এ উচ্ছ্বাস কি মানায় আমার মতন বিষয়ীর মুখে?

ভালো কথা : গুরুদেব টেলিফোন ক'রে আমাকে ভরসা দিয়েছেন যে, নাটক অভিনয় ক'রে তপতীর সাধনার ক্ষতি হবে না। তবে আমার বেশ একটু ক্ষতি হয় রকমারি লোকের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতে—আরো এইজন্যে যে এভাবে ভোজের পর ভোজ চলতে থাকলে আমার মনটার কোথায় যেন

বেঁধে—এ করছি কী? তবে মনকে নিয়ে আমাকে এভাবে ভুগতে হয়েছে তো শুধু এ-পরিবেশেই নয় ভাই—বরাবরই—যেখানেই আনন্দের হর্‌রা বইয়েছি আমার গানে গল্পে দহরম মহরমে। এর বিহিত কী করব ভেবে পাইনি এখনো। তবে আশা করি একদিন না একদিন মিলবেই এ-সমস্যার সমাধান, আর আমার মনে হয় কি জানো?—যে, মিলবে তপতীরই মাধ্যমে। নানা সময়ে তোমার নানা ধমকে আমি দ'মে গেলেও তোমার একটি কথায় অন্ততঃ আমি ভরসা পেয়েছি প্রচুর: যে, ও আমার সাধনসঙ্গিনী হ'তে এসেছে আমার সাধনাকে উঁচু দিকে ঠেলতেই, নিচু দিকে টানতে নয়।

যাই হোক এখানকার খেলা সাঙ্গ হ'ল। টাকা উঠেছে আশাতীত—পাঁচ পাঁচ হাজার। আর সবরকমের লোকই খুশী হয়েছে: যারা ভজনে আনন্দ পায় না তারা নাটক দেখে, আর যারা শ-কে পছন্দ করে না তারা গান শুনে। তবে পাঁচমিশেলির এ-সুবিধে তো আছেই—নৈলে আর বৈচিত্র্য বলেছে কেন?

এ চিঠির উত্তর তুমেলেই দিও। আমরা কাল কি পরশু রওনা হব। তোমাদের সব খবর দিতে ভুলোনা।

ইতি। স্নেহ ঋণী অসিত।

পুঃ। 'গোবিন্দ লীনো মোল' গানটির অনুবাদ ও স্বরলিপি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ললিতা চেয়েছে, না পাঠিয়ে পারি?

অষ্টম পর্ব

(চার বৎসর বাদে)

এক

অসিত তপতীকে নিয়ে যখন ডুমেল আসে তখন তার সত্যিই একবারও মনে হয় নি যে, শিষ্যা পুরোপুরি গুরুমুখী হ'য়ে সংসারবিমুখ বৈরাগ্যকে আপ্রাণ আঁকড়ে ধরবে। ভেবেছিল—হরদয়ালজি ঠাট্টা ক'রে যে-কথা বলেছিলেন তপতী তা-ই করবে: অর্থাৎ, তিন চার মাস ডুমেলে গুরুগৃহবাস ক'রে বাকি সাত আট মাস শোভা পাবে হয় পতিগৃহে আদরিণী গৃহিণী রূপে, না হয় পিতৃগৃহে গৌরবিনী কর্ত্রী রূপে। অসিতকেও মেলারামজি অনুরোধ করেছিলেন—"প্রতিবৎসর অন্ততঃ একমাস ক'রে মুসুরিতে ভজন ক'রে সংসারীদের শূন্যচিত্ত ভগবানের কৃপাধন্য করতে।"

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর—প্রায় প্রতিপদেই বিশেষ ক'রে অধ্যাত্ম জগতে। তপতী এ সূত্রের একটি মূর্তিমতী টীকা হ'য়ে দাঁড়াল মাসখানেকের মধ্যেই। স্পষ্ট লিখে দিল দৌলতরামকে যে, সে আর গার্হস্থ্য জীবনে ফিরে যাবে না, তবে উপস্থিত দুই ছেলের দেখাশোনা করতে রাজী আছে যদি তাদের ডুমেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (বলা বাহুল্য তপতীর এ-প্রস্তাবে স্বামী স্বয়মানন্দের সায় ছিল।)

দৌলতরাম তথা মেলারামজির মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়ল। অবশ্য মেলারামজি মুসুরিতে কথা দিয়েছিলেন চোখের জলে যে, তপতীকে তিনি সংসারের গোয়ালে মাথা মুড়ুতে পীড়াপীড়ি করবেন না। একাধিকবার বলেছিলেন যে, প্রেমলবাবার একটি উপমা তাঁর মন নিয়েছে: যে, দীপশিখা মাটির প্রদীপে জ্বললেও তার আত্মীয় মাটি নয়—আকাশের দীপালিকা। কিন্তু উচ্ছ্বাসের মাথায় মানুষ যা বলে তাকে উচ্ছ্বাস কেটে গেলে তেমনি অবাস্তব মনে হয় যেমন রঙিন স্বপনকে মনে হয় ধূসর জাগরণে। তাই তিনি তপতী আর ফিরবে না শুনে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তাকে চিঠির পর চিঠি লেখা সুরু করলেন তার গার্হস্থ ধর্ম ও গৃহচর্চার কর্তব্য সম্বন্ধে রকমারি গুরুগম্ভীর উপদেশ দিয়ে। হরদয়ালজি টেলিফোনের পর টেলিফোনে ওকে মিনতি জানালেন। দৌলতরাম টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। কিন্তু বৃথা: তপতী অচল অটল। যে-মন ওর সংসারের রঙে রঙিয়ে উঠে দুদিন আগে সেই রঙকেই শ্রেষ্ঠ রঙ মনে করত, সে

যোগজীবনের রঙে রঙিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বদ্‌লে গেল: লিখল দৌলতরামকে যে, মীরা ওকে একটি গান দিয়েছেন যা থেকে ও নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি আলো পেয়েছে—আর এ-আলো যেমন তেমন আলো নয় এর যথার্থ নাম—দিশারি আলো। গানটি এই:

প্রেমকা রঙ্গ ভরা নৈনোঁমে, প্রেমকা কিয়া সিঙ্গার।
নাচত গাবত রঙ্গ দূঁ গোকুল, রঙ্গ দূঁ সব সংসার।
একবার জো ডালে রঙ্গ বহ, যুগ যুগ ছুটে নাহী।
বো হী রঙ্গ পাবন আঙ্গ॥*

এবার দৌলতরামও স্রেফ ভুলে গেল—সে একদা অসিতকে কী বলেছিল সকৃতজ্ঞে: যে, অসিতই তার গুরুশক্তিতে রঙিয়ে ফুটিয়ে নন্দিতা ক'রে তুলেছে এমন শিশ্যাকে যে সংসারের হাজারো সুখবিলাসেও কোনদিন সুখী হয় নি। মনের এক মেজাজে যে-দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্য মনে হয় তাকে মনে হয় মায়া কল্পনা সে-মেজাজ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে। দৌলতরাম রুষ্ট হ'য়ে লিখল:

"তোমার এ-ঝোঁক সাময়িক—ধোপে টিঁকবে না। তাই তুমি ফিরবেই ফিরবে জেনে আমি ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করব। উচ্ছ্বাস আবেগ ছুটে যেতে না যেতে তুমি দেখতে পাবেই পাবে যে যাকে শ্যামের বৈরাগী রঙ ভাবছ সে আসলে নেশার রঙ—ধর্মের নয়। গৃহিণীর পক্ষে, মা-র পক্ষে, স্ত্রীর পক্ষে যোগাশ্রমের ধূসর রঙ পরদেশী, অপলকা বিষবৎ পরিহার্য······" ইত্যাদি।

অসিত কী করবে ভেবে না পেয়ে গুরুদেবকে লিখতে যাবে এমন সময় শুনল তিনি অসুস্থ—ফের "চাতুর্মাস্যের আইভরি টাওয়ারে" অজ্ঞাতবাস করবেন। অগত্যা সে ফের প্রেমলকে লিখল সব কথা জানিয়ে। উত্তর দিল ললিতা:

"দেখলে তো দাদা, দেখলে তো স্বচক্ষে—তোমাকে কী ভাবে ঠাকুর ফাঁসালেন? তিনি কি শুধু রঙ দিয়েই ছাড়েন? না: হাবভাবেও মন কাড়েন তিনি। তাই না তপতী এমন বদ্‌লে গেল দেখতে দেখতে।

"তবে মিথ্যা বলব না দাদা ও যে ঠাকুরের রঙে এমন রাতারাতি রঙিয়ে

*প্রেমের রঙে এ-নয়ন রঙায়ে প্রণয়ের প্রসাধনে
নেচে গেয়ে রাঙা করিব গোকুল—লালে লাল এ ভুবনে।
একবার যদি দেয় রঙ শ্যাম—হয় না আর তো ম্লান:
সেই রঙেই রঙাব প্রাণ।

উঠবে আমিও সত্যিই ভাবি নি। তাই আমার ওর প্রতি শ্রদ্ধায় এবার খানিকটা সমীহের ছিটেফোঁটা লাগল—যার সাহেবি নাম awe! বাস্তবিক, ও যে বৈরাগ্যের পথে এত দ্রুতবেগে রণ্ডিয়ে উঠবে কে ভেবেছিল?—তবে এ-ও তো তাঁরই কারসাজি দাদা—ভাগ্য ভাগ্য ভাগ্য! মনে পড়ে ওরই একটি অপূর্ব গান তুমি পাঠিয়েছিলে সেদিন:

মিলো কলঙ্কসো ঝুমর বনয়ো মাথেকা সিঙ্গার:
মোহ কী বেড়ী ঝাঁঝর হো বাজি নূপুরকী ঝনকার।

আমি এর অনুবাদ করেছি—জানো কি?—

কলঙ্ক হ'ল সিঁথির সিঁদুর মাথার মণি শোভার:
মোহ শৃঙ্খলও হ'ল কিঙ্কিণি পায়ে পায়ে ঝঙ্কার।

"একেবারে অক্ষরে অক্ষরে দাদা! যে-ই একবার তাঁর বাঁশির ডাকে সাড়া দিয়েছে তাকেই এই কলঙ্কের পসরা বইতে হয়েছে, নিরাশার কাঁটাবনের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে ঢিটিক্কারকে সিঁথির সিঁদুর ক'রে। কারণ মোহশৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বেজে ওঠে কেবল ঐ একই সর্তে: তাঁর জন্যে শুধু সব ছাড়ার দুঃখই নয়, অপযশের টিপকেও জয়তিলক ব'লে বরণ না করলে লক্ষ্যসিদ্ধি হয় না, হয় না, হয় না,। তপতী যে এ পেরেছে এ-জন্যে তাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার। বোলো ওকে। ইতি।

তপতীর স্নেহধন্যা দিদি ললিতা।

"পুনশ্চ। হ্যাঁ, 'আর একটা কথা: তুমি তার নানা যোগবিভূতির খবর দিয়েছ তোমার হাল আমলের দুতিনটি চিঠিতে। এ-সবই ওর আধারের অসামান্যতার চিহ্ন—মানি। কিন্তু আরো ঢের বড় চিহ্ন ওর এই ঘরছাড়া—যাকে সাহেব পুরাণ বলে: burning one's boats"

* * *

এই সঙ্গে প্রেমলেরও এক দীর্ঘ পত্র:

ভাই অসিত,

তপতীকে আমার আশীর্বাদ তথা অভিনন্দন দিও। ললিতার সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত: ও উচ্চকোটির সাধিকা—একশোবার। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে এখন আর বেশি কিছু লিখব না। কারণ আমি জানি ওর পরীক্ষার এই তো সবে আরম্ভ। আরো অনেক আরামবাগ ছেড়ে দুর্গম পথের পথিক হ'তে হবে,

মায়ামোহের রংমহল ছেড়ে শূন্যতার মরুপার হ'তে হবে। তাই অপেক্ষা করব আর প্রার্থনা করব যেন ও পারে প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে—পরমহংসদেবের ভাষায়—ভাবের ঘরে চুরি না ক'রে।

আজ তোমার আর একটা (দুর্ধর্ষ) প্রশ্নের উত্তর দিতে কলম ধরেছি। ফের একটু বকতেই হবে তোমাকে—কী করি বলো? তুমি যে বুঝেও বুঝতে চাইছ না—কেন অবিশ্বাসকে আমল দেওয়া সর্বনেশে। প্রশ্ন করেছ বেশ প্রসন্ন মুরুব্বিয়ানার সুরেই কবি এ-ই কি মিথ্যা বলেছেন :

They are but the slaves of light
who have never known the gloom ?"

শ্লোকটা বোধহয় তোমার মনে এত বেশি বসেছে তপতীর "গ্লুম"-কে বাহবা দিতে চাও ব'লে, তাই না? (এটা আমার অনুমান কিন্তু) কিন্তু ভাই, এ-ধরণের কাব্যিয়ানা খতিয়ে হ'য়ে দাঁড়ায় অসুরদেরই ওকালতি—যদিও অজান্তে —কারণ বিশেষ ক'রে সাধনার পথে সংশয়ের সমর্থন হ'ল ছদ্মবেশে বাধারূপী অসুরদেরই আস্কারা দেওয়া।

তুমি রুখে উঠে লিখেছ : সব অবিশ্বাসই কি মন্দ, আর বিশ্বাস সবই শ্রীমন্ত? তাহ'লে কি বলবে হাঁচি টিকটিকি জাতীয় কুসংস্কারও বিশ্বাস্য?

শোনো ভাই, একটু শান্ত মনে। "কুসংস্কার" বলতে না বলতে শিরপা তুলো না। বলো তো আমাকে—যদি কেউ সরলভাবে এসব বিশ্বাস করে, তার ক্ষতিটা হয় ঠিক কতখানি আর কোথায়? চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারো কি আমাকে? কিন্তু উল্টোদিকে ভগবানে, গুরুবাক্যে সাধুদের আশীর্বাদে বিশ্বাস না থাকলে মানুষ যে দিশাহারা অশান্ত হ'য়ে শেষে তিতিবিরক্ত (সিনিক) হ'য়ে পড়ে এর আমি অগুন্তি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। তোমার নানা বুদ্ধিমন্ত বন্ধুদের দৃষ্টান্তই নেও না। বুদ্ধির যুক্তির উল্টো পাল্টা ঝড়তুফানে দিগ্বিদিক ছুটে শেষটা কি তাঁরা কোনো স্থির লক্ষ্য বা তীর্থের খবর পেয়েছেন যেখানে তাঁদের অশান্ত মন জুড়োতে পারে, সংসারের হাজারো ভুল ভ্রান্তি দুর্বাসনার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁদের মধ্যে একজনও বলতে পারে,—'আমি অভয় পেয়েছি?' না, পারে না। আর কেন পারে না জানো? কারণ অবিশ্বাস মানেই—মনের সব দোরজানলা বন্ধ ক'রে দেওয়া যার ফলে ঠাকুরের আলো হাওয়া ঢুকবার পথ পায় না। আঁধার ঘরে বাতি জেলে বা বন্ধঘরে

বিজলি পাখা চালিয়ে কি কখনো খোলা আলো হাওয়ার আনন্দ আরাম মিলতে পারে ভাই? অন্যদিকে ভুল বিশ্বাসে ক্ষতির পরিমাণ কতখানি বলবে আমাকে? অমুক কেউ হাঁচলে দুবার ব'সে যায়? গেলেই বা কী যায় আসে—যদি তার মহৎ বিশ্বাস থাকে—যদি সে সর্বান্তঃকরণে মানে যে, স্বার্থের চেয়ে পরার্থ নিষ্ঠায় মানুষ ধন্য হয়? যে অতি-বিশ্বাসী পরের প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ দেয় তাকে তোমার পছন্দ না যে অবিশ্বাসী বুদ্ধিবাদীর কারুর জন্যে প্রাণ কাঁদে না তার দীপ্ত নাস্তিক মনকে তুমি গদ গদ হ'য়ে বরণমালা দেবে? অসিত মানুষ যতই হাঁকডাক করুক না কেন, কিছুদিন পরে সবাই ঠেকে শেখে যে, বড় বড় বোলচালে চমক জাগানো সম্ভব হ'লেও কোনো মহৎ পাথেয়ই মেলে না। আসলে নানা সংস্কৃতি বা কালচারের আস্ফালনই খতিয়ে বাঁকা বুলি মাত্র। কিন্তু বরণীয় মহনীয় বিশ্বাস হ'ল—সৎপথে থাকা ভালো ব'লে মানা, কাউকে কখনো ঠকাবো না পণ নেওয়া, পরের দুঃখে সাহায্য করতে চাওয়া, মহৎকে প্রণাম করার তৃষ্ণা, শ্রদ্ধাকে বরেণ্য ব'লে বরণ করার সংকল্প—এইসব। তুমি যে-সমস্ত হাল আমলের বিলিতি বুলি কপ্‌চে মনে করছ—তাদের উদ্‌গাতারা হ'লেন গভীরদর্শী নবীর দল, যে সব বুলি প্রায়ই কথার কথা ভাই, দুচারজন মান্য গণ্য বক্তার ধ্বনির সঙ্গে অজস্র জনগণমনের প্রতিধ্বনি জুড়ে তাল পাকিয়ে ওঠে ব'লেই তারা হ'য়ে ওঠে এত জোরালো যে লোকে মনে করে অকাট্য। যথার্থ চিন্তাশীল সত্যান্বেষীর সংশয় অন্য জাতের—বলতে কি, তাকে ঠিক সংশয় বলা চলে না, বলা উচিত—জিজ্ঞাসা। তাই বলছি তোমায়—শাস্ত্রের কথা অবিশ্বাস কোরো না, কোরো না, কোরো না: যোগবিভূতি শুধু যে আছে তাই নয়, যোগীরা যে-মুহূর্তে আত্মাভিমান থেকে মুক্ত হ'য়ে ঠাকুরের বাহন হন সে-মুহূর্তে তাঁরা যোগবিভূতির শক্তি দিয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারেন। আরো মহত্তর শক্তি হ'ল—সাধুসন্তের আশীর্বাদ, মহাত্মাদের চারিত্র শক্তির প্রভাব, সদ্‌গুরুর কৃপা। এ সব শক্তি দুই-আর দুয়ে-পর-এর ম'ত প্রমাণ করা যায় না জানি, কিন্তু তোমাকেও মানতে হবে যে, যে সব বিশ্বাস অকাট্য গাণিতিক—Mathematical—তাদের তথ্যগত—informative—মূল্য থাকলে থাকলেও তাদের প্রসাদে মানব চরিত্রের এক তিলও উন্নতি হয় না, সে সব খবর জানার আগে অশিক্ষিত মানুষ যেমন হীন ও হিংসুক ছিল সে সব জানবার পরে শিক্ষিত মানুষও ঠিক

তেমনি নীচ ও জঘন্য থাকে। এক কথায়, বুদ্ধিমন্ত বৈজ্ঞানিক এডুকেশনের ফলে গড়পড়তা মানুষ মহত্ত্বের দিকে এক ইঞ্চিও মাথায় বাড়ে না, কি আর্ত জীব এক ফোঁটাও শান্তি সান্ত্বনা আনন্দ পায় না—যেমন পায় সহজ আস্তিক্যে, সরল শ্রদ্ধাবিশ্বাসে, সাধুর আশীর্বাদে, সদ্‌গুরুর স্নেহদীক্ষায়, ভক্তির পুণ্যস্পর্শে।"

অসিত এই ধরণের কথা প্রেমলের চিঠিতে যতবারই পড়ত ততবারই চম্‌কে চম্‌কে উঠত। প্রথম প্রথম তার মনে হ'ত বৈ কি যে, প্রেমল একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলছে বিশ্বাসের গুণকীর্তন করতে গিয়ে, কিন্তু ক্রমশঃ দেখতে পেল যে, সে একটুও ভুল বলে নি—অবিশ্বাস আর সংশয়ই সাধনার সবচেয়ে বড় বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় বারো আনা সাধকের ক্ষেত্রে। তাই ক্রমশঃ ওর মনও সায় দিল প্রেমলের কথায় যে, সাধকের পক্ষে চালাক সংশয় ও বৈজ্ঞানিক অবিশ্বাসকে আমল না দিয়ে সরল অন্ধ শ্রদ্ধা বিশ্বাসের প্রবৃত্তিকে বরণ করাই শ্রেয়।

দুই

এদিকে তপতীর আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনে সুরু হ'ল এক নতুন পর্ব—একের পর এক নানা অতীন্দ্রিয় দর্শন শ্রবণের প্রত্যক্ষ অকাট্য এজাহারের আবির্ভাব। তপতী আসার আগে ও গুরুদেবকে মাঝে মাঝেই লিখত: "যোগবিভূতির সম্বন্ধে হাজারো জনশ্রুতি শুনেছি গুরুদেব, এবার কিছু দেখালে মন্দ হয় না। এ নিছক কৌতূহল নয়। নানা অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞা—intuition—যে যোগদীক্ষায় বিকশিত হয় এ জানাও তত্ত্বজিজ্ঞাসার পর্যায়েই পড়ে তো।" ···গুরুদেব কেবল একদিন হেসে বলেছিলেন: "যখন সময় হবে দেখতে পাবে বাবা, ভেবো না। ঠাকুর জানেন কখন কাকে কী পথ্য দিতে হয়। এখন যদি যোগবিভূতির দেখা পাও হয়ত এত তড়পে উঠবে যে, হাত পাও ভাঙতে পারে।"

তপতীর অভ্যাগমের পর ওর যেন এই বহুবর্ষলালিত প্রার্থনার উত্তর মিলল। ও লিখত, বিশেষ ক'রে প্রেমলকে, তপতীর মাধ্যমে অমুক তমুক অঘটনের কথা—গুরুদেবকেও লিখত অবশ্য, কিন্তু প্রেমলকে লিখেই বেশি

তৃপ্তি পেত। একথা গুরুদেবকে একদিন জানাতে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন: "এতে কিছু অন্যায় হয় নি, অসিত, আরো এই জন্যে যে, যোগবিভূতি সম্বন্ধে প্রেমলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে—তোমার কোথাও ভুলচুক হ'লে সে ধরিয়ে দিতে পারবে।"

কথাটা সত্য: প্রেমল ওকে বরাবরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখত যে, এসব অঘটন সত্য হ'লেও এসব শক্তির চমকে মুগ্ধ হ'তে নেই, সোজা ভগবানের দিকে এগিয়ে চলাই পন্থা। একথা অসিতও যে জানত না তা নয়, কিন্তু তবু অঘটনকে প্রত্যক্ষ করার বিস্ময়ে তার মন এত উল্লসিত হ'য়ে উঠত যে বলব না বলব না ক'রেও নানা বন্ধুকেই ব'লে ফেলত। কিন্তু ফল সব সময়ে ভালো দাঁড়াত না। তাদের মধ্যে কেউ বা "মিরাক্ল"-কে হেসে উড়িয়ে দিত কল্পনা ব'লে; কেউ বা বলত বিজ্ঞ ভঙ্গিতে যে, অসিত নানা সস্তা "সিদ্ধাই"-এর ফেরে প'ড়ে ডুবল ব'লে; কেউ বা এসব অঘটনের ব্যাখ্যা করতে না না পেরে রেগে আগুন হ'য়ে রটিয়ে বেড়াত যে, এসবই সেই old old story তিলকে তাল ক'রে লোকের তাক লাগিয়ে বাহাদুর বনবার অপচেষ্টা। কয়েকবার এই ভাবে ঘা খেয়ে অসিত যাকে তাকে সরলভাবে এসব অঘটনের কথা বলা ছেড়ে দিল, তবে এসব অঘটনকে ভিত্তি ক'রে নামধাম বদলে গল্প লিখে প্রেমলকে পাঠাত। উত্তরে প্রেমল বড় একটা সাড়া দিত না, কিন্তু ললিতা দিত সোৎসাহে, আর ঐ সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজের কোনো কোনো অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা তপতীকে লিখে জানাত। এই সূত্রে ললিতার সঙ্গে অসিত ও তপতীর অন্তরঙ্গতা আরো গভীর হ'য়ে উঠল।

কিন্তু বাইরের লোকে এ সম্বন্ধে অসিতের উচ্ছ্বাসকে প্রায়ই ভুল বুঝত। অসিত তপতীর নানা যোগবিভূতি দেখে মুগ্ধ হ'লেও সত্যিই "অভিভূত" হয় নি কোনোদিনই। তপতী ওকে প্রায়ই বলত যে, তথ্য হিসেবে যোগ-বিভূতির নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে গবেষণার মূল্য থাকলেও হৃদয় চায় কেবল দুটি মধু-স্বাদ—দৈবী করুণার তত্ত্ব আর শুদ্ধা ভক্তির রস। প্রেমলকে একথা লেখাতে সে খুশী হ'য়ে লিখল যে একথা শুনে সে ও ললিতা উভয়েই অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছে: এই-ই তো চাই, যোগ সাধনার পথে যোগবিভূতি কিছুটা আলো দিতে পারলেও অন্তিম লক্ষ্যসিদ্ধি হ'তে পারে কেবল পরা ভক্তিতে। তাই সাধনার শ্রেষ্ঠ সোপান ভজন—বিভূতি কি সিদ্ধাই নয়।

অসিতের মন প্রাণ এ কথায় সাড়া দিত বৈকি, কেবল তপতীর একটি বিভূতিকে ও বড় ক'রে না দেখেই পারত না: তার নানা ভজন শোনা ও প্রাণকাড়া পদাবলী নির্ভুল আবৃত্তি করা। দিনের পর দিন সে ভাবসমাধিতে শুনত চমৎকার চমৎকার হিন্দি মীরাভজন আর ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হওয়ার পরে ভজনগুলি অনর্গল আবৃত্তি ক'রে যেত। তপতীর ভাষা ছিল উর্দু, তাই কেমন ক'রেও দীর্ঘ হিন্দি ভজন ও মনে রাখত—অসিত ভেবে পেত না।

কিন্তু এ বিস্ময়ের আনন্দের চেয়ে ও বড় আনন্দ ছিল ভজনগুলির সৌন্দর্য। ছন্দে সাবলীল, মিলে নিখুঁৎ, ভাবে গভীর ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এমন তৃপ্তিকর তথা কবিত্বময় হিন্দি ভজন অসিত আর কখনো শোনে নি। কোনো কোনো ভজন অসিত ললিতাকে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে বাংলা অনুবাদ ক'রে পাঠাতো। বাকি সব ভজন অসিত নিজেই অনুবাদ করত বাংলায় বা ইংরাজীতে। ওর মন আনন্দে আরো উজিয়ে উঠত—মাঝে মাঝে গুরুদেবও ভজনগুলির তারিফ ক'রে ওকে চিঠি লিখতেন ব'লে। শুধু তাই নয়—আশ্রম প্রেসে তিনি এ-ভজনগুলি ছাপাবারও অনুমতি দিলেন। অগত্যা ওর সন্দিহান গুরুভাইরাও অনেকে ওর মুখে ভজনগুলি শুনতে আসতেন। তপতীর অভ্যুদয়ে যাঁরা অপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ মানতেন—অন্ততঃ মুখে—যে ভজনগুলি অনবদ্য।

অসিত এ-ভজনাবলির মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ ভক্তির পাথেয় ও আনন্দের প্রেরণা পেত। (পরে গ্রামোফোনেও তপতীর কয়েকটি ভজন গেয়েছিল। তাতে বাইরের অনেক বোদ্ধাও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওকে লিখতেন—এসব গান গ্রামোফোনে আরো গাইতে।)

কিন্তু আশ্চর্য, তপতী এ সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। সে চাইত কেবল একটি জিনিষ—গুরুসেবা। ভজনগুলি শোনবার বা আবৃত্তি করবার সময়ে যে সে আনন্দ পেত না তা নয়—(ভালো সঙ্গীতে ও কবিতায় সে মুগ্ধ হ'ত ছেলেবেলা থেকেই)—কিন্তু কৈশোরেই এক দুর্বোধ্য বৈরাগ্যমুখী বৃত্তি তাকে যেন ছিনিয়ে নিয়েছিল সমস্ত ঐহিক কীর্তির মোহ থেকে। সে প্রায়ই বলত অসিতকে যে, আশৈশব তাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করত কারমেলাইট নান্-দের কৃচ্ছ্রসাধন। ওর এক ক্যাথলিক স্কচ সখী বাঙ্গালোরে একটি 'নানারি'-তে আশ্রয় নিয়েছিল। তার আচারিপনা, কৃচ্ছ্রসাধন, ঐকান্তিকতা—

সর্বোপরি, পবিত্রতা ও সংসার বিতৃষ্ণা প্রবল ভাবেই ওর মন টানত। একদিকে গুরুনানকের প্রতি ভক্তি—যিনি গৃহী হ'য়েও মহাভাগের পদ পেয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন সংসারকেই ভগবানের সাধনপীঠ ব'লে বরণ করতে (অসিতের কাছে তপতী প্রায়ই গুরুগ্রন্থ পড়ত 'গুরুমুখী' ভাষায়—অসিত ও গুরুনানকের নানা বাণী অনুবাদ করত ইংরাজী ও বাংলা কবিতায়): অন্যদিকে কার্মেলাইট নানাদের নানা বৈরাগ্যবাণী: Vanity of vanities, all is vanity ......In the midst of life we are in death......The fashion of this world passeth away.. ...Vain is the help of man *—এ দুই স্ববিরোধী প্রবণতা ওকে সময়ে সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন অতিষ্ঠ ক'রে তুলত যে, ওর মনে হ'ত বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাবে যেখানে দুচক্ষু যায়। অথচ কেন যে ওকে নিয়ে দুই শক্তি টানা ছেঁড়া করত ও সত্যিই ভেবে পেত না।

দুমেলে আসার পরে গুরুদেব অসিতকে তিন চারটি পত্রে বুঝিয়ে লেখেন—কেন এমন হ'ত! সেসব চিঠির কপি আসতে সানন্দেই পাঠিযে দিত প্রেমলকে। তপতীও থেকে থেকে ওর আশ্রম-জীবনের কথা গুছিয়ে লিখত ললিতাকে। একবার প্রেমল লিখেছিল: যারা উচ্চবিকশিত চেতনা নিয়ে জন্মেছে তাদের মধ্যে প্রায়ই এরকম নানান্ স্ববিরোধী বৃত্তির লীলাখেলা দেখা যায়। ললিতা কিন্তু এসব হেঁয়ালির তল পেতে আদৌ চেষ্টা করত না। লিখত তপতীকে এসব নিয়ে মাথা না বকিয়ে একটানা শুধু গুরুসেবা ক'রে যেতে। একটি পত্রে লিখেছিল: "ভাই এ-ধরণের নানান অবোধ্য ব্যাপার দিনের পর দিন সব সাধক সাধিকারই জীবনে ঘটে। আমার মধ্যেও বারবারই ঘটেছে, পরেও ঘটবেই ঘটবে যদি বাঁচি আরো দুদিন। সময়ে সময়ে আমারও মনে হয়—এ-পৃথিবীতে জন্মাতে না চাওয়ার যে-তৃষ্ণা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে (যে-তৃষ্ণা দুঃখ পেলে আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে) সে-তৃষ্ণা শুভ ব'লেই ঠাকুর বার বার গীতায় লোভ দেখিয়েছেন: 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—আমাকে পেলে আর ভয় নেই—ফিরে ফিরে জন্মাতে হবে না এ-পৃথিবীতে'। মা-র মধ্যেও দেখতাম এই পুনর্জন্ম চক্র থেকে অব্যাহতি পেয়ে ওপারে যাবার তৃষ্ণা। (মনে পড়ে দাদার মুখে তিনি প্রায়ই

* সবই মায়া মায়া মায়া: জীবনের কেন্দ্রে মরণের বসতি, ঐহিক সবধুমধামই নশ্বর ·মানুষের সহায়তা সবই অলীক···

শুনতে চাইতেন কান্ত কবির একটি গান—'কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে ?) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যদিকেও জোর দিতেন সমানেই—প্রায়ই বলতেন আমাকে : 'গুরু যা চান তাই ক'রে যা না। শুধু চাইতে হবে তাঁর মনের মত হ'তে। তারপর তাঁর ইচ্ছার প্রসাদে (স্বেচ্ছার সব ঝোঁক মিলিয়ে যেতে না যেতে) ঠাকুর তোর গুরুর নির্দেশের মধ্যে দিয়েই তোকে আপন ক'রে নেবেন—তোর মধ্যে দিয়েও নিজের লীলা পোষ্টাই করবেন পরমানন্দে। বাপীও আমাকে বলে প্রায়ই এই কথাই অন্যভাবে; ধমকায় : 'আমি হেন চাই তেন চাই—চোপরাও! তুমি কী চাও না চাও কে জানতে চাইছে? সব আগে ঠাকুর কী চান জানবার চেষ্টা করো—তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অর্থাৎ তিনি চান যে, তুমি তাঁকে জানবে চিনবে দেখবে চাখবে—এ ছাড়া আর সবই হ'ল বাজে কথা—ছাড়ো সে বাগাড়ম্বর।' এ নিয়ে একদিন প্রণবদা তর্ক তুলেছিল : 'ঠাকুর কী চান মা, আমরা যে আদৌ জানতেই পারিনা ছাই।' তাতে মা হেসে বলেছিলেন : 'সেই জন্যেই তো চাই গুরুকরণ—কেন না এক গুরুই আমাদের সব আত্মবঞ্চনার হাঁকডাক থামিয়ে ব'লে দিতে পারেন ঠাকুর সত্যি কী চান। তাই গুরুবাক্য অকুণ্ঠে মেনে নিতে পারলে এমন সুলগ্ন আসবেই আসবে জেনো যখন দেখতে পাবে—ইষ্ট আর গুরু অভেদ। তখন শুধু প্রাপ্তির অঢেল আনন্দ—আর মুক্তির অগাধ শান্তি। সে যে কী শান্তি কী বলব তোদের'……ইত্যাদি। তাই ভাই—আমার কথার যদি কোনো মূল্য থাকে তোমার কাছে তবে মনে রেখো—আমি এই গুরুসেবার পথেই পেয়েছি সংশয় থেকে মুক্তি। না পেলে দেহের এত দুঃখ ও এমন হাসিমুখে বইতে পারতাম কি—যা দেখে কলকাতায় তোমরা এত আশ্চর্য হ'তে?"

ললিতার কথায় তপতীর আনন্দ হ'ত বৈ কি। কিন্তু গুরুসেবার প্রবৃত্তি ওর প্রথম থেকেই এত প্রবল ছিল যে, ললিতার কথাতে ওর নজির করার দরকার হত না—শুধু তার সমর্থনের আনন্দকেই বরণ ক'রে নিত, তা থেকে নতুন ক'রে জোর পেতে হ'ত না। ললিতাকে উত্তরে তপতী লিখেছিল : "তোমার কথার মূল্য দিদি? তুমি কী জানবে তোমাকে আমি কোথায় বসিয়েছি আমার অন্তরে? দিদি, সংসার আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি। কিন্তু কী ভালো লাগা উচিত তার দিশা না পেয়ে ভাবতাম এ-বৈরাগ্য তো শূন্যমুখী—

আত্মঘাতী। তোমাকে দেখে প্রথম উত্তর পেলাম বৈরাগ্য খাঁটি হ'লে তার আগুন কীভাবে আমাদের শুদ্ধ ক'রে, পূর্ণ করে প্রাপ্তির পথে এগিয়ে দিয়ে।"

কী ভাবে তপতী ললিতার প্রেরণাকে গ্রহণ করেছিল তার দৃষ্টান্ত দিতে অসিত একবার প্রেমলকে লিখেছিল :

"তপতী প্রায়ই বলে ললিতার হাসিমুখে দেহের দুঃখ সওয়ার কথা। ওকেও এ-দুঃখ কম সইতে হয় নি। কলকাতায় তো স্বচক্ষেই দেখেছ—থেকে থেকে হঠাৎ কী ভাবে ওর হাঁপানি দারুণ হ'য়ে উঠত। তার উপর সময়ে সময়ে রক্তবমন আর বুকে এমন ব্যথা যে, ওর ঠোঁট নীল হ'য়ে যায়। তখন মনে হয় সত্যিই—আর আশা নেই ; কিন্তু তারপরেই হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে! সে যে কী বিমল হাসি ভাই, কী বলব? বলে—গভীর নিশ্বাসের কষ্টের সময়েও ওর অন্তরে গভীর শান্তির না কি একটুও নড়চড় হয় না!! এ চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতে পারতাম না ভাই!

"কিন্তু ওর গুরুসেবা? এ-তাগিদ এল ওর কোত্থেকে আমি ভেবে পাই না। ও কোনোদিনই গুরুবাদে বিশ্বাস করত না—তোমাকে ও নিজেই তো বলেছে কলকাতায়। তার উপর আমার মতন গুরু! তোমার মতন গুরু হ'লেও বা বুঝতাম। আমি নিজে কখনো যা পারি নি—গুরুবাক্য নির্বিচারে মেনে নেওয়া—ও পারল কী ক'রে? তুমি আমাকে ধমকাতে তাই থেকে কি ছেঁকে নিল নাকি? না, সত্যি বলছি ভাই, সময়ে সময়ে আমার কী যে চিত্তগ্লানি হয়! মনে হয়—এত গুরুভক্তি দিল কি না অপাত্রে, হায় হায়! সোজা গুরুভক্তি! একটা দৃষ্টান্ত দিই। ওর হাঁপানি শীতের সময় বাড়ে। কিন্তু গুরুদেব ওকে বলা সত্ত্বেও ও শীতে আর কোথাও যেতে চায় না। বলে—ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গুরুবরণ করেনি—এসেছে শুধু গুরুসেবা ক'রে ধন্য হ'তে। ভাবতে পারো—বিলাস ছেড়ে এ আশ্রমের দুঃখ বরণ—বিশেষ ক'রে আমাদের আশ্রমে যেখানে কেউ কারুর দরদী নয়! (আমার মনে পড়ে একটি বিখ্যাত গান : 'I care for no one in the world, and nobody cares for me!')

"আর সেবা ব'লে সেবা। ক্রোরপতির মেয়ে রোজ দুবেলা রাঁধে! এ আশ্রমে রান্না অখাদ্য। এখানে তো ললিতা নেই। ও ধরল—ও হবে ললিতা। গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে দুবেলা স্টোভে আমার জন্যে রাঁধবে রকমারি তরকারি। হাজার হাঁপানি হ'লেও শুয়ে থাকবে না—বা রান্নাবান্না বাদ দেবে না।

"আরো আশ্চর্য—ওর টাইপ করা। আমার নানা ইংরাজী কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও টাইপ ক'রে যায় দিনের পর দিন। গত বৎসর পাঁচমাস ধ'রে ৪।৫ ঘণ্টা ক'রে খেটে আমার একটা গোটা উপন্যাসই টাইপ ক'রে ফেলল! সে-সময়ে ওর হাঁপানি প্রায়ই ওকে ভীষণ কষ্ট দিত, কিন্তু ও ভ্রূক্ষেপও করত না। স্বচক্ষে দেখেছি আমি—একটুও বাড়িয়ে বলছি না ভাই—যে, বুকের কষ্টে ওর চোখ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারা নামছে দুগাল বেয়ে—অথচ ও সমানে টাইপ ক'রে চলেছে! আমি বারণ করলে বলে: 'সত্যিই আমার মনে গভীর শান্তি নামে তোমার কাজ করলে—তাতে ক'রে বুকের ব্যথা সওয়াও সহজ হ'য়ে আসে।' এর পরে আর কী বলব বলো?

"আর এক আশ্চর্য অঘটন দিনের পর দিন ঘটতে দেখেছি ভাই—শুধু আমি নই, আমার আরো দু'তিনটি গুরুভাইও দেখেছেন স্বচক্ষে—যে, হঠাৎ বুকের কষ্টে যখন ও এ-পাশ ও-পাশ করে সে সময়ে কখনো কখনো বলে: 'ভয় নেই, শুনেছি এইমাত্র যে, ন মিনিট বাদে ব্যথা চ'লে যাবে—বারো মিনিটে—সতেরো মিনিটে…' আর প্রতিবারই ঘড়ি ধ'রে দেখেছি ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যথা চ'লে যায়—এক মিনিটও এদিক ওদিক হয় না! কী বলব বলো? হতভম্ব হ'য়ে গেছি! গুরুদেবকে সেদিন লিখেছিলাম: 'আপনি ভুল বলেন নি গুরুদেব। আজকাল দিনের পর দিন দেখছি অঘটন। আমার একটি খাতায় লিখে রেখেছি শতাধিক অঘটন তারিখ দিয়ে—খুঁটিয়ে। নাম দিয়েছি—NO REASON CAN EXPLAIN—একদিন না একদিন ছাপবই ছাপব—প্রেমল হাজার রাগ করলেও। কত দূরদর্শন, Prophetic vision, খাম ছুঁয়ে ব'লে দেওয়া কে চিঠিতে কী লিখেছে…আরো কত রকম কাণ্ড—ছাপব না? বলেন কি আপনি!' গুরুদেব নিশ্চয়ই হাসেন আমার এই থ হ'য়ে যাওয়ার বর্ণনা প'ড়ে।"

* * *

এমনি সময়ে একদিন হঠাৎ তপতী কেঁদে অসিতকে বলল: "কালরাতে ধ্যানে দেখলাম—সাধুদা তোমাকে লিখছেন: দিদি আর নেই। লিখছেন—সে ছিল আলমোরা আশ্রমের প্রাণ—'life and soul' আরো লিখেছেন তুমি তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে তাঁর স্তবগান করেছ ব'লে তিনি সাংঘাতিক রাগ করেছেন। সাংঘাতিক কথাটির নিচে লাল পেন্সিলের দাগ।"

তিনদিন পরে প্রেমলের পত্র এল :

ভাই অসিত,

তোমাকে আমি প্রায় মাসখানেক লিখিনি—লেখার সময় ছিল না ব'লেও বটে, তোমার উপর সাংঘাতিক রেগে গেছি ব'লেও বটে।

তোমাকে বারবার বলেছি আমার সম্বন্ধে না লিখতে। কিন্তু তুমি কিছুতেই আমার কথায় কান দাও না। তাই বাধ্য হ'য়ে এবার ultimatum পাঠাচ্ছি—ফের যদি কখনো আমার সম্বন্ধে লেখো—আমি মহাজ্ঞানী, মহাযোগী মহাত্যাগী···ইত্যাদি—তাহ'লে আমি আর শুধু যে তোমায় চিঠি লেখা বন্ধ করব তাই নয়, তোমার মুখদর্শনও করব না। হয়েছে কি, তুমি জানো কিনা যে তোমার 'পরে রাগ আমি চেষ্টা করলেও রাখতে পারি না—তাই তুমি আমার কথায় কান দাও না। কেবল মনে রেখো : তুমি নিজেই লিখেছ—অঘটন সাধকদের জীবনে ঘটে পদে পদে। এর পরের বার দেখবে আর একটি অভিনব অঘটন ঘটল : প্রেমল অসিতের নাম শুনলে শুধু যে 'চিনি না' বলছে তাই নয়—সত্যিই অসিতকে ভুলে গেছে স্রেফ মনের জোরে! সুতরাং সাধু, সাবধান!

তোমাকে লেখার সময় না পাওয়ার কারণ—ললিতার অসুখ মাসখানেক আগে খুব সঙ্গিন হ'য়ে ওঠে। সুরথদা দিল্লি থেকে দুটি বড় ডাক্তার নিয়ে আসে। কিন্তু তারা জবাব দিয়ে মাথা নেড়ে চ'লে যায়। ব'লে : "A matter of days!"

ওর প্রস্থান—দেখবার মত। শেষ পর্যন্ত মুখের হাসি মেলায় নি। শেষদিন বলেছিল এখন তোমাকে না জানাতে—কারণ তপতীরও তখন খুব অসুখ।

শেষ দিনে সন্ধ্যাবেলায় ওকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল পূব দিকে মুখ ক'রে। সেদিন সোনার আলোয় আকাশে ঝলমলিয়ে উঠল আনন্দের অন্তিম মেলা। আনন্দময়ীর যোগ্য অভ্যর্থনা। আলোয় মিলিয়ে গেল আলো।

এরপরে বলবার আর কী থাকতে পারে বলো? যাঁর দান তিনি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। সে পরম আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে—জানি। কেবল দুঃখ এই যে, তার পুণ্য স্পর্শ পেয়ে আমরা আর ধন্য হ'তে পারব না দিনের পর দিন। আর সবচেয়ে বড় ফাঁক রেখে গেল সে—যে ছিল আলমোরা আশ্রমের প্রাণ—life and soul!

তপতী কেমন আছে এখন? তাকে আমার আশীর্বাদ দিও। তার দুই ছেলেকে কি তার স্বামী পাঠিয়েছে দুমেলে? ছোট ছেলের অসুখ শুনেছিলাম। আশা করি সেরে উঠেছে এতদিনে?

ইতি। তোমার স্নেহবদ্ধ

প্রেমল

তিন

ললিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই তপতী ফের পড়ল। ওর হাঁপানির কষ্ট বরাবরই ছিল—কখনো বাড়ত, কখনো কমত। কিন্তু ওর রক্তবমন বন্ধ হয়েছিল। ললিতার মহাপ্রয়াণের শক্-এ ফের সেই বমন সুরু হ'ল। অসিত লিখল সুরথদাকে। তিনি ভয় পেয়ে জানালেন মেলারামজিকে। হরদয়াল সেসময়ে মুসুরিতে: টেলিফোন করলেন অসিতকে। অসিত বলল: তপতী একটু ভালো আছে, কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

হরদয়ালজি বললেন: তাঁর সায়াটিকা ব্যথা বেড়েছে নৈলে তিনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসতেন, কিন্তু তপতীকে এবার বুঝিয়ে বলা চাই-ই চাই যে, শুধু স্বামীই তো নয়, দুই ছেলের প্রতিও মার কর্তব্য আছে—আরো এইজন্যে যে মা না হ'লে সন্তানের চলে না। অসিত বলল: "তপতী বলছে ছেলেদের ওর কাছে পাঠিয়ে দিতে।" উত্তরে হরদয়ালজি বললেন: "দৌলতরাম সাফ জবাব দিয়েছেন—তপতী না ফিরলে তিনি ছেলেদের পাঠাবেন না কখনই।" শেষে বললেন: "আর এইসব দুশ্চিন্তায় মেলারামজি ফের শয্যা নিয়েছেন—বুকের ব্যথায়। তপতী যদি জব্বলপুরে যেতে না চায় অন্তত: একটিবার মুসুরিতে আসুক।"

তপতী এই প্রথম বিচলিত হ'ল। হরদয়ালজিকে লিখল:

"কাকা,

আপনি অন্তত: জানেন—সংসারে বাবার চেয়ে আমি কাউকে ভালোবাসিনি (না, স্বামীকেও না, আমার ছেলেদেরও না)। বাবা চিরদিনই ছিলেন আমার কাছে দেবতার সামিল। আর সেইজন্যেই তাঁর কথা আমি ঠেলতে পারি নি ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করতে রাজী হয়েছিলাম—নৈলে তিনি গভীর দুঃখ

পেতেন ব'লে। বিবাহ ক'রে তাঁকে আমি সুখী করতে পারি নি কেন তাও আপনি জানেন। কিন্তু সে যাক। আমার বক্তব্য এই (একটু বুঝবার চেষ্টা করুন্ কাকা, লক্ষীটি!) যে, আমি বাবার ইচ্ছাকে মান দিতেই বিবাহ করার পরে মেনে নিয়েছিলাম আমার কর্তব্যকে, যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি সংসারের তদারক করতে, স্বামী সন্তান কুটুম্ব সেবা করতে। কেন পারি নি শেষ পর্যন্ত তাও আপনার অগোচর নেই: আমার মন মেনে নিয়েছিল ছেলেবেলায়ই যে, সবার উপর সত্য ভগবান্—সংসার নয়। আপনার ও কথাও আমি মানতে পারি না যে, 'মা না হ'লে সন্তানের চলে না।' কত মাতৃহারা পুত্র পরে দেশের দশের একজন হয়েছেন—কে না জানে? সেবার জব্বলপুরে যদি আমার মৃত্যু হ'ত তাহ'লে অজয় বা তরুণ কি ভেসে যেত? না কাকা, আমাকে এসব মামুলি ছেলেমানুষি যুক্তি দিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করবেন না। আপনি এ-ও জানেন যে, এসব সংসারী যুক্তি আমার মনকে একটুও স্পর্শ করে না—উপায় কি? তাছাড়া আমি সংসারে বিষম অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম। অসুখ বেড়ে চলেছিল আরো মনঃকষ্টে একথাও আপনি ও বাবা খুব ভালো ক'রেই জানেন—নৈলে দাদাজিকে আমার 'প্রাণদাতা' ব'লে একাধিক টেলিগ্রাম করতেন না বহু ধন্যবাদ দিয়ে। কিন্তু একদিক দিয়ে এও অবান্তর। আসল কথা এই যে, ছেলেবেলা থেকেই কে যেন আমার কানে কানে বলত—বিশেষ যখন আমি গুরুগ্রন্থ পড়তাম—যে, আমি সংসারী হ'তে জন্মাই নি। কেবল আমি সাহস পাই নি একলা চলতে—সংসারে থেকে একলা চলা সম্ভবও ছিল না। এই সঙ্কটের দুর্লগ্নে এলেন দাদাজি আমার জীবনে—তাঁকে দেখেই আমার মন গান গেয়ে উঠল—'পেয়েছি পেয়েছি দিশারি গুরু!' তারপরই দেখা পেলাম সাধুদার—কলকাতায়। তিনি আমাকে বললেন: ভগবানকে চাইতে হয় সব বজায় রেখে নয় মা,—সব ছেড়ে অকূলে ঝাঁপ দিয়ে। এ সব-ছাড়ার ডাক যে সত্যি একবার শুনেছে সে আর কোনো ডাকে সাড়া দিতেই পারে না।'

"আমার স্বামীকে কি বাবাকে আমি এ সব কথা লিখতে ব্যথা পাই, তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—আপনি ব্যথা দিয়ে আমার ব্যথা বুঝে তাঁদের বোঝাবেন একটু। বলবেন—সংসারে আমাকে জোর ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আমি বাঁচব না।

"সব শেষে আর একটি কথা ব'লেই আমি ইতি করব। কথায় কথায়

আপনারা মাতৃস্নেহের গুণগান করেন। কিন্তু আমি সন্তানদের নিয়ে উচ্ছ্বাসী হ'তে পারি না—কী করব কাকা? তা ব'লে অবশ্য আমি নির্মম মা নই। একথা এক সময়ে আপনারাও সবাই মানতেন, যদিও আজকাল মনে করেন—আমি পাষাণী। কিন্তু ব'লে রাখছি আজ আপনারা পরে মিলিয়ে নেবেন—যে, স্নেহ দয়া ভালোবাসা দরদ আমার বুকের নিশ্বাস, চোখের আলো। এক সময়ে আমার স্বামীও একথা মানতেন। কিন্তু আমি দীক্ষা নিয়ে চ'লে আসার পরে নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ ক্ষোভ দুঃখ অভিমান যে আমি বুঝি না এমনও নয়। কিন্তু ঐ যে বললাম কাকা যে-কান একবার ঠাকুরের অকূল বাঁশির ডাক শুনেছে তার পক্ষে আর কূলকে আঁকড়ে থাকা সম্ভব নয়। এক কথায়, আমার পক্ষে এখন সংসারে ফিরে যাওয়া শুধু যে অসম্ভব তাই নয়—অকল্পনীয়।"

উত্তরে হরদয়ালজি তপতীকে না লিখে আবেদন জানালেন সোজা অসিতকে:

"দাদাজি, তপতীকে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি। আপনাকেও শ্রদ্ধা করি—শুধু শ্রদ্ধা নয়, আমরা সবাই আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ যে, ওর অসুখে আপনি সব ছেড়ে পুরো এক মাস ধ'রে ওর শিয়রে প্রার্থনা ক'রে ওকে পুনর্জীবন দিয়েছেন। আমরা পাঞ্জাবী—সাধুসন্ত গুরুর আশীর্বাদ আন্তরিক বিশ্বাস করি। কিন্তু তপতীর সব ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হওয়ায় সায় দিই কেমন ক'রে বলুন?

"আরো এক কথা। তপতীর ছোট ছেলে তরুণের বয়স এখন মাত্র পাঁচ বৎসর। তার খুব অসুখ। দৌলতরাম লিখেছে সে অত্যন্ত রোগা হ'য়ে গেছে। নার্স গভর্ণেস মাসী পিসী ওদের যত্ন আর মা-র স্নেহ কি সমান হ'তে পারে? তাই আমি বলি কি, তপতী মাঝে মাঝে জব্বলপুরে এসে থাকুক—ধরুন বছরে ছমাস, তারপরে ওর যা প্রাণ চায় করুক, আমরা কথাটি কইব না। মেলারামজিকেও সেদিন এই কথা বলেছি। তিনিও এই আপোষে রাজী (দৌলতরামও আমাকে ধরেছে তপতীকে অনুরোধ করতে—যেন সে আর 'না' ব'লে তার মনে দুঃখ না দেয়।) তপতীকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি না স্বামীজি! ওকে যে একবার চিনেছে সে ওকে আর মন মন থেকে সরাতে পাবে না।

মেলারামজি তো উঠতে বসতে বলেন যে, তপতী তাঁর নয়নতারা। সত্যিই তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা। আপনাকেও তাই তিনি কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন—আপনি অন্ততঃ একটিবার ওকে নিয়ে মুসুরি আসুন। তাঁর এখন শরীর ভালো যাচ্ছে না, নৈলে তিনিই যেতেন দুমেল। আপনি যদি রাজী হ'ন তো আমাকে পত্র পাঠ তার করবেন আমি আমার মোটরে ক'রে আপনাকে আর তপতীকে মুসুরি নিয়ে আসব। দৌলতরামও অজয় তরুণকে নিয়ে যাবে সেখানে, কথা দিয়েছে।—আমার সায়াটিকা একটু ভালোর দিকে। ইতি।"

তপতী পিতার অসুস্থতার কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হ'ল। ও সংসারে সবচেয়ে কাতর হ'য়ে পড়ত তাঁকে দুঃখ পেতে দেখলে। অসিতকে জিজ্ঞাসা করতে অসিত বলল: "যেতে চাও তো আমি না বলব না। কেবল ভেবে দেখো—এতে ফল ভালো হবে কি না।" তখন অগত্যা তপতী লিখল প্রেমলকে সব কথা জানিয়ে। সে উত্তরে লিখল: "প্রণবের অসুখ বেড়েছে, তাই বড় চিঠি লিখতে পারছি না। কেবল একটি কথা ব'লেই থামব: সংসারীর 'আপোষ'-এ সংসার কাছে আসতে পারে, কিন্তু ভগবান দূরে স'রে যানই যান। এ শুধু আমার কথা নয় মা, যুগ যুগ ধ'রে প্রতি বৈরাগীকেই এই দোটানায় বহু দুঃখ পেয়ে নানা ওঠাপড়ার পর ঠেকে শিখতে হয়েছে যে, সংসারের সঙ্গে আপোষে শুধু যে শেষরক্ষা হয় না তাই নয়, সংসারের সঙ্গে গরমিলও বেড়েই চলে, যার ফল শুধু—অন্তর্দ্বন্দ্বের ফেঁপে-ওঠা আর দৈবী করুণার স'রে-যাওয়া। এর বেশি আমি বলতে চাই না—তোমার গুরু একথা হাড়ে হাড়ে জানেন ব'লেও বটে।"

এ চিঠি পেয়ে তপতীর মন বিষম খারাপ হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনঃকষ্টে ওর হাপানি ফের দেখতে দেখতে সঙিন হ'য়ে উঠল—দেখা দিল আবার একের পর এক নানান্ উপসর্গ—বুকে দুঃসহ ব্যথা, থেকে থেকে দমবন্ধ মতন হওয়া, যা খায় কিছুই রাখতে পারে না—যার শেষ পরিণতি এই সাংঘাতিক রক্তবমন। এই প্রথম অসিত প্রেমলকে জানালো না। ললিতার মৃত্যু সংবাদ পাবার পরে কোন্ মুখেই বা নিজের বা তপতীর সমস্যা নিয়ে ওর পরে চড়াও হবে? কিন্তু ভবিতব্যকে ঠেকাবে কে? প্রেমল হঠাৎ একদিন ধ্যানে বসতেই দেখল তপতী শয্যাশায়ী শ্বাসকষ্টে। তৎক্ষণাৎ ও লিখল অসিতকে:

ভাই অসিত,

ললিতার দেহরক্ষার পরে—(প্রণবের অসুস্থতার জন্যেও বটে)—আমার ঘাড়ে আশ্রমের নানা দায়িত্বের ভার পড়ায় আমি তোমাদের খবর নিতে পারি নি। কিন্তু কেন জানি না আজ কেবলই তপতীর কথা মনে হচ্ছিল। ধ্যানে বসতেই দেখলাম সে শয্যাশায়ী। তাই এই চিঠি।

তপতীর গত চিঠির উত্তরে তাকে আমি হয়ত কিছু কঠিন কথা লিখে থাকব যাতে সে মনে দুঃখ পেয়েছে। তাকে শুধু বোলো: আমি ভুক্তভোগী ব'লেই জানি—সংসারীরা সংসারের ঠাট বজায় রাখতে চেয়ে শুধু যে লম্বা লম্বা কথা বলে তাই নয়—আপ্ত বাক্যেরও এমন টীকা করে যা—কিন্তু থাক একথা। মানুষ আসক্তির দাস হ'লে যে আসক্তির ওকালতি না ক'রেই পারে না একথা কে না জানে এবং মানে?

আমি এ চিঠি লিখছি শুধু তপতীর খবর জানতে। তুমি পত্রপাঠ জানিও—(না, তার কোরো)—সে কেমন আছে এখন। দরকার হ'লে আমি সুরথদাকে লিখতে পারি—ভালো ডাক্তার নিয়ে দুমেলে উড়ে যাবেন তিনি। কত নামকরা ডাক্তারই যে তাঁর হাতধরা—জানো তো।

এই সঙ্গে আর একটা কথাও বলতে চাই! আমার গত পত্রে আমি তোমার 'পরে রাগ ক'রে তোমাকে ধমকেছিলাম! কিন্তু তখন তো জানতাম না তপতীর অসুখের কথা। যা হোক, আমার সে সব বকুনি মন থেকে মুছে ফেলো ভাই। কারণ তুমি নিশ্চয় মনে মনে জানো—তোমার 'পরে রাগ আমি হাজার চেষ্টা করলেও রাখতে পারি না।

এ-সূত্রে কেবল একটা কথা বলি। ললিতার যখন অসুখের খুব বাড়াবাড়ি হয় তখন যে-পত্রিকায় তোমার প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল আমার 'মহানুভবতা'র সম্বন্ধে—সেটির এককপি সুরথদাই আমাকে পাঠান। তুমি জানো—আমি চাই না কোনো আত্মবিজ্ঞপ্তি বা পাবলিসিটি। মহাভাগ বৈষ্ণবেরা 'প্রতিষ্ঠা'-কে 'শূকরী বিষ্ঠা' নাম দিয়েছেন। সাধকদের একটি মস্ত বাধা হ'ল এই যোগী তপস্বী জ্ঞানী ধ্যানী ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভের কামনা। তাই মা আমাকে পই পই ক'রে মানা করতেন—নামযশের কামনাবাসনাকে কোনো ছলেই প্রশ্রয় না দিতে। কিন্তু তুমি কিছুতেই আমার কথায় কান দাও না—ঝোঁকের মাথায় আমাকে নানা উপাধি দিয়ে বাড়িয়ে বহু মিথ্যে 'হুজুগে' কৌতূহলীর সামনে খাড়া ক'রে

ধরো। এতে আমি বিলচিত না হ'য়ে পারি নি কেন না স্তবস্তুতিতে আমার সাধনার সত্যিই ক্ষতি হয়। তোমাকে মাত্র কয়মাস আগে লিখেছিলাম—তুমি আমার অযথা গুণ-কীর্তন কোরো না, কোরো না, কোরো না। কিন্তু তুমি আমার সেচিঠিটিও ছাপিয়ে দিয়ে লিখেছ—মহানুভবের মহিমাকীর্তন করা তুমি তোমার শুধু কর্তব্য নয়, স্বধর্ম ব'লে মনে করো। আর কেউ হ'লে আমি তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখতাম না। কিন্তু তোমার 'পরে হাজার রাগ হ'লেও যেই মনে হয় তোমার গানের কথা, প্রাণের কথা, হাসির কথা, স্নেহের কথা—সবার উপর, তোমার আন্তরিকতার ও সরলতার কথা—সেই সব রাগ ক্ষোভ আমার জল হ'য়ে যায়। তবু শেষবার বলি—করজোড়ে—যদিও তুমি শুনবে না জানি—আমার সম্বন্ধে আর কিছু লিখো না লিখো না লিখো না, আর আমার সব চিঠিই ছিঁড়ে ফেলে ঝিলমের জলে ভাসিয়ে দিও, ভাসিয়ে দিও, ভাসিয়ে দিও।............

ইতি

স্নেহাধীন প্রেমল।

চার

(এক মাস পরে)

ভাই প্রেমল,

তোমার রূঢ় কথায় কি আমি রাগ করতে পারি কখনো? বলতে কি, তোমার সঙ্গে আমার একটা তফাৎ এই যে, তুমি আমার 'পরে রাগ করতে চেয়েও রাগ করতে পারো না। আমি তোমার 'পরে আদৌ রাগ করতেই পারি না।

কিন্তু আমার গানের প্রাণের স্নেহের কথা লিখে কেন আমাকে বিব্রত করেছ বলো তো? আমি গান গেয়ে হয়ত তোমাকে কিছু আনন্দ দিয়ে থাকব। কিন্তু তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার সঙ্গে কি সে-আনন্দের তুলনা হয়! আমার দেখা না পেলে তোমার সাধনার ধারার এতটুকুও মোড় বদলাত না, বা আমার গান না শুনলে তোমার আত্মোৎসর্গের যজ্ঞদীপ্তি একচুলও কমত না! কিন্তু তোমার দেখা না পেলে আমি হয়ত এ গুরুবাদী অবতারবাদী আশ্রমে টিঁকতেই পারতাম না—হয়ত আজও অশান্ত ধূমকেতুর ম'তই ঘুরে বেড়িয়ে এখানে ওখানে সেখানে

একটু আধটু শান্তি পেয়ে তুষ্ট থাকতাম। এ যে আমার কথার কথা নয়—তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। আমার গুরুভক্তি মেকি না হ'লেও তোমার গুরুভক্তির মতন নিটোল নয় এ কথাও আমি তোমার কাছে কোনোদিনই গোপন করিনি। আমার কতবারই তো মনে হয়েছে—(তোমাকে বলেওছি, যার জন্যে তুমি কখনো কখনো আমাকে ভুল বুঝেছ)—যে, আমি স্বভাবে গুরুবাদী নই। কেন মনে হয় বলব? প্রথম কারণ: আমার সত্যিই মনে হয় সময়ে সময়ে যে, এক গুরুকে ভক্তি ক'রেও অন্য গুরুকে সমান ভক্তি করা সম্ভব। দ্বিতীয় কারণ: তোমার গুরু-ইষ্ট অভিন্ন এ-পুঁথি পাঠে আমার মন আদৌ সায় দেয় না। কিন্তু তবু বলব যে তোমার নির্বিচল গুরুভক্তি দেখে আমি পেয়েছি একান্তী হবার প্রেরণা—গুরু সেবার প্রেরণা—চঞ্চলতা ত্যাগ ক'রে নিষ্ঠাকে বরণ করার প্রেরণা। আমি ভাই নানা সাধুরই আশীর্বাদ পেয়েছি সত্যি। কিন্তু তোমার কাছে পেয়েছি—পারের পারানি বললে একটু অত্যুক্তি হবে হয়ত, কিন্তু অবসাদে আশ্বাস, অবিশ্বাসে প্রত্যয়, সবার উপর চিত্তচাঞ্চল্যে কৃষ্ণৈকান্ত হওয়ার উৎসাহ পেয়েছি বললে একটুও ভুল বলা হবে না। এ হেন তোমার গুণ কীর্তন করার ফলে আমার মনের জোর বাড়ে—তাই আমি বারবার তোমার সম্বন্ধে কোনকিছু লিখব না কথা দিয়েও কথা রাখতে পারি না—চাই আর পাঁচজনকেও জানাতে যে, এ তেল নুন লকড়ির যুগেও এমন আত্মভোলা আদর্শবাদী জন্মায় যে আদর্শের জন্যে সর্বস্ব পণ করতেও ভয় পায় না।

তুমি জানো—আমার সঙ্গে তোমার স্নেহ-সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল কয়েকটি বিশেষ যোগাযোগে: একটি—মা-র স্নেহাশিস। তিনি প্রায়ই বলতেন—আজো কানে বাজে—"আমার তিনটি ছেলে: অসিত, প্রেমল, প্রণব।" তাঁর অনাবিল স্নেহ আমি ভুলতে পারব না কোনদিনই। তারপর ললিতা। এমন স্নেহময়ী সরলা অথচ ঐকান্তিকা ভক্তিমতী আমি দেখিনি এক তপতী ছাড়া। তারপর এল তপতী—সেও পেল তোমাদের দু'জনের আশীর্বাদ। তোমাদের কাছে সেও গিয়েছিল যে-আশা নিয়ে সে আশা তার ষোলোকলা পূর্ণ হ'ল তোমাদের স্নেহের পরম সমর্থনে। বিশেষ ক'রে ললিতার সরল অভিনন্দনে। তাই তো, যে তার ছেলের অসুখেও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি সে "দিদি"র নাম করতে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। সে অপার স্নেহময়ী আজ নেই যার অমল হাসির আলোয় আমারও মনের আঁধার কেটে গেছে কতবারই! জানি—সে ঠাকুরের পায়ে

আশ্রয় পেয়েছে। ঠাকুর ভরসা দেন নি কি: "কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"?*

কিন্তু তবু বুকের মধ্যে আমার সত্যি কী যে খালি খালি লাগে ভাবতে যে, এমন সরলা অমলা প্রাণোচ্ছলা আনন্দময়ীর আর দেখা পাব না এ জগতে! তোমাকে কী সান্ত্বনা দেব ভাই? কলম সরে না। তাছাড়া কী-ই বা বলব তোমাকে যা তুমি জানো না? তোমার কাছেই তো শুনেছি—সব সহায় যখন স'রে যায় তখনই ঠাকুর আসেন অসহায়ের সহায় হ'য়ে। আলমোরায় একবার তুমি বলেছিলে—আমার ডায়রিতে টুকে রেখেছিলাম, শোনো: "যখন সব দুয়ার বন্ধ হয় ভাই তখনই তাঁর দুয়ার খোলে—যে আমিকে এত ভালোবাসি তার মরণের আগে ঠাকুরকে আপন বলবার জোর পাব কোত্থেকে? স্বভাবের রূপান্তর মানেই তো মরণান্তে নবজন্ম।"

এ ছাড়াও তোমার কত কথাই না আমি টুকে রেখেছি আমার ডায়রিতে! তুমি এ জন্যে অনর্থক রাগ করো। এ যে আমি না ক'রে পারি না—এটুকু তুমি বুঝবে কবে? যে বুঝত সে চ'লে গেছে ব'লে আমার অবস্থা আরো কাহিল হয়েছে আজ। কে এখন আমার হ'য়ে লড়বে তোমার সঙ্গে? না ঠাট্টা নয় ভাই, চোখের জলে একথা লিখছি—বিশ্বাস কোরো।

তপতীর অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। সে তোমার চিঠি পড়তে পড়তে কেবলই চোখ মুছেছে আর বলেছে: "এমন মানুষ কটা আসে দাদা, এ-টাকা-আনা-পাইয়ের দুনিয়ায়—যে এতবড় শোক পেয়েও আমার অসুখের কথা ভাবতে পারে—আর শুধু ভাবা নয়, তোমাকে লিখতে পারে এমন মধুর চিঠি?"

তবে তপতীর জন্যে তুমি ভেবো না। ওর চারদিকে ঠাকুরের করুণার আভা আমি দেখতে পেয়েছি। এবার যা ঘটল সে অঘটনই বলব। যখন কোনো আশাই ছিল না ওর বাঁচবার সেই সময়েই হ'ল আশ্চর্য দর্শন—কিন্তু থাক সে কথা দেখা হ'লে মুখে বলব, চিঠিতে লিখতে বাধে—কেমন যেন 'বাসি' মনে হয়! তাছাড়া আমি এ-ধরণের মেয়ে কখনো দেখিনি আগে যে অসহ্য দেহযন্ত্রণার মধ্যেও হাসি মুখেই সব কাজ ক'রে যেতে পারে—এমন কি ডাক্তার

* অর্জুন, বলছি তোমাকে আমার ভক্ত ডুবতে পারে না। (গীতা)

দেখাতেও চায় না, বলে "আমার এখন এ-দুঃখ পাওয়ার দরকার ছিল ব'লেই তো কষ্ট পাচ্ছি দাদা! নৈলে দয়াল ঠাকুর কি আমাকে অকারণ দুঃখ দিচ্ছেন? আর এক অঘটন ঘটেছে: ওর স্বামী ও বাপ মার মত হঠাৎ একেবারে বদ্‌লে গেছে। কেমন ক'রে বদলালো বলতে সাধ হয়, কিন্তু এ-চিঠির বহর একেই বেড়ে গেছে, আর বাড়ানো চলবে না—তোমার উপর আশ্রমের সমস্ত ভার পড়েছে—সে-ভার আর বাড়ালে চলবে কেন? অবশ্য প্রণব আছে। তবু যে-আনন্দময়ী চ'লে গেছে তার স্থান তো আর কেউই নিতে পারবে না। তাই শুধু তার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ পাঠিয়েই ইতি করি এবার।

প্রণব ও সুরথদাকেও আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিও।

গুরুদেব অসুস্থ। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। আগে আগে মাঝে মধ্যে দেখা পেতাম, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তিনি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছেন যেন "আকাশের ভগবান্।" অবশ্য মধুর মঞ্জুল চিঠিতে আশ্বাস দেন যথেষ্টই। কিন্তু বলো তো ভাই, চিঠির দাম অস্বীকার না ক'রেও বলা যায় না কি—সব চেয়ে বড় সম্বন্ধের ফুল কি শুভদৃষ্টির ছাড়া আর কোন বৃন্তে ফুটে উঠতে পারে? যাহোক মধুরেণ সমাপয়েৎ করি: তপতী ওর সংকট অসুখের সময় একটি গান আবৃত্তি করেছিল হাঁপাতে হাঁপাতে (তার পরেই ওর সংকট কেটে যায়) তার প্রথম স্তবকটি এই:

আজ সখী মন ভঙ্গ বধাঈ—হম ঘর সাজন আয়ে!
দুর্লভ রৈন পিয়া সুধ লীনী সোয়ে ভাগ জগায়ে।
আয়া সাগর নদী সমানে,
আয়া চাঁদ কিরণ অপনানে
আয়া দীপ পতঙ্গ মনানে—মৈ হরিদরশন পায়ে।

আজ সখী, প্রাণ ভরে কূলে কূলে—প্রিয়তম এলো ঘরে আমার।
দুর্লভরাতে ভাগ্যের ঘুম ভাঙাতে সোহাগভরে অপার।
নদীর মিলন চেয়ে এল নিধি,
চাঁদ হ'ল কৌমুদীর অতিথি,
পতঙ্গ পেল প্রদীপের প্রীতি—দরশন আমি পেয়েছি তার।

এ-গানটি থেকেও আমি আলো পেয়েছি কম নয়। বলতে কি, তপতীর

নানা ভজনই আমার সাধনার আঁধার পথে কিছু না কিছু আলো ঝরায় ব'লেই ওর গানের আমি ভক্ত হ'য়ে উঠছি দিন দিন। মানে, শুধু রূপের জৌলুষই নয়, সত্যের দিশাও পাই কিছু কিঞ্চিৎ ওর নানা গানের নানা চরণ থেকেই। যেমন ধরো এই গানটি। আমি এর ভাষ্য করি এই ব'লে যে, শুধু সান্তই অনন্তের প্রসাদ চায় না, অনন্তও শেষে সান্তকে বরণ করে—আর তারই নাম করুণা, কৃপা প্রসাদ—যা-ই বলো। এখানে শুনতে পাই প্রায়ই যে, গুরুর মধ্যে যে-ভাগবতী চেতনা আছে তার স্পর্শই হ'ল আসল। তাঁর মানবিক সত্তা বা বিকাশ গৌণ। কিন্তু আমার মন একথা নেয় না ভাই, কী করব বলো তুমি রাগ করলে? আমার মনে হয়—ঠাকুর গুরুকে তাঁর প্রতিনিধি ক'রে পাঠান তাঁর এই মানবিক স্পর্শের মধ্যে দিয়েই ভাগবতী চেতনার বা দেহাতীত প্রেমের দীক্ষা দিতে। ভগবান্ তো সারা বিশ্বেই চারিয়ে রয়েছেন। তবু কেন তিনি বললেন: "সম্ভবামি যুগে যুগে মানুষী তনুমাশ্রিত" হ'য়ে? কারণ কি এই নয় যে, স্থূল বস্তুবিশ্বে ইন্দ্রিয় জগতেও তাঁর মানবিক স্পর্শের কোনো গভীর সার্থকতা আছে? তাই হয়ত মা একবার আমাকে বলেছিলেন—তোমার মনে থাকতে পারে—যে আমার অনেক সংশয় গ্রন্থি কেটে যেত যদি গুরুর ব্যক্তিগত—পার্সনাল—সেবার কাজে লাগতে পারতাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম ভাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার—অনুমতি পাই নি। না-পাওয়ার নিশ্চয়ই কারণ আছে, আর সে-কারণের মূলে আছে আমার অযোগ্যতা একথা মানতেও আমার অভিমানে বাধে না। কিন্তু তা ব'লে কেমন ক'রে এ-মিথ্যা উচ্চারণ করব যে, গুরুদেবের অতিমানস চেতনার আলোয় আমার মনের সব অন্ধকার কাটে বা তাঁর চিঠিতে যে-গভীর আনন্দ পাই তাতে মন আমার তৃপ্তিতে এমন টইটম্বুর হ'য়ে ওঠে, যে আর কোনো অভাবই থাকে না? তবে থাক এ কাঁদুনি গাওয়া। তুমি হয়ত ফের আমার পরে বিরূপ হবে আমি শিষ্য হ'য়ে গুরুকে বিচার করছি ব'লে।

ইতি। তোমার স্নেহধন্য অসিত

পাঁচ

(দেড় মাস পরে)

ভাই অসিত,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরি হ'ল কারণ ললিতার শ্রাদ্ধশান্তির পরেই প্রণব ফের এমন অসুখে পড়েছিল যে, দিন পনেরো আগে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। সুরথদা দু-দুটি ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। তাদের ইঞ্জেকশনের পরে উপস্থিত একটু ভালো আছে। তবে সম্প্রতি আরো বেশি ক'রে বলা সুরু করেছে—মার মতন—যে, তার ডাক এসেছে। ভাবতে একটুও ভালো লাগে না। তবে সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। যে বিধানই তিনি দিন না কেন মেনে নেব তাঁর মঙ্গল বিধান ব'লে। তাই যাক ও কথা।

তোমার চিঠি প'ড়ে অনেক কথাই মনে হ'ল। সময় থাকলে আগেকার মতন দীর্ঘ পত্রে তর্ক জুড়ে দিতাম। কিন্তু প্রণব অসুখে পড়ার পরে আমার কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে।—তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলব যা বলতে চাই তবে তিলে সুরু ভনিতা তালে সারা হ'লে আমাকে দূষো না—আমাকে জানোই তো—যা বলি তা সব সময় করি না—হয়ত করতে চাই না ব'লেই।

প্রথম কথা এই যে, তুমি আমার কাছে পেয়েছ অনেক পথের পাথেয় কিন্তু আমি তোমার কাছে যা কিছু পেয়েছি সবই গৌণ বা অবান্তরের কোঠায়—তোমার এ-বিশ্লেষণ প'ড়ে আমি স্তম্ভিত! (ললিতা থাকলে কিন্তু স্তম্ভিত না হ'য়ে হেসে কুটি কুটি হ'ত—বলত : "বিনয়ী হ'তে হ'তে মানুষ কি রকম অন্ধ হ'য়ে পড়ে দেখে আমি ভয়ে আর বিনয়ের ছায়াও মাড়াই না।")

সত্যি, কেমন ক'রে তুমি বললে—আমি তোমার কাছে পেয়েছি শুধু একটুখানি গানের আনন্দ? ভাই, তোমাকে আমি একবার জোর দিয়েই লিখেছিলাম মনে পড়ছে যে, এ-পথে সহযাত্রীর সঙ্গ সময়ে সময়ে অমূল্য হ'য়ে ওঠে। সত্যিকার গুরুভাইকে তাই তো এত অন্তরঙ্গ মনে হয়। তোমাকে আমরা কেউই বাইরের লোক মনে করি নি ব'লেই কাছে টানতে পেরেছি। পারতাম কি যদি তুমি সত্যিই আমাদের অন্তরঙ্গ না হ'তে? মা কি অকারণ বলতেন উঠতে বসতে যে, তাঁর তিনটি পুত্র—তাঁর যে-অঙ্গীকার

তুমি সগৌরবেই উদ্ধৃত ক'রে থাকো পাঁচজনের কাছে? গৌরব করতে পারো বৈ কি—একশোবার।

আমি আরো একটু বলব: যে, তুমি বাইরের দিক থেকে দেখতে আমাদের বন্ধু হ'লেও অন্তরে আমাদের সতীর্থ, গুরুভাই-ই বটে। নজির: মহাভারতের শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন: "অহং গুরুর্মহাবাহো, মনঃ শিষ্যঞ্চ বিদ্ধি মে" —অর্থাৎ কিনা প্রতি তৃষার্ত মনই খতিয়ে তাঁর শিষ্য যাঁর নাম—কৃষ্ণ, উপাধি গুরু। তাই তো তোমাকে প্রথম দর্শনেই আমি বরণ করেছিলাম আমার আত্মার আত্মীয় ব'লে। নৈলে কি তোমাকে ঘড়ি ঘড়ি এত অসঙ্কোচে ধম্‌কাতে পারতাম ভাই? অহঙ্কার আমার যথেষ্ট থাকলেও এতটা দম্ভান্ধ আমি নিশ্চয়ই নই যে, নিজেকে তোমার গুরুভেবে তোমার সঙ্গে কথা কইব মুরুব্বি ঢঙে। তাছাড়া যার গানে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের মন্দিরে তার প্রীতি সমর্থন দরদ কি আমার কাছে অমূল্য না হ'য়ে পারে? তাই অমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না, এনো না, এনো না যে, তোমার কাছে আমি যা পেয়েছি তা না পেলেও আমার বিশেষ কিছুই আসত যেত না।

এবার তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই। প্রথমে ভেবেছিলাম—যাক, কাজ নেই। কিন্তু তারপর মনে হ'ল (তোমাকে অন্তরঙ্গ মনে করি ব'লেই) যে, তুমি ভুল বুঝবে না কখনই। তাই বলি—যদিও বলতে সত্যিই বাধছে।

কথাটা এই যে, তোমার সাধনার পরিবেশ যে তোমার কাছে কত কষ্টকর আমি বুঝি ভাই, বিশ্বাস কোরো। গুরুসান্নিধ্য আমার কাছে তৃষ্ণার জলের সামিল। গুরুসেবাকেও আমি আমার সাধনার ভিৎই মনে ক'রে থাকি। দৈনন্দিন আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই আমি গুরুকে মা ব'লে বরণ করতে পেরেছিলাম। তিনি একাধারে গুরু ও মা না হ'লে আমি যে স্বজন স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসে দুদিনও টি'কতে পারতাম না তুমি এ সত্যটি আবিষ্কার করেছিলে প্রথমেই—যে জন্যে তোমার অন্তর্দৃষ্টির আমি তারিফ না ক'রে পারি নি। মা-ও ঠিক সেই জন্যেই তোমাকে বলেছিলেন তোমার গুরুদেবের কোনো ব্যক্তিগত—পার্সনাল—সেবার কাজ নিতে। স্বামী স্বয়ম্ভানন্দ তাঁর সাধনার সিদ্ধির জন্যে নিজেকে শিষ্যদের কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে রেখেছেন ভাবতে

আমি দুঃখ বোধ করেছি বহুবারই—কিন্তু তাঁকে বিচার করতে সাহস পাই নি। আমি কী জানি বলো—তিনি কোন্ অচিন শক্তিকে টেনে নামাতে চাইছেন তাঁর অসামান্য তপঃশক্তির জোরে? তাঁকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তা বলে তাঁকে গুরুবরণ করার কথা ভাবতেও পারি না।

কিন্তু তোমাকে কোনোদিন এ সব কথা বলি নি—সুফল ফলবে না ব'লেই, তোমার দুঃখ বা খেদ বুঝি না ব'লে নয়। তবে আমার মনে হয় কী জানো? —যে, তোমার পক্ষেও অন্য কোনো গুরুবরণ করা সম্ভব ছিল না। কেন ছিল না—সে কথা আজ বলব না, শুধু এইটুকু আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হব যে, ঠাকুর আমাদের অনেককে ভোগানও যোগের জোগান দিতেই। তাই আমার মনে হয়—পরে কোনোদিন (যখন আমি আর থাকব না এ-জগতে) তুমি বুঝতে পারবেই পারবে—কেন তোমার জন্যে ভগবান্ এমন গুরুর ব্যবস্থা করেছিলেন যিনি পৃথিবীতে এসে দীক্ষা দিয়েও—তোমার ভাষায়—"আকাশের ভগবান্" হ'য়ে সর্ববিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতাকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমার তিরোধানের বরাবর উল্লেখ করি, এতে দুঃখ পেও না। গুরুর কৃপায় আর কিছু লাভ হোক বা না হোক এটুকু অন্ততঃ আমি দেখতে পেয়েছি যে, মরণ ব'লে যাকে আমরা এত ভয় করি সে পরম বন্ধু হ'তে পারে এবং হ'য়েও থাকে যদি ভগবানকে আমরা সত্যিই প্রেমঘন আলোর আলো, বন্ধুর বন্ধু ব'লে বরণ করতে পারি। আমি এখনো পুরোপুরি পারি নি তাঁকে এভাবে বরণ করতে, কিন্তু আভাষ পেয়েই অভয় পেয়েছি, আর পাথেয় পেয়েছি তাঁর প্রেমের পূর্ণ আশ্বাসে। এ যদি না পেতাম তা হ'লে মা ও ললিতার বিচ্ছেদের পরেও মন মুখ এক ক'রে বলতে পারতাম কি যে, সে বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়েই পেয়েছি হারানিধিকে আরো পূর্ণ ক'রে? কিন্তু মনে রেখো—এ চিঠি শুধু তোমার আর তপতীর জন্যে। তাকে আমার অন্তরের আশীর্বাদ দিও। সন্তানের অসুখেও যে সে বিচলিত হয় নি—গুরুর চরণেই শরণ চেয়েছে এজন্যে তাকে আমি সাধুবাদ দিই সর্বান্তঃকরণেই জেনো। ললিতা থাকলে হয়তো ছড়া কাটত "ধন্য ধন্য" ব'লে।

তোমার মুখে তপতীর গানটি শুনতে খুব ইচ্ছা হয়। সত্যিই চমৎকার গান—আর শুধু চমৎকার নয়—এরই নাম যথার্থ ভজন—এই প্রেমের উপলব্ধি। আমরা ভালোবাসি না ব'লেই টের পাই না প্রিয়তম আমাদের কত

ভালোবাসেন।—সত্যিই এ কথার কথা নয় ভাই, যে, আমরা এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তোমার গাওয়া একটি গান ললিতা তার দেহান্তের ঠিক দুদিন আগে গাইছিল বিগ্রহের সামনে চোখের জলে :

ফিরালে তারে
ফিরায় না রে,
ভালো সে বাসে নিরভিমানে :
অসীমা নামে সীমার টানে।"

ইতি। তোমার স্নেহ-ঋণী প্রেমল।

ছয়

(তিন সপ্তাহ পরে)

ভাই প্রেমল,

তোমার চিঠি পড়তে পড়তে তপতীর ফের সেই ভাবসমাধি। ঠিক এরকম ব্যাপার আমি আগে কখনো দেখি নি—কোনো সাধিকার যে ভগবানের কথায় এভাবে এক নিমেষে চেতনা বদলে যেতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বলতে কি, ওর ধ্যান ক'রে ভাবসমাধি পেতে হয় না। ভক্তির আবেশ হ'তে না হ'তে যেন কী এক নেশায় ওকে পেয়ে বসে—ও ভাব চাপতে মাথায় চাপড় দেয় বারবার। এ আমরা সবাই দেখেছি—ওর প্রতি যারা বিরূপ তারাও বলেনা এসব ভান। ও বলে—ভাবের সময় কি একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ মতন ওঠে শিরশির ক'রে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। যদি ও মাথা চাপড়ে সে-প্রবাহকে উঠতে বাধা না দেয় তাহ'লে প্রবাহটা ওঠে সোজা ওর ব্রহ্মরন্ধ্রে—অমনি যেন ওর মাথার ওপর একটা ঢাকনা মতন খুলে যায়, আর ও দেখে—ওর চেতনা বাইরে, উপরে ভাসছে, নিচে ওর দেহ স্থাণু, নিশ্চল। এ অবস্থায় ওর শুধু একটা পরম আনন্দ বা শান্তির অনুভূতি হয়—মনে হয় যেন দেহের কোন ভারই নেই। এরই নাম কি মুক্তি? জানি না ভাই। (মা-র ভাষায় খাঁচার পাখী, আকাশের খবর রাখবে কোত্থেকে বলো?)

যাহোক, কাল হঠাৎ গুরুদেব আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক দীর্ঘ পত্র

লিখেছেন—কেন তাঁকে একান্তী হবার জন্যে মৌনী হ'তে হয়েছে। এ-মৌনব্রত না বুঝলেও তাঁকে আমি বিশ্বাস করি, আর চিনতে পারছি একাধারে মনীষী, ঋষি ও কবি ব'লে। তবে তাব'লে তাঁর কাছে যা পাই নি তাকে তো আর "ভ্রান্তি" নাম দিতে পারি না। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই আমি তোমার কাছে এত কৃতজ্ঞ ভাই, যে, এ অপ্রাপ্তির কিছুটা অন্ততঃ ক্ষতিপূরণ মিলেছে তোমার জ্ঞান ও স্নেহের প্রসাদে। তাই কাঁদুনি গাইব না আর। মেনে নেব—তোমার ভাষায়—যে, আমার মঙ্গলের জন্যেই ভগবান্ আমাকে এমন বিচিত্র বিভূঁয়ে এনেছেন যার সম্বন্ধে বলা চলে প্রাচীন ছড়া কেটে মডার্ণ আক্ষরিক ভাষ্য দিয়ে: "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

তবে এ-সূত্রে মনে পড়ে তোমার আর একটা কথা: তুমি বলতে প্রায়ই (আমার ডায়রি থেকে টুকে দিই):

"যারা নিজের অহংকে খুঁটি ক'রে পথ চলে তারা একটু ঝড়ঝাপটাতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে, তাদের পায়ের নিচের মাটিও হয় চোরাবালি; কিন্তু যারা ঠাকুরকেই আঁকড়ে ধ'রে থাকে তাঁর শরণ নিয়ে, ভূমিকম্পও তাদের ক্ষতিপূরণ এনে দেয় গঙ্গাজল উৎসারিত ক'রে—অর্জুনের অঘটনী বাণের ম'ত।" আমার ক্ষেত্রে এ-ক্ষতিপূরণ এল তপতীর গাঙ্গ অভ্যুদয়েই বলব। গুরুদেব যতই দূরে স'রে যাচ্ছেন ও তো ততই কাছে আসছে ঠাকুরের কৃপার নানা অঘটনী নিদর্শন ফুটিয়ে। নইলে আমার কী গতি হ'ত বলো তো?

ওর দুই ছেলেই এসে গেছে। ওর স্বামীও ফের হয়েছেন আমার পরম অনুরাগী বন্ধু। উনি বুঝতে পেরেছেন—লিখেছেন একটি চিঠিতে যে, তপতী হুমেলে না এলে বাঁচত না। এ-ও কি এক অঘটন নয়? প্রতিপদেই তো দেখছি যে, ঠাকুর তপতীর পথের বাধা সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কত সংশয় গ্রন্থি মোচন ক'রে দিচ্ছেন পরপর।

অবশ্য আমাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে খুশখেয়ালে চলার আরামকে—যার নাম travelling light। তবে এ-ও যে আমার দরকার ছিল—ঠাকুর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন না কি প্রতিপদেই? আমি চাইতাম না সংসারের কোনো দায়িত্ব নিতে—যৌবনে আমি গাইতাম একটি হাসির গান: "গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও কোমর এঁটে বেপরোয়া।" তাই হয়ত সংসার শোধ তুলল। পালিয়ে কে কবে যথার্থ মুক্তি পেয়েছে?

এ ঠাট্টা নয় ভাই। অল্পবয়সেই হাতে বিস্তর টাকা পড়ে। বুদ্ধিশুদ্ধির কোঠায়ও একেবারে দেউলে ছিলাম না তো কাজেই "বেপরোয়া" হ'য়ে চলতে গিয়ে দুচারবার হোঁচট খেতে হয়েছে বৈ কি। কিন্তু কোনোবারই যে পিছলে পড়ার ফলে হাত পা ভাঙেনি—এ-ও কি তাঁর কৃপা নয়—বলত ললিতা ঠিকই। আমিও বারবারই উপলব্ধি করেছি তন্ত্রের সেই শ্লোকটির সত্যতা যেটি তুমি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেঃ যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা"—যা আমাদের চরম বাধা, তাই আমাদের বিকাশের পরম সহায় হয় করুণার ঘটকালিতে—মা ও বলতেন না কি উঠতে বসতে?

তপতীর ক্ষেত্রে এ-সত্যটি কতভাবেই যে ফলেছে—আর একবার নয়, দিনের পর দিন—তোমাকে নানা দৃষ্টান্ত দিযে বলতে কী যে ইচ্ছা করে! কিন্তু চিঠিতে কতটুকুই বা বলা যায়?

তবে না বললেই বা কী? ওর আসল সত্তা যে আগুনের—তুমিই তো আমাকে বলেছিলে প্রথম। সে সময়ে তোমার কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি—(যদিও ওকে আমার খুবই ভালো লেগেছিল)—কিন্তু বিলাসে মানুষ শ্রীমস্তিনী যে এক কথায় গুরুশরণার্থিনী যোগিনী হ'তে পারবে—without turning a hair—কেমন ক'রে আঁচ পাব বলো?

তাই এই সূত্রে তোমার কাছে শুধু যে আমার ঋণ আরো বেড়ে গেছে তাই নয়, তুমিই ওকে প্রথম চিনিয়ে দিয়েছিলে ব'লে তোমার সঙ্গে যোগসূত্র যেন আরো সুপুষ্ট হ'য়ে উঠল ওর মাধ্যমে।

তারপর দেখলাম ওর বুদ্ধি প্রতিভা নিষ্ঠা। কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি আমি ওর ভজনে। আমি গানকে করেছি শুধু পেশাই তো নয় ভাই—নেশা। তাই না ও বৃন্দাবনের গান শুনিয়েই আমাকে বশ ক'রে ফেলল। ওকে আরো কাছে পেলাম তো ঠাকুরের এই বৃন্দাবনী লীলার প্রসাদেই। তুমি ওকে প্রথমেই বরণ ক'রে নিয়েছিলে আমার "রক্ষাকবচ" নাম দিয়ে মনে আছে? বলেছিলে আমাকে: "যারা ওকে গ্রহণ করবে না তাদের বরণমালা দিলে তুমি অপরাধী হবে ঠাকুরের কাছে—যিনি ওকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

তবু সব বুঝেও মন আমার আজ বিষণ্ণ। শুনছি গুরুদেবের অবস্থা নাকি বিশেষ আশাপ্রদ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। তবে আমাকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিলে শতাধিক সাধক সাধিকাও সেই

অধিকার দাবি ক'রে শোরগোল করবে—ফলে তাঁর অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না। কাজেই দুঃখ পেলেও নিজেকে বোঝাই—আরো তোমার কথায়—যে, গুরুর বিধান মেনে না নিলে এক্ষেত্রে অপরাধ হবে।

তবে মুস্কিল হয়েছে এই যে, তাঁর অসুখের জন্যেই তোমার কাছে ছুটে যেতে পারছি না। নিরুপায় হ'য়ে কেবল গান গাইছি আর লিখছি নানা অঘটনী কাহিনী। ফলে কিছু কিঞ্চিৎ আনন্দ পাচ্ছি বৈ কি। তবে এ আনন্দ কর্মযোগ না কর্মভোগ ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি আছ দূরে, গুরুদেব থেকেও নেই। অগত্যা শুধু তপতীর ভাবসমাধি তথা নানান্ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উপলব্ধিকে আঁকড়ে ধ'রেই টিঁকে আছি বলব—অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত—পরে কী হবে কে জানে? কারণ এখানে থাকতে সত্যিই আমার আর ভালো লাগে না ভাই। আর যাঁর জন্যে এখানে আসা তিনিই যদি চোখের আড়াল হন তবে এখানে থাকার মানেই বা কী?

অনেক বাজে কথা লিখলাম হয়ত। তবে তোমাকে সব কথা লেখা আমার একটা ব্যসনের মতনই হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাই যা মনে আসে লিখে যাই, কারণ জানি আর সবাই ভুল বুঝে আমাকে শাপমন্যি দিলেও তুমি ব্যথা দিয়ে আমার ব্যথা বুঝবেই বুঝবে।

তবে একটা জিনিস চোখে পড়ছে আমার দিনের পর দিন। শুধু যে অভাবনীয় ভাবে অন্তরে বল ভরসা শক্তির পাথেয় জুটে যাচ্ছে তাই নয়—বাইরেও যাকে বাইবেলে বলে sign—ঠাকুরের করুণার নিদর্শন বা উঁকি—তাও মিলছে একের পর এক। না, শুধু অঘটনের মাধ্যমেই নয়, তপতীর নানা উপলব্ধি অনুভূতি দর্শনাদির মধ্যে দিয়েও কে যেন বারবারই বলছে কানে কানে "মা ভৈঃ। আমি আছি।"

কিন্তু না, আমি যেন কম ক'রে বললাম। ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে লীলা করছেন শুধু তপতীর ধ্যানলোকেই নয়—আমাদের এই কুটিরের বাহ্য রঙ্গমঞ্চেও বটে।

যে-প্রসাদের কথা তোমার মুখে শুনেছিলাম দেখেছি স্বচক্ষে। তার বর্ণনা না করলেও চলবে। একদিন ললিতা বলেছিল আমাকে ফিশ ফিশ ক'রে যে তোমাদের মন্দিরে তুমি বিগ্রহসেবা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়েছিল নানা অদ্ভুত কাণ্ড: যথা তুমি ভোগ নিবেদন ক'রে চ'লে আসো, কিছুক্ষণ পরে ভোগ তুলে আনতে গিয়ে দেখতে পাও—অর্ধেক ভোগ নেই, স্পষ্ট চিহ্ন ভুক্ত

অন্নের! রাত্রে রাধারাণী ও ঠাকুরকে পাশাপাশি শয়ন দিয়ে চ'লে আসো সকালে ঠাকুরকে তুলতে গিয়ে দেখ—এঁর নূপুর ওঁর পায়ে, ওঁর বালা এঁর হাতে, এঁর কণ্ঠহার ওঁর গলায়—এমনি সব বিপর্যস্ত! সারারাত কি যেন এক অপরূপ রসবিলাস চলেছে দুজনের মধ্যে। "এম্‌নি ক'রে"—বলেছিল ললিতা জোর দিয়েই—ঠাকুর জানান দিয়ে গেলেন যে, 'আমি আছি—বাস্তবের চেয়েও বাস্তব-ভাবে আছি।' পরে এসব অঘটন আস্তে আস্তে বন্ধ হ'য়ে যায়—যখন এসব নিদর্শনের আর প্রয়োজন রইল না।"

ললিতার এ-কথাগুলি আমি আমার ডায়রিতে টুকে রেখেছিলাম—আরো এই আশায় যে পরে কোনোদিন আমার ভাগ্যে এ-ধরণের দর্শনলাভ ঘটতে পারে—কে জানে?

হয়ত সে-স্বলগ্ন বেজে উঠত না কোনোদিনই যদি না তপতী আসত আমাকে অভয় দিতে—বিশেষ ক'রে আমার সাধনার এই সংকট লগ্নে—যখন ক্রমশঃ নানা অনর্থ এসে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। গুরুদেবকে তো আমি বেশি লিখতে পারি না এ সব কথা কারণ তিনি সম্প্রতি লিখেছেন যে, তাঁকে তপস্থায় আরো মগ্ন হ'তে হয়েছে এই জন্যেই যে, যে-মহাভাগবতী শক্তির আবাহন করতে তিনি ব্রত নিয়েছিলেন সে-শক্তির অবতরণ আসন্ন।

কিন্তু তাঁকে চিঠি আর না লিখলেও তাঁর এ চমকপ্রদ উক্তিতে আমার মনে দুরকম দোলা জেগে উঠেছে পাশাপাশি। এক, ভাবতে ভালো লাগে যে, গুরুদেব "জগদ্ধিতায়" দুশ্চর তপস্থায় মগ্ন আছেন, সব ছেড়ে আবাহন করতে চাইছেন এমন এক অঘটনী করুণাশক্তিকে যার পদার্পণে আমাদের চেতনার যুগান্তর ঘটল ব'লে। অন্যদিকে, তাঁর মঙ্গল স্পর্শ পাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে আসছে, দিনের পর দিন তাঁর যে-স্নেহলিপি পেয়ে ঘনায়মান সংশয়কে দাবিয়ে রাখতাম সে-আশ্বাসটুকু থেকেও বঞ্চিত হবার ফলে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হচ্ছে। কিন্তু গুরুকরণ ক'রেও গুরুর ঘনিষ্ঠ মানবিক স্পর্শ না পাওয়ার দুঃখ তোমরা বুঝবে না। আলমোরায় মাঝে মাঝে তোমাকে ঠাট্টা ক'রে একটি প্রাচীন কবির খেদ আবৃত্তি করতাম মনে আছে কি তোমার?—

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?

কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?

ইতি
তোমার স্নেহ-ঋণী অসিত

সাত

প্রেমলকে তপতী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত চিঠিটি ডাকে দেবার পরে অসিতের মনে হ'ল—হয়ত একটু কম ক'রে বলা উচিত ছিল। প্রেমল বারবারই ওকে সাবধান ক'রে দিত এই ব'লে যে, সংসারে understatement-এর আর্ট শেখা বড় দরকার—overstatement-এ উল্টো উৎপত্তি হয়। ভাবতে ভাবতে ওর মন বিষম খারাপ হ'য়ে গেল: কে জানে প্রেমল কীভাবে নেবে ওর উচ্ছ্বাস? হাজার হোক ইংরাজ রক্ত তো—আবেগ উচ্ছ্বাসকে অত্যুক্তি মনে করা যার স্বধর্ম।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল—তপতীর মাধ্যমে দিনের পর দিন অঘটন ঘটতে দেখার পরে উচ্ছ্বাসকে ঠেকায় কী করে? পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ে: কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যোগাবিভূতি পড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে—অর্থাৎ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ স্বাদ না পেলেও তাঁর করুণাশক্তির লীলাখেলা চাক্ষুষ করা নানা অঘটনের মধ্যে দিয়ে। তিনি অর্জুনকে "পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্" ব'লে কি ভাগবত অঘটন দেখতেই ডাক দেন নি? অঘটনদের থিতিয়ে যাবার পরে রকমারি যোগবিভূতির সার্থকতা কতটুকু দাঁড়াত শুনি—যদি তাদের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরের এই "যোগম্ ঐশ্বরম্"—কিনা অঘটনী লীলার কিছুটা অন্তত: আভাস না মিলত? একথা ওর আরও মনে হ'ত যোগবিভূতির বৈচিত্র্যের দরুণ। সে কত রকমের অঘটন! সবচেয়ে বড় অঘটন অবশ্যই দিনের পর দিন অপূর্ব ভজনের অভ্যাগম—কিন্তু তাই ব'লে কি অন্য সব অঘটন কিছু কম চমকে দেয়?

ওর প্রথম চমক লাগল তপতীর ধ্যান দেখে! কয়েকদিন ধ্যানে বসতে না বসতেই সমাধি! একেবারে পাষাণস্থির—petrified যাকে বলে!! অবশ্য শান্তিমার সমাধি দেখেছিল স্বচক্ষে কিন্তু আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টার বেশি হ'ত

না। ও তাঁর ধ্যানে-বসা নিশ্চল মূর্তি একবার চাক্ষুষ করেছিল রাত দুটো থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত। আহা! সে কী সুন্দর ভাব মূর্তি! নিশ্বাস পড়ছে কি না মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত—সূক্ষ্ম পেঁজা তুলো নিয়ে ধরত ওর নাকের কাছে তবে বোঝা যেত তুলোর ঈষৎ দোলা দেখে। আশ্রমের সাধক সাধিকারা কেউ কেউ এসে দেখে যেত তারপর বলত লম্বা লম্বা কথা: "এ-সমাধির চেয়ে আরো উচ্চ অবস্থা হচ্ছে সহজ সমাধি অর্থাৎ এ-জগৎকে বরখাস্ত ক'রে সমাধির শান্তি পাওয়া নয়—জাগতিক সব কাজের মধ্যে থেকেও সমান যোগারূঢ় থাকা—সচেতন অবস্থায় নিঃসংবিৎ সমাধির শান্তি ভোগ করা—যেমন গুরুদেবের সহজ সমাধি"—ইত্যাদি। অথচ আশ্চর্য এই যে তারা কেউই গুরুদেবের এমনকি নিঃসংবিৎ সমাধিও কোনোদিন চক্ষে দেখে নি, সহজ সমাধি তো দূরের কথা! তাদের হাঁকডাক শুনে ওর মনে পড়ে যেত প্রেমলের প্রায়শোক্তি: words, words, words!

তাই তো আরো ওর মন আবিষ্ট হ'ত তপতীর মাধ্যমে নানা যোগবিভূতির লীলাখেলা প্রত্যক্ষ ক'রে। খামের মধ্যে চিঠি পড়া খাম না খুলে, অপরের মনের চিন্তা টের পাওয়া, দূরের জিনিষ দেখা, স্বপ্নে দেখা কবে কী ঘটবে, কোনো ছবি দেখে ব'লে দেওয়া মানুষটির অতীত ইতিহাস……এ সবই ওকে চমকে দিত বিশেষ ক'রে এসব অঘটন চাক্ষুষ করার আনন্দ শিহরণের দরুণ। কিন্তু আরো বড় বিভূতি ক্রমশঃ প্রকট হ'ল—যার খবর পেয়েছিল প্রথম প্রেমলেরই কাছে। প্রেমল বলেছিল—দু-একবার মোহনভোগ মন্দিরে রেখে মন্দিরের দোর বন্ধ ক'রে মা-র ঘরে এসে ধ্যান করতে বসার খানিকক্ষণ পরেই উঠে গিয়ে দেখেছিল—প্রসাদের খানিকটা ঠাকুর উঠিয়ে নিয়েছেন। অসিত গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে দুমেলে ফিরে—কলিযুগেও ঠাকুর এভাবে সত্যি লীলা করেন কি না। উত্তরে গুরুদেব বলেছিলেন যে, আধার খুব নির্মল হ'লে ঠাকুর নিবেদিত ভোগকে এভাবে গ্রহণ ক'রে প্রসাদ ক'রে দেন বৈ কি—তবে এ খুবই বিরল অঘটন।

সেদিন কালীপূজা। হ'ল কি, অসিতকে ওর এক গুজরাতী বন্ধু উপহার দিয়েছিল একটি যুগল মূর্তি কৃষ্ণ ও মীরার—মোটা কাঁচে উৎকীর্ণ (etch) করা। নিচে বিজলী বাতির "বাল্ব্"—বোতাম টিপলেই আলো জ্ব'লে উঠে মূর্তি দুটি ঝলমল ঝলমল করে। যেন জীবন্ত প্রতিমা মনে হয়! অসিত ও

তপতী ওদের ঠাকুরঘরে এই কাঁচে-উৎকীর্ণ-করা যুগল মূর্তির সামনেই রোজ ভজন ধ্যান জপ করত। সেদিন সকালে অসিতের হঠাৎ "ব্রেন-ওয়েভ" এল—মনে হ'ল মোহনভোগ নিবেদন করা হোক—এই যুগল মূর্তির সাম্‌নে—দেখাই যাক না ঠাকুর গ্রহণ করেন কি না। না করেন বেশ তো—নিবেদিত হালুয়াকে সাধারণ প্রসাদ ব'লে বরণ করা যাবে।

ওর সত্যিই মনে হয় নি ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করবেন—প্রেমলের বিগ্রহসেবা তো সাধারণ সেবা না—ঐকান্তিক পূজা। অসিত কোনোদিন বিগ্রহই রাখে নি তা বিগ্রহসেবা! গুজরাতী বন্ধুটি উপহার দিয়েছিল ব'লেই যুগল মূর্তিটিকে বিগ্রহ ক'রে দাঁড় করিয়েছিল—তা ব'লে সত্য বিগ্রহ তো এ নয়। কাজেই বৃথা চেষ্টা। তবু—কৌতূহল হ'ল মরিয়া না মরে রাম—দেখাই যাক না। মীরা যখন নিজে দিনের পর দিন এসে তপতীকে গান শোনান তখন একেবারে নির্ভরসা হওয়া সাজে কি ?

তপতী স্নান ক'রে গরদের সাড়ী প'রে নিজে হাতে হালুয়া রেঁধে একটি থালায় বৃত্তাকারে সাজিয়ে কৃষ্ণ-মীরার প্রোজ্জ্বলন্ত যুগলমূর্তির সাম্‌নে রেখে পাশের ঘরে এসে ধ্যানে বসল অসিতের সঙ্গে।

বসতে না বসতে ভাব সমাধি! গদ্‌গদ কণ্ঠে বলল: "ঠাকুর! ঠাকুর! বালগোপাল! পাশে মীরা! দেখ দেখ······" অঝোরে অশ্রু ঝরে······" ঠাকুর শিশু তো, খাবলে খাবলে ভোগ খাচ্ছেন······আর শোনো কী বলছেন: হালুয়ার মাঝে একটি সোজা দাগ কেটে বলছেন: 'মীরা এ-অর্ধেক তোমার ও অর্ধেক আমার!······ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর······"

অসিত শিউরে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে সত্যিই হালুয়ার এক ধার থেকে কে যেন কুরে নিয়েছেন খানিকটা ভোগ—বাকিটায় রয়েছে স্পষ্ট শিশুর হাতের কচি আঙুলের দাগ—আরও চমকপ্রদ—সত্যিই গোল হালুয়ার মাঝ বরাবর একটা লম্বা ঋজু লাইন—স্পষ্ট ব্যাস রেখা—diameter !

অসিতের বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। সে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে গান ধ'রে দেয় সোচ্ছ্বাসে: তপতীর সদ্যজাত পঞ্চমাত্রিক ভজনটির শেষ স্তবক:

তুম্হী নাথ পালক হো রক্ষক হো মেরে।
তুম্হী আসরা তুম সহায়ক হো মেরে।
য়হ ভোলে ন নৈয়া জো নাবক হো মেরে।

পিলায়ে হো অমরিত পিয়ে জা রহী হুঁ।
তুম্হারে সহারে জিয়ে জা রহী হুঁ ॥

শেষে তপতীও গাঢ়কণ্ঠে ধ'রে দিল দোয়ারে :

তুমিই নাথ, পালক সখা রক্ষক সহায়।
তারকা বরি' তোমারি তরী বাহি এ-তমসায়।
কান্ত যার কাণ্ডারী সে অকূলে কূল পায়।
মরণ বুকে করে সে পান অমৃত অমরার
জীবন যাপি জপিয়া আশা তোমারি করুণার।

অসিত আত্মহারা আনন্দে প্রেমলকে সব কথা লিখে দিল। শেষে লিখল : "রাসপূর্ণিমা এল ব'লে—ফের ভোগ দেব—দেখা যাক ঠাকুর আবার গ্রহণ করেন কি না। তপতী হেসে বলছে : 'বেশি লোভ ভালো না, সাহেবরা বলে : curiosity killed the cat?' উত্তরে আমি বুক ঠুকে বললাম : 'গীতায় ঠাকুর বলেছেন আমাদের কর্মেই অধিকার আছে ফলে নেই। অর্থাৎ ভোগ নিবেদন করবার অধিকার আছে—কিন্তু তাকে প্রসাদ করার ভার কেবল তাঁর।'

কী বলো বেশ জবাব হয় নি?"

আট

রাসপূর্ণিমা এল যথাকালে—কালীপূজার এক পক্ষ বাদে। অসিতের বুকে জেগে ওঠে ফের কৌতূহলী আনন্দের হিল্লোল। ঠাকুর ফের ভোগ গ্রহণ করবেন না কি? যদি না করেন—ভাবতে মন খারাপ হয় বৈ কি। কিন্তু অমনি রুখে উঠে কে যেন বলে বুকের মধ্যেই : "গ্রহণ করবেন করবেন করবেন ঠাকুর। তপতীর মতন নির্মলার নিবেদিত ভোগে তাঁর লোভ আছে—হাজার হোক, বালগোপাল শিশু তো!"

ঠিক এই সময়ে—জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে—ওর কাছে অতিথি হ'য়ে এল ওর এক পিসতুত ভাই রমেন—সঙ্গে স্ত্রী কুসুম ও আট বছরের মেয়ে লক্ষ্মী। রমেন অসিতের সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছিল একই স্কুলে। বরাবরই অসিতের নেওটো। অসিত বলল ওকে কালীপূজার প্রসাদের কথা। রমেন তপতীকে প্রণাম ক'রে

হাতজোড় ক'রে হেসে ছড়া কাটলো (অসিতের কাছেই সে পেয়েছিল ছড়াকাটার দীক্ষা):

যে-দিদিজির দৈবী মোহনভোগের স্বাদ পেতে
লোভী বালগোপাল রূপে ঠাকুর আসেন সেধে,
কে না তাঁকে বলবে "দেবী," করবে নমস্কার—
হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে আনন্দে বারবার?

কিন্তু কুসুমের মনে সংশয় ছিল। এ কি কখনো হ'তে পারে? মুখে অবশ্য কিছু বলে নি সে-সময়ে, কিন্তু পরে রমেন বলেছিল তপতীকে: "দিদিজি! আপনি ওর যে কতবড় উপকার করেছেন জানেন না। ওকে দিয়েছেন বিশ্বাসের বর।"

"কী ক'রে বিশ্বাস এল? ঠাকুর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন বলে?"

রমেন জবাব দেবার আগে কুসুম বলল: "না দিদিজি! মিথ্যে বলব না। আমার বিশ্বাস এসেছিল—যেদিন কৃষ্ণমীরার সেই আলো জ্ব'লে উঠে ফের নিভে গিয়েছিল।"

এ অঘটনটি ঘটেছিল দুঃখময় পরিবেশে—ওদের দুমেলে আসার তিন সপ্তাহ পরে—ঠিক যখন স্বামী স্বয়মানন্দ অসুখে পড়েন।

কিছুদিন থেকে তিনি তাঁর অন্ত্রে ব্যথা বোধ করতেন। তাই আরো চাতুর্মাস্য ব্রত নিয়ে মৌনী হ'য়ে ছিলেন। কিন্তু রাসপূর্ণিমার মহাপ্রসাদের বিবরণ প'ড়ে তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও খুসী হয়ে অসিতকে আশীর্বাদ ক'রে লিখে পাঠান: "এখন তো সংশয়ভঞ্জন হয়েছে?"

কিন্তু অসিতের সংশয় এল অন্য দিক থেকে। গুরুদেবের নিষ্পাপ দেহ। তার উপর দুশ্চর সাধনা। তাঁর এমন শক্ত অসুখ করল কেন? মন ওর আজকাল আগেকার মতন খারাপ হ'ত না আত্মীয় স্বজনের অসুখ শুনলে। হবে কেমন ক'রে—যারা ওর সাধনাকে সন্দেহের চোখে দেখে, মনে করে সংসারের কাড়াকাড়ি হানাহানির রাজ্যই একমাত্র বাস্তব —ভগবান্ কবিকল্পনার ছায়ামূর্তি বা মায়ালীলা? কিন্তু গুরুদেব—যাঁর জন্যে সব ছেড়ে আসা—থাকা এই দূর বিদেশে বিভুঁয়ে—যাঁকে বরণ না করলে ও সংসারের মায়ার খেলাকে মায়া ব'লে চিনতেই পারত না—তাঁর অসুখ শুনবামাত্র ওর মন কেমন যেন নিরাশার অথই জলে পড়ত। কী হবে

যদি তিনি দেহরক্ষা করেন? ভাবতেও ওর চোখের আলো কালো হ'য়ে আসত।

ঠিক এই সময়ে তাঁর অসুখের বাড়াবাড়ি হয়। তাই তো অসিত আরো সাগ্রহে বরণ করেছিল ঠাকুরের মহাপ্রসাদকে। মনকে বোঝালো—গুরুদেব তো ঠাকুরের প্রতিনিধি মাত্র—তাই স্বয়ং ঠাকুর যখন তাঁর স্পর্শ দিয়েছেন তখন ভয় কিসের?

কিন্তু তবু মন খারাপ হ'ল ফের মহাপ্রসাদ গ্রহণের পরেও। রমেন উদ্বিগ্ন হ'য়ে গুরুদেবের কথা জিজ্ঞাসা করত একে ওকে তাকে। কিন্তু কেউই জানত না তাঁর অসুখটা ঠিক কী—কোন্ দিকে মোড় নিয়েছে—চিকিৎসা হচ্ছে কি না…

ফলে অসিতের মনে সংশয় ফের নিরাশার দিকে মোড় নিল—যেমন ওর প্রায়ই হ'ত। ও তপতীকে একথা বলতে সে বলল: "দাদা, যদি রাগ না করো তবে একটা কথা বলব?"

"কী"

"মহাপ্রসাদ পাওয়ার পরেও তোমার সংশয় কি নিরাশা আসত না যদি তুমি মনে রাখতে—ঠাকুর মহাপ্রসাদ দেন চমকে দিতে নয়—ধন্য করতে।"

রমেন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফের প্রণাম করল তপতীকে, বলল: "ঠিক বলেছেন দিদিজি। আর একথা আমাদের সম্বন্ধে আরো বেশি খাটে।" ব'লে কুসুমের দিকে তাকালো।' কুসুম কিন্তু সে-তিরস্কার গায়ে মাখল না—ব'সে রইল গুম্ হ'য়ে। সে যে তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বিশ্বাসই করে নি যে মোহনভোগ খেতে ঠাকুর সত্যি সত্যি বালগোপাল হ'য়ে এসেছিলেন।

সেদিন রাতে যুগল মূর্তির সামনে ধ্যানে বসতেই অসিতের মনে এল প্রার্থনা: "ঠাকুর, আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি সত্যিই একে ওকে তাকে তোমার মহাপ্রসাদের কথা বলেছিলাম তাদের চমকে দিতেই বটে।—তুমি আমাকে শেখালে তপতীর মধ্যে দিয়ে যে, তোমার এ-করুণায় আমার শুধু সাড়া দেওয়া চাই এই ব'লে:

এ লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম ধন্য হ'ল অন্তর।"

কিন্তু পরদিন সকালে খবর এল—গুরুদেবের অসুখ আরো বেড়েছে। অসিত ঠাকুরঘরে প্রার্থনা করতে বসল। সকালবেলা—তাই কৃষ্ণমীরার যুগলমূর্তির নিচেকার আলো জ্বালায় নি সুইচ টিপে।

খানিকবাদে চোখ খুলে দেখে: আলো জ্বলে উঠেছে। অঙ্গে শিহরণ জাগল। ডাকল রমেন কুসুম ও তপতীকে। না, রমেন বা কুসুম আলো জ্বালায় নি তো! অসিতকে ধ্যানস্থ দেখে ওরা কেউ ঘরে ঢোকেই নি। তপতী? সে তখন রাঁধছিল গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে।

রাতে রমেন কুসুম ও লক্ষ্মী নিচের তলায় শুত। অসিত দোতালার শুয়ে, তপতী ঘরের মধ্যে। তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অসিতের সংশয় কেটেও কাটে না: সত্যি কি আলো জ্বলেছিল সকালে? ঘুম আসে না কিছুতেই।

এমন সময় কে যেন কানে কানে বলল: "যাও ঠাকুর ঘরে দেখে এসো।"

নিশুত রাত। সবাই ঘুমিয়ে। অসিত পা টিপে টিপে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে: ফের আলো জ্বলেছে—মূর্তি দুটি জ্বল জ্বল ক'রে উঠে যেন হাসিমুখে অভয় দিচ্ছে। ও তপতীর ঘুম ভাঙিয়ে সব বলল। তপতী রমেনকে ডাক দিল, রমেন কুসুমকে। সবাই এসে সানন্দে নাম গান সুরু ক'রে দিল সোচ্ছ্বাসে:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে···

নামগান শেষ হ'লে সবাই ফের গিয়ে শুয়ে পড়ল যে যার বিছানায়। অসিত ইচ্ছে ক'রেই সুইচ টিপে আলো নেভালো না। চোখে ঘুম আর আসে না কিছুতেই, বিছানায় শুয়ে কেবল ভাবে: "ঠাকুর যদি আলো জ্বালাতে পারেন তাহ'লে নেভাতেও পারেন না কি?"

এম্‌নি সময়ে ফের সেই স্বর: "দেখে এসো ঠাকুর ঘরে—ঠাকুর আলো নিভিয়ে দিয়েছেন।"

অসিত গিয়ে দেখে—সত্যিই তাই!

ফের ডাকল সবাইকে। তখন শেষ রাত—নামগান গাইতে গাইতে আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠলো। কী আনন্দ! কী আনন্দ!···

এই প্রথম কুসুমেরও বিশ্বাস হ'ল যে, ঠাকুরের করুণা অঘটনের মধ্যে দিয়ে এযুগেও নিজেকে জানান দিতে পারে।

নয়

গানের শেষে অসিত রমেনকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় ঝিলমের ধার দিয়ে। রমেন হঠাৎ বলে: "আচ্ছা অসিদা, একটা প্রশ্ন মনে আসছে—করব?"

"কী প্রশ্ন?"

"রাগ করবে না বলো?"

"না করব না। বল্।" ব'লে অসিত হেসে।

"হঠাৎ মনে হ'ল—আচ্ছা ঠাকুর যখন আলো জ্বালাতেও পারেন দেখলে তখন তোমার মনে হয়েছিল তো—তিনি নেভাতেও পারেন?"

"হয়েছিল—বলেছি তো তোকে।"

"ব'লেই তো ফাঁসিয়েছ দাদা!

আমার বেয়াড়া মনও তাই টুকছে—আচ্ছা, ঠাকুর প্রসাদ কুরে নিয়ে হয়কে নয় করতে পারেন বলছ। অর্থাৎ যা ছিল তা আর নেই—হাওয়া। বটে তো? আচ্ছা। অথ, আমার প্রশ্ন এই—তাহ'লে তো ঠাকুর নয়কেও হয় করতে পারেন নিশ্চয়ই? মানে, যেখানে প্রসাদ ছিল না সেখানে এল? অর্থাৎ তাঁর হুকুমে অস্তি যদি নাস্তি হয়, তবে নাস্তিই বা অস্তি হ'তে পারবে না কেন শুনি?"

অসিত হেসে বলল: "অর্থাৎ শূন্য টুপির মধ্যে পায়রা? ভানুমতীকা খেল?"

রমেন জিভ কেটে বলে: "ছি ছি! অমন কথা বলে? আমি বলছিলাম প্রসাদ—মহাপ্রসাদের কথা। বললাম তো এইমাত্র?"

অসিত ফের হাসে: "বললি তো। কিন্তু ঠাকুরকে তো বলা যায় না যে শ্রীলশ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ দেবশর্মার উল্টো অঘটনটি দেখতে সাধ হয়েছে ঠাকুর চ'লে এসো—নইলে মান থাকবে না?"

"ফের! যাও তোমাকে যদি আর কখনো কোনো মনের কথা বলি। বললাম শুধু জানতে চেয়ে—তুমি হানলে মোক্ষম ব্যঙ্গবাণ!"

অসিত ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে বলে: "ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে কী না হয় ভাই? মনে নেই মথুরবাবুর সেই রামকৃষ্ণদেবকে চ্যালেঞ্জ করা—ঠাকুর কি লাল জবার গাছে সাদা জবা ফোটাতে পারেন? পরদিন তিনি মথুরবাবুকে

ডেকে দেখিয়েছিলেন: 'দেখ মথুর, একই গাছে একই বোঁটায় দুটি জবা—একটি লাল্ অন্যটি শাদা!"

"জানি ভাই। পড়তে পড়তে শিউরে উঠেছি ভেবে—এ-ও হয়—হ'তে পারে বিশেষ ক'রে এ-ঘোর কলিযুগে?"

দশ

ওরা ফিরে আসতেই কুসুম বলল অসিতকে মৃদু স্বরে: "দিদিজি আজ ভাবে আছেন, আপনি একটু চোখ রাখবেন।"

অসিত ও রমেন দুজনেই বুঝল। তপতীর মাঝে মাঝেই ভাবাবস্থা হ'ত আরো অনেকে দেখেছিল—আশ্রমের সাধক সাধিকারাও কেউ কেউ। কিন্তু তারা প্রায়ই "ঢ-ঙ" নাম দিয়ে তপতীর ভাবকে এককথায় বাতিল ক'রে বাঁকা হেসে প্রস্থান করত। তা সত্ত্বেও রমেন ও কুসুমের খুব ভক্তি হয়েছিল, আরো এইজন্যে যে ভাবাবস্থায় তপতীর মুখে কেমন যেন একটা "আলো" নামত—বলত আট বছরের মেয়ে লক্ষ্মী। রমেন ও কুসুম চমকে উঠত প্রায়ই যখন তপতী ভাব চাপতে নিজের মাথায় চাপড় দিত। 'ভাবসমাধিকে ঠেকাতে"—জুড়ে দিত লক্ষ্মী হাসতে হাসতে। শুনে ওরা সবাই হাসত বটে, কিন্তু বলাবলি করত—বর্ণনাটা খুব ভুল হয় নি।

গোল টেবিলের চারধারে চারটি চেয়ার। কুসুম চা ও রুটি-মাখন পরিবেশন ক'রে বসল একটি মোড়া টেনে।

হঠাৎ লক্ষ্মী ব'লে উঠল অসিতকে: "দেখুন, দেখুন জ্যাঠামণি, দিদিজির ভাব—কী ভীষণ দুলছেন!—প'ড়ে যাবেন—সামলান!"

অসিত খেয়াল করে নি, বলছিল রমেনকে গুরুদেবের অসুখের কথা। লক্ষ্মীর কথায় চমকে তাকিয়ে দেখে—সত্যিই তপতী চেয়ারে ব'সে দুলছে এপাশ থেকে ওপাশ, আবার ওপাশ থেকে এপাশ—চোখ সামনের দিকে চেয়ে, কিন্তু উত্তান নয়ন—দৃষ্টিহীন—কেবল দুগাল বেয়ে দুটি সরু ধারা চিক চিক করছে প্রাতঃসূর্যের একফালি সোনার আলোয়।

অসিত উঠে তপতীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়—যদি হঠাৎ প'ড়ে যায়, ধরবে। রমেন কুসুম ও লক্ষ্মী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ তপতী ব'লে ওঠে ধরা গলায় থেমে থেমে : "কে···ঠাকুর !···কী ? প্র—প্রসাদ ? বৃ—বৃন্দাবনের মহাপ্রসাদ, ঠাকুর ? আহা, আহা, দ—দাও, দাও ঠাকুর !

ব'লে দুই শূন্য হাতের অঞ্জলি মেলে ঈষৎ উপরদিকে উঠিয়েই দুহাত বন্ধ করে ঝিনুকের মতন। তারপরই ফিরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে অসিতকে : "দাদাজি—দ—দাদাজি ! ঠাকুর···ঠ—ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাপ্রসাদ দিয়ে গেলেন···এই দেখ !" ব'লে কৃতাঞ্জলি খুলতেই সবাই চমকে ওঠে : এ কী ! এক তাল মোহনভোগ !!

অসিত রমেনের দিকে তাকায়। রমেনের চোখ জলে ভ'রে আসে ফের (ওর সহজেই চোখে জল আসত) ও উঠে গড় হ'য়ে তপতীকে প্রণাম ক'রে আবৃত্তি করে :

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

* * * *

একটু বাদে এই সুরেলা লগ্নে বেসুর এসে দিল হানা। গুরুভাই সোহনলালের আকস্মিক অভ্যুদয় ! বলল : "গুরুদেবের অসুখ বেড়েছে। চেষ্টা করা দরকার কোনো ডাক্তারকে তলব করার।"

অসিত উঠে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করতে যাবে এমন সময়ে তপতী বাধা দিল : "না। গুরুদেবকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কিছু কোরো না। তিনি জানেন কাকে ডাকতে হবে না হবে।"

সোহনলাল বিরক্ত হ'য়ে : "গুরুভক্তি বটে" ব'লেই প্রস্থান।

এগারো

এর পর একের পর এক ঘটতে থাকে আরো অবিশ্বাস্য অঘটন। একদিকে দিনের পর দিন গুরুদেবের খবর না পাওয়া, বা এর ওর তার মুখে দুঃসংবাদের জনশ্রুতির অশুভ স্ফুরণ, অন্যদিকে তপতীর মাধ্যমে নানা অঘটনে অসিতের বিষাদ কেটে যাওয়া। আর একবার নয়—বারবার। রমেন একদিন বলেছিল :

"দাদাগো, মনে হয় যেন ঠাকুর তোমাকে এমন ভাবে পরীক্ষা করতে চাইছেন যেভাবে তিনি সচরাচর সাধকদের পরীক্ষা করেন না—অন্ততঃ এযুগে।"

কথাটা ও মিথ্যে বলে নি সত্যিই অসিতের সময়ে সময়ে মনে হয় বুঝি ঠাকুর ওকে বিষাদের অথই জলে চুবিয়ে দমবন্ধ করতে চান—শুধু তারপরে ডাঙায় তুলে আনন্দের হিল্লোল বওয়াতে—ধাক্কা দিয়ে বার বার ফেলে দেন—শুধু পরম স্নেহে হাত ধ'রে ওঠাতে। বলত ও রমেনকে থেকে থেকে: "ভাই, অনেক কিছুই ঝাপসা ছিল—তবে একটু একটু ক'রে আলো আসছে যেন। গুরুদেবের একটা কথা মনে হয় আজকাল প্রায়ই: 'যত বাধা ততই বিকাশ'।"

রমেন ঈষৎ ম্লান কণ্ঠে বলত: "তা বটে দাদা, কিন্তু পোড়া মন মানে না, প্রশ্ন ক'রে বসে—গুরুদেবের মতন মহাপুরুষের এত দেহদুঃখ সইতে হয় কেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতন যুগাবতারের কেন ক্যান্সার হয়?

বলতে না বলতে ফের সোহনলালের অভ্যুদয়। বলল যেন সদর্পে: "ডাক্তার কাল আসছেন লাহোর থেকে। গুরুদেব মত দিয়েছেন।"

তপতী বলল: "কিন্তু গুরুদেব—?"

সোহনলাল হেসে বলল: "না আমি আমার বন্ধু ডাক্তারকে বলি নি। তাঁকে টেলিফোন করতে তিনি নিজে থেকেই আসতে চাইলেন।" ব'লেই হেসে: "অবশ্য আশ্রমে সবাই জানবে—তিনি হঠাৎ এসে পড়েছেন—শ্রীনগরের পথে।"

* * * *

পরদিন বিকেলে অসিত সোহনলালকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল: "ডাক্তার বলেছেন—গুরুদেবের অবস্থা খুবই সঙিন।"

অসিতের বুকের মধ্যে খালি খালি লাগে। সত্যিই কি……কিন্তু সভয়ে ও এ-চিন্তাকে ঠেলে দেয়: "না না না, হতেই পারে না—না না না।"

কিন্তু চিন্তারা কি কথা শোনে? যতই পণ নেয় দুর্ভাবনাদের আমল দেবে না ততই যেন তারা পেয়ে বসে।

বুকের মধ্যে বেদনা যখন প্রায় অসহ হ'য়ে উঠেছে তখন অসিত তপতীকে ডাকল: "এসো, একটু প্রার্থনা করি একসঙ্গে—সবাই মিলে।"

ঠাকুর ঘরে ওরা পাঁচজনে বসল কৃষ্ণমীরা যুগলমূর্তির সামনে। একটু পরেই তপতীর সেই পরিচিত ভাবসমাধি। বলল গাঢ়কণ্ঠে: দাদা, একটি গান শুনেছি।"

ও ব'লে যায়, রমেন লিখে নেয় (ও খুব দ্রুত লিখতে পারত) আস্থায়ীটি এই :

জীবনকী নৈয়া ডোল রহী, ডোলে জীবনকী নৈয়া।

তুম কহাঁ গয়ে হো খেবনহার, হো কহাঁ গয়ে কন্হৈয়া ? *

গানটি আবৃত্তি করতে করতে তপতীর কণ্ঠস্বর মৃদু হ'য়ে আসে—অশ্রু এসে বার বার বাধা দেয়। অতি কষ্টে সবটুকু বলার পর সে চুপ ক'রে থাকে চোখ বুঁজে। প্রথমেই লক্ষ্মী গিয়ে ওকে প্রণাম করে, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিশ ফিশ ক'রে বলে কুসুমকে : "মা মা! দিদিজির পা থেকে ভুর ভুর ক'রে চন্দনের গন্ধ বেরুচ্ছে!"

অতঃপর রমেনের পরে কুসুম প্রণাম করার সময় তপতীর পদ চুম্বন ক'রে বলে অসিতকে : "দাদা! দিদি কি চন্দন বেটে লেপেছিলেন পায়ে?"

অসিত : সে কি? ও কোনোদিনই কোনো সুগন্ধি কিছু মাখে না, বিশেষ চন্দন ও বরাবরই এত পবিত্র মনে করে—পায়ে মাখবে কি বলো?

রমেন : কিন্তু চমৎকার চন্দনগন্ধ!

তারপর আরো আশ্চর্য—বিস্ময়ের পরে বিস্ময়—ওর চুল থেকে হাত থেকে কণ্ঠ থেকে চন্দনগন্ধ নিঃসৃত হ'য়ে ঘর ছেয়ে যায়!

অসিতের বুকে শিহরণ জাগে! ও নানা বইয়ে পড়েছিল দেহ থেকে সুরভি নিঃসৃত হওয়া একটি বিশিষ্ট যোগবিভূতি। পড়েছিল—শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অষ্টপ্রহর পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হ'ত। গঙ্গোত্রীবাসী বিখ্যাত বৃদ্ধ যোগী কৃষ্ণাশ্রমের অঙ্গ থেকেও অপরূপ সুগন্ধ নিঃসৃত হয় শুনেছিল সোহনলালেরই কাছে। কিন্তু তপতীর অঙ্গ থেকে চন্দনগন্ধ—এ কী ব্যাপার?

সেদিন রাতে তপতী ওকে বলে : "দাদা, তোমাকে আমি বলি নি—তুমি পাঁচজনকে না ব'লে থাকতে পারো না ব'লে। আমার ভাবসমাধিতে আমি ঠাকুরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবামাত্র চন্দনগন্ধ আমার সর্বাঙ্গে ছেয়ে যায়—হাতে পায়ে বুকে চুলে···কিন্তু এখানে তোমার গুরুভাইরা অনেকে এসব নিয়ে হাসাহাসি করেন ব'লেই আমি বলি নি কাউকে—" ব'লে হেসে : "কিন্তু আজ ধরা প'ড়ে গেলাম লক্ষ্মীর জন্যে।"

সবাই হেসে ওঠে একজোটে। অসিতের অবসাদ কেটে যায়।

* (করে) জীবনতরণী টলমল, কাঁপে জীবনতরণী তুফানে!
(কোথা) তুমি কাণ্ডারী হে শ্যামল, তুমি কোথায় লুকালে কে জানে?

বারো

কিন্তু তারপর তপতীর মধ্যে দিয়ে আরো কতরকমের অঘটনই যে ঘটতে থাকে দিনের পর দিন! অসিত আনন্দ রাখবে কোথায় ভেবে পায় না। কারণ প্রেমল ওকে যতই তিরস্কার করুক না কেন, অসিত কোনদিনই যোগবিভূতিকে হেনস্থা করেনি। ওর বরাবরই মনে হ'ত—প্রতি যোগবিভূতিই প্রকট হয় সাধকের কাছে একটি মহাসত্যের এজাহার দিতে: যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টি চালাবার জন্যে নানা বিধান—Law—তৈরি করলেও, তিনি নিজে যে কোনো বিধানেরই তাঁবেদার নন এই সত্যের সত্যটি প্রমাণ করতেই যোগবিভূতির অঘটনী লীলাখেলা ক'রে থাকেন যুগে যুগে। তাছাড়া অসিত সকৃতজ্ঞেই স্বীকার করত—তপতীর নানা যোগবিভূতি ওকে বরাবরই নিরাশা স্বপ্নভঙ্গ অবসাদের বেদনা থেকে টেনে তুলেছে—করুণাকে প্রকট ক'রে, দেখিয়ে (যে কথা রমেন বলেছিল হাসির ছলে) যে ঠাকুর তাঁর ভক্তকে নানা পাকে ফেলেন শেষে তাঁর প্রসাদ দিতেই। কিসের প্রসাদ? আবিষ্কারের, বিস্ময়ের, শিহরণের। জীবন সচরাচর চলে দুর্বিষহ একঘেয়ে ছন্দে—দিনের পর দিন সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। কজন ভাগ্যবানের ভাগ্যে অঘটনের চমক হানা দেয়—নিরাশা কাটিয়ে আশ্বা দিতে, একঘেয়েমি দাবিয়ে চমক জাগাতে, স্রোতহীন তামসিকতায় আনন্দের বান ডাকাতে?

কিন্তু মুখে তর্ক করলেও ও মানত মনে মনে তপতীর তিরস্কারকে যে, ঠাকুর প্রসাদ দেন চম্‌কে দিতে নয়—তাঁর পুণ্য স্পর্শ দিয়ে ধন্য করতে—যাকে বাইবেলে বলেছে sign—নিদর্শন। খৃষ্ট sign চাওয়ার বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু শুধু ভৎর্সনার সময়ে, কার্যক্ষেত্রে তিনি উঠতে বসতে "নিদর্শন" প্রকট করতেন না কি —রোগ সারিয়ে, মৃত্যুমুখী প্রাণীকে জীবনের রসতটে ফিরিয়ে এনে, সর্বোপরি, তাঁর অবতারী রূপের প্রমাণ দিয়ে?

কিন্তু এ যুগে ভাগবত নিদর্শন প্রকট হয় না—the age of miracles is past—এ-প্রসিদ্ধি ও আশৈশব শুনে এসেছে। তাই তো তপতীর আবির্ভাবকে সে আরো বরণ করেছে ঠাকুরের করুণার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান রূপে। তার নিজের জীবনক্ষেত্রে তপতী ছাড়া আর কার মাধ্যমে যোগবিভূতির এমন

অকাট্য নিদর্শন ঝল্‌কে উঠতে পারত? ও মনে মনে সত্যিই বিধাতাকে প্রণাম করত এজন্যে—আর প্রণাম করবার সময় প্রায়ই গভীর কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে জল আসত। তপতীকে নিয়ে ও বাড়াবাড়ি করছে যোগের চেয়ে যোগবিভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে—এ-অপবাদে ও শুধু হাসত। একদিন বলেছিল রমেনকে: "বেচারারা জানে না তাই মানে না। আমি যে জানি—তপতী কিসের প্রতীক হ'য়ে এসেছে আমার কাছে।"

কিন্তু তপতীর মাধ্যমে নানা অঘটনের প্রকাশ অতিপ্রত্যক্ষভাবে অসিতের সাধনার সহায় হ'লেও ওর কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয় থাকবে একটি সেরা অঘটন: গুরুদেবের মুখে ও শুনেছিল—ঠাকুরের করুণা প্রতি সাধকের সামনে তার আধার-অনুসারে বাধা দাঁড় করায় তার অন্তর্লীন সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তাকে গভীরতর সার্থকতার স্বাদ দিতে। এ-সত্যের যে-পরিচয় সে পেয়েছিল এক অবিস্মরণীয় রাতে—কোনোদিন কি ভুলবে? ওর জীবনে গভীরতম নিরাশার অতলে পড়ার সে-যন্ত্রণার দুর্লগ্নে—কে এল কালো মেঘের বুক চিরে অচলা চপলার অবিশ্বাস্য অভয় ঝল্‌কে তুলতে?

তেরো

আরো একজন ডাক্তারকে তলব করা হ'ল শেষদিন—শ্রীনগর থেকে। কিন্তু তখন "টু লেট": স্বামী স্বয়মানন্দ শেষ দুদিন আর চোখ মেলেন নি। ডাক্তার এসে বললেন: "আশা নেই"। কিন্তু তবু দিতে হয় ব'লেই দিলেন একটা শেষ ইঞ্জেকশন হাতের উপরে অঙ্গুষ্ঠের কাছে।

তপতী দেখলো ধ্যানে—রাত দুটোর সময়ে—যে, গুরুদেবের স্বর্ণবর্ণ দেহ উপরে উঠছে। সে তাঁকে বলল: "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি যে আপনার কাছে এসেছি আপনার আশ্রয়ে যোগসাধনা করতে!"

গুরুদেব স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "মা, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ অসিতের কাছে। সেও তোমাকে দেখবে—তুমিও তাকে দেখবে: পিতাপুত্রী গুরুশিষ্যা বড় মধুর সম্বন্ধ মা—খুব কম ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতীর ভাগ্যেই ঘটে।"

তপতী কেঁদে উঠল। অসিত বারান্দা থেকে জিজ্ঞাসা করল: "কী ব্যাপার?"

তপতী বলল ওর দর্শনের কথা। অসিতের মাথা ঘুরে উঠল……তারপর আর কিছু মনে নেই……

ভোরের আলোয় যখন অসিতের চেতনা ফিরে এল তখন তপতী অসিতের শিয়রে ব'সে একমনে নাম জপ করছে। সামনে শ্রীনগরের ডাক্তার সাহেব চুপ ক'রে ব'সে।

জ্ঞান ফিরে আসতেই ডাক্তার হেসে বললেন: "কোনো ভয় নেই অসিত বাবু! you are out of the wood—definitely."

অসিত ম্লান হাসে শুধু।

ডাক্তার বিদায় নিলেন শুধু টনিকের ব্যবস্থা ক'রে।

অসিত জীবনে এত দুর্বল বোধ করে নি কখনো। এ তো শুধু অসুখ বা হঠাৎ মাথা ঘোরা নয়, এ যেন—কী বলবে—যে-নৌকা চলছে পাল তুলে তার পালের হাওয়া হঠাৎ ঝড় হ'য়ে উঠে প্রায় কূলে এসে ভরাডুবি! এত করুণা, এত সাধনা, এত সাধুসন্তের আশীর্বাদ সবই মনে হয় ওর মায়া…… অবাস্তব—কৃতান্তের দংষ্ট্রা।

শুধু তপতীর কথা ভেবেই ও কিছু বলে না। পাশ ফিরে শোয়। তপতী সমানেই নাম জপ ক'রে চলে।

* * *

রাত এগারোটায় অসিত তপতীকে বলল: "আজ ঠাকুর ঘরেই শোব তপতী।"

"বেশ তো," ব'লে তপতী ঠাকুর ঘরে যে সোফাটি এক কোণে ছিল সেটি মাঝখানে টেনে এনে তোষক বিছিয়ে অসিতকে শুইয়ে দিল।

অসিতের মাথাঘোরা তখন থেমেছে—কিন্তু খুব দুর্বল মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে।

এবার ওর বিষাদের প্রধান কারণ নিজের পরে সংশয় নয়—গুরুদেবের সাধনা ব্যর্থ হবার বেদনাই ওকে অভিভূত করেছিল। তিনি যে সিদ্ধির আগেই এমন হঠাৎ কাউকে কিছু না ব'লে কয়ে মহাপ্রয়াণ করতে পারেন এ যে কল্পনারও অতীত! ওর মনে হ'ল যেন পায়ের নিচে মাটি নেই—শুধুই চোরাবালি। দাঁড়াবে কোথায়?

ওর মনে আজ কেবলই একটি প্রার্থনা জেগে ওঠে: "যদি গুরু বিনা সাধনায় বস্তুলাভ না-ই হয়, তবে এ-জীবনের পূর্ণচ্ছেদ হোক এখন ঠাকুর! তুমি তো গীতায় বলেছ—অন্তিম সময়ে যে তোমার শরণ চাইবে তাকে তুমি চরণ দেবে। আমি চাই আজ পূর্ণ শরণ। তুমি ঠাঁই দাও রাঙা পায়। আর যদি না দাও তবে ভরসা দাও যে গুরু ছেড়ে গেলেও তুমি আমার কাছেই আছ।"

এই সময়ে তপতী এক গেলাস জল নিয়ে এসে সোফায় বসল ওর পায়ের কাছে। অসিত বলল: "আমি আর পারছি না তপতী। তুমিও প্রার্থনা করো আজ যে, সব শেষ হ'য়ে যাক।" তপতী চোখ মুছল কিন্তু একটি কথাও বলল না। কী-ই বা বলবে এ-অতলস্পর্শী হতাশার দুর্লগ্নে? একটু পরে অসিত ওর হাত থেকে জল নিয়ে চুমুক দিতে যাবে—এমন সময়ে অদূরে কৃষ্ণমীরা মূর্তির নিচের বাল্‌ব্‌ জ্ব'লে উঠল! অসিত চম্‌কে উঠে বলল: "দেখ দেখ তপতী! ঠাকুর ফের সেই লীলা সুরু করেছেন—আলো জ্বালানোর।" কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে ফের আলো নিভে গেল।

তারপরে ঘটল সেই অবিস্মরণীয় অঘটন: আলো জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে······ওরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।······দশ-বারোবার এইভাবে জ্বলা-নেভার পর আলো নিভে গেল। শুধু একফালি চাঁদের আলো তপতীর ম্লান মুখকে যেন আদর করতে থাকে। অসিতের জিভে দুষ্ট সরস্বতী ভর করলেন, ও ব'লে বসল ঠাকুরকে উপহাস ক'রে: "তপতী খৃষ্টানদের ঠাকুর যখন বলেন আলো হোক—Let there be light—আলো জ্বলে। কিন্তু আমাদের ঠাকুরটি দ্বাপরযুগে বিশ্বরূপ দেখাবার শক্তি ধরলেও কলিযুগে শুধু চালকলা ভোগ খেতে খেতে, এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছেন যে, ছোট্ট আলোকেও আর বাগ মানাতে পারেন না।"

যেই এই কথা বলা অম্‌নি আলো জ্ব'লে উঠল—এবার আর নিভল না!!

তপতীর ভাবসমাধি হ'য়ে গেল ফের। একটু পরে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হ'য়ে আবৃত্তি করল:

বোল ন পাঈ, রহী লজাঈ, এক কহী না জীকী:
আতী দেখা, জাতী দেখা—সুন্দর ছবি হরীকী!

অসিতের বুকের মধ্যে কে যেন আলো জ্বালিয়ে দিল মুহূর্তে! সে উঠে ব'সে

প্রথমে তপতীর সঙ্গে গাইল এ-দুটি লাইন, তার পরে মুখে মুখে অনুবাদ ক'রে গাইল সেই একই সুরে :

আমি কি বলিব বল্? দেখে বিহ্বল হয়েছি যে সখী পলকে :
শুধু আসা-যাওয়া তার দেখি বারবার—সুন্দর ছবি ঝলকে !

পরদিন অসিত সব লিখে পাঠাল প্রেমলকে এক দীর্ঘপত্র।

চোদ্দ

অসিতের চিঠি আলমোরা পৌঁছবার আগেই প্রণব শয্যাশায়ী হ'য়েও ওকে লিখেছিল :

ভাই অসিত,

গতকাল সকালে সুরথদা রেডিওতে শুনেছেন তোমার গুরুদেবের দেহরক্ষার সংবাদ। তাঁর টেলিগ্রাম পেয়েই তোমাকে লিখছি। আমার শরীর এখনও দুর্বল, তাই অনেক কথাই হয়ত লিখতে পারব না যা নিশ্চয়ই লিখতাম যদি আমাকে লিখতে এত বেগ পেতে না হ'ত।

তোমাকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্ধা আমার নেই ভাই, উপদেশ দেবার তো নয়ই। প্রেমল বলে—সে-ও তোমাকে ঠিক উপদেশ দেয় না—তোমাকে বলে বা লেখে নিজের সঙ্গে আলাপের ছন্দেই। কে না নিজেকে বোঝায়, উপদেশ দেয়, নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করে নানান সংকট লগ্নে? এও তেমনি।

কিন্তু আমি ওদিক দিয়েই যাব না। তোমাকে শুধু এই কথাটি জানাতেই আজ এ-চিঠি লিখছি যে : আমি তোমার সঙ্গে আছি, অর্থাৎ তোমার শোকের ভাগ আমিও নিতে চাই।

তবে দু একটি অঘটন-এর খবর তোমাকে দিতে সাধ হয়েছে আজ—শুধু তুমি অঘটনের কথা শুনতে ভালোবাসো ব'লেই নয়, এজন্যও বটে যে, অঘটনগুলি সত্যিই গুরুর করুণার প্রত্যক্ষ এজাহারই বলব। প্রেমলকে জিজ্ঞাসা করতে সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল যে, সে তোমাকে এতদিন বলে নি এসব কথা পাছে তুমি রটিয়ে দাও এই ভয়ে। "কিন্তু এখন"—বলল সে—"তুমি তাকে লিখতে পারো, হয়ত সে মনে জোর পাবে। 'হয়ত' বলছি কেন না এ-বিষয়ে আমার মনে এখনো সংশয় আছে। কিন্তু মরুক গে, তুমি

তাকে লিখে দিতে পারো বিশেষ ক'রে মা যেদিন মহাপ্রয়াণ করেন সেদিনকার কথা।"

তাই আমি লিখছি ভরসা ক'রে।

প্রথম কথা বলি শোনো খানিকটা ভূমিকা হিসেবেই : যে, আমিও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নি যখন মা তাঁর দেহরক্ষার আগে আমাদের বলতেন যে, তিনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন না—ওপারে গেলেও এপারে সর্বদাই তাঁর আসা যাওয়া থাকবে। নানা ভাবেই তিনি বলতেন একথা : যে সদ্‌গুরু শিষ্যদের ছাড়েন না যতদিন তাঁর নির্দেশ তাদের তীর্থপথে বাতি ধরতে পারে। আমি একথা যে ঠিক অবিশ্বাস করতাম তা নয় অবশ্য, কারণ মা-র কথা মিথ্যা হ'তে পারে না এ-বিশ্বাসে আমার গলদ নেই, তবু—কিন্তু মিথ্যে ভনিতা থাক, শোনো যা যা বলতে আজ কলম ধরা।

যেদিন মা দেহরক্ষা করেন সেদিন আমাদের সকলের মনের অবস্থার কথা আর কী বলব? তুমি নিজে ভুক্তভোগী, জানোইতো—মানুষের নিজেকে কী অসহায় মনে হয় সে দিশারিকে হারালে যাঁর স্নেহাশিস ধ্রুবতারা হ'য়ে প্রাণের তুফানে জ্বলে অভয়ের দিশা দিতে। আমরা সবাই মিলে তাঁর দেহ নিয়ে দুতিনমাইল দূরে এক ঝর্ণার ধারে দাহাদি শেষকৃত্য সমাপন ক'রে ফিরলাম দুপুর রাতে। প্রেমলের দেহ তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। শুতে শুতেই অঘোর নিদ্রা। কিন্তু শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনতে পেল, মা-র কণ্ঠস্বর : "জাগো গোপাল, ঘুমচ্ছ কি? ধ্যানে বসবে না? আমি আছি।" বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন তরপে উঠে প্রেমল আকুল হ'য়ে বলল : "তুমি আছো তো দেখা দিচ্ছ না কেন মা?" উত্তর এল : "আমি তোমাকে দেখা দেব না। আমি যেখানে আছি তোমাকে সেখানে উঠে আসতে হবে ধ্যানবলে।" এমনি ক'রে ফের দ্বিতীয় রাত্রেও মা তাকে ঘুম থেকে জাগান, বলেন : 'আমি আছি, তোমার মধ্যেই আছি।" তৃতীয় রাত্রে বলেন : "আমি আছি, সকলের মধ্যেই আছি।" এমনি ভাবেই গুরু বিদেহ অবস্থায় থেকেও তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন ধ্যানের এক ভূমি থেকে আর এক ভূমিতে, যার ফলে তার কাছে এপার-ওপারের ব্যবধান ঘুচে যায়।

গুরু দেহে থাকতেও প্রেমল তাঁকে যেভাবে প্রতিপদে তাঁর নির্দেশ নিয়ে চলত বিদেহ অবস্থাতেও তেমনি প্রত্যক্ষভাবেই পায় তাঁর আদেশ। কি ভাবে আর একটু বললে হয়ত বোঝাতে পারব।

মুকুন্দকে তুমি তো খুব ভালো ক'রেই জানো। সে আজকাল তোমার গান এত চমৎকার গাইছে যে কী বলব? তোমার গানের ঢং এত সুন্দর আর কারুর গলায় শুনি নি। সে প্রেমলকে কী রকম ভালোবাসে তাও জানো নিশ্চয়ই। একবার—আমরা তখন বৃন্দাবনে—ললিতা তাকে তার করল: আসতেই হবে—you must mnst come, কী করে বেচারী? ডবল must-এর শমন জারি হয়েছে—হাজিরি না দিয়ে উপায় কি? সে বৈদ্যনাথ থেকে বৃন্দাবনে আসতে আমাদের আসর জ'মে উঠল—আরো তার মুখে তোমার গান শুনে।

কিছুদিন পরে যখন মুকুন্দ বৈদ্যনাথ ফিরবে ফিরবে করছে, হঠাৎ তার দাদা এক তার করলেন ললিতাকে যে আলমোরা ফেরার আগে যেন একবার বৈদ্যনাথ ঘুরে যায়। ললিতা তো উজিয়ে উঠল মহানন্দে। আমরা সেদিন সকালে যমুনাতীরে প্রেমলের কুটিরের প্রাঙ্গনে ব'সে এই সব কথা বলছি এমন সময়ে ও উঠে গেল কুটিরে। একটু পরে ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বলল ললিতাকে: "না, যাওয়া হবে না। মা বারণ করেছেন। আলমোরায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সেখানে মন্দিরে দরকার পড়বে।"

শুনে ললিতা ম্রিয়মাণ, আমরাও হতাশ, কিন্তু করার কিছু নেই, যখন মা-র প্রত্যাদেশ।

আমরা সেইদিনই রওনা হলাম। আশ্রমে পৌঁছেই দেখি—যে-পুরোহিতের 'পরে বিগ্রহ সেবার ভার ছিল সে হঠাৎ গায়েব—আর আমরা যেদিন পৌঁছলাম ঠিক তার আগের দিনই পালিয়েছে! কাজেই বুঝতেই পারছ—আমরা সেদিন না পৌঁছলে মন্দিরে বিগ্রহসেবাই বন্ধ হ'য়ে যেত। মা-র আদেশ ছিল—বিগ্রহসেবায় যেন কখনো গাফিলি না হয়—একদিনের জন্যেও না।

* * *

এত বড় চিঠি লিখব ভাবি নি। প্রেমল এসে বিষম বকছে আমাকে। আমি হেসে বললাম: "লিখে ক্লান্ত হয়েছিলাম একটু, কিন্তু জিরিয়ে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছি, মা ভৈঃ।" ও গম্ভীর হ'য়ে চিঠিটা আদ্যন্ত খুব মন দিয়ে প'ড়ে বলল: "কাল পরশুর মধ্যে ওর চিঠি পাব মনে হয়। তাহোক, ওকে পাঠিয়ে দাও। হয়ত ওর বিষাদ কাটতেও পারে। তবে ভয় হয়—পাছে উল্টো উৎপত্তি হয়—যদি ও ভাবে—প্রেমল দেখা পেল গুরুর, কেবল আমিই পেলাম

পেলাম না……আমি নিশ্চয় গুরুর অযোগ্য শিষ্য…ইত্যাদি।—জানোই তো ও কী ভাবে সংশয় অবসাদকে প্রশ্রয় দেয় কথায় কথায়।”

না ভাই, বিষণ্ণ হোয়ো না। গুরুর দেখা যদি আজ না পাও, দুদিন পরে পাবেই পাবে। তিনি কি তোমাকে লেখেন নি একবার যে, তুমি তাঁর “জীবনের একটি অচ্ছেদ্য অংশ?”

গুরু ও ইষ্টের কৃপা তোমাকে ঘিরে থাকুক—এই প্রার্থনা করি।

ইতি। স্নেহাধীন প্রণব

পনেরো

(তিন সপ্তাহ বাদে)

ভাই অসিত

তোমাকে কী বলব বলো? তোমার গুরুদেব যে হঠাৎ এভাবে দেহরক্ষা করবেন আমি সত্যিই ভাবি নি। তোমার কথা মনে হয় সব সময়েই। প্রণবের অসুখের জন্যে আমি নড়তে পারছি না, নৈলে এখনি দুমেলে ছুটে যেতাম—যদিও জানি যে, গভীর শোকের সময়ে কোন সান্ত্বনাই কাজে আসে না। তবে আমার তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে তোমাকে সান্ত্বনা দিতে নয়—শুধু জানাতে যে, তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু শুধু তোমার আনন্দেরই সরিক নয়, বেদনারও অংশীদার। আমি আজ কেবল একটি কথা বলতে চাই, আশা করি কিছু মনে করবে না, বুঝতে চেষ্টা করবে কেন আমি বলছি যা বলতে যাচ্ছি।

তুমি যে তোমার গুরুদেবের মধ্যে দেখতে পাও নি যা আমি দেখতে পেয়েছিলাম আমার গুরুমা-র মধ্যে বা তপতী দেখতে পেয়েছে তোমার মধ্যে—একথা ভাবতে আমি খুবই দুঃখ পাই। কিন্তু তুমি যে গুরুর মধ্যে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেলে তাঁকে ভগবান্ ব'লে মানতে রাজী নও তোমার এ-অকপট ঘোষণার জন্যে আমি তোমাকে একবারও অহঙ্কারী ভাবি নি—যদিও তুমি অনেক সময়েই আমাকে ভুল বুঝে ব্যথিত হয়েছ। আমি বরং তোমাকে আরো বেশি শ্রদ্ধা করেছি—তোমার সত্যনিষ্ঠার জন্যে। বলতে কি, তোমাকে আমি যে এত ভালোবেসেছি তার প্রধান কারণ তোমার গীতিপ্রতিভা নয় (যদিও তোমার মতন গান আমি কখনো শুনি

নি) তোমাকে আমি অন্তরঙ্গ ব'লে অঙ্গীকার করেছি তোমার নিষ্করুণ নির্ভীক সত্যবাদিতার জন্যে। আমি ভাই এমন সত্যাশ্রয়ী মানুষ বেশি দেখি নি এ-সংসারে।

কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আমি মা-র কাছে প্রার্থনা করতাম বারবারই—যেন তাঁর আশীর্বাদে তুমিও গুরু কৃষ্ণ অভেদ এই মহাসত্যটি উপলব্ধি করতে পারো। কারণ আমার মনে হয়েছে অগুন্তিবারই যে, যদি এ-গুহ্যতত্ত্বটি তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করে তাহ'লে তোমার সাধনার বাধার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবেই যাবে। সেই জন্যেই আরো ললিতা ও আমি দুজনেই তপতীর তোমাকে অকুণ্ঠে গুরুবরণে শুধু মুগ্ধ নয় আশ্বস্ত হয়েছিলাম ভেবে যে, তুমি দেখতে পাবে তার গুরুবরণ ও তোমার গুরুবরণের মধ্যে তফাৎটা ঠিক কোনখানে। কিন্তু ফের বলছি, আমাকে ভুল বুঝো না—তুমি যে তোমার গুরুর মধ্যে দেখতে পাও নি যা তপতী তোমার মধ্যে দেখতে পেয়েছে এজন্যে তোমাকে অপরাধী ব'লে দেগে দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর প্রশ্নই ওঠে না। খৃষ্টদেবের সব কথা আমার মন নেয় না, কিন্তু তাঁর একটি কথায় আমার মনের পুরো সায় আছে: যে, মানুষকে বিচার করতে নেই। আমি কেবল জুড়ে দিতে চাই—কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করা ভালো: Not to judge but to understand. আমার মনে হয় না—আমি বা ললিতা তোমাকে কঠোরভাবে বিচার করেছি যখন তোমাকে বলতাম গুরুর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিতে। কারণ আমরা দুজনেই দেখতে পেয়েছিলাম তোমার কোথায় বাধছে—এবং কেন? তুমি তোমার গুরুদেবকে গভীর ভক্তি করলেও ইষ্টকে তাঁর মধ্যে দেখতে পাও নি যেমন পেরেছিলেন ধরো চৈতন্যদেবের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা বা শ্রীকুলদানন্দ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে। তপতী তার নানা ভজনে গুরু-কৃষ্ণের এই অভেদবাণী এত সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেছে ব'লেই আরো ভেবেছিলাম সংশয়ের কাঁটাবনে তার গানের আলোয় তুমি পথ দেখতে পাবে। তুমি তার একটি ভজন ললিতাকে পাঠিয়েছিলে তার মহাপ্রয়াণের কয়েক মাস আগে। সে-গানটি তার বিশেষ প্রিয় ছিল—বিশেষ শেষ স্তবকটি:

কহতী মীরা: সব কুছ তজকে রহুঁগি ঠাড়ী দ্বারে।
গুরু কিরপা বিন হরী মিলে না, বিফল হৈঁ সাধন সারে।

সদগুরু মিলে, মিলে পরমেশ্বর, "জয় গুরু, জয় হরি ধ্যাউঁ।"
গুরু তজ কৌন দুয়ারে জাউঁ, কৌন দুয়ারে জাউঁ ?

ললিতার এ-স্তবকটি এত ভলো লেগেছিল যে চলতে ফিরতে তোমার বাংলা অনুবাদটিও গাইত মূল হিন্দির সঙ্গে :

মীরা গায় : সব ছেড়ে আমি রবো দাঁড়ায়ে গুরুর দ্বারে কেবল।
গুরুকৃপা বিনা কে পেয়েছে হরি ? হয়েছে সাধনা কার সফল ?
যে পায় গুরুকে পায় ভগবানে, জয় গুরু জয় হরি অপার !
গুরু ছেড়ে কার দুয়ারে যাব লো, গুরু ছেড়ে যাব দুয়ারে কার ?

ফের বলি—পুনরুক্তি মার্জনীয়—আমাদের দুজনের মনে আশা ছিল যে, তপতীর ছোঁয়াচে গুরু-ইষ্টের অভেদ উপলব্ধি তোমার অন্তরে ফুটে উঠবে এইভাবে—ফুলের মতন। তা হ'ল না। নাই হোক। আমার এখন মনে হয় (ললিতাও বলত একথা) যে, তুমি গুরুর কাছে যা পাও নি পাবে শিষ্যার কাছে। আর কেন পাবে বলব ? কারণ, তুমি সত্যের জন্যে গুরুত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলে ব'লে। এ কথার মধ্যে আশা করি তুমি কোনো স্ববিরোধী অসঙ্গতি দেখবে না। আর যদি দেখ-ও—তাহ'লেও আমার ক্ষতিপূরণ মিলবে : তুমি মানতে বাধ্য হবে ব'লে যে, আমি গুরুনিষ্ঠ হ'লেও গুরুগোঁড়া নই।

জানি না এসব কথা লেখা আমার ঠিক হ'ল কি না। তবে যদি একথায় তুমি মনে একটুও ব্যথা পাও তবে আমাকে ভুল বুঝো না ভাই লক্ষ্মীটি ! ভেবো না—তোমার ব্যথার ব্যথী আমি নই। যদি না হতাম তাহলে এত খোলাখুলি লিখতাম না যা মনে আসে—লিখতাম বিচক্ষণ সাবধানীদের মতন—রেখেঢেকে।

প্রণবের অবস্থা ভালো নয়। সুরথদা দিল্লী থেকে আবার স্পেশালিষ্ট ডাকতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজের খরচে। কিন্তু এবার প্রণব সাফ ব'লে দিয়েছে—সে আর কোন ওষুধই খাবে না। সেও এই গানটি আজকাল প্রায়ই আবৃত্তি করে, আর বলে মাঝে মাঝে : "আহা, যদি অসিতের অপূর্ব কণ্ঠে এটি শুনতে পেতাম ?"

এ-হেন তোমার কাছে আমরা পাবার মতন কিছু পাই নি এমন কথা তুমি মনে করতে পারলে কী ক'রে যতই ভাবি ততই বুঝি তোমার আত্মভোলা

সরলতার মূল্য। তুমি যে মানুষকে নানা ভাবে কত কী দাও তার হিসেব রাখো না ব'লেই তোমার বহুমুখী প্রতিভা তোমার সাধনার অন্তরায় হয় নি। ললিতা থাকলে খুশী হ'য়ে হাততালি দিত: "যাহোক শেষে একটা মিষ্টি কথাও বললে তোমার নেওটো ভক্ত বেচারীকে। তোমার ধমকের পরে তার আরো মিষ্টি লাগবে।" ইতি—

তোমার স্নেহ-ঋণী প্রেমল।

ষোলো

তপতীর চোখে জল উপছে পড়ল প্রেমলের চিঠি প'ড়ে। বলল: "চলো যাই সাধুদার কাছে।"

অসিত: তোমার দুই ছেলেকে কে দেখবে? যদিও তারা আশ্রমের বোর্ডিং-এ আছে তবু তোমার তদারক করা চাই-ই চাই। এখন তো আর গুরুদেব নেই। তার উপরে যখন তুমি আমি এখানে persona non grata.

তপতী (ভেবে): ওদের জব্বলপুরে পাঠিয়ে দেব।

অসিত: না। সেটা ভালো হবে না। বরং (ভেবে) প্রেমলকেই ডাকি —মানে ডাকাডাকি করি। দুজনে মিলে ওকে ধ'রে পড়লে ও না এসে থাকতে পারবে না।

তপতী: কিন্তু প্রণবদার অসুখ যে—ভুলে গেলে? তাছাড়া এখানকার পরিবেশে কি সাধুদাই আরাম পাবেন মনে করো?

অসিত: তা বটে। কিন্তু কী করা যায় তাহ'লে বলো তো?

তপতী (হঠাৎ): কাল আমার এক গুজরাতী বন্ধুর চিঠি পেয়েছি। পুণায় তাঁর একটি বাংলো আছে। লিখেছেন সেখানে গিয়ে একটু জুড়োতে। আমি যেতে চাইছিলাম আলমোরা। কিন্তু প্রণবদার অসুখের জন্যে সাধুদার 'পরে আশ্রমের সমস্ত ভার পড়েছে। দিদিও তো নেই, এখন (চোখ মুছে)··· আলমোরা গেলে সাধুদাকে বিব্রতই করা হবে। কিন্তু এইমাত্র একটা ব্রেনওয়েভ খেলে গেল মাথার মধ্যে—পুণায় গিয়ে সাধুদা ও প্রণবদাকে ডাকলে কেমন হয়?

অসিত: কিন্তু···চলবে কী করে? আমার বই ও গ্রামোফোন রেকর্ডের আয় তো মাত্র মাসে আড়াইশো তিনশোর বেশি নয়। আজকালকার দিনে—

তপতী : সে হ'য়ে যাবে। অতশত ভাবতে নেই। যে-তুমি ঠাকুরের জন্য সব ছেড়েছ সে-তোমাকে ঠাকুর অভাবে রাখবেন না কখনই।

অসিত (একটু চুপ ক'রে থেকে) : তথাস্তু। You win.

তপতী (উৎফুল্ল) : বীরের মতনই কথা।

ব'লেই তপতী নিজের নামেই তার করল পুণার ঠিকানা দিয়ে : যেন প্রণবকে নিয়ে প্রেমল চ'লে আসে তার পেয়েই—Must must must come !

পিঠ পিঠ উত্তর এলো : "অসম্ভব। প্রণব আবার পড়েছে। উঠে বসতে পর্যন্ত পারে না।

সতেরো

পুণায় এসে গুছিয়ে বসতে তপতীর প্রায় তিন মাস লাগল। চিমনলাল কিছু বিছানা আসবাবপত্র দিলেন উপহার। বাকি সব সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকান থেকে কিনতে হ'ল। চিমনলালের চেষ্টায় অজয় ও তরুণের ঠাঁই হ'ল ওখানকার শিবাজী মিলিটারী বোর্ডিং স্কুলে। ব্যয়ভার বহন করলেন দৌলতরাম। তপতী দুবেলা নিজের হাতে রাঁধত। প্রেমলকে সব কথা খুলে জানাতে সে খুশী হ'য়ে লিখল : 'তুমেল আশ্রম ছেড়ে এসে খুব ভালোই করেছ, এবার মন দিয়ে ভজনে বসে যাও। আর তো গুরুবাদের সমস্যা নেই। শুধু ইষ্টকেই ধ'রে পড়ো। গুরুর কাছে যে আশীর্বাদের মূলধন পেয়েছ ভজনে খাটালে মুনাফা হবেই হবে।"

কিন্তু তারপরই নিশ্চুপ। অসিত দু-তিনখানা চিঠি লিখেও জবাব না পেয়ে চিন্তিত হ'য়ে লিখল স্বরথদাকে। স্বরথদা : তার করলেন—"প্রণব গত রবিবার দেহরক্ষা করেছে"।

*　　*　　*　　*

অসিত (চিন্তিত মুখে) : এখন কী করা যায় ?

তপতী : চলো, সোজা আলমোরায় যাই।

অসিত (চিন্তিত) : সেটা কি ঠিক হবে ? প্রেমলের 'পরে এখন আশ্রমের সমস্ত ভার পড়েছে—

তপতী : তাহ'লে ওঁকে এখানে ডাক দাও।

অসিত : কিন্তু—

তপতী : সে সব হ'য়ে যাবে। আমার কিছু গহনা তো আছে।

অসিত : তোমার ব্যাঙ্কের বিশ হাজার টাকা যদি ত্রমেল আশ্রমে দিতে না বলতাম……

তপতী : ছি ছি, অমন কথা বলে!

অসিত : কেন বলব না? তিনি তো "তোমার" গুরুদেব ছিলেন না।

তপতী : কী যে বলো দাদাজি! গুরুর গুরু—তার উপর আমাকে কি তিনি প্রাণভ'রে আশীর্বাদ করেন নি?

অসিত : সে তো সাম্‌নাসাম্‌নি নয়—ধ্যানে।

তপতী : ধ্যানে পাওয়া আশীর্বাদ কি আরো বড় নয়? তোমার মনে আছে আমি কী দেখেছিলাম?

অসিত : মানে? মনে থাকবে না কেন?

তপতী : না, তুমি ভুলে গেছ। যেদিন গুরুদেব মহাপ্রয়াণ করলেন আমি দেখেছিলাম তাঁর সোনালি দেহ উঠছে আকাশের দিকে। আমি বললাম: "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি যে আপনার আশ্রয় পেতেই এসেছি ত্রমেলে।" তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "তোমার গুরুর হাতেই তোমাকে সঁপে দিয়ে গেলাম মা।"

অসিত : মনে আছে, তবে আমি সে সময়ে মনে করেছিলাম এ হ'ল সেই ব্যাপার যাকে প্রেমল বলে the wish is the father of the thought.

তপতী (হেসে): জানি। তোমার যে সন্দেহ বাতিক! তাই তো ঠাকুর আমাকে দিয়ে এসব দর্শন ঝল্‌কে তোলেন তোমাকে বাগ মানাতে। আমার বেশ মনে আছে—আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, গুরুদেবের দেহ যখন উপরের দিকে উঠছিল তখন আমি তাঁর একটি হাতের উপরে কালো দাগ দেখেছিলাম। তুমি বলেছিলে: হ'তেই পারে না, তাঁর হাতে তিল টিল বা কালো কোনো দাগই নেই। তারপর কেমন জব্দ! পরদিন যখন সব শেষ হ'য়ে গেছে আমরা গেলাম তাঁর ঘরে পুণ্য দেহকে প্রণাম করতে—আমি দেখলাম তাঁর হাতে কালো দাগ। তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন: "শেষ মুহূর্তে তাঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল।" তখন তোমার বিশ্বাস হয়। তুমি কি সোজা সাবধানী, দাদাজি!

অসিত : হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে।

তপতী : তবে কেন বললে—আমি তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি কেবল ধ্যানে? আমি অন্ততঃ আজ পর্যন্ত ধ্যানে যা যা দেখেছি তাদের মধ্যে একটা দর্শনও কি মিথ্যা হয়েছে? সাধুদাও কি বলেন নি, আমার ধ্যান দর্শন থেকে আমাদের দুজনেরই সাধনার অনেক দিশা মিলবে?

অসিত : তা তো হ'ল। কিন্তু তাকে এখন এখানে ডাকলে—

তপতী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি আমি—ভালোই হবে। আর সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। যদি দরকার হয় ওঁর ট্রেনভাড়া আমি পাঠিয়ে দেব। সে ভার আমার। তুমি লেখো তাঁকে।

অসিত : এবার তুমিই না হয় লিখলে—যখন এযাত্রা hostess তুমিই।

তপতী : ছি ছি! (পায়ের ধুলো নিয়ে) তুমি যে কী! এমন কথা বলে? আমি তো হসন্ত, তোমার পায়ের নিচে ছাড়া বসব কোথায়?

অসিত : উলটিয়ে রেফ হ'য়ে—সরাসর মাথায়!

তপতী : যাও—তোমার মুখে কোনো আগল নেই।

অসিত (কৃত্রিম গাম্ভীর্যে) : গুরুর সাত খুন মাফ—তোমার সাধুদার কাছেই তো শুনেছ উঠতে বসতে। তাই অকুতোভয়ে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি তাকে ডাক দাও। আমি বলছি বলছি বলছি (নটভঙ্গিমায় আবৃত্তি) :

শোনো বৎসে, আদেশ আমার :
পূজ্য সাধুদাকে প্রণমিয়া ভক্তিভরে
করো অনুরোধ : "একবার
আসিতেই হবে কৃপা ক'রে
দেখিতে অন্তত—যোগবলে
শিষ্যা হ'ল কেমনে বা আজ
শ্রীগুরুর অন্নদাত্রী তথা ধাত্রী ছলে।
দেখিতে চাহেন যদি—আসুন উড়িয়া যোগিরাজ!

আঠারো

(ন দিন পরে)

মা তপতী !

তোমার স্নেহলিপি পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। কিন্তু এতদিন তোমাদের জানাই নি আমার শরীরের দুরবস্থার কথা কারণ তোমাদের নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তো—এর উপর আমার জন্যে তোমাদের উদ্বিগ্ন করি কোন মুখে বলো ?

আমার কী রোগ ? সে জটিল ব্যাপার মা ! নিদান পেতে ডাক্তারেরও কম বেগ পেতে হয় নি। যা হোক শেষে ওরা ধরেছে যে, অন্ত্রে ক্ষত হয়েছে—এক জীবাণুর (মাইক্রোব) প্রসাদে। এর নাম বুঝি আইলাইটিস। সারবার ব্যাধি নয়—এক অস্ত্রোপচার ছাড়া পথ নেই। কিন্তু আমি চাই না সার্জনের ছোরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

কিন্তু আমার কথা থাক। অসিতের এক চিঠি পেয়েছি পাঁচ-ছয় দিন আগে। ও ফের বিমর্ষ হ'য়ে লিখেছে—"গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে আমার সব ভরসাও মহাপ্রস্থান করেছে।" কিন্তু একথা কি ওর মতন উচ্চকোটির সাধকের মুখে সাজে মা, তুমিই বলো তো ? অবসাদ থেকে থেকে কার না আসে জীবনে ? তাই ব'লে কি তাদের আমল দিতে হবে ? মা, মনে রেখো—"ঠাকুর আমাদের পার্থিব সব মিথ্যা সহায় কেড়ে নেন তাঁর প্রেমের নিত্য সহায় দিতে" এ-আপ্তবাক্য তেমনি অকাট্য সত্য বাণী যে, "ঊষা রয়েছে নিশার কোলেই।" জানো তো প্রবচন :

If winter comes can spring be far behind ?

প্রণব কী যে শান্তিতে গেছে ! তবে ঠাকুরকে যে সত্যি চেয়েছে তার কি ভয় থাকতে পারে মা ? কাঁটাও তার পায়ের নীচে ফুল হ'য়ে ফোটে—অন্ধকারের বুক চিরে ঝরে আলোর ঝর্ণা।

আমি ভাবি না আর একটুও। আমার ডাক এসেছে কিনা বলতে পারি না। তবে যদি এসেই থাকে তা হ'লে সে তো আনন্দেরই কথা মা ! এ-জগতে ঠাকুর আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাজে, যদি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান

সেও হবে তাঁরই কাজে তো। শুধু একটি বর চাই আমি: যেন ঠাকুরের সব বিধানকেই মাথায় তুলে নিতে পারি এই বিশ্বাসে যে,

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি।

অর্থাৎ, ঠাকুরের রাঙা চরণ সর্বদা মনে রাখলে সব অমঙ্গল দূর হয়, আর মেলে তাঁর মিলন মধুর স্বাদ!

তাই আমার জন্যে একটুও দুর্ভাবনা কোরো না মা! আমাদের একমাত্র আশ্রয় সেই চিরবন্ধু নিত্যসাথী—আদি মধ্য ও অন্ত্য পর্বে তিনি ছাড়া আর আমাদের কে আছে বলো অভয় দিতে?

অসিতকে আমার গভীর স্নেহ ও শুভেচ্ছা দিও। এদিকে যদি হঠাৎ শেষের শাঁখ বেজে ওঠে তবে ওদিকে তোমরাও শাঁখ বাজিয়ে দোয়ার দিও: "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"—শেষ যাত্রীর শেষ পথটুকু—the last lap—মঙ্গলময় হোক। মনে রেখো পাপ ও নিরানন্দ আমাদের কেউ নয়। আনন্দেই আমাদের জন্ম আনন্দেই আমাদের স্থিতি, আনন্দেই আমাদের সমাপ্তি। ইতি।

তোমার স্নেহাশ্রিত সাধুদা

উনিশ

অসিত পুণার সবচেয়ে নামকরা সাহেব সার্জনের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে ঠিক করল—যেক'রে হোক প্রেমলের অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করাতেই হবে, নৈলে ও বাঁচবে না। তপতী চিমনলালের সঙ্গে পরামর্শের পর বম্বের এক নার্সি হোমের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে তাকে পটিয়ে নিল। তপতীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হ'য়ে রাজী হ'লেন সেন্টের অপারেশনের ব্যবস্থা করতে—ফী না নিয়ে। অসিত প্রেমলকে আগে জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু তপতী বলল আগে ব্যবস্থা না ক'রে জানানো কোনো কাজের কথা নয়।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল—প্রেমলকে অতদূর থেকে পুণায় টেনে আনা যায় কী ক'রে? তার করল স্বরথদাকে। স্বরথদা টেলিগ্রাম করলেন যে, প্রেমলের শরীর অত্যন্ত দুর্বল, আলমোরা থেকে পুণা যাওয়ার পথক্লেশ সইতে পারবে

কিনা সন্দেহ। তপতী প্রেমলকে তার করল যে, দরকার হ'লে অসিত নিজে গিয়ে তাকে সঙ্গে ক'রে অতি সন্তর্পণে নিয়ে আসবে।

উত্তরে প্রেমল টেলিগ্রাম করল : "অসম্ভব। চিঠি লিখছি।"

দুদিন পরে প্রত্যাশিত চিঠি এল :

অসিত ভাই,

তুমি ও তপতী এত ক'রে আমাকে ডাকছ—দেখাশোনা করবে, ডাক্তার দেখাবে, নিজে এসে "অতি সন্তর্পণে" নিয়ে যাবে—যত ভাবি ততই মনটা ভিজে ওঠে। ইচ্ছা করে খুবই তোমার স্নেহসঙ্গ পেতে, গান শুনতে, তপতীর পরিচর্যা চাখতে, তোমাদের নব মন্দিরের বিগ্রহসেবা দেখতে। কিন্তু সে তো হবার নয় ভাই। এতদূর যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া এখন সময় এসেছে সবই ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করার—জীবন মরণ এক ক'রে। তপতী প্রায়ই বলত না : "মন ভাবে জু্ঁ রাখ—যেমন খুশি তোমার আমায় রাখো আমি সবই তোমার বিধান ব'লে মেনে নেব ?" এই এই এই—এই-ই হ'ল সাধনার শেষ সিদ্ধি ভাই, এই আত্মসমর্পণ। তাই ব্যস্ত হোয়ো না আমার জন্যে। যদি ঠাকুর আমাকে তাঁর পায়ে ডেকে নিতেই চান তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হ'তে পারে.বলো তো ?

তপতীকে বোলো—আমি রোজই সকাল সন্ধ্যা তার সেই গানটি আবৃত্তি করি যেটি তুমি কলকাতায় ললিতাকে শিখিয়েছিলে—মনে আছে ? (এখন তো গাইতে পারি না আর, আবৃত্তি ক'রেই তুষ্ট থাকতে হয়।)

ইৎনা করো হরীজী, জব অন্তকাল আয়ে :
হরিনাম মুখসে লেতে য়ে নৈন বন্দ্ হো জায়ে !
কিৎনা সমা গঁবায়া !
জো পানা থা ন পায়া,
প্রভু তুম ন দূর হোনা—জব অন্তকাল ছায়ে।
অব সাঁঝকী হৈ বেলা,
প্রাণী হুয়া অকেলা,
অব তুম হি সাথ দেনা—জব মন তুম্হে বুলায়ে
জব ছোড় সারে বন্ধন য়হ শরণ তেরি চাহে।

ললিতা এটি অনুবাদ ক'রে প্রায়ই গাইত গুন গুন ক'রে—তার শেষ শয্যায় :

যাচি—এই কোরো : শেষ দিন আমার
আসিবে বন্ধু যবে,
যেন জপিতে জপিতে নাম তোমার
মুদি এ-নয়ন ভবে।
বৃথা কাটায়েছি কাল কত,
তাই হয়নি সফল ব্রত,
প্রভু, তুমিও থেকো না দূরে—আমার
ফুরাবে গো দিন যবে।
দেখ, ছায় সন্ধ্যার বেলা,
আমি পান্থ আজ একেলা,
এসো, তুমি হও চিরসাথী আমার—
তোমায় ডাকিব যবে,
সব বাঁধন যখন টুটি তোমার
শরণ চাহিব ভবে।

তপতীকে আমার আশীর্বাদ দেব কী বলো—যে এমন গান বাঁধতে পারে? …আমার অভিনন্দন জানাই শুধু। তুমি আমার স্নেহালিঙ্গন নিও ভাই।

তোমার স্নেহঋণী প্রেমল।

কুড়ি

সাতদিন বাদে তপতী লিখল :

ফ্লোরা বৌদি,

কাল সাধুদার চিঠি পেলাম। আমি আজ ভোরে ধ্যান করছিলাম। দেখলাম তাঁকে : দীপ্ত মূর্তি! ভজন করছেন……দু চোখে ধারা। তাঁর মাথার উপরে নীল আলো। একটু পরে দেখলাম তাঁর মাথায় একটি আলোঘন হাত।…

জানি—শোক করার কিছুই নেই! তিনি বিশ্বাস করতেন না—এ-জীবনের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গতির কোনো পূর্ণচ্ছেদ হয়। তবু তাঁকে যারা কাছ

থেকে দেখেছে, প্রতিমুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে পথের পাথেয়, পারের পারানি—তাদের মন মানা মানে না তো!

আমি এ-চিঠিটি আপনাকে লিখছি—কারণ দাদাজি একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তিনি বলছেন: "সে আমাকে কখনো নিরাশ করে নি, যখনই আমি তার কাছে চেয়েছি স্নেহের নির্দেশ সে শত কাজ সত্ত্বেও আমাকে বলে নি—সময় নেই উত্তর দেবার। সেদিনও—যখন তার এত অসুখ—আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। সে ভালোই আছে ভেবে আমি আমার এক প্রিয় বন্ধুর ছোট মেয়েকে কোলে ক'রে রঙিন ছবি তুলে তাকে পাঠিয়েছিলাম—আমি প্রায়ই তো তাকে ছবি পাঠাতাম—সে উত্তরে লিখেছিল (আমার জন্মদিনের ঠিক আগেই): "কদমগাছের নিচে তোলা ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে তোমার যে-ছবিটি পাঠিয়েছ দেখে আনন্দ হ'ল। তোমার সেই মধুর মূর্তি! যেন এ-মূর্তি অনেক দিন আমাদের কাছে থাকে।"

দাদা একথা বলতে বলতে ফের চোখের জল ফেললেন। বললেন: "আহা, যদি সে সময়ে জানতাম তো গিয়ে তাকে জোর ক'রে টেনে আনতাম এখানে। তার কাছে কেবলই পেয়ে এসেছি—আর এতই পেয়েছি যে, মনে হ'ত পাওয়াটাই বুঝি তার সঙ্গে আমার লেনদেন এর গোড়াকার ছন্দ। দেওয়ার কথাটা সে ভুলিয়ে দিত নিজে দিয়ে—কেবলই দিয়ে—দুহাতে—দিনের পর দিন।"

দাদা নিজে লিখতে পারছেন না। তাই আমিই আপনাকে লিখছি: দাদা জানতে চান—শেষের ইতিহাসটুকু—কী ভাবে তিনি চ'লে গেলেন আঁধার থেকে আলোর রাজ্যে। সাধুদার উদাত্ত কণ্ঠের প্রার্থনা আজ কেবলই বেজে উঠছে আমাদের বুকের তারে: "তমসো মা জ্যোতির্গময়!"

আপনি যদি একটু কষ্ট ক'রে জানান তো বড় কৃতজ্ঞ থাকব। আমাকে আপনি দেখেন নি, কিন্তু সাধুদা ও দিদির কাছে হয়ত শুনে থাকবেন যে, তাঁরা আমাকে দিয়েছিলেন তাঁদের অহেতুক স্নেহ ও অঢেল আশীর্বাদ। যখন সাধুদার শেষ অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি সে সময়ে আমারো হাঁপানি অত্যন্ত বেড়েছিল। আমরা জানতাম না তাঁর এত অসুখ। তাই দাদা লিখেছিলেন শুধু আমার অসুখের কথা। কিছুদিন বাদে—তখন সাধুদা শয্যাশায়ী—দাদাকে লেখেন নিজ হাতে: "তপতী কেমন আছে আমাকে জানাতে ভুলো না।"

অহেতুক স্নেহের কথা বইয়েই পড়েছি। দাদাজি ও সাধুদাকে দেখে সে-কথা আর জনশ্রুতির কোঠায় নেই, হয়েছে প্রত্যক্ষ বর। এ-বর দিতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁরা অদেখার দেখা পেয়ে বলতে পারেন যে, যা কিছু আমাদের ধারণ ক'রে আছে—আসে সেই অদেখা পরম দর্শনীয়ের কাছ থেকে, সেই অচিন চিরচেনার প্রসাদে। এ-ও সাধুদারই উক্তি—লিখেছিলেন তিনি মা-র স্নেহ প্রসাদের সম্পর্কে।

আপনারা ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী যে, আপনাদের বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝেই এসে থাকতেন। তাই কিছু শুনতে চাই আপনার মুখে তাঁর শেষ পাড়ি দেওয়ার কাহিনী।

ইতি। আপনার
স্নেহার্থিনী বোন তপতী

একুশ

স্নেহের দিদিমণি,

তোমাকে আমি শুধু জানি না—চিনি। তোমার ছবি দেখেও টের পেয়েছি তুমি কী বস্তু। প্রেমল তোমার সম্বন্ধে কত কথাই যে বলত! ললিতা বলত—তার চার-চারটি দিদির কথা মনেও থাকে না, কিন্তু এই একটি ছোট বোনের মায়ায় প'ড়েই তার আখের নষ্ট হ'ল—মায়া কাটিয়ে পড়ল মোহের খপ্পরে। জানো তো কি রকম ছিল তার কথার ঢং।

এ-বৎসর প্রেমলের অসুখ বাড়ে খুবই। যেতে হয়েছিল নৈনিতাল। যেখান থেকে একটু সেরে এসেছিল। কিন্তু সে নামমাত্র। এ-অন্ত্রের রোগ যে সারবার নয় ও জানত। কিন্তু বলত: "ভাবনা কিসের? এখানেও যাঁর পায়ে আছি সেখানেও তাঁর পায়েই তো থাকব।"

নৈনিতাল থেকে ফেরার পথে আমাদের বাড়ীতে দশবারোদিন ছিল। যখন অন্ত্রের যন্ত্রণা বেশি বাড়ত চুপ ক'রে শুয়ে থাকত। দেখতাম শুধু ঠোঁট নড়ছে। আশ্চর্য, দেখতাম—দেহের এত কষ্ট, কিন্তু মুখে সে-ক্লেশের এতটুকুও ছাপ পড়ে নি! সেখানে শুধুই আলো, ছায়ার চিহ্নও নেই। যন্ত্রণার মধ্যেও

ঠিক তেমনি আপনভোলা প্রাণখোলা হাসি! মরণ যেন তাকে হার মানাতে এসে তার চরণ ধ'রে বলত: হার মেনেছি, কেবল একটু কাঁদো—বাইরের লোকের কাছে আমাকে এমন অপদস্থ কোরো না। তোমার মুখে অভয় দেখলে যে আমি লজ্জা পাই······

এ আমার কথা নয়—তোমাদের সুরথদার উপমা! তিনিও ভক্ত তো, তাই তাঁকে চিনেছিলেন।

কিন্তু শেষ দিনের কথা কী বলব দিদি? বলবার বেশি কিছু নেই। শুধু দেখবার ছিল অনেক কিছু—বিশেষ ক'রে তার মুখের আলো। সে আলো সত্যই যেন ছড়িয়ে পড়ত সারা ঘরময়। মৃদু নীরব হাসি—অথচ কী স্নিগ্ধ শান্ত কান্তি!

শেষেদিনে মন্দিরে তাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেলাম। ঠাকুর ও রাধারাণীর দিকে তাকিয়ে বলল "আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও।"

কথায় জড়তার লেশ ও নেই।

বসে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে তোমার সুরথদাকে বলল তোমার সেই গানটি আবৃত্তি করতে—যেটি ললিতার মুখে আমরা শেষ শুনেছিলাম:

ইৎনা করো হরীজী, জব অন্তকাল আয়ে
হরিনাম মুখসে লেতে য়ে নৈন বন্দ হো জায়ে।

উনি গানটি আবৃত্তি ক'রে তাকালেন ওর মুখের পানে, শুধালেন: "ঘরে যাবে?"

ও বলল: "না, ঠাকুরের চরণেই থাকব। ঐ গানেই তো আছে: 'প্রভু তুম ন দূর হোনা—জব অন্তকাল আয়ে'।"

ব'লেই ওঁকে বলল অপরূপ হেসে: "তপতী আর অসিতকে লিখে দিও সুরথদা, যে, যাবার আগে আমি তাদের জন্যে শুধু এই প্রার্থনা করেছি—যেন এই গানটি তাদের হৃদয়ের তারেও বেজে ওঠে বিদায় বেলায়।"

ব্যস, আর কিছু বলেনি। কেবল শেষ নিশ্বাস নেবার একটু আগে যুগল বিগ্রহের দিকে চেয়ে বলল: "রাধারাণী! এসেছ? এসো।"

দুচোখ দিয়ে শুধু দুটি সরু ধারা নামল।

শেষ কথা : "আমার নৌকো চলেছে পাল তুলে……জয় রাধে !"

তোমার ফ্লোরা বৌদি

*   *   *

তপতী (চোখের জল মুছে) : না, দাদাজি, কাঁদব না। কেবল প্রার্থনা করব—তাঁর আশীর্বাদে যেন আমাদের নৌকাও বিদায় বেলায় পাল তুলে চলে রাধারাণীর করুণার হাওয়ায়। জয় রাধে গোবিন্দ রাধেশ্যাম !

অসিত (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে গাঢ়-কণ্ঠে) : জয় রাধে গোবিন্দ রাধেশ্যাম !

সমাপ্ত